চার্লস ফ্রিয়ার এণ্ডরুজ

মলিনা রায়

চার্লস ফ্রিয়ার এণ্ডরুজ

দীনবন্ধু এণ্ড্রুজ

অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর - অঙ্কিত

চার্লস ফ্রিয়ার এণ্ডরুজ

মলিনা রায়

বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ
কলিকাতা

অধ্যায়সূচী

চিত্রসূচী

প্রচ্ছদে মুদ্রিত এণ্ডরুজের রেখাচিত্র শ্রীমুকুল দে কর্তৃক অঙ্কিত

সূচনা

প্রতিটি মানুষই যাত্রী। বেশির ভাগ মানুষ কিন্তু ভুলে যায় তার স্বলক্ষণ, তার আসল চরিত্র। তাই তাদের সারা জীবনের চলার মধ্যে সুর আসে না, ছন্দও ফোটে না। তাদের চলাটা নিরুপায় হয়ে চলার সামিল হয়ে ওঠে। আসেন এক-এক জন মহৎ যাত্রী যাঁর জীবনযাত্রার প্রতিটি পর্ব একটি অখণ্ড সুরে বাঁধা, একটি অজেয় মনের আলোকে উদ্‌ভাসিত। কত বন্ধুর পথ ধরে তাঁকে চলতে হয়, কত ভুল-বোঝার ভার তাঁকে করতে হয় বহন ও কত অহেতুকী নিন্দার শিলাবৃষ্টি তাঁকে সহ্য করতে হয়। তবুও সব আঘাত সহ্য করে পথ চলেন এই ধরনের অসামান্য যাত্রী মানব-প্রেমের অনির্বাণ শিখা অন্তরে জ্বালিয়ে।

বিশ্ব-পথের এইরকমই একজন মহান যাত্রী ছিলেন চার্লস ফ্রিয়ার এণ্ডরুজ। ১৮৭১ খ্রীস্টাব্দে ইংলণ্ডের এক মধ্যবিত্ত পরিবারে তাঁর জন্ম। পিতামাতার ধার্মিক জীবন তাঁর জীবনটিকে ঘিরে একটি প্রশান্ত ও নির্মল বায়ুমণ্ডল সৃষ্টি করে রেখেছিল। তাঁদের এই সন্তানটির জীবনের সুর তাঁরাই বেঁধে দিয়েছিলেন।

১৮৯০ খ্রীস্টাব্দে কেম্‌ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হয়ে অসাধারণ বুদ্ধিমত্তার পরিচয় দিয়ে ১৮৯৫ খ্রীস্টাব্দে তিনি এই বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্যতম শ্রেষ্ঠ পুরস্কার 'বার্নি পুরস্কার' লাভ করেন। যে বিষয়টি নিয়ে প্রবন্ধ লিখে তিনি এই পুরস্কার পান সেটিও প্রণিধানযোগ্য। তাঁর প্রবন্ধের বিষয়টি ছিল—'মূলধন ও শ্রম, এই দুয়ের সংঘাতের সঙ্গে খ্রীস্টধর্মের সম্বন্ধ'। শ্রমিক-আন্দোলনের স্রোত তখন প্রবলভাবে বয়ে চলেছে ইংলণ্ডে। ধর্মের দোহাই দিয়ে সেই আন্দোলনকে পাশ কাটিয়ে যান নি এণ্ডরুজ। মজুর-আন্দোলন সম্বন্ধে তাঁর চিন্তার পরিধি ছিল যেমন ব্যাপক তেমনি গভীর। এই সময়ে তিনি বিশপ ওয়েস্টকট-পরিচালিত 'ক্রিশ্চান সোশ্যাল য়ুনিয়ন'-এ যোগদান করেন এবং ওয়েস্টকটের মধ্যস্থতায় ডারহামের কয়লাখনির মজুরদের ধর্মঘটের অবসান ঘটান। প্রগাঢ় শ্রদ্ধা ছিল এণ্ডরুজের এই ধার্মিক মানব-দরদী ধর্মযাজকের প্রতি। ওয়ালওয়ার্থের গরিব ডক-শ্রমিকদের ও ফেরিওয়ালাদের মধ্যে এণ্ডরুজ বেশ কিছুকাল ধরে যে কাজ করেছিলেন, তার প্রেরণার উৎস ছিলেন বিশপ ওয়েস্টকট।

কিন্তু অন্তর্দ্বন্দ্ব ও মানসিক সংঘাতের শেষ কোথায় মহৎ জীবনে? খ্রীস্টধর্মে একান্ত বিশ্বাসী এণ্ডরুজ আনুষ্ঠানিক খ্রীস্টধর্মের প্রচলিত বিধিগুলির থেকে

আঘাতের পর আঘাত পেতে লাগলেন। যারা খ্রীস্টান নয় তাদের মুক্তি নেই, তাদের জন্য অনন্ত নরকবাস— এই ধারণা তাঁর মনকে ব্যথিত করল। খ্রীস্টদেবের করুণার ও অহিংসার সঙ্গে খ্রীস্টধর্মের এই বিধিটিকে তিনি কিছুতেই মিলিয়ে নিতে পারলেন না। খ্রীস্টীয় সমাজের যে বিশেষ সম্প্রদায়ভুক্ত ছিলেন তাঁর বাপ-মা সেই 'আরভিন্-আইট্' সম্প্রদায়ের সঙ্গে সব সম্পর্ক ছিন্ন করলেন এণ্ডরুজ ১৮৯৫ খ্রীস্টাব্দে। ধর্মের ক্ষেত্রে কোনো আপস সম্ভব নয় এই প্রত্যয় থাকায় বাবা-মা দুঃখ পাবেন জেনেও তিনি এই কাজটি করলেন। এই ব্যথার পথ ধরেই এণ্ডরুজ এগিয়ে চললেন সত্যের দিকে।

মায়ের মুখে ভারতবর্ষের কথা শুনেছিলেন তিনি শিশুকাল থেকেই। তরুণ বয়সেই তাই তাঁর মনে জেগেছিল ভারতবর্ষে যাওয়ার স্বপ্ন। তখন কিন্তু তাঁর বিশ্বাস ছিল যে ইংরেজ ভারতবর্ষের প্রভূত কল্যাণ সাধন করছে, ভারতবর্ষকে সাহায্য করছে নয়া দুনিয়ার পথে এগিয়ে যেতে। ১৯০৪ সালের বিশে মার্চ তারিখে এণ্ডরুজ ভারতবর্ষে এসে পৌঁছন। এই দিনটি ছিল তাঁর পরম প্রিয় দিন। এই দিনটিকে তিনি তাঁর দ্বিতীয় জন্মদিন বলে অভিহিত করেছেন।

ভারতবর্ষে এসে ইংরেজ-শাসনের প্রত্যক্ষ পরিচয় পেয়ে এণ্ডরুজ মর্মান্তিক আঘাত পেলেন। খ্রীস্টধর্মে বিশ্বাসী একটি জাতি অন্য একটি জাতির সঙ্গে এইরকম অসংস্কৃত ও নিষ্ঠুর ব্যবহার করতে পারে— এটি তাঁর ধারণার বাইরে ছিল। ভারতে খ্রীস্টীয় ধর্মপ্রচারকদের মধ্যে জাতিভেদের অস্তিত্ব তাঁকে বিস্মিত ও দুঃখিত করল। ভারতবর্ষের জীবনের সঙ্গে তাঁর চিন্তার ও ভাবের যোগস্থাপনের কাজ এগিয়ে চলল ধীরে ধীরে। তিনি বুঝতে পারলেন যে তার সত্তাটিকে ফিরে পাওয়ার জন্যে ভারতকে স্বাধীনতা লাভ করতেই হবে।

ঐতিহাসিক ধারার অন্তর্নিহিত অভিপ্রায় আকস্মিকতার মধ্যে দিয়ে আপনাকে প্রকাশ করে। জীবনে এমন-সব অপ্রত্যাশিত যোগাযোগ ঘটে যার ফল সুদূরপ্রসারী হয় মানব-ইতিহাসে। ১৯১২ সালে লণ্ডনে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে এণ্ডরুজের প্রথম দেখা' এমনি একটি ঐতিহাসিক ঘটনা। এই সাক্ষাৎটি নবজীবনের সূচনা করল এণ্ডরুজের জীবনে। সব-কিছু থেকে নিজেকে সরিয়ে নিয়ে ভারতের সেবায় তাঁর জীবনকে নিবেদিত করবেন— এই সংকল্পে পৌঁছলেন তিনি। ভারতের খ্রীস্টান সমাজের সঙ্গে যুক্ত থেকে যে কাজ তিনি করে আসছিলেন এত বছর, সেই কর্মক্ষেত্র থেকে এবারে তাঁকে সরে আসতে

হবে, এটাও বুঝতে পারলেন তিনি। খ্রীস্ট-ভক্ত এই মানুষটি উপলব্ধি করলেন যে, খ্রীস্টান সমাজ যে পথ ধরে চলেছে ইংরেজ-শাসিত ভারতবর্ষে, সে পথ খ্রীস্টদেব-প্রদর্শিত পথ নয়।

১৯১২ সালে লেখা একটি চিঠিতে এণ্ডরুজ রবীন্দ্রনাথকে লিখলেন—"আমার প্রাণ চায় যথার্থ স্বাধীন ভারতের মূর্তিটি দেখব। অথচ দেশের বর্তমান অবস্থায় সেটি কি সম্ভব? পরাধীনতার ও দুর্নীতির পাপচক্র কেবলই আবর্তিত হয়ে চলেছে শাসক ও শাসিতদের মধ্যে।" ১৯১৩ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে এণ্ডরুজ শান্তিনিকেতনে যান প্রথমবারের মতো। রবীন্দ্রনাথ তখন বিদেশে। এই বছরের সেপ্টেম্বর মাসে গান্ধীজি সত্যাগ্রহ আন্দোলন শুরু করেন দক্ষিণ-আফ্রিকায়। দক্ষিণ-আফ্রিকায় সত্যাগ্রহ আন্দোলনের সাহায্য-কল্পে অর্থসংগ্রহের জন্যে সারা ভারত পরিক্রমা শুরু করেন গোখেল। এণ্ডরুজের সঙ্গে তাঁর দেখা হয় লাহোরে। সত্যাগ্রহ আন্দোলনে গান্ধীজিকে সাহায্য করবার জন্যে এণ্ডরুজকে দক্ষিণ-আফ্রিকায় যেতে অনুরোধ করেন গোখেল। এণ্ডরুজ সঙ্গে সঙ্গে রাজী হন। ভারতবর্ষ ছাড়বার আগে এণ্ডরুজ ও পিয়ার্সন শান্তিনিকেতনে যান রবীন্দ্রনাথের আশীর্বাদ নেওয়ার জন্যে। রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে তাঁরা আর-একবার দেখা করেন জোড়াসাঁকোর বাড়িতে। মহর্ষিদেবের ঘরে নিয়ে গিয়ে রবীন্দ্রনাথ উপনিষদের দুটি মন্ত্র লিখে দেন তাঁদের যাত্রার পাথেয়-স্বরূপ।

১৯১৪ সালের পয়লা জানুয়ারি দিনটিও ভারত-ইতিহাসের একটি স্মরণীয় দিন, এই দিন এণ্ডরুজ ডারবানে পৌঁছন আর জাহাজঘাটে গান্ধীজির সঙ্গে তাঁর প্রথম সাক্ষাৎ। এমনি করে ভারতের দুজন শ্রেষ্ঠ পুরুষের সঙ্গে এণ্ডরুজের মিলন ঘটল। সত্যাগ্রহ আন্দোলনকে সফল করে তোলবার জন্যে দক্ষিণ-আফ্রিকায় এণ্ডরুজ যে অসামান্য কাজ করেছিলেন তার তুলনা নেই। এণ্ডরুজ না থাকলে জেনারল স্মাট্‌স-এর সঙ্গে গান্ধীজির চুক্তি সম্পন্ন হত কি না সন্দেহ। শরীর অসুস্থ থাকা সত্ত্বেও তিনি গান্ধীজি ও স্মাটস্‌-এর মধ্যে যোগাযোগ স্থাপনের কাজ অশ্রান্তভাবে করেছিলেন। তাঁর পরম ভালোবাসার মা মরণাপন্ন জেনেও তিনি গান্ধীজিকে একলা ফেলে মাকে দেখতে ইংলণ্ডে যান নি। ডারবানে থাকাকালীনই মায়ের মৃত্যুখবর পেলেন। রবীন্দ্রনাথকে লিখলেন—'অনেক সময় ভেবেছি অবাক হয়ে ভারতের প্রতি আমার এই গভীর প্রেম কোথা থেকে এল। আজ এই শান্ত মধুর ক্ষণে

আমার আরাধ্যতমা মায়ের সুন্দর জীবনটির স্মৃতি সম্মুখে রেখে বুঝতে পারছি ভারতের প্রতি আমার প্রেমের মূলে রয়েছে মায়ের ভক্তিপ্লুত চিত্তের গভীর অনুরাগ।··· ভারতবাসীর দৃষ্টিতে আমার মায়ের চোখের দৃষ্টি আর ভারতের মাতৃমুখে আমার মায়ের মুখখানি দেখতে পাব।'

এত গভীর ভালোবাসা নিয়ে ভারতের সেবায় নিজেকে নিবেদিত করেছিলেন তিনি। তবুও জীবন তাঁকে নিষ্ঠুর আঘাত হানতে ছাড়ে নি। দক্ষিণ-আফ্রিকা থেকে ভারতে ফিরে এলেন ভগ্ন শরীর ও মায়ের মৃত্যুতে ব্যথিত হৃদয় নিয়ে। এখানে এসে শুনলেন যে এদেশে অনেকে তাঁকে ব্রিটিশের চর বলতে কুণ্ঠিত হল না। এই মর্মান্তিক আঘাতের দিনে তাঁর অন্তরের একমাত্র সম্বল ছিল তাঁর প্রতি গান্ধীজির ও রবীন্দ্রনাথের অপরিসীম ভালোবাসা।

ভারতবর্ষের প্রতিটি আন্দোলনের সঙ্গে এণ্ডরুজের যোগ ছিল অসীম। জালিয়ানওয়ালাবাগের ঘটনার পর তিনি অমৃতসরে যান। সেখানে স্টেশনেই তাঁকে আটক করে দিল্লীতে ফেরত পাঠিয়ে দেয় পাঞ্জাব গভর্নমেণ্ট। জালিয়ানওয়ালাবাগের হত্যাকাণ্ডের বে-সরকারি তদন্তের যে ব্যবস্থা হয় তার সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত ছিলেন এণ্ডরুজ। ইংরেজ শাসকেরা পাঞ্জাবে ভারতবাসীর অপমান যেভাবে ঘটাল তার প্রতিবিধানের জন্যে তিনি বদ্ধপরিকর হলেন। দীপ্ত ভাষায় বললেন—'আমি মনে প্রাণে এই কথাই বলতে চেয়েছি যে কেবল স্বাধীনতাই ভারতের আত্মসম্মান ফিরিয়ে আনতে পারে।' ১৯২১ সালের উনিশে জানুয়ারি কলকাতার ছাত্রদের এক সভায় তিনি বললেন—'ভারতের স্বাধীনতা আমার খ্রীস্টধর্মের এক নীতি। ইংলণ্ড যদি আয়র্ল্যাণ্ড ও ভারতবর্ষকে সামরিক শক্তির সাহায্যে অধীন করে রাখে— তবে সে-ইংলণ্ডের প্রতি আর আমার পূর্বের অনুরাগ অটুট থাকবে না। ভারতবর্ষও যদি তার অনুন্নত সম্প্রদায়কে উন্নত না করে তবে সে আর আমাদের স্বপ্নের ভারত থাকবে না।'

আমরা আগেই দেখেছি যে কেম্‌ব্রিজে থাকাকালীনই শ্রমিক-আন্দোলনের সঙ্গে তাঁর সংযোগ হয়েছিল আর যে রচনাটির জন্যে তিনি কেম্‌ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্যতম শ্রেষ্ঠ পুরস্কারটি পান সেটিও মজুর-আন্দোলনের সঙ্গে খ্রীস্টধর্মের কী সম্বন্ধ হবে তারই আলোচনা। চিরদিনই তাঁর গভীর দরদ ছিল গরিব মজুরদের প্রতি। ১৯২১ সালে যখন আমাদের দেশের রেলওয়ে মজুরেরা ধর্মঘট করে তখন সেই মজুরদের পাশে গিয়ে দাঁড়ান এণ্ডরুজ।

১৯২৫ সালে নিখিল ভারত ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেসের নাগপুর অধিবেশনে এণ্ডরুজকে ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেসের সভাপতি নির্বাচিত করা হয়।

ধনতান্ত্রিক সমাজ-ব্যবস্থা সম্বন্ধে তাঁর মনোভাবের সুস্পষ্ট পরিচয় পাই আমরা ১৯২০ সালের ৯ সেপ্টেম্বর তারিখে গান্ধীজিকে লেখা একটি চিঠি থেকে। এই চিঠিতে এণ্ডরুজ লেখেন— 'ক্যাপিটালিজমের বিরুদ্ধে সংগ্রামে বল্‌শেভিক নীতি আমরা কতটা গ্রহণ করতে পারি? ভারতবর্ষে আমরা কি ক্যাপিটালিজমের সম্পূর্ণ বিরোধী? সাম্রাজ্যবাদেরও পুরো বিরোধী নই বোধ হয়। আমি নিজে অবশ্য ক্রমশই বুঝতে পারছি যে এই দুটি জিনিস আসলে এক।'

তাঁর লেখা এই কয়েকটি লাইন খুবই গুরুত্বপূর্ণ। দেখা যাচ্ছে যে ভারতবর্ষের স্বাধীনতা-আন্দোলন যে ক্যাপিটালিজম্-বিরোধী নয়, এমন-কি, পুরোপুরি সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধীও নয় এই সন্দেহ তাঁর মনে জেগেছিল। গান্ধীজি যখন খিলাফৎ আন্দোলনকে সমর্থন করলেন তখনই বোধ হয় ভারতের স্বাধীনতা-আন্দোলন সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী কি না এই সন্দেহ জাগে এণ্ডরুজের মনে। তাঁর নিজের যে ধারণাটি তিনি সুস্পষ্টভাবে আমাদের জানিয়েছেন সেটি হচ্ছে এই যে ক্যাপিটালিজম্ ও আধুনিক কালের সাম্রাজ্য-বাদ— এ দুটিই হচ্ছে এক— একই বীজ থেকে এদের উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ।

খিলাফৎ আন্দোলনকে এণ্ডরুজ আদবেই সমর্থন করেন নি। এ বিষয়ে তিনি বহু চিঠি লেখেন গান্ধীজিকে। একটি চিঠিতে লেখেন—'খিলাফৎ নীতি তুরস্ক সাম্রাজ্যকে এমন পবিত্র মনে করে যে অন্য জাতির স্বাধীনতা খর্ব করে— এর প্রতি আমার অসীম ঘৃণা। তুমি এখনো স্পষ্টভাবে আমার প্রশ্নের জবাব দিতে পার নি। প্রশ্নটি অতি সহজ। তুমি কি আরব, আর্মেনিয়া ও সিরিয়ার স্বাধীনতা অস্বীকার করবে? তাদের দেশ তো তাদের নিজের, তুরস্কের নয়।'

আরো লিখলেন—'যে খিলাফৎ অটোমান সাম্রাজ্যের দাবি করে তাকে আমি কিছুতেই মানতে পারি না। কারণ সে দাবি ভারতের স্বাধীনতার মূলেই কুঠারাঘাত করবে। কোনোরকম সাম্রাজ্যের একেবারেই বিরোধী আমি।'

ভারতীয় সংস্কৃতি, ভারতের বিশ্বাত্মবাদ ও বিশ্বসংস্কৃতি— এই তিনটি বিষয়ে গান্ধীজির ধারণাগুলিকে তিনি গ্রহণ করেন নি। এই-সব বিষয়ে তিনি একান্তভাবে রবীন্দ্রনাথের অনুগামী ছিলেন। বিশ্বভারতীর জন্যে প্রয়োজনের

সময় অর্থসংগ্রহ করে রবীন্দ্রনাথের বহু দুশ্চিন্তার ভার লাঘব যেমন তিনি করেছিলেন তেমনি ভারতে ও ভারতের বাইরে নানা দেশে বিশ্বভারতীর আদর্শ প্রচার করে তাকে বিশ্ববাসীর কাছে পরিচিত করেছিলেন। রবীন্দ্র-নাথের প্রতি তাঁর গভীর ভালোবাসা যে রূপ নিয়েছিল বিশ্বভারতীর সেবায় তার তুলনা নেই। গান্ধীজি ছিলেন তাঁর প্রিয়তম বন্ধু, রবীন্দ্রনাথ ছিলেন তাঁর অন্তরের গুরু।

এই অনুপম মানুষটির জীবনী লিখেছেন শ্রীমতী মলিনা রায়। এই জীবনী লিখতে তিনি যে কত পরিশ্রম করেছেন নানা জায়গা থেকে মালমশলা সংগ্রহ করতে, সেটি তাঁর বইটি পড়লেই বোঝা যায়। দীনবন্ধু এণ্ডরুজের প্রতি তাঁর অপরিসীম শ্রদ্ধার পরিচায়ক এই বইটি। রবীন্দ্রনাথ ও এণ্ডরুজের মধ্যে যে-সব পত্রবিনিময় হয়েছিল সেগুলি স্বভাবতই হয়েছিল ইংরেজি ভাষায়। সেই চিঠিগুলির মধ্যে থেকে কতকগুলির অনুবাদ করেছেন শ্রীমতী মলিনা রায়। ইতিপূর্বে সেগুলি বিশ্বভারতী থেকে 'রবীন্দ্রনাথ-এণ্ডরুজ পত্রাবলী' নামে প্রকাশিত (১৩৭৪) হয়েছে।

দীনবন্ধু এণ্ডরুজের কাছে ভারতবাসী চিরঋণী। তাঁর মতো ভারত-সেবক, দীনের বন্ধু ও বিশ্বমানব-প্রেমিক এই পৃথিবীতে বিরল। তাঁর ভারত-প্রেমের ও ভারত-সেবার পূর্ণ পরিচয় আছে এই বইটিতে। তথ্য-ঐশ্বর্যে ও পরিবেশন-সরসতায় সমৃদ্ধ দীনবন্ধু এণ্ডরুজের এই জীবনী নিঃসন্দেহে আমাদের চিত্তকে শুদ্ধ করবে ও আনন্দ দেবে।

১ মার্চ ১৯৭০

সৌম্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর

নিবেদন

চার্লস ফ্রিয়ার এণ্ডরুজ ছিলেন ভারতের স্বাধীনতা-সংগ্রামের একনিষ্ঠ সেবক, বিশ্বভারতীর আদর্শপ্রচারে রবীন্দ্রনাথের একান্ত সহকারী বন্ধু, গান্ধীজি ও দ্বিজেন্দ্রনাথের সহোদর ভ্রাতৃতুল্য। প্রেমাবতার যীশুখ্রীস্টের রাজাধিরাজ মূর্তি প্রত্যক্ষ করেন তাঁর পরমারাধ্য গুরুদেবের মধ্যে, আর বিদেশী শাসনে নিপীড়িত ভারতের দীন জনগণকে ক্রুশবিদ্ধ যীশুখ্রীস্টের জীবন্ত বিগ্রহরূপেই তিনি দেখেছেন।

এই খ্রীস্টভক্তের কর্মময় জীবনের সম্পূর্ণ আলেখ্য উন্মোচিত করা সহজসাধ্য নয়, কারণ তিনি নিজেকে অন্তরালে রেখেই আমৃত্যু ভারতের সেবা করে গেছেন; জীবনে কখনো নেতার আসন গ্রহণ করেন নি। বন্ধুজনের কাছে লেখা তাঁর অজস্র পত্রের মধ্যে তাঁর প্রতিদিনকার জীবনচর্যার ছবি পাওয়া যায়। রবীন্দ্রনাথের কাছে লেখা পত্রগুলি ছাড়া অধিকাংশই এখন দুষ্প্রাপ্য। এণ্ডরুজ শতবর্ষপূর্তি উপলক্ষে তাঁর পত্রগুলি প্রকাশিত হলে ভারতবাসী এই মানবদরদী বন্ধুকে আরো ঘনিষ্ঠভাবে জানতে পারবেন।

'রবীন্দ্রনাথ-এণ্ডরুজ পত্রাবলী' নিয়ে কাজ করার সময়েই দীনবন্ধু এণ্ডরুজ শতবার্ষিকী উপলক্ষে বাংলাভাষায় তাঁর একটি জীবনীগ্রন্থ প্রকাশের বাসনা আমার মনে জাগে। কারণ বাংলাভাষায় রচিত তাঁর কোনো জীবনীগ্রন্থ নেই। বিশ্বভারতীর আনুকূল্য না পেলে অবশ্য আমার এ ইচ্ছা সফল হত না। সেজন্য বিশ্বভারতী কর্তৃপক্ষের নিকট আমি বিশেষ কৃতজ্ঞ।

এ কাজে যাঁরা আমাকে উৎসাহদান করেছেন তাঁদের মধ্যে পূজনীয়া প্রতিমা দেবী এবং শ্রদ্ধেয় শরৎচন্দ্র দত্ত আর ইহলোকে নেই। শ্রীনিত্যানন্দ-বিনোদ গোস্বামী রোগশয্যায় থেকেও নানাভাবে আমাকে পরামর্শদান করেছেন। যাঁদের সক্রিয় সহানুভূতি লাভ করেছি তাঁদের মধ্যে শ্রীবিনয়েন্দ্র-নাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীশৈলেশচন্দ্র সেন, শ্রীরামসিং তোমর ও শ্রীমতী অশোকা গুপ্তের নাম উল্লেখযোগ্য। রবীন্দ্রজীবনীকার শ্রীপ্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় পাণ্ডুলিপি পড়ে নানাভাবে কাজের নির্দেশ দিয়েছেন। অধ্যাপক শ্রীভূদেব চৌধুরী বহু পরিশ্রমে পুস্তকটিকে সুসংবদ্ধ আকার দান করেছেন। শ্রীশোভন-লাল গঙ্গোপাধ্যায় ও শ্রীচিত্তরঞ্জন দেবের সহায়তায় রবীন্দ্রসদনে রক্ষিত মূল চিঠিপত্র ও দুষ্প্রাপ্য পুস্তক এবং পত্রপত্রিকাদি ব্যবহারের সুযোগ পেয়েছি।

পাঠভবনের সহকর্মীদের মধ্যে শ্রীঅনাথনাথ দাস ও শ্রীমতী উমা ঘোষের সহায়তা স্বীকার করি। প্রচ্ছদ ও চিত্র -নির্বাচন করেছেন শ্রীপুলিনবিহারী সেন। শ্রীজগদিন্দ্র ভৌমিকের অক্লান্ত অধ্যবসায়ের ফলে পুস্তকটি এণ্ডরুজ জন্ম-শতাব্দীতে প্রকাশিত হল। তা ছাড়া শ্রীসুবিমল লাহিড়ী ও শ্রীগগন দে প্রুফ-সংশোধন ও ভাষার যথাযথ পরিমার্জনের জন্য বহু আয়াস স্বীকার করেছেন। শ্রীঅনুপম রায়ের সহযোগিতাও স্মরণ করি। এঁরা সকলেই আমার ধন্যবাদার্হ। পুস্তকটি কিন্তু গবেষণাগ্রন্থ নয়। এর মূল উদ্দেশ্য সর্বমানবিকতায় উদ্‌বুদ্ধ, প্রেমে কোমল, অথচ কর্তব্যনিষ্ঠায় অটল চার্লি এণ্ডরুজের জীবনকথা সর্ব-সাধারণে পরিচিত করা। এণ্ডরুজের বৈচিত্র্যপূর্ণ জীবন ভবিষ্যতে বহু লেখকের রচনার বিষয় হবে মনে করে এই ক্ষুদ্র দীপশিখাটি রেখে গেলাম।

শান্তিনিকেতন
৭ পৌষ ১৩৭৮

মলিনা রায়

চার্লস ফ্রিয়ার এণ্ডরুজ

১

ইংলণ্ডে

জন্মকথা ও শৈশবস্মৃতি। মা বাবা যীশুখ্রীস্ট

মানুষের ইতিহাসে নবজাতকের আবির্ভাব এক পরম বিস্ময়; নূতন প্রাণ আনে নবীন সম্ভাবনার ইঙ্গিত। তবু বিকাশের ধারায় সব আশা তো পূর্ণ হয় না, নূতন প্রায় সর্বদাই তলিয়ে যায় পুরাতনের আবর্তে। ক্বচিৎ দু-একজনের জীবন-ইতিহাসে দেখি নূতনত্বের ছাড়পত্র অম্লান, মানব-মনের চিরকালের বিস্ময় তাঁরা, মানবহৃদয়ে রয়েছে তাঁদের নিত্যকালের আসন পাতা।

রবীন্দ্রনাথের মতে বুদ্ধ সেই নবজাতকদের পরমতম একজন, অপরজন যীশুখ্রীস্ট। এ যুগে খ্রীস্টসেবক চার্লস এণ্ডরুজ আপন সীমিত জীবনপাত্রে নবজাতক যীশুখ্রীস্টের অনির্বাণ আলোক-শিখাটিকে অখণ্ড প্রদীপের মতো বয়ে ফিরেছিলেন। মানবচেতনার ইতিহাসে তাই সে-জীবন কখনো পুরাতন হবে না, জীর্ণ হবে না তার প্রকাশমাধুরী। ইংলণ্ডে ভারতবর্ষে আফ্রিকায় —অধ্যাপনা ও ধর্মযাজনা থেকে রাজনীতি ও শ্রমিক আন্দোলন; বিচিত্র-ভূমিক মানবসেবার গভীরে ঈশ্বরসেবার চরিতার্থতা, সবকিছু মিলে চার্লস ফ্রিয়ার এণ্ডরুজ এক অবিস্মরণীয় কীর্তিদীপ্ত নূতন প্রাণ।

জন্মসূত্রে পিতামাতার কাছ থেকেই এই মহাপ্রাণ তাঁদের প্রগাঢ় ধর্মশীলতা, অকপট সরলতা ও নিঃস্বার্থ প্রেমের অধিকারী হন। পিতা জন এডুইন ধর্মযাজক, মাতা মেরী শার্লট ধর্মপ্রাণা স্নেহশীলা রমণী। তাঁদের বাস ছিল টাইন নদীর তীরে নিউকাস্‌লে। তাঁদের চৌদ্দটি ছেলেমেয়ের একজন হলেন চার্লি[১]; পিতার চতুর্থ সন্তান। ১৮৭১ খ্রীস্টাব্দের ১২ ফেব্রুয়ারি তাঁর জন্ম।

মা ছিলেন নিরলস গৃহকর্মপরায়ণা ও নিঃস্বার্থ সেবাময়ী। বৃহৎ পরিবার পরিচালনায় স্বামীকে সাংসারিক চিন্তাভাবনার উর্ধ্বে রাখায় ছিল তাঁর সযত্ন প্রয়াস।[২] এত যে কর্মব্যস্ত তবু মুখে ছিল শান্ত হাসির দীপ্তি। যীশুখ্রীস্টের বিষয়ে সন্তানদের তিনি শিক্ষা দিয়েছিলেন উপদেশ দিয়ে নয়, নিজ জীবনের

---

১ এক ভারতীয় হৃদয় [বনারসীদাস চতুর্বেদী], ভারতভক্ত এণ্ডরুজ, পৃ. ২।

২ C. F. Andrews, 'My Life Story", *Visva-Bharati Quarterly*, May 1940, পৃ. ৯।

দৃষ্টান্তে। দিনের শেষে ছেলেমেয়েদের কাছে টেনে নিয়ে যখন প্রার্থনামন্ত্র গাইতেন তখনই মাতার প্রতি শ্রদ্ধায় শিশুচিত্তগুলি উদ্‌বেল হত, শান্তির ধারা যেন চারি দিকে বর্ষিত হত।

চার বছর বয়সে চার্লি একবার বাতের জ্বরে মরণাপন্ন হয়েছিলেন। তখন তাঁর পাশে বসে শীর্ণ হাত-দুখানি নিজ হাতে নিয়ে মা তাঁকে শোনাতেন প্রভু যীশুর কথা। তাই সে অল্পবয়সে ঈশ্বর ও যীশুখ্রীস্ট সম্বন্ধে তাঁর একটি অস্পষ্ট ধারণা হয়। সুস্থ সবল থাকলে হয়তো তা এত সহজে হত না।

সে সময়কার একটি ঘটনা তাঁর খুব মনে পড়ত।[১] বহুদিন জীবন ও মৃত্যুর মধ্যে দোলা খেয়ে বাঁচার আকাঙ্ক্ষা তিনি প্রায় ত্যাগ করেছিলেন। একদিন ভোরে চোখ মেলতেই নজরে পড়ল অপূর্ব সুন্দর একটি ফুল, মা বিছানার পাশে রেখে গেছেন যাতে ঘুম ভেঙেই সেটি তিনি দেখতে পান। ফুলটির সৌন্দর্য তাঁকে মুগ্ধ সচকিত করল। তিনি যেন নবীন জীবনে সঞ্জীবিত হলেন। বেঁচে ওঠার স্বাভাবিক আগ্রহ তাঁকে ক্রমশ সুস্থ করে তুলল। পরবর্তীকালে কর্মজীবনের কঠিন বিপর্যয় ও চিন্তাধারার বিচিত্র পরিবর্তনের মধ্যেও এণ্ড্রুজ কোনোদিন ঈশ্বর, যীশুখ্রীস্ট ও অমরতা সম্বন্ধে বিশ্বাস হারান নি। তিনি মনে করতেন, শৈশবে রোগশয্যায় শুয়ে মায়ের মধ্যে যে শান্ত আধ্যাত্মিক গভীরতা দেখেছিলেন, তারই প্রভাবে এ সম্ভব হয়েছিল।

অতি শৈশবে যীশুখ্রীস্ট সম্বন্ধে এণ্ড্রুজের মনে যে বোধ জাগে তাতে তাঁর মা-বাবাই ছিলেন তাঁর চোখে খ্রীস্টের প্রতিচ্ছবি। রাখাল-রাজা (Good Shepherd) যীশুখ্রীস্টের যে রঙিন ছবি ঘরে ছিল সেটি দেখলে মায়ের মুখ মনে পড়ে তিনি আনন্দে অধীর হতেন।

ছেলেবেলার কথা ভাবতে গেলে আরো কয়েকটি ছবি তাঁর চোখে ভাসত।[২] প্রথম হল খ্রীস্টোৎসবের আগের রাতে আগুনের ধারে মা বসে আছেন, তারই আলো মায়ের মুখে এসে পড়েছে। ছেলেমেয়েরা তাঁকে ঘিরে বসে তাঁর মুখে গল্প শুনছে বেথলিহেমের সেই দেবশিশুর জন্মকথা। মা বলে চলেছেন— সেই নবজাতকের সন্ধানে মরুভূমি পেরিয়ে পূর্বদেশ থেকে তিনজন জ্ঞানীব্যক্তি এসেছিলেন কেবলমাত্র আকাশের তারার দিকসংকেতে। একজন

---

১ C. F. Andrews, *What I Owe to Christ* (1932), পৃ. ৪৬-৪৭।

২ তদেব, পৃ. ৬০।

চীন থেকে, একজন আফ্রিকা থেকে আর-একজন ভারতবর্ষ থেকে এসেছিলেন। তখন মায়ের মুখে শোনা সে-সব দূরের দেশের নামগুলির মধ্যেও কেমন যেন একটা রহস্যময় জাদু মাখানো থাকত। পরদিন ভোরে উঠে ভাইবোনরা চুপি চুপি মায়ের ঘরের বন্ধ দরজার সামনে দাঁড়াতেন। কিছুক্ষণ ফিসফাস চলত। হঠাৎ একসঙ্গে জোরে গেয়ে উঠতেন প্রার্থনা-মন্ত্র— খ্রীস্ট-ভক্তদল, জাগো জাগো (Christian, awake)— এ-সবের মধ্যে তখন জেগে উঠত অদ্ভুত এক রোমাঞ্চ।

এণ্ডরুজ যখন খুবই ছোটো তখন সমস্ত পরিবার বার্মিংহামে চলে আসেন। দু ভাই চার্লি আর বার্টি ছোটো বোন ইডিথকে সঙ্গে নিয়ে মিস হিপকিন্সের স্কুলে যান।[১] শৈশবেই প্রাকৃতিক দৃশ্যের যে-কোনো নতুন ঐশ্বর্য তাঁর মনে অফুরন্ত আনন্দের দোলা জাগাত। বনমধ্যে সূর্যালোকের আভা, বাড়ির বাগানে বহুবর্ণের ফুলের সমারোহ অথবা পাকা ফসলের শিষে সূর্যাস্তের শেষ স্পর্শ, জলের উপর আলোর ঝিকিমিক, বৃষ্টি-ধৌত আকাশে মেঘের বর্ণসম্ভার— এ-সব দেখলে তিনি অভিভূত হতেন।

বনের মধ্যে ডোবার ধারে পাখির বাসা দেখে একদিন আহ্লাদে তাঁর প্রাণ নেচে উঠল।[২] কাছে গিয়ে দেখেন তাতে রয়েছে চারটি ডিম— একটুখানি নীলের আভা মেশানো সাদা রঙের। তখনই সে চারটি ডিম নিয়ে ছুটে বাড়ি এসে উচ্ছল উৎসাহে মা-বাবাকে দেখালেন। মা একটু আড়ালে ডেকে নিয়ে যখন বললেন, মা-পাখি ফিরে এসে খালি বাসা দেখলে কত কষ্ট পাবে— তখনই সব উৎসাহ মুহূর্তে যেন নিবে গেল। বাবাও ধীরে ধীরে বোঝালেন যে সব-কটি ডিমই নিয়ে আসা তো খুবই অন্যায় কাজ হয়ে গেছে। পক্ষিমাতার কথা চিন্তা করে অন্তত দুটি একটি রেখে আসতে হত। এর পরে অনুশোচনায় সারারাত আর ঘুম এল না চার্লির চোখে। সকালে ডিম চারটি রেখে আসবেন ভেবে বনে ঢুকে কোথাও সেই জায়গাটি আর খুঁজে পেলেন না। নিরাশ ক্ষুব্ধ মনে বাড়ি ফিরে জীবনে সেই প্রথম তিনি ঈশ্বরের কাছে ক্ষমাভিক্ষা করলেন।

কল্পনাপ্রবণ শিশু ছিলেন বলে অল্পবয়সে ধর্মভয়ও ছিল তাঁর অত্যধিক।[৩]

---

১ Benarasidas Chaturvedi & Marjorie Sykes, *Charles Freer Andrews* (1949), পৃ. ৩।

২ C. F. Andrews, *What I Owe to Christ*, পৃ. ৬৭-৬৮।

৩ তদেব, পৃ. ৬১-৬২।

একবার ঝগড়ার সময় রাগ করে দাদাকে বোকা বলে ফেলেছিলেন। তার পর থেকে কয়েকদিন বাইবেলে বর্ণিত নরকাগ্নির চিন্তা তাঁকে অস্থির করে তুলেছিল। ঈশ্বরকে তিনি তখনো প্রেমময় বলে জানেন নি। ভয়ে সম্ভ্রমে দূরের বস্তু বলে মনে করতেন কিন্তু যীশুখ্রীস্টকে মনেপ্রাণে ভালোবাসতেন।

এণ্ডরুজের পিতৃদেব জন এণ্ডরুজ বার্মিংহামের যে গির্জার যাজক ছিলেন সেখানে উপাসক-সংখ্যা কম ছিল কিন্তু তাঁদের ধর্মনিষ্ঠা ছিল প্রবল।[১] এঁরা ছিলেন অতিথিপরায়ণ স্বজনবৎসল সজ্জন। এঁদের সুদৃঢ় ঐক্যবন্ধনে বেঁধেছিল যে একটি বিশ্বাস সেটি হল ত্রাণকর্তা প্রভু যীশু স্বর্গ থেকে নেমে এসে শীঘ্রই এই ধরাধামে অবতীর্ণ হবেন। সেই আশাতেই যেন তাঁরা জীবনধারণ করতেন। খ্রীস্ট-সাধক এডওয়ার্ড আরভিঙের নামানুসারে এঁদের আভিঙ্‌পন্থী বলা হত। কিন্তু জন এণ্ডরুজের সেটা পছন্দ হত না। তিনি বলতেন, এ আন্দোলন কোনো মানুষের সৃষ্ট নয়। স্বয়ং ঈশ্বরই এই ভবিষ্যদ্‌বাণী করে গেছেন। যীশুর দ্বিতীয়বার অবতরণে যে আর বিলম্ব নেই সে বিষয়ে এণ্ডরুজ-দম্পতি সংশয়-রহিত। Catholic Apostolic Church—এই নামটি তাঁরা পছন্দ করতেন। বাইবেলে যে বারোজন খ্রীস্টদূতের (Apostle) কথা বর্ণিত আছে তাঁদের নিয়ন্ত্রণাধীনে খ্রীস্টসংঘ যীশুখ্রীস্টের আগমন প্রতীক্ষা করবে নববরসমাগমে সুসজ্জিতা বধূর মতো। যীশুখ্রীস্টের আসার সময় হয়ে গেছে, খ্রীস্টসংহতিকে এবার তাই প্রস্তুত হতে হবে।

উপাসনার প্রধান অংশ ছিল খ্রীস্টপ্রসাদ গ্রহণের অনুষ্ঠান ; প্রতি রবিবার খুব জাঁকজমক করে সেটি হত। উপাসকমণ্ডলীতে বড়োরাও থাকতেন শিশুরাও থাকত। এণ্ডরুজ যখন খুব ছোটো তখন দীর্ঘসময় গির্জায় বসে থাকার বিষম ক্লান্তি তাঁকে পীড়ন করত। ছেলের অস্থিরতা দেখে মা তাঁকে পাশে বসাতেন, নানা উপায়ে তাঁকে শান্ত রাখার চেষ্টা করতেন। মাঝে মাঝে রঙচঙে প্রার্থনাপুস্তকও চার্লির হাতে দিতে হত।

প্রার্থনামন্ত্রপূত নৈবেদ্য-গ্রহণের শান্ত ক্ষণে উপাসকদের মধ্যে কেউ কেউ হঠাৎ উঠে ভবিষ্যদ্‌বাণী করতেন।[২] স্তব্ধ ঘরে একটি স্বরের গুঞ্জন উঠে হঠাৎ আবার থেমে যেত। এ ব্যাপার শিশুদের মনে অনেকসময় অপূর্ব এক শ্রদ্ধা-মেশানো আতঙ্কের সৃষ্টি করত।

---

১ C. F. Andrews, *What I Owe to Christ*, পৃ. ৭২।

২ তদেব, পৃ. ৭৯।

সে সময় কল্পনার অন্তর্জগৎ এণ্ডরুজের চোখে এত স্পষ্ট ছিল যে তিনি সে-রাজ্যে অবাধে বিচরণ করতেন।[১] অন্তরের দৃষ্টিতে যে ছবি ভেসে উঠত তা প্রত্যক্ষ করার আশ্চর্য ক্ষমতা শৈশবেই তাঁর ছিল। বাইরে যা দেখা যায় না তা তিনি চোখে দেখেছেন বললে দিদি রেগে গিয়ে তাঁকে বলতেন, 'তুমি মিথ্যে বলছ।' চার্লি বলতেন, 'সত্যিই যে আমি দেখলাম।'

যেদিন প্রার্থনাসংগীত অভ্যাস করতে গির্জায় গিয়ে ফিরতে সন্ধ্যা হত, সেদিন চার্লি রুদ্ধশ্বাসে বাড়ির দিকে ছুটতেন। কবরস্থানের ধূসর পাথরগুলির দিকে চোখ পড়লেই মনে হত এই বুঝি মৃতব্যক্তিরা বেরিয়ে আসছেন। তাঁর কেমন ভয় করত। নিজেদের ঘরের চিমনি-আগুনের উত্তপ্ত সান্নিধ্যে ফিরে এসে তবে তাঁর ভয় কাটত। অথচ এ-সব কথা সংকোচে কারো কাছে প্রকাশ করতে পারেন নি, এমনই লাজুক প্রকৃতি ছিল তাঁর।

পরিবার ক্রমশ বড়ো হতে লাগল। বাড়িও বদল হল। মিস্ হিপকিন্সের ছোটো স্কুলের পরে মিঃ ডিকিনের স্কুলে ভর্তি হলেন এণ্ডরুজ। কিন্তু তখনো পিতাই ছিলেন ছেলেদের সবচেয়ে বড়ো শিক্ষক। শরীরে মনে তিনি ছিলেন সবল সুস্থ, ধর্মজীবনে দৃঢ়বিশ্বাসী। প্রকৃতির সৌন্দর্যে বিস্ময়বিমুগ্ধ হবার দৃষ্টি তাঁকে চিরকিশোর করে রেখেছিল। ছেলেদের আদর্শ সঙ্গী হয়েই তিনি ছিলেন। নিউকাস্‌লে যখন ছেলেরা খুবই ছোটো তখনো তিনি তাঁদের সমুদ্রের ধারে বেড়াতে নিয়ে যেতেন। এখানে বার্মিংহামে এসে শহরের ধোঁয়া থেকে অনেক দূরে সাট্‌ন পার্কে নিয়ে গিয়ে ছেলেদের কখনো সাঁতার শেখাতেন, কখনো ক্রিকেট খেলায় উৎসাহ দিতেন। চার্লির মধ্যে গভীর প্রকৃতিপ্রীতি জাগিয়েছিলেন তাঁর পিতা। কেননা জন এণ্ডরুজ অন্তরে ছিলেন কবি, তাঁর শেষজীবন অতিবাহিত হয় কবিতারচনায়।

শৈশবে রোগভোগের ফলে চার্লি শারীরশ্রমে কাতর হতেন, তাই বইয়ের মধ্যে পেলেন তাঁর কল্পনাপ্রবণ চিত্তের আশ্রয়। পিতার আলমারিতে ছিল ওয়ালটার স্কটের কবিতা ও উপন্যাসের কীটদষ্ট খণ্ডগুলি।[২] সাহিত্যজগতে এই তাঁর প্রথম প্রবেশ। তাই এঁর রচনার প্রভাব চার্লির জীবনে যতখানি প্রবল এমন আর কারো নয়। স্কট্-এর লেখার নৈতিক আদর্শের দিকটি তাঁর

---

১ C. F. Andrews, *What I Owe to Christ*, পৃ. ৮০।

২ তদেব, পৃ. ৫০।

চিন্তারাজ্যে প্রথম গভীর রেখাপাত করে। শান্তিনিকেতনে এসে রবীন্দ্রনাথের বড়দাদা দ্বিজেন্দ্রনাথের কাছে যখন শুনলেন যে তাঁর জীবনেও স্কট্-এর প্রভাব অনেকখানি— তখন শৈশব-স্বপ্নের রাজ্য স্কটিশ হাইল্যাণ্ডের সৌন্দর্য-কল্পনা মুহূর্তে উভয়কে একই ঘনিষ্ঠতার সূত্রে বেঁধে দিয়েছিল।[১] স্কট্-এর উপন্যাসগুলি পাঠকালে সাটন পার্কে গিয়ে কল্পনায় স্কট্-এর নায়কদের সঙ্গে চার্লি নির্জনে বিচরণ করতেন। সেখানে তিনি কখনো আইভ্যান হো, কখনো রব্ রয়, কখনো বা মারমিয়ানের সঙ্গী।[২] তার পর ক্রমশ নিজেদের বাড়ির ছোট্ট বাগানেও একা একা এই অভিনয় হত। এমনি করে নির্জনতায় তাঁর স্বপ্নের জগৎ রূপ পেতে শুরু করল। কোনো মানুষের কাছেই তাঁর চিন্তার জগৎটিকে মেলে ধরতে পারতেন না বলে নিজের কল্পনা-ঘেরা আকাশেই ছিল তাঁর নিত্যবিহার।

স্কট্-এর উপন্যাস পড়ে কৈশোরেই তিনি এক আশ্চর্য ক্ষমতার অধিকারী হয়েছিলেন। এই যে প্রত্যক্ষ জগৎ, ভগবান যীশুর অনন্ত প্রেমের ক্ষেত্র— তার সৌন্দর্য-অনুভূতির শক্তি যেন এখানেই তিনি প্রথম পেলেন। তখন থেকে প্রাকৃতিক বা আধ্যাত্মিক— সব সৌন্দর্যই তাঁর মনে ঈশ্বরানুভূতি জাগাত।

ছেলেবেলায় বাবার হাত ধরে বিকেলে যখন বেড়াতে বেরতেন তাঁর সঙ্গে পা মিলিয়ে চলতে চলতে মন দিয়ে তাঁর কথা শুনতেন। এই বেড়ানোতে তাঁর নিজের উৎসাহ তো ছিলই, তা ছাড়া অমন মনোযোগী শ্রোতা পেয়ে তাঁর বাবারও বলার আনন্দ যেত বেড়ে। মানবজীবন ও ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে নিজের মনোভাব তখনই তিনি ছেলের কাছে ব্যক্ত করতেন। ছেলের সঙ্গে ইতিহাস রাজনীতি ও ধর্মের আলোচনাও করতেন সমবয়স্ক বন্ধুর মতো। জন এণ্ডরুজের মতে এ জগতের পরিচালন-ক্ষমতা একান্তভাবে ঈশ্বরেরই হাতে, মানুষ বুদ্ধি ও শক্তি -মত্ততায় মনে করে নিয়ন্ত্রণবিধি বুঝি তারই অধিকারে।

ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের মাহাত্ম্যে পিতার বিশ্বাস ছিল অপরিসীম। মহারানী ভিক্টোরিয়া ব্রিটিশ দ্বীপপুঞ্জের রানী ও ভারতবর্ষের সম্রাজ্ঞী— এ তাঁর পরম গর্বের বিষয় ছিল। চার্লিকে একখানি সুন্দর রঙিন ছবির বই উপহার দিয়েছিলেন। সে পুস্তকে চীনের আফিঙ-সংগ্রাম সংক্রান্ত বিষয়টিকে পর্যন্ত

---

১ C. F. Andrews, *What I Owe to Christ*, পৃ. ৫১।

২ Chaturvedi & Sykes, *Charles Freer Andrews*, পৃ. ৬।

ইংরেজদের গৌরবের তালিকায় স্থান দেওয়া হয়েছে। সিপাহী-বিদ্রোহের ইতিহাসে সেনানী হ্যাভলক, আউটরাম ও লরেন্সের কথা এমন আবেগের উচ্ছ্বাসে তিনি বলতেন যে চার্লির কল্পনাপ্রবণ শিশুচিত্ত উৎসাহে উদ্দীপ্ত হত। ব্রিটিশ শাসন-ব্যবস্থায় কোনো অন্যায় কোনো ত্রুটির কথা ভারতবর্ষে আসার আগে পর্যন্ত এণ্ডরুজ কখনো শোনেন নি। পিতাও অকপটে বিশ্বাস করতেন তাঁর দেশের লোক বিদেশে গিয়ে কখনো পাপাচরণ করতে পারে না।

শিশু চার্লি একদিন বেড়িয়ে এসে মাকে ডেকে বললেন, তাঁকে যেন রোজ খাবারের সঙ্গে চারটি ভাত দেওয়া হয়।[১] বড়ো হয়ে তাঁকে যে ভারতবর্ষে যেতে হবে। বাবার কাছে শুনেছেন ভারতবাসীরা ভাত খায়। তাই সেখানে যাবার আগে ভাত খাওয়া অভ্যাস করে নিতে হবে তো! ভাতের কথায় মা হেসে বললেন, অদ্ভুত ছেলে। কিন্তু তাঁর কণ্ঠস্বরে বেদনার আভাস পাওয়া গেল। হয়তো মন বলল, এ ছেলে বড়ো হলে আর ঘরে থাকবে না। সন্তানদের মধ্যে চার্লি ছিলেন তাঁর বড়ো আদরের, আর চার্লির জীবনে মায়ের ভালোবাসাই ছিল পরম ঐশ্বর্য।

পিতার সম্বন্ধে লিখতে গিয়ে চার্লি বলেছেন[২]—

ঠাকুরদাদার মতো আমার বাবার মধ্যেও আত্মত্যাগের একটি তীব্র আকাঙ্ক্ষা ছিল। সংসারের প্রতি এমন বৈরাগ্য আর কারো দেখি নি। পার্থিব কোনো বস্তুর কোনো আকর্ষণ তাঁর ছিল না। কী খেতেন কী পরতেন সে-সব ব্যাপারে ছিলেন সম্পূর্ণ উদাসীন।... আধ্যাত্মিক জগতে জন্মগত অধিকার বলে যদি কিছু থাকে তবে তা আমি পেয়েছি বাবার কাছ থেকে। শেষ দিকে তিনি ধর্মবিষয়ে আমাদের একটি ছোট্ট উপদেশই কেবল দিতেন। সেটি হল, 'বিবেক যে পথ দেখাবে, সব বাধা উপেক্ষা করে সেই পথেই চলবে।' আত্মার গভীরে গোপন রয়েছে যে অমৃতময় বাণী— সেই তো বিবেক। তিনি নিজেও যেমন অন্তরের এই আলো ধরেই চলতেন, আমাদেরও সেই শিক্ষাই দিয়েছেন। বলেছেন, পবিত্র হৃদয়ে সত্যের পথে অগ্রসর হলেই সে আলো ক্রমশ উজ্জ্বলতর হবে। খ্রীস্টান জীবনের এই আদর্শই শিশুর সারল্যে তিনি নিজে মেনে চলেছেন আমরণ।

---

১ C. F. Andrews, *What I Owe to Christ*, পৃ. ৬৬

২ তদেব, পৃ. ৩৭-৩৮

শৈশবের একটি ঘটনার কথা এণ্ডরুজের বিশেষ করে মনে পড়ত।[১] আকস্মিক দৈন্য ও বিপর্যয় নিয়ে এলেও ঘটনাচক্রটি শেষ পর্যন্ত তাঁদের পারিবারিক কল্যাণ বহন করে এনেছিল।

এণ্ডরুজের মায়ের উত্তরাধিকারসূত্রে পাওয়া অনেক সম্পত্তি ছিল। পিতা তাঁর এক বন্ধুর হাতে সেগুলি তত্ত্বাবধানের ভার দিয়েছিলেন।[২] একদিন খবর পাওয়া গেল মায়ের যা অর্থসম্পদ সব নিয়ে পিতৃবন্ধুটি একেবারে দেশ ছেড়ে উধাও হয়েছেন। পিতা সব শুনে স্তম্ভিত হয়ে গেলেন, আঘাতটি তাঁর পক্ষে মর্মান্তিক হয়েছিল। কেননা সেই অর্থ ছিল মায়ের আর বিশ্বাসঘাতকতা করলেন পিতারই এক বন্ধু। সন্ধ্যা-উপাসনার সময় এল। পিতা বাইবেল থেকে সেই অংশটি পড়লেন, 'যদি তুমি শত্রুরূপে আসতে তবে এ আঘাত আমার সহ্য হত কিন্তু তোমাকে যে বন্ধু বলে বিশ্বাস করেছিলাম।' এর পরের অংশে বাইবেলে যে অভিশাপবাণী রয়েছে তা আর তিনি উচ্চারণ করলেন না। অতি কষ্টে উদ্যত অশ্রু দমন করে সেদিন শুধু ঈশ্বরের কাছে বন্ধুর হয়ে ক্ষমাপ্রার্থনা করলেন।

এণ্ডরুজের বয়স তখন মাত্র নয় কি দশ। এই দৈবদুর্বিপাকে মা-বাবার প্রতি তাঁর শ্রদ্ধা আরো বেড়ে গেল। সমস্ত পরিবারটিও যেন পরস্পরের প্রতি ভালোবাসায় আরো দৃঢ়সম্বদ্ধ হল। তবে এণ্ডরুজের মতে এর সব চেয়ে বড়ো সুফল হল যে মোটামুটি সচ্ছল অবস্থা থেকে তাঁরা হঠাৎ দরিদ্র হয়ে গেলেন। এর পর থেকে ছেলেমেয়েদের খাওয়া-দাওয়া ও পড়াশুনার ব্যবস্থার জন্য পিতামাতাকে কঠিন পরিশ্রম করতে হত আর ছেলেরাও সে অল্পবয়সে তাঁদের কষ্ট লাঘবের কথা ভাবতে শিখলেন। বার্টিকে তো পড়া ছেড়ে অর্থ উপার্জনে মন দিতেই হল আর চার্লি তখন থেকে বৃত্তি নিয়ে নিজের লেখাপড়া চালিয়ে গেলেন, ছোটো ছোটো ভাইবোনদের পড়ারও কিছু সাহায্য করতে লাগলেন।

শিক্ষার্থীর ভূমিকায়

বার্মিংহামে ষষ্ঠ এডওয়ার্ডের নামে যে বিদ্যালয় আছে সেখানে চার্লি ভর্তি হলেন। ক্লাসের বয়ঃকনিষ্ঠ ছাত্রহিসাবে সহপাঠীদের অনেক উৎপাত তাঁকে

---

১ एक भारतीय हृदय [बनारसीदास चतुर्वेदी], भारतभक्त एण्डरूज, पृ. ६-८।

২ C. F. Andrews, *What I Owe to Christ*, পৃ. ৫৩।

সহ্য করতে হত। যখন থেকে হেডমাস্টার রেভারেণ্ড এ. আর. ভার্ডির ক্লাসে যেতে শুরু করলেন তখন মেধাবী ছাত্র হিসাবে স্কুলে তাঁর নাম হল। ক্রমে শারীরিক দুর্বলতাও অনেকটা কাটিয়ে উঠলেন। বৃত্তি পেয়ে চার্লি কেম্‌ব্রিজে পড়বেন ও তার পরে পিতার ধর্মযাজকবৃত্তি গ্রহণ করবেন— এই ছিল তাঁকে নিয়ে মাতাপিতার উচ্চাকাঙ্ক্ষা। ছেলেও মা-বাবার আশা চরিতার্থ করার চেষ্টায় ঐকান্তিক পরিশ্রমে পড়াশোনা করতে লাগলেন। তা ছাড়া খেলাধুলা ছবি-আঁকা বিতর্ক অভিনয়, সবেতেই স্কুলের প্রধান ছাত্রের সম্মান পেলেন।[১]

স্কুলের পাঠ শেষ করে কেম্‌ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হতে যাবেন, ঠিক এ সময়ে তাঁর জীবনে আমূল পরিবর্তন এল। ঘটনাটি বাস্তবে যে ভাবে ঘটেছিল তারই একটি বর্ণনা দিয়েছেন *What I Owe to Christ* গ্রন্থে।[২] বয়ঃসন্ধিকালে বিদ্যালয়ে পাঠকালে তাঁর জীবনে কতকগুলি প্রলোভন আসে। তার জন্য তিনি পূর্ব থেকে প্রস্তুত ছিলেন না। পরিবারের একান্ত স্নেহচ্ছায়ায় লালিত হবার পর হঠাৎ বৃহৎ বিদ্যালয়-ভবন, তার বড়ো বড়ো শ্রেণীবিভাগ— এ-সবের মধ্যে তিনি একান্ত অসহায় বোধ করতেন। ছাত্ররা সবাই তাঁর বয়োজ্যেষ্ঠ। তা ছাড়া তাঁর শরীর দুর্বল থাকায় তারা তাঁকে নির্মম উৎপীড়ন করত। শেষ পর্যন্ত আত্মরক্ষার জন্য তিনি অন্য ছাত্রদের অনুকরণে কতকগুলি কু-অভ্যাসের চর্চা শুরু করলেন। মনে জানতেন যে এ অন্যায় আচরণ। এতে তাঁর কোমল অন্তর্বৃত্তিগুলি ক্রমশ বিকৃত হতে লাগল। বাইরে থেকে দেখলে কোনো পরিবর্তন চোখে পড়ত না। কিন্তু সর্বদা একটি পাপবোধ তাঁকে পীড়া দিত।

সংশয়। সংশয়-মুক্তি

এরই মধ্যে বৃত্তি পেয়ে তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়তে যাবেন স্থির হল। পিতামাতা তাঁদের প্রত্যাশা আংশিক পূর্ণ হবার আনন্দে বিভোর। একদিন ভ্রমণকালে পিতা তাঁকে আগ্রহভরে বললেন যে ভবিষ্যতে অ্যাপস্‌লিক চার্চের সেবায় তিনি নিযুক্ত হবেন— এই তাঁদের আন্তরিক কামনা। তাঁর কথা শুনে পুত্রের চিত্তে আলোড়ন উপস্থিত হল। কারণ আচারভ্রষ্ট স্বভাব নিয়ে

---

১ Chaturvedi & Sykes, *Charles Freer Andrews*, পৃ. ৯, ১০।

২ C. F. Andrews, *What I Owe to Christ*, পৃ. ৮৮।

যাজকতায় বৃত হবার মতো কপটাচরণ তিনি করতেই পারবেন না। তবু তৎক্ষণাৎ সে কথা সরলভাবে পিতাকে জানিয়ে দেওয়া যে তাঁর কর্তব্য ছিল তাও পারলেন না।

সপ্তাহের পর সপ্তাহ কেটে যায়, বাবাকে বলা হয় না। একদিন রাতে শুতে যাবার আগে বিছানার পাশে জানু পেতে বসে প্রার্থনা করছেন। অপ্রত্যাশিতভাবে অকস্মাৎ অন্তরের পাপভাবনা ও অপবিত্রতার বোধ তীব্র-রূপে তাঁকে আঘাত করল। সে যেন বজ্রপাতের পূর্বে বিদ্যুতের চমক— ঘোর অন্ধকার ছাড়া আর কিছুই দেখা যায় না। দু হাতে মাথা ঢেকে সমস্ত পৃথিবী ভুলে আলোর সন্ধানে তিনি ভগবানের শরণ নিলেন। মানসিক যন্ত্রণার সে তীব্রতায় তিনি সময়ের জ্ঞানও হারিয়ে ফেলেছিলেন।

অনেক রাত পর্যন্ত সে সংগ্রাম চলল। অবশেষে প্রশান্তি ও ক্ষমাপ্রাপ্তির একটি আশ্চর্য চেতনা সত্তার গভীরে সঞ্চারিত হতে লাগল, অশ্রুধারা নিয়ে এল অপরিসীম স্বস্তি। তখন স্পষ্ট বুঝলেন যীশুই তাঁর ত্রাণকর্তা। তাঁর প্রেমে তিনি চিরতরে আবদ্ধ হলেন, পাপাসক্তি দূরে গেল।

প্রথম সচেতন চিন্তা তাঁর মাথায় এল বাইবেলে বর্ণিত কুষ্ঠরোগীদের কাহিনীটি। মনে পড়ে গেল যীশুখ্রীস্ট তাদের রোগ নিরাময় করলে তারা তাঁর জয়ধ্বনি করে। তাই তিনিও সেই রাত্রিশেষে গির্জায় উপাসনায় যোগ দিয়ে কৃতজ্ঞচিত্তে প্রভুর জয় ঘোষণা করতে প্রস্তুত হলেন। ঠিক প্রার্থনার শুরুতে গিয়ে সেখানে পৌঁছলেন। গত রাতের কথা চিন্তা করে মন কৃতজ্ঞতায় প্রেমে শান্তিতে নব-আনন্দে ভরপূর। যীশুখ্রীস্ট যে ক্ষমা করে তাঁকে আপন করে নিয়েছেন। গির্জায় প্রার্থনাসংগীত আর ধর্মগ্রন্থ পাঠ চলছে। পারিপার্শ্বিকের বন্ধনমুক্ত চিত্ত তখন অন্তরের গভীরে যে নবসংগীতের স্বরলহরী উঠছে, তারই সঙ্গে ভেসে চলেছে। গির্জার প্রার্থনার শেষ অনুরণন কানে আসতেই কোন্ ঊর্ধ্বলোক থেকে আশীর্বাদের ধারা তাঁর উপর ঝরে পড়তে লাগল। আগের রাতের শান্তি ও ক্ষমা হাজার গুণ হয়ে তাঁর চার দিকে বিশাল সমুদ্রের সৃষ্টি করল। সেই ভগবৎ-প্রেমের বন্যাধারা তরঙ্গে তরঙ্গে তাঁকে ভাসিয়ে নিল। কৃতজ্ঞ নমস্কারে নতজানু হয়ে অনেকক্ষণ গির্জায় বসে রইলেন সমস্ত সংসার ভুলে। বাইরের জগতের চেতনা এতখানি হারিয়েছিলেন যে গির্জার পাহারাদার এসে যখন কাঁধে হাত রাখল তিনি হঠাৎ চমকে উঠলেন।

বাড়ির পথে চলেছেন, সোনামাখা রোদে পথঘাট ভেসে যাচ্ছে। নতুন

জীবনের দীক্ষা মনেও যেন নববসন্তের দোলা দিয়েছে। মা-বাবা চুপ করে তাঁকে দেখলেন, সব বুঝলেন। তিনি কিন্তু এ বিষয়ে কারো সঙ্গে আলোচনা করতে পারেন নি। কারণ মনে হয়েছে এ এমন অভিজ্ঞতা একান্ত আপনজনকেও যা বলা চলে না। সেইদিন থেকে যীশুখ্রীস্ট তাঁর জীবনে প্রাণবন্ত হয়ে উঠেছেন। বাইবেল পাঠে তাঁর যে মূর্তি মনে জাগে সে মূর্তিতে নয়। অথবা কল্পনায় গ্যালিলি-তীরে তাঁর অনুসরণও এ নয়। যে প্রভু তাঁর চিরকালের ভালোবাসার ধন প্রতিদিনে প্রতিমুহূর্তে তাঁরই উপস্থিতি হৃদয়ের গোপন কন্দরে অনুভব করেছেন। যীশুখ্রীস্টের কাছে তাঁর ঋণ যে কতখানি বুঝতে গেলে এ ঘটনাটি জানা দরকার।

মায়ের মুখে শুনে শৈশবে যখন যীশুখ্রীস্টের চিন্তা করতেন মেঘের মধ্য দিয়ে তিনি আসছেন, তাঁকে যেন সত্যিই চোখে দেখতে পেতেন। একটু বড়ো হতেই সে ছবি দৃষ্টি থেকে মুছে গিয়েছিল। এবারের এই অন্তর্দর্শন কিন্তু সম্পূর্ণ আলাদা। এ ঈশ্বরেরই প্রচ্ছন্ন রূপায়ণ। তাঁরই অপূর্ব আবির্ভাব। এণ্ডরুজের অন্তরতম ভাবনায় ঈশ্বর ও যীশু একাকার হয়ে গিয়েছিলেন। ঈশ্বরের কথা চিন্তা করলেই যীশুখ্রীস্টের মুখ তিনি সামনে দেখতে পেতেন।

ঈশ্বর। মানুষ

এণ্ডরুজ বলেছেন[১]—

সংস্কৃতে একটি শব্দ আছে 'রূপম্'। ঈশ্বরের মধ্যে যা ছিল অনির্দেশ্য, অসীম ও নৈর্ব্যক্তিক যীশুতে তা হল নির্দিষ্ট, সসীম, ব্যক্তিগত। এভাবে যীশু আমার চোখে যথার্থই ঈশ্বরের রূপম্ হয়ে দেখা দিয়েছিলেন।

যীশুখ্রীস্টের নিগূঢ় রহস্য বলতে গিয়ে তিনি এ গ্রন্থে আরো লিখেছেন[২]—

যে হৃদয়ে তিনি প্রবেশ করেন, তাঁর সান্নিধ্য অনুভব করলে সে এই চোখেই মানবরূপে ভগবৎপ্রেম মূর্তিমান দেখে। যাঁকে আরাধনা করি সেই ঈশ্বর তখন আর অজানা থাকেন না। তিনি মানুষের মধ্যে দেখা দেন, তিনি আমাদের এত কাছে থাকেন যে আমাদের প্রত্যেক বেদনা তাঁকে আঘাত করে, আমাদের সকল পাপের দুঃখ তিনি ভোগ করেন। প্রেমে তিনি

---

১ C. F. Andrews, *What I Owe to Christ*, পৃ. ৯৮।

২ তদেব, পৃ. ১০১, ১০২, ১০৪।

আত্মদান করেন, প্রেমাস্পদের জন্য তিনি সকল বিদ্রূপ অপমান নিজে বহন করে স্বচ্ছন্দে ক্রুশে বিদ্ধ হন।

শুধু ভাবজগতে নয়, কর্মেও তিনি যে প্রেমস্বরূপ তা আমরা বিশ্বাস করি। ভগবানের প্রেম আমাদের অন্তর ভরে তোলে কর্মের অনুরাগে, তাঁর কর্মের আহ্বান আমাদের হৃদয়ে প্রতিধ্বনি তোলে গানের সুরে।... এ-সব অভিজ্ঞতা বাক্যে বিবৃত হয় না। কারণ বাক্য কেবল সত্যের প্রতীক হতে পারে কিন্তু সত্যি পৌছতে পারে না।

পরদিনই এণ্ডরুজ তাঁর নবলব্ধ আনন্দকে কার্যে রূপায়িত করতে চেষ্টা করেন। যে গির্জায় প্রতি রবিবার উপাসনা করেছেন তার পাশেই ক্যামডেন স্ট্রীটের বস্তিগুলোর দিকে এতকাল ফিরে তাকান নি। সেখানে দরিদ্রদের সঙ্গী হয়ে ছিল কুশ্রী পরিবেশ, মদের নেশা ও আনুষঙ্গিক কু-প্রবৃত্তি। আগে স্বপ্নেও কখনো এদের ঘরে গিয়ে দেখাশোনা করার কথা ভাবেন নি। এখন যীশুর আকর্ষণে এরা তাঁর প্রিয় হল। নিজ অভিজ্ঞতার কথা মুখে কাউকেও বলতে পারেন নি, কিন্তু বন্ধুত্বে আবদ্ধ হওয়া তো তাঁর পক্ষে কিছু কঠিন ছিল না। বস্তির ঘরে ঘরে গিয়ে সকলের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ পরিচয় করলেন যাতে প্রয়োজন হলে তাদের সেবায় লাগতে পারেন।

এই অনুভূতির মধ্য দিয়ে যেন চেতনার দিগন্তে নতুনের আভাস লেগে তাঁর প্রতিদিনের অস্তিত্বও নবীন হয়ে উঠল। আকাশের রঙ হল আরো ঘন নীল, প্রকৃতির মাধুর্য সহস্রগুণ বেড়ে গেল। পূর্ণিমার একটি রাত ভোর পর্যন্ত হেঁটে বেড়িয়েছেন, শারীরিক অবসাদ বা পীড়নের বোধও ছিল না। যে অধ্যাত্মস্তরে বাস করছিলেন, সবই তাতে স্বাভাবিক মনে হয়েছিল।

সব চেয়ে তাঁকে বেশি টানত মানুষের মুখ, বিশেষ করে তাতে যদি দুঃখ-দুর্দশার ছায়া পড়ত। সকলকেই যে-কোনো রকমে সাহায্য করার জন্য প্রাণ হাঁপিয়ে উঠত। যত ক্ষুদ্র সেবাই হোক, কারো নজরে না পড়লে তাতে যেন আরো বেশি আনন্দ পেতেন।

কেম্‌ব্রিজে পাঠার্থী

পরের মাসে কেম্‌ব্রিজে পেম্‌ব্রোক কলেজে এসে ভর্তি হলেন। সেখানে নদীর ধারে গাছের সারি, দেয়াল ঘিরে লাল লতানো ফুলের বাহার, চ্যাপেল থেকে ধর্মসংগীতের সুর ভেসে আসছে— আশ্চর্য এক স্বপ্নময় জগতে যেন প্রবেশ

করলেন। পুরানো বন্ধু গুলির সঙ্গে বসে কাব্য ও ধর্ম আলোচনা করতেন। অধ্যাপক চার্লস প্রায়রকে পেলেন শুভার্থী বন্ধুরূপে।

এণ্ড্রুজের জীবনের কেন্দ্রে রয়েছে এখন ধর্ম, কিন্তু নানা বিষয়ে তাঁর প্রদীপ্ত আগ্রহ। নৌকাবাইচে আর অন্যান্য খেলাধুলায় তাঁর উৎসাহের অন্ত ছিল না। সমবয়সী ছাত্ররা যখন তাঁর ঘরে এসে আলাপ-আলোচনা করতেন, তাঁরা দেখে অবাক হতেন যে কত বিচিত্র বিষয়ে চার্লির জ্ঞানের ক্ষেত্র বিস্তৃত। বন্ধুরা ঘর থেকে চলে গেলে মিনিট কুড়ি ঘুমিয়ে নিয়ে মধ্যরাত্রে আবার নতুন উৎসাহে পড়ায় মন দিতেন চার্লি।

স্বপ্নের মতো সুন্দর এ সময়কার আর-একটি ঘটনার ছাপ বহুকাল তাঁর মনে ছিল। সেই গভীর অনুভূতির বর্ণনা দিয়ে বলেছেন[১]—

সেই শরৎকালে ছুটিতে গ্রামে ছিলাম। একদিন লিচফিল্ড গির্জার দিকে চলেছি। বাইরের আকাশ যেমন আমার অন্তরাকাশও তেমনি আলোক-সমুজ্জ্বল। দূর থেকে গির্জার তিনটি চূড়া দেখে আমার মন আনন্দে গান গেয়ে উঠল। পথ অতিক্রম করলাম যেন হাওয়ায় ভেসে।...

গির্জায় বসে প্রার্থনাসংগীত শুনতে শুনতে হঠাৎ আমার কী যে হল বোঝাতে পারব না। স্থান কাল বাইরের জগৎ— সবই সরে গেল। আমি ঊর্ধ্বলোকে চলে গেলাম। সেখানে কল্পনাতীত আলোর রাজ্য। হঠাৎ আবার দেখি এ জগতে নেমে এসেছি। তখন আনন্দ-উদ্‌ভাসিত মনে ঘরে ফিরে চললাম।

রাস্তায় বেরতেই একটি ভিখারি ভিক্ষা চাইল। পকেট থেকে সব কটি পেনি বের করে যখন ওর হাতে দিই, হৃদয় আমার তখন আনন্দ-আবেগে উদ্‌বেল। অনেকক্ষণ কিছু খাই নি, বাড়ি ফেরার পথও অনেকখানি। তবু ফেরার পথের ক্লান্তি বা অনাহারের কষ্ট কিছুই বোধ করি নি। কেননা আমার প্রিয়তম তাঁর দিব্যপ্রেমে আমাকে যে আকর্ষণ করেছেন তার জন্য কৃতজ্ঞতা জানাবার সুযোগ পেয়ে আমি তখন কৃতার্থ।

১৮৯০ খ্রীস্টাব্দে কেম্‌ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের পেম্‌ব্রোক কলেজে ভর্তি হবার আগেই যে যীশুখ্রীস্টের কৃপালাভ করেছিলেন, এণ্ড্রুজ মনে করতেন সেটি তাঁর পরম সৌভাগ্য। নয়তো অন্তরের পরিবর্তন আসার আগে সেখানে গেলে তিনি ভেসে যেতেন। ভর্তি হয়েই আবার কলেজে টিউটর হিসেবে অধ্যাপক

১ C. F. Andrews, *What I Owe to Christ*, পৃ. ১০৬-১০৮।

চার্লস হেরম্যান প্রায়রকে পাওয়া— সেও তাঁর সুকৃতির ফল বলেই তিনি মানতেন। প্রায়র প্রথম পরিচয়েই তাঁর মানসিক অবস্থা বুঝেছিলেন। তার পর প্রশ্ন করে করে তাঁর গোপন কথাটি শুনে নিলেন। যে কথা এণ্ডরুজ এতদিন পর্যন্ত আর কাউকে বলতে পারেন নি— সেও এঁকে বলতে হল। ওঁরও নিজ জীবনে তরুণ বয়সে অনুরূপ অভিজ্ঞতা হয়েছিল। এঁর প্রতি এণ্ডরুজের হৃদয়ের শ্রদ্ধা ও অনুরাগ ক্রমে বেড়ে চলল।

ধর্ম ও সমাজ

অধ্যাপক প্রায়র ছিলেন প্রগাঢ় পণ্ডিত। অথচ শিশুর মতো সরল ছিল তাঁর প্রকৃতি। তাই এণ্ডরুজ তাঁর ছাত্র হয়েও বন্ধু হতে পেরেছিলেন। ক্রমে তাঁর গৃহ এণ্ডরুজেরও গৃহ হয়ে উঠল। তাঁর জীবন এমন সৎ ও পবিত্র ছিল যে কলেজে থাকতেই এণ্ডরুজ তাঁকে যীশুখ্রীস্টের প্রতিরূপ মনে করতেন। বিশ্ববিদ্যালয়-জীবনে নানা সমস্যা ও সংশয়ের ঘাত-প্রতিঘাতেও খ্রীস্টধর্মে বিশ্বাস এণ্ডরুজ যে অটুট রাখতে পেরেছিলেন সে কেবল অধ্যাপক প্রায়রের বন্ধুত্বের সংস্পর্শে আসার ফলে। ভারতবর্ষে আসার পূর্ব পর্যন্ত এমন বন্ধু তিনি আর পান নি। ডারহামের বিশপ ওয়েস্টকটের জামাতা ছিলেন চার্লস প্রায়র। বিশপ ওয়েস্টকট খ্রীস্ট সমাজ-সংঘের সভাপতি। এ সংঘের কাজ ছিল খ্রীস্ট-ধর্মের নৈতিক তত্ত্বগুলিকে বর্তমান যুগের সামাজিক ও অর্থনৈতিক সমস্যার সমাধানে নিযুক্ত করা। সংঘের কেম্‌ব্রিজ শাখার সেক্রেটারি হয়েছিলেন এণ্ডরুজ। এ কাজে তাঁর কোনো মানসিক দ্বন্দ্ব ছিল না, কারণ দীনদুঃখী শ্রমিকদের জন্য ওয়েস্টকটের সংবেদনশীলতার সঙ্গে এণ্ডরুজের ভাবনারও যে মিল ছিল। কেম্‌ব্রিজের দরিদ্র ছেলেদের রবিবাসরীয় ক্লাসে এণ্ডরুজ পড়াতেন আবার তাদের বাড়ি বাড়ি গিয়ে সাংসারিক সুখদুঃখের খোঁজখবরও নিতেন। ছুটির দিন কাটাতেন ওয়ালওয়ার্থের পেমব্রোক কলেজ-মিশনে। কেম্‌ব্রিজে ১৮৯৫ খ্রীস্টাব্দে তিনি যে বার্নি পুরস্কার পান তাঁর সে রচনার বিষয় ছিল 'পুঁজি ও শ্রমের দ্বন্দ্বে খ্রীস্টধর্মের স্থান'। এ রচনার প্রেরণা পান ওয়েস্টকটের সাহচর্যে ও খ্রীস্ট সমাজ-সংঘের কাজের মধ্যে।

বিশপ ওয়েস্টকটের প্রভাব যে এণ্ডরুজের জীবনে কতখানি তা বলে শেষ করা যায় না। এঁর কনিষ্ঠ পুত্র বেসিল ছিলেন এণ্ডরুজের ঘনিষ্ঠ বন্ধু। গরমের ছুটিতে কখনো কখনো এণ্ডরুজ এঁদের বাড়িতে গিয়ে থাকতেন।

তখন বিশপের সঙ্গে ধর্ম ও সমাজ বিষয়ে তাঁর নানা আলোচনা হত। বিশপ খ্রীস্টভক্তদের এক নতুন ধরনের সংঘবদ্ধ জীবনের আদর্শ মনে পোষণ করতেন। প্রাচীন সন্ন্যাসী-সংঘের মতো সুপরিমিত হবে এদের জীবনধারণ-পদ্ধতি। দরিদ্র জীবনযাপন, বিদ্যাচর্চা ও ভগবৎ-আরাধনা— এ তিনটি হবে এদের লক্ষ্য। সংঘ যাদের নিয়ে গঠিত হবে তাদের ব্রহ্মচারীর একক জীবন যাপন চলবে না। বহু খ্রীস্টভক্ত পরিবারের সমষ্টিযোগেই এটি গঠিত হবে। এণ্ডরুজের চিন্তাজগতে এ ভাবটি গভীর রেখাপাত করেছিল। নিজে কৌমার-জীবন যাপন করলেও গৃহস্থজীবনই যে মানবজীবনের শ্রেষ্ঠ আদর্শ এ কথা মনে-প্রাণে মানতেন।

বিশপ ওয়েস্টকটের জীবনের আরো একটি ঘটনার প্রভাব এণ্ডরুজের জীবনে পড়েছিল। শিল্পে মালিক-শ্রমিক বিরোধের প্রতি প্রকৃত খ্রীস্টানের মনোভাব কী হবে— এই ছিল এণ্ডরুজের জিজ্ঞাস্য। ডারহামে একবার আশি হাজার কর্মী তিনমাস ধরে কয়লাখনিতে ধর্মঘট করে। ওয়েস্টকট খনি-কর্মচারীদের জানতেন, তাদের ভালোও বাসতেন। আবার খনির মালিকরা যেমন কর্মচারীরাও তেমনই তাঁকে মানত। তাঁর মধ্যস্থতায় আপস হয়, ধর্মঘটও মিটে যায়। পরবর্তী জীবনে এণ্ডরুজ অনেক ক্ষেত্রে অনেক বিরোধের নিষ্পত্তি করেন নিজে মধ্যস্থ থেকে।

শাস্ত্র বনাম সর্বমানবিক প্রেমধর্ম

পেমব্রোক কলেজে পাঠকালে ধর্মবিষয়ে তাঁর মনে নানারূপ দ্বিধাসংশয় জাগে। বন্ধুদের সঙ্গে নিয়মিত তিনি উপাসনা-সভায় যোগ দিতেন। খ্রীস্টান ধর্মগ্রন্থের একটি প্রতিপাদ্য বিষয় হল, অ-খ্রীস্টান জনগণ অনন্তকাল দণ্ডভোগ করবে। যে যীশুখ্রীস্ট ঈশ্বরের অনন্ত প্রেম জগতে প্রচার করেছেন, তাঁর সম্বন্ধে এরূপ বিপরীত ধারণা অত্যন্ত অধার্মিক চিন্তা বলে এণ্ডরুজের মনে হত। মানবত্রাতা যীশুর কল্পনায় নরকের স্থান কোথায়? তিনি বলেছেন, একটি পাখির মৃত্যুও আমাদের পরমপিতাকে বেদনা দেয়।

তাই একদিন সন্ধ্যায় বন্ধুদের সঙ্গে এ বিষয়ে আলোচনার পর বাইবেল খুলে টেবিলের সামনে বসে এণ্ডরুজ এ-সব বিষয় চিন্তা করছিলেন। অন্তরের যে আলো এতদিন পথ দেখিয়েছিল তা ক্রমশ অস্পষ্ট হয়ে আসছিল। কিন্তু ঈশ্বর চিরপ্রেমময় এতে তো সন্দেহ নেই। যত শাস্ত্রগ্রন্থের প্রমাণ এর বিপক্ষে

যাক— এ বিশ্বাস ত্যাগ করা তাঁর পক্ষে আধ্যাত্মিক আত্মহত্যারই সমান। অথচ যে সম্প্রদায়ে তাঁর জন্ম, তাঁদের পক্ষে শাস্ত্রবাণীর অর্থ অমোঘ ঐশ্বরিক নির্দেশ।

এভাবে চিন্তা করছেন, ঠিক সে সময়ে তাঁর সামনে এল একটি জ্যোতির্ময় আবির্ভাব।[১] এমন একটি দর্শন ঘটল যাতে আবার তাঁর জীবনের ধারা পরিবর্তিত হল। বাইরের কোনো মূর্তি এ নয়, কেবল একটি নিকট সান্নিধ্য —তাতে অসীম শান্তি পেলেন। সেই আভ্যন্তরীণ দীপ্তিতে তাঁর সমগ্র সত্তা শুচিস্নাত হল। এ বিষয়েও কাউকে কিছু বলেন নি। তবে এতে তাঁর চলার পথে নতুন সাহসের সঞ্চার হয়েছিল। অন্তরের আলো উজ্জ্বলতর হয়ে তাঁকে পথের নির্দেশ দিল।

জন্মগত ধর্মসম্প্রদায়ের সঙ্গে সম্পর্কচ্ছেদ

১৮৯৫ খ্রীস্টাব্দ। ধর্ম সম্বন্ধে তাঁর মনের যে দ্বন্দ্ব তার সমাধান অবিলম্বে প্রয়োজন। প্রায় পাঁচ বছর কেম্‌ব্রিজে আছেন, ধর্মজীবনে নূতন অভিজ্ঞতা সঞ্চয় হয়েছে। বাড়িতে বাবা হৃদ্‌রোগে আক্রান্ত। তবু আত্মগোপন করে থাকবার আর উপায় নেই। এই অবস্থাতেও নিজের মানসিক পরিবর্তনের খবর জানিয়ে দিলেন তাঁকে। তীব্র আঘাত পেলেন পিতা, মায়ের মনের উদ্‌বেগ চোখে মুখে প্রকাশ পেল, অথচ কিছু বললেন না তিনি। পিতা বিশ্বাসই করতে চান না যে পুত্রের শৈশবের ধর্মবিশ্বাসে সংশয়ের আলোড়ন সৃষ্টি হয়েছে। তাঁর ধারণা হল বিদ্যার অহংকার ছেলেকে ভুলপথে নিয়ে যাচ্ছে। একখানি চিঠি লিখে এণ্ডরুজ আবার নিজের মনের অবস্থাটি তাঁকে জানালেন। তাতে পিতা আরো উত্তেজিত হয়ে পড়লেন। এরূপ মানসিক সংগ্রাম বহুদিন চলেছিল।

এ দিকে ট্রাইপজ পরীক্ষা এসে গেছে। এ পরীক্ষায় প্রথম শ্রেণীতে উত্তীর্ণ না হলে ফেলোশিপ পাবেন না। বন্ধুদের পরামর্শ চাইলেন— পরীক্ষাটা আগে হয়ে যাক, ধর্মসম্বন্ধে জটিল প্রশ্নের মীমাংসা হবে তার পরে, কী বল? প্রিয় বন্ধু বেসিলের চেষ্টায় এ দ্বন্দ্বের অবসান ঘটল। সমবয়স্ক বন্ধুদের মধ্যে বেসিল ছিলেন ঘনিষ্ঠতম। তিনি বুঝিয়ে বললেন, এণ্ডরুজ যদি নিজের

---

১ C. F. Andrews, *What I Owe to Christ*, পৃ. ১১৪।

বিবেকের নির্দেশ এভাবে অগ্রাহ্য করেন তাতে তাঁর নৈতিক অধঃপতন ঘটবে। এতে তাঁদের বন্ধুত্বেরও অবসান হবে। বাইবেল থেকে উদ্ধৃতি দিয়ে বেসিল বললেন, সর্বাগ্রে ভগবদ্-রাজ্যের সন্ধান করো, অন্য সব সাংসারিক বিষয় আপনি তোমার আয়ত্ত হবে।

এ-সব শুনে এণ্ড্রুজের চোখ খুলল। তিনি বুঝলেন অধ্যাত্মক্ষেত্রে ভাবনার ধারা বাড়ির সঙ্গে বিচ্ছেদ নিয়ে এলেও এ কঠিন পথে তাঁকে এগোতেই হবে। গ্রামে গিয়ে নির্জনে একাকী এ বিষয়ে চিন্তা করলেন। ফিরে এসে পিতৃ-পিতামহের আর্ভিঙাইট্ সম্প্রদায় ত্যাগ করে পরীক্ষার মাত্র তিন সপ্তাহ আগে পড়ায় মন দিলেন। কিন্তু মন তখন তাঁর শান্ত। পরীক্ষার ফল বেরলে জানা গেল বিশেষ সম্মানের সঙ্গে তিনি উত্তীর্ণ হয়েছেন। গত দশ বছরের মধ্যে কেম্‌ব্রিজের কোনো ছাত্র এমন উত্তরপত্র লেখে নি।

নূতন দীক্ষা। নবীন কর্মক্ষেত্রে

লিচফিল্ড ক্যাথিড্রেলে এণ্ড্রুজের হস্তার্পণ অনুষ্ঠানের (confirmation) আয়োজন হয়েছিল। সেদিন গির্জার সৌন্দর্য ও বিশপের স্নেহময় হাতের স্পর্শ পিতামাতার ধর্ম থেকে বিচ্ছেদব্যথার গভীরতা আরো যেন বাড়িয়ে তুলেছিল।

বহুকাল পরে এ বিষয়ে চিন্তা করতে গিয়ে এণ্ড্রুজ বলেছেন[১]—

> মা-বাবার সঙ্গে খ্রীস্টপ্রসাদ গ্রহণ বন্ধ করে আমি ঠিক কাজ করি নি। বাইরের দিক থেকে দেখলে মনে হবে, তাঁদের পথ থেকে আমার পথ অনেক দূরে সরে গিয়েছিল। কিন্তু যীশুখ্রীস্টের প্রতি আমাদের আন্তরিক বিশ্বাসে তো কোনো পরিবর্তন আসে নি। বরং দীক্ষার পরে তাঁদের সঙ্গে আত্মিক যোগ আরো ঘনিষ্ঠ হল। কেননা মতপার্থক্যের বেদনায় আমরা যীশুখ্রীস্টের দর্শন প্রত্যহ নতুন করে পেয়েছি, এতে তাঁর ক্রুশযন্ত্রণার উপলব্ধিও তীব্রতর হয়েছে। অবশেষে বাবা বুঝলেন যে যীশুখ্রীস্টের প্রেরণায়ই আমাকে এ পথ বেছে নিতে হয়েছে।

পেম্‌ব্রোক কলেজের সামনে সেণ্ট মেরীস্ চার্চ। সেখানে প্রতিদিন ভোরে দিব্যপ্রসাদ গ্রহণে যোগ দিয়ে সে দুর্যোগের দিনে এণ্ড্রুজের আত্মা দৃঢ় আশ্রয় পেয়েছিল। প্রতি প্রত্যুষে একবার যীশুর সান্নিধ্যে অনুপ্রাণিত হওয়া এরূপে তাঁর সহজ প্রবৃত্তিতে এসে গিয়েছিল।

---

১ C. F. Andrews, *What I Owe to Christ*, পৃ. ১১৮।

একটি বিষয় এখানে প্রণিধানযোগ্য ; সে বয়সে ধর্মবিষয়েই শুধু তাঁর মনে দ্বিধাসংশয় জেগেছিল তা নয়। কেম্‌ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয় বৈজ্ঞানিক গবেষণায় ও গণিতশাস্ত্রের চর্চায় তখন ক্রমোন্নতির পথে চলেছে। সেই অবাধ প্রগতির যুগে নবলব্ধ জ্ঞানের প্লাবনে অনেক পুরাতন চিন্তাধারাই ভেসে যাচ্ছিল। ঐ সময়েই ছাত্র ও অধ্যাপক হিসেবে কয়েক বছর এণ্ড্রুজ সেই সাধনার পীঠস্থানে অতিবাহিত করেন। নিজের ক্ষুদ্র জীবনতরীটি নিয়ে গতানুগতিকতার নিরাপদ আশ্রয়ে যে ভেসে বেড়াবেন, কেম্‌ব্রিজে থেকে এণ্ড্রুজের পক্ষে তা অসম্ভব ছিল। ভগবানেরই অসীম দয়া এই যে শত তরঙ্গের উচ্ছ্বাস অগ্রাহ্য করে তাঁকে গভীর সমুদ্রে পাড়ি দিতে হয়েছিল যীশুখ্রীস্টে তাঁর বিশ্বাসকে সুদৃঢ় করার জন্য। নিরুপদ্রব শান্তিতে ধর্মচর্চা করার কোনো মাহাত্ম্য তাঁর কাছে ছিল না। পরবর্তী জীবনে খ্রীস্টের অনুসরণে সমুদ্র পর্বত লঙ্ঘন করে অজানা দেশে ঘুরে বেড়িয়েছেন। যখনই সাহস হারিয়েছেন, মন দমে গেছে, তখন অন্তরে বসে খ্রীস্টই তাঁকে নবপ্রেরণায় সঞ্জীবিত করেছেন।

পেম্‌ব্রোক কলেজে পড়ার সময়ে ওয়ালওয়ার্থের কলেজ-মিশনে গিয়ে এণ্ড্রুজ যখনই কাজ করেছেন, মনের দ্বিধাসংশয় ভুলে কিছুদিন আনন্দে কাটিয়েছেন। সেখানে জীবন ছিল সরল, দুঃখীর দুঃখ মনে সমবেদনার সঞ্চার করত। খ্রীস্ট সেখানে তাঁর একান্ত কাছে ছিলেন, সচেতনভাবে তাঁরই সেবা করেছেন। তাতে অসীম আনন্দ পেতেন, সমস্ত দিনটি তাঁর সান্নিধ্যে ভরে মধুর হয়ে থাকত।

অধ্যাপকবন্ধু চার্লস প্রায়র তাঁর মনের এ ভাবটি ঠিক বুঝেছিলেন। তাই এণ্ড্রুজ যখন কেম্‌ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনার চাইতে সেখানকার কলেজ-মিশনে দৈন্যনিপীড়িতের সেবার দীক্ষা নিতে চাইলেন তাতে তিনি সাগ্রহে সম্মতি দিলেন। তিনি স্পষ্ট বুঝেছিলেন, কিছুকালের জন্য অন্তত এণ্ড্রুজকে বিশ্ববিদ্যালয় থেকে একেবারে দূরে সরে যেতে হবে। সেখানে কঠিন বাস্তবের সংঘাতে তাঁর আসা চাই। কেননা তিনি তখনো বড়ো বেশি স্বপ্নবিলাসী ছিলেন।

প্রথম দীনসান্নিধ্যে 'দীনবন্ধু'

মিশনের কাজে এণ্ড্রুজের প্রস্তুতির জন্য ইংলণ্ডের উত্তরখণ্ডে এমন একটি স্থান প্রায়র বেছে নিলেন যেখানে নরনারী অসহ দারিদ্র্যে প্রপীড়িত। মানুষের

এত কষ্ট এণ্ডরুজ আগে আর কখনো চোখে দেখেন নি। সেখানকার বিশপ ছিলেন ডক্টর ওয়েস্টকট। জায়গাটি হল সাণ্ডারল্যাণ্ডের মঙ্কওয়্যারমাউথ, এণ্ডরুজের জন্মস্থান নিউকাস্‌ল্‌ অন টাইন থেকে বেশি দূরে নয়। ওয়েস্টকটের বাসস্থানও তার কাছেই অবস্থিত ছিল।

ভারতবর্ষে এসে কাজ করার ইচ্ছাও এ সময়ে এণ্ডরুজের মনে জেগেছিল। কিন্তু তার আগে দীনদুঃখীদের সঙ্গে থেকে তাদের সেবা করার প্রতিজ্ঞা তিনি অন্তরে গ্রহণ করলেন। সে বিষয়ে এণ্ডরুজ নিজেই বলেছেন[১]—

> মনে স্থির করলাম অভাব-অনশনক্লিষ্ট গরিবদের সঙ্গে যদি থাকি তবে ওদের সমান হয়েই থাকব, ওদের চেয়ে উঁচু মানে নয়। ভগবান যীশু নির্ধনের মধ্যে নির্ধন হয়েই ছিলেন আর খ্রীস্টবিশ্বাসী হয়ে প্রভু যীশুর আদর্শ যাঁরা মানেন না, তাঁরা কখনো খাঁটি মিশনরি হতে পারবেন না। দরিদ্র পরিবেশে আপনি সংগতিপন্ন থেকে ধর্ম-উপদেষ্টা বলে নিজেকে প্রচার করা যীশুখ্রীস্টের আদর্শবিরোধী।

বিলাতে শ্রমিকরা তখন সপ্তাহে পঁচিশ শিলিঙ উপার্জন করত। তাতেই তাদের সংসার চালাতে হত। এণ্ডরুজ ছিলেন অবিবাহিত। তাই তিনি সপ্তাহে মাত্র দশ শিলিঙ খরচ করতেন নিজের জন্য। বড়ো কষ্টে তাঁর দিন চলত। সপ্তাহের শেষভাগে হাত খালি। প্রায়ই কিছু না খেয়ে রাতে ঘুমোতে যেতে হত।

মঙ্কওয়্যারমাউথ স্থানটি ইংলণ্ডের উত্তরে। সেখানে ওয়্যার নদীর মোহানায় সাধুরা যে ক্ষুদ্র গির্জাঘরটি তৈরি করেছেন সেখান থেকে অদূরবর্তী সমুদ্রসৈকত দেখা যায়। পরমশ্রদ্ধেয় খ্রীস্টীয় ধর্মযাজক বীড্‌-এর পুণ্যস্মৃতিতে জায়গাটি পূতপবিত্র। কেননা এ গির্জাঘরে তিনি স্বয়ং উপাসনা করে গেছেন। তার পরে যুগ যুগ কেটে গেছে। বহু শিল্পবিপ্লবের মধ্য দিয়ে সাণ্ডারল্যাণ্ডের জাহাজ-ঘাঁটির পরিবর্তন হয়েছে। কিন্তু সেই ধূসর পাথরের গির্জাঘরটি সবুজ ঘাসে-ঢাকা সমাধিস্থানের উপর আজও অপরিবর্তিত রয়ে গেছে।

এখানকার গির্জার যাজক হপ্‌কিন্‌সন্‌ অধ্যাপক প্রায়রের কলেজের সহপাঠী। তিনি এণ্ডরুজকে অতি সমাদরে কাজে টেনে নিলেন। বীড্‌ যে পাথরের উপর জানু পেতে প্রার্থনা করেছেন, সেখানে বসে এণ্ডরুজ যেন দূর

---

১ এক ভারতীয় হৃদয় [বনারসীদাস চতুর্বেদী]. ভারতভক্ত এণ্ডরুজ, পৃ. ৩৩।

অতীতের প্রভাব মনেপ্রাণে অনুভব করলেন। তাঁর কাজ হল বর্তমানে, বাস্তব-জীবনের সঙ্গেই তাঁর সম্পর্ক। সমাধিস্থানের নীচে বিরাটকায় জাহাজ তৈরির কারখানা। বারো হাজার লোক কাজ করছে কেবল একটি কারখানাতেই। অনেক রাত পর্যন্ত কাজ চলে। গতি— কেবল দ্রুত গতি। তারই দুর্নিবার আকর্ষণে যেন অন্ধ পদক্ষেপে এগিয়ে চলেছে মানুষ। দক্ষ শিল্পীর আয় প্রচুর, আরো দ্রুত কাজ এগিয়ে নেবার জন্য তাদের সব রকমে প্রলুব্ধ করা হচ্ছে। মানুষকে খাটিয়ে নেওয়া হচ্ছে যন্ত্রের মতো। এণ্ডরুজ তাকিয়ে দেখলেন— ক্ষুধায় তৃষ্ণায় ক্লান্তিতে জর্জর জনসমুদ্র কাজের শেষে ছুটে চলেছে মদের দোকানের দিকে। নেশা দিয়ে তারা নিজেদের ভোলাতে চায়। তা ছাড়া আছে জুয়াখেলা, পরস্পর মারামারি। এ-সবের মধ্য দিয়েই তারা অপরিসীম শ্রমের ক্লান্তি অপনোদন করতে চায়।

কাজের বিশেষ দক্ষতা যারা অর্জন করে নি এদের অবস্থা আরো শোচনীয়। কেবলমাত্র প্রাণে বেঁচে থাকে তারা। মদের দোকানের সামনে ভিড় দেখে এণ্ডরুজ ভাবতেন[১]—

আমি নিজে যদি এভাবে হাতুড়ি পেটার কাজে দিবারাত্রি নিযুক্ত থাকতাম, তবে স্বাভাবিক ভদ্রজীবন যাপন আমার পক্ষেই কি সম্ভব হত?

সাণ্ডারল্যাণ্ডের ছোটো গির্জাটি সম্বন্ধে একটি সুন্দর কাহিনী সেখানে প্রচলিত ছিল। ডেনমার্কের জলদস্যুরা এসে যখন সকলকে নিহত করল তখনো প্রভুর বন্দনাগান নিত্যনিয়মিত ধ্বনিত হয়েছে ধর্মযাজক জেম্‌স আর বালক গায়ক বীড-এর কণ্ঠে। সেই বালক উত্তরকালে ইংলণ্ডের ধর্মীয় ইতিহাসের জনক নামে খ্যাত হয়েছিলেন।

এণ্ডরুজ তাঁর স্মৃতিকথায় লিখেছেন[২]—

সাণ্ডারল্যাণ্ডের যে কর্মী-বালকদের আমি দেখেছি তারা যে সেই সাহসী বীরের একেবারে অযোগ্য উত্তরাধিকারী ছিল তা বলতে পারি না। এমনই প্রাণপূর্ণ সতেজ নির্ভীক কিশোর বালকের দল নিয়ে একটি ক্লাব গঠনের ভার আমাকে দেওয়া হল, সে ক্লাবের নাম দিয়েছিলাম জেনারেল গর্ডন ক্লাব। দেয়ালে রঙিন ছবি ছিল— মাথায় লাল ফেজ পরে মরুভূমির উপর

১ "Reminiscences," *The Modern Review*, February 1915, পৃ. ১৭৮।

২ তদেব, পৃ. ১৭৯।

উটের পিঠে চলেছেন, জেনারেল গর্ডন। সারাদিন জাহাজের কারখানায় অক্লান্ত পরিশ্রমের পর এই তরুণদল সন্ধ্যায় ক্লাবে আসত। কিছুক্ষণ খেলাধুলা হত। তার পর তাদের গোল করে নিয়ে বসে যাবতীয় গল্প-কাহিনী আমি শোনাতাম। আমার যে সহকারীটি ছিল তার নাম জ্যাক জব্‌লিঙ।

জ্যাকের জীবনের ইতিহাসও অদ্ভুত। সে ছিল নামজাদা বক্সিং-খেলোয়াড়। বহু পুরস্কার পেয়েছে দ্বন্দ্বযুদ্ধে। গ্রামের লোকের কাছে সে যেন এক মূর্তিমান আতঙ্ক। মাতাল অবস্থায় একদিন একটি সেবিকাকে অপমান করার সঙ্গে সঙ্গে গির্জার এক যাজক এসে ধাক্কা দিয়ে তাকে মাটিতে ফেলে দিলেন। কোথায় সে উঠে আবার তাঁকে আক্রমণ করবে তা নয়। সে একেবারে শান্তভাবে উঠে তাঁর হাত ধরে বলল, 'আজ থেকে আমি আপনার।' সেই থেকে সে নিয়মিত গির্জায় আসে, মদ ছোঁয় না। এখন তাঁর একমাত্র চেষ্টা হল কারখানার কর্মীবন্ধুদের মদের দোকানের আকর্ষণ থেকে রক্ষা করা। একদিন একজন একপাত্র মদ জ্যাকের মুখে ছুঁড়ে মারল, পাত্রটির আঘাতে ওর ঠোঁট কেটে গেল। মুখ দিয়ে যখন রক্ত গড়িয়ে পড়ছে, একদিনকার এই বক্সিং-খেলোয়াড়টি তখনো একবার হাত তুলল না। সেই বোধ হয় তার জীবনের সর্বশ্রেষ্ঠ জয়।

মঙ্কওয়্যারমাউথের একটি দুঃখীজীবনের রূপান্তর-সাধনে এণ্ডরুজের ভূমিকা কী ছিল তিনি নিজে তার বর্ণনা দিয়েছেন।[১] সেখানে একটি বিধবা বৃদ্ধা বাস করতেন। তিনি সারাজীবন অভাবের যাতনা সয়েছেন, শান্তি বা আনন্দ কাকে বলে জানতেন না। ঈশ্বরে বিশ্বাস তাঁর ছিল কিন্তু অন্তরের যে প্রদীপটি সমগ্র সত্তার পরিবর্তন ঘটায় তা তখনো তাঁর মধ্যে জ্বলে নি।

গুড ফ্রাইডের দিন এল। সেদিনকার তিনঘণ্টাব্যাপী উপাসনার পর দুঃখের ভার লাঘব করবেন বলে তিনি এণ্ডরুজের কাছে গেলেন। তখন কোন্ অদৃশ্য শক্তির নির্দেশেই তিনি হয়তো চলছিলেন। জানালেন ভগবৎ-প্রেমের আশ্রয়ই তিনি চান, কিন্তু সন্দেহ অবিশ্বাস এসে যে তাঁর দৃষ্টি রুদ্ধ করে। এণ্ডরুজ বলে ওঠেন, 'প্রভু যীশু কি ক্রুশে বিদ্ধ হয়ে সকল মানুষের পাপসন্তাপ আপনি গ্রহণ করেন নি? সেই পরম আশ্বাস পেয়েও তবে কেন এই পরিতাপ? আত্মসমর্পণে কেন এই দ্বিধা?'

---

১ C. F. Andrews, *What I Owe to Christ*, পৃ. ১২৬-১২৭।

এই সহজ কথা কটি শুনে এণ্ডরুজের মুখের দিকে তিনি চেয়ে রইলেন। তাঁর দৃষ্টি যেন ভগবৎপ্রেমের ধারায় অভিসিঞ্চিত হল। এণ্ডরুজ বুঝতে পারলেন যে প্রভুর দর্শন তাঁর মিলেছে। সে মুহূর্ত থেকেই মহিলাটির স্বভাবে পরিবর্তন এল।

মঙ্কওয়্যারমাউথে বাস করার কালের আরো কয়েকটি বিশেষ আনন্দের স্মৃতি তাঁর মনে পড়ে। প্রাচীনতার ঐতিহ্যে সমৃদ্ধ সেখানকার গির্জাঘরটি দেখলে তাঁর কোন্ গতজন্মের কথা মনে পড়ত। এই নব-অনুভূতি একান্ত সজাগ হলে নরদাম্ব্রিয়ায় ব্রিটিশ চার্চের এই গির্জাগুলিকে তীর্থ হিসেবে দর্শনের আকাঙ্ক্ষায় তিনি ভ্রমণে বেরিয়েছেন। ছুটির দিনে বেসিল এসে তাঁর ভ্রমণের সঙ্গী হতেন।

এভাবে ধর্মযাজকের দীক্ষা গ্রহণের পূর্বেই অতীতের স্মৃতিসুরভিত চার্চ অব ইংল্যাণ্ডকে এণ্ডরুজ তাঁর মাতৃভূমির মতো ভালোবাসতে শুরু করেছেন। সে আনুগত্য ক্রমশ বেড়েই চলেছিল।

মঙ্কওয়্যারমাউথ বাসের আর-একটি পুণ্যস্মৃতি বেসিলের চিররুগ্‌ণ দিদির প্রতি তাঁর অসীম শ্রদ্ধা।[১] শৈশব থেকেই প্রায় তিনি অশক্ত দুর্বল। তখন তাঁর পার্থিবজীবন প্রায় শেষ হয়ে এসেছে। তা তিনি জানতেন আর যাবার জন্য আনন্দেই প্রস্তুত হয়েছিলেন। তিনি তখন সচেতনভাবে অনন্তের কোলে বাস করছিলেন, ব্যথাকে আনন্দে রূপান্তরিত করতে পেরেছিলেন। ভারি সুন্দর একখানি দেবীপ্রতিমার মতো মুখ, চারি দিকে বালিশে-ঘেরা শুভ্র বিছানায় শুয়ে আছেন— তাঁকে দেখে এণ্ডরুজের মনে হয়েছে ঈশ্বরের সামনে গিয়েই যেন দাঁড়িয়েছেন। ভাইবোনদের মধ্যে বেসিলকে তিনি সবচেয়ে ভালোবাসতেন তাই তাঁর প্রার্থনা দিবারাত্রি তাঁকেই ঘিরে থাকত।

দিদির তিনটি ভাই ভারতবর্ষে গিয়েছিলেন। তাই বেশির ভাগ সময় তাঁর হৃদয়ের যোগ থাকত ভারতের সঙ্গে। ভারতীয় মহিলাকে কখনো চোখে না দেখেও তাঁদের গুণাবলীর যথাযথ উপলব্ধি কী করে তিনি তখনই করতে পারতেন, এতে এণ্ডরুজ অবাক হয়েছেন।

ইংলণ্ডের উত্তরখণ্ডে স্বল্পকাল অবস্থানের মধ্যে মানবপুত্র যীশুর চিত্র এভাবে বারে বারে এণ্ডরুজের সম্মুখে উপস্থিত হয়েছে। তাঁর পদচিহ্ন সর্বদেশে

---

১ C. F. Andrews, *What I Owe to Christ*, পৃ. ১২২-১৩৩।

সর্বকালে বর্তমান। তিনি যে কেবল তাঁর জীবনটিকে গড়ে তুলেছিলেন তা নয়, এণ্ড্রুজ যা হয়ে উঠতে চেয়েছিলেন তার জন্য চার দিক থেকে তার পরিমণ্ডলটিও সৃষ্টি করছিলেন।

যাজকতায় আত্মনিবেদন

অধ্যাপক প্রায়র এণ্ড্রুজের ধর্মপথের প্রত্যেকটি ধাপ আগে থেকে সাগ্রহে চিন্তা করে রেখেছেন। তাঁর আহ্বানে সাণ্ডারল্যাণ্ড থেকে এণ্ড্রুজ পেমব্রোক কলেজ-মিশনে গেলেন। ১৮৯৬ খ্রীস্টাব্দের ২১ এপ্রিলে দক্ষিণ-পূর্ব লণ্ডনের ওয়ালওয়ার্থে দরিদ্রদের সেবার ভার তাঁকে দেওয়া হল। কাজে যোগ দেবার ছয় সপ্তাহ পরে এক পুণ্য রবিবারে[১] (Trinity Sunday) রচেস্টারের বিশপ তাঁকে উপযাজক (Deacon) পদে দীক্ষা দেন। এণ্ড্রুজ সেখানে মিশনের কাজে যে কয় বছর কাটিয়েছেন সেগুলিকে তাঁর জীবনের পরম আনন্দের দিন মনে করতেন।

ওয়ালওয়ার্থে যাদের মধ্যে তিনি কাজ করতেন তার বেশির ভাগ ছিল ফেরিওয়ালা ও ডকের শ্রমিক। কর্মসংস্থানের অভাব ও দুর্বল স্বাস্থ্যের কারণে বেশির ভাগ পরিবার সেখানে দুঃখদুর্দশার চরমে এসেছিল। সেখানে অন্নহীনকে অন্নদান ও বস্ত্রহীনকে বস্ত্রদান ছিল মিশনের প্রধান কাজ। অনেক ক্ষেত্রে একটি ঘরেই অনেকগুলি পরিবার বাস করার ফলে শিশুরা হত ক্ষীণজীবী, তাই তাদের মৃত্যুর হারও ছিল অত্যধিক।

গির্জার চারি দিক ঘিরে ছিল এ-সব ঘিঞ্জি বস্তি। কিন্তু অধিবাসীরা ছিল অদম্য প্রাণশক্তিতে পূর্ণ। এরাই যুদ্ধক্ষেত্রে প্রমাণ দিয়েছে, সারাজীবন আধপেটা খেয়েও ক্ষীণদুর্বল লণ্ডনের বস্তিবাসীরা সৈনিকের ভূমিকাতেও কী অপরিসীম বীর্য প্রদর্শন করতে পারে। এই স্বচ্ছন্দ হাসিখুশি বেপরোয়া ছন্নছাড়া লোকগুলি তাঁকে দেখেই সম্পূর্ণ বিশ্বাসভরে তাদের বন্ধু করে নিল। উৎসবে আনন্দে যেমন দুঃখে দুর্দশায়ও তেমনি তাঁকে বাড়িতে ডেকে নিয়ে তাদের সব-কিছুর ভাগ দিত।

সেখানে যে বাড়িটিতে এণ্ড্রুজ থাকতেন সে যেন এক ক্লাবঘরে রূপান্তরিত হয়েছিল। তাঁর ঘরদোর দেখাশোনার জন্য সাণ্ডারল্যাণ্ড থেকে দুটি মহিলা

---

১ ট্রিনিটি সান্ডে— ভগবানের ত্রিমূর্তির আরাধনার জন্য নির্দিষ্ট ঈস্টার পর্বের পরে অষ্টম রবিবার।

এসেছিলেন। তাঁদের জননীসুলভ যত্নে পাড়ার ছেলেমেয়েরা যখন তখন সেখানে আসত যেত।

গির্জাঘরটিতে রবিবারে উপাসনা হত আর সপ্তাহের অন্যান্য দিনে সে ঘরেরই অধিকাংশ জায়গা জুড়ে ছেলেরা খেলাধুলা করত, মাঝে মাঝে বক্সিংও চলত। এণ্ডরুজ ক্রিকেট শেখাতে পারতেন ভালো। এখানকার ক্লাবের সদস্যরা বছরে একবার কেম্‌ব্রিজে পেম্‌ব্রোক কলেজে যেত সেই সময়কার ছাত্রদের অতিথি হয়ে। সেখানকার খেলার মাঠে দু দলের ক্রিকেট খেলার প্রতিযোগিতা হত। সন্ধ্যায় সমবেত গানবাজনার শেষে গভীর রাত্রে ওয়ালওয়ার্থের অধিবাসীরা গৃহে ফিরত।

রবিবাসরীয় ক্লাস একটি খুলেছিলেন তিনি বিশেষ করে চোর ও গাঁটকাটাদের জন্য। তাদের কেউ ছিল জিঞ্জার নামে, কেউ স্মাইলার, কেউ পাঞ্চার, কেউ বা মিক্কি— অন্য কোনো নাম বা উপাধি তারা স্বীকার করত না। তিনি কখনো তাদের উপদেশ দেন নি, তিরস্কার করেন নি বা তাদের কোনো গোপন কথা কারো কাছে ফাঁস করে দেন নি। তাই তারা নিজেদের মধ্যে স্বীকার করে নিয়েছিল যে তিনি সত্যিই 'ভদ্রলোক'। শেষ পর্যন্ত তাদের কাছে তাঁর এই সুনাম অব্যাহত ছিল। স্কুলের পাঠ হিসাবে বেশির ভাগ দুঃসাহসিকতার গল্পই তিনি তাদের শোনাতেন। প্রশান্ত মহাসাগরীয় দ্বীপপুঞ্জে, নিউগিনিতে বা মধ্য-আফ্রিকায় যে-সব নরখাদক জাতি আছে— তাদের কথা শোনাতেন। গ্রীষ্মকালে তাদের নিয়ে ভ্রমণে বেরতেন কখনো সমুদ্রতীরে, কখনো বা এপিং ফরেস্টে। তখন তাদের পকেটকাটা বা দোকানের জিনিস অপহরণ বারণ ছিল। সুন্দর সাজানো দোকানের সামনে দাঁড়িয়ে ওদের হাত নিশপিশ করত। কাছে এসে মিষ্টি করে বলত, 'মিঃ এণ্ডরুজ, একবার কেবল দেখিয়ে দেব কেমন করে আমরা জিনিস সরাই?' তিনি তখন যথার্থ বন্ধুর মতো তাঁর দৃঢ় আপত্তি জানাতেন।

বহুদিন পরের একটি ঘটনা। এণ্ডরুজ তখন ভারতবর্ষে এসেছেন। সিমলায় সানাওয়ারে মিলিটারি অ্যাসাইলামে তিনি তখন অধ্যক্ষের কাজ করছেন।[১] একদিন খাকি-পোশাক-পরা একটি সৈনিক হেসে সামনে এসে দাঁড়িয়ে বলল, মিঃ এণ্ডরুজ, আমাকে বুঝি চিনতে পারলেন না?

---

১ "Reminiscences," *The Modern Review*, February 1915, পৃ. ১৮২।

তাকিয়ে দেখেন সেই লাল কটা চুল, মুখে হলদে দাগ। ওয়ালওয়ার্থের ক্লাসে গোল হয়ে ঘিরে বসা, এপিং ফরেস্টে ভ্রমণ— সব ছবি এক মুহূর্তে মনের পর্দায় ভেসে গেল। চেয়ার থেকে উঠে দু হাতে ওকে কাছে টেনে বললেন— আরে জিঞ্জার যে, তুমি এখানে কোথায়?

ওকে চিনতে পেরেছেন দেখে ও যে কী খুশি হল। সেখানে বসে সরল-ভাবে নিজ জীবনের সব ঘটনা সে বলে গেল। একবার একটা বড়ো রকমের চুরির পরে পুলিস পিছু নিয়েছিল। তখনই সৈনিকদলে ভর্তি হয়ে সে ভারতবর্ষে চলে আসে। এখানে ব্যাণ্ড-বাদকদলের একজন। ব্যাণ্ড-ঘরের জানলা দিয়ে এণ্ডরুজকে সে একটিবার দেখতে পেয়েই ছুটে এল, ধরতে পারল না। তার পরে খোঁজ করে সন্ধান পাওয়ামাত্র সাবাথু থেকে বারো মাইল পথ হেঁটে চলে এসেছে। এখন হেঁটেই ফিরবে। যাবার আগে এণ্ডরুজকে রাজি করিয়ে নিল তাদের সঙ্গে একদিন খেতে হবে।

সে এক পরীক্ষার দিন গেছে বটে। সৈন্যদলের পাচক যত রকম রান্না জানত সেই বিশেষ ভোজে সবেরই ব্যবস্থা হয়েছে। এণ্ডরুজ স্বভাবতই স্বল্পাহারী। জিঞ্জার সামনে থেকে সব জিনিস বার বার বলে বলে তাঁকে খাওয়াতে লাগল। সেদিন জিঞ্জারকে দেখে তাঁর কত যে আনন্দ হয়েছিল! চালাক চটপটে তরুণ সৈনিক, মদ ছোঁয় না— সৈন্যদলের অফিসাররা তাকে স্নেহ করেন, বয়ঃকনিষ্ঠরা সবাই সমীহ করে।

আর-একটি ওয়ালওয়ার্থের ছাত্র— স্মাইলার নাম তার— সেবার হঠাৎ দেখা হল কলকাতায়।[১] ১৯০৬ খ্রীস্টাব্দের বড়োদিনে এণ্ডরুজ ভারতের জাতীয় কংগ্রেসে যোগ দেবেন ভেবে কলকাতায় এসেছেন। সেবারকার কংগ্রেস-সভাপতি দাদাভাই নওরোজীকে তিনি আগে কখনো চোখে দেখেন নি, অথচ মনে মনে তাঁকে প্রায় পূজা করেন। কর্নওয়ালিস স্ট্রীটের অক্সফোর্ড মিশনে এসে সকালে পৌঁচেছেন। ওভারটুন হলে সেদিন তিনি ভারতের জাতীয় আন্দোলন সম্বন্ধে বক্তৃতা দেবেন। সেখানকার দেয়ালে বড়ো বড়ো অক্ষরে সেই বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়েছে। স্মাইলার কাজ করে নৌবাহিনীতে। বড়ো-দিনের ছুটিতে কলকাতায় এসেছে— পথ চলতে চলতে তার চোখে পড়ল বিজ্ঞাপনটি। Y. M. C. A.-তে খোঁজ করে বিকেলে অক্সফোর্ড মিশনে গিয়ে

১ "Reminiscences", *The Modern Review*, March 1915, পৃ. ২৭২।

তাঁর সঙ্গে দেখা করল। দেখা হতে দুজনেই আনন্দে প্রায় সমান অভিভূত। দেখলেন জিঞ্জারের মতো স্মাইলারও মদ ছেড়ে দিয়েছে। তাঁর আরো ভালো লাগল দেখে যে তাদের সেই দুষ্টু দুষ্টু চোখের চাউনি তখনো রয়েছে।

সৈনিকের কথায় তাঁর জীবনের একটি করুণ অভিজ্ঞতার কাহিনী এণ্ডরুজ বলেছেন।[১] সেটিও ওয়ালওয়ার্থের ঘটনা। একদিন রাতে একটি লোক রাস্তায় মদ খেয়ে পড়ে আছে দেখে তাকে ঘরে এনে শুইয়ে দিলেন। সকালে জেগে উঠে সে লজ্জায় অনুশোচনায় যেন মরমে মরে গেল। লম্বা চওড়া স্বাস্থ্যবান সুশ্রী যুবক, সৈনিকের অনেক গুণই তার মধ্যে আছে। নিজের কথা সংকোচে বলতে চায় না। তবু প্রশ্ন করে করে এণ্ডরুজ জানলেন যে সে মিশর, দক্ষিণ আফ্রিকা আর ভারতবর্ষ ঘুরে এসেছে। বোঝা গেল তার নিজের অধঃপতনের মূল কারণ তার স্ত্রী। মেয়েটি সুন্দরী, সারাক্ষণ মদে চুর হয়ে আছে, স্বামীটিকেও ধাপে ধাপে নামিয়ে আনছে। সৈনিকটি নিজের দোষ অস্বীকার করে নি অথচ এণ্ডরুজ বুঝলেন কী মানসিক সংগ্রামের মধ্যে দিয়ে সে চলেছে। তাকে সঙ্গে করে বাড়ি পৌঁছে দিতে গিয়ে তার স্ত্রী ও সন্তানদের অবস্থা দেখে এণ্ডরুজ দুঃখে অভিভূত হলেন। বার বার চেষ্টা করেও স্বামী-স্ত্রীর অভ্যাস ফেরাতে পারলেন না। একদিন দেখা গেল তারা সেই বাড়ি ছেড়ে চলে গিয়েছে। এভাবে লণ্ডনের জনারণ্যে তিনি তাদের হারিয়ে ফেললেন।

অপর অভিজ্ঞতাটিও প্রায় অনুরূপ বললে চলে।[২] ক্ষুধাতৃষ্ণায় কাতর একটি ভদ্র-চেহারার লোক একদিন তাঁর কাছে এলে তিনি চা আর খাবার আনতে উঠে গেছেন। ফিরে এসে কিছু লক্ষ্য করেন নি। কয়েকদিন পরে টের পেলেন গির্জার দুটি রুপার পাত্র খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। একদিন রাত বারোটায় দরজায় শব্দ হতে বেরিয়ে এসে দেখেন সেই লোকটি মাতাল অবস্থায় দাঁড়িয়ে, তার হাতে সেই রুপার পাত্রের একটি, ভাঙাচোরা অবস্থায়। এ দুষ্কর্মের শাস্তিভোগ তার দরকার মনে করে এণ্ডরুজ তাকে পুলিস স্টেশনে নিয়ে গেলেন। সে ছিল পুরানো দাগী। তবু তাঁর অনুরোধে ম্যাজিস্ট্রেট মাত্র এক মাস জেল ও জরিমানার ব্যবস্থা করলেন। জরিমানা এণ্ডরুজ নিজে দিলেন

১ "Reminiscences", *The Modern Review*, March 1915, পৃ. ২১৩।

২ তদেব, পৃ. ২১৩।

আর জেলে তার সঙ্গে দেখা করার অনুমতি নিলেন। সে সময় লোকটি তাঁর কাছে স্বীকার করে যে সে ভদ্রসন্তান, পাবলিক স্কুলে পড়েছে। কিন্তু কুসঙ্গে পড়ে সে নিজের জীবন নষ্ট করেছে। কিছুদিন পরে তার যক্ষ্মারোগ ধরা পড়লে এণ্ডরুজ হাসপাতালে গিয়ে দু বছর ধরে তার দেখাশোনা করেছেন। সে কিন্তু মৃত্যুকাল পর্যন্ত কিছুতেই বাবার নাম ঠিকানা তাঁকে জানায় নি। বলেছে হাসপাতালের দিন কটিই তার জীবনের সর্বপ্রলোভনমুক্ত পরম নিশ্চিন্ত পরিসমাপ্তি।

ওয়ালওয়ার্থের অভিজ্ঞতা বর্ণনা করতে গিয়ে এণ্ডরুজ বলেন, কেউ যেন না মনে করেন, তিনি মানুষের অধঃপতনই কেবল চোখে দেখেছেন। ধর্মযাজক ছিলেন বলে এ-সব নিয়ে তাঁকে বেশির ভাগ সময় কাটাতে হত। কিন্তু যে জিনিসটি তাঁর মনে গভীর রেখাপাত করেছে তা হল এই নিঃসম্বল অভাজনদের নিঃস্বার্থ দয়াপ্রবৃত্তি। পরস্পরের প্রতি তাদের সৌহার্দ্য ও ঔদার্য অপরিমেয়। এ-সব বস্তিজীবীরা কেবল অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার ব্যাপারেই অমিতব্যয়ী হয়ে ওঠে। মৃতের প্রতি শ্রদ্ধা তাদের বেহিসাবী করে তোলে।

রবিবাসরীয় বিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীরা যেদিন ভ্রমণে বেরত, বছরে সেই একটি দিন ছিল শিশুদের বড়ো আমোদের। প্রায় পাঁচশো ছেলেমেয়েকে সঙ্গে নিতে হত, তাই এণ্ডরুজের মন উদ্‌বেগে ভরে থাকত। উত্তেজনায় উন্মত্ত ছেলেমেয়েদের জড়ো করে লণ্ডনের ভিড়ের মধ্য দিয়ে স্টেশনে নিয়ে যাওয়া, সেখানে তাদের সুশৃঙ্খলভাবে ট্রেনে বসিয়ে রাখা, কোনো দুর্ঘটনা যাতে না ঘটে এমনিভাবে আবার তাদের ফিরিয়ে আনা— এ-সব কি সোজা কাজ? সারাদিনের মধ্যে কত রকম খবর যে আসত! হঠাৎ কেউ এসে বলল, 'মিঃ এণ্ডরুজ, এমাকে বোধ হয় জিপ্‌সীরা ধরে নিয়ে গেছে।' আবার একজন এসে হয়তো খবর দিল, 'মেরী অ্যান নদীতে পড়ে গেছে।' যাই হোক কোনোদিনও একটি ছেলেমেয়েও কিন্তু খোওয়া যায় নি। সবাই নিরাপদে ফিরে এসেছে। তবে ঘরে এসেও তাঁর কি নিষ্কৃতি ছিল? কখনো কখনো উদ্‌বিগ্ন মা-বাবা মাঝরাত্তিরে বাড়িতে এসে খোঁজ করতেন, 'মিঃ এণ্ডরুজ, আমার লিজা বা আমার জন কোথায় গেল?' আবার খোঁজা-খুঁজি শুরু হলে দেখা যেত তারা হয়তো স্টেশন থেকে বাড়ি ফেরার পথে কোনো বন্ধুর সঙ্গে খেলায় মেতে গেছে। এই শিশুদের মধুর সঙ্গ তাঁর মনে অপরূপ বাৎসল্যের অনুভব জাগিয়ে তুলত। বেড়াবার সময় তাদের ছোটো

ছোটো হাত তাঁর হাতে গুঁজে দিয়ে তারা বলত, 'মিঃ এণ্ডরুজ, আজ কী মজা, না?' তার পরে সমবেত গান শুরু হয়ে যেত। হাতে তাদের ছোটো ছোটো পতাকা, সজোরে যুদ্ধের গান গেয়ে চলত। তাঁর মনে হত, 'আহা বেচারিরা! হয়তো বছরের মধ্যেই যুদ্ধে কতজনের ভাই অথবা বাবার মৃত্যু-সংবাদ আসবে।' তাঁর সেই সময়কার মনোভাব এভাবে বিবৃত করেছেন[১]—

মানবজগৎ এখানে চোখের সামনে মূর্ত হয়ে আমার চিত্তকে প্রসন্নতায় ভরে তুলত। সে যেন বিশাল সমুদ্রে অবগাহন, ক্ষুদ্র তরঙ্গের অভিঘাত অতিক্রম করে স্নানার্থী শরীরের শিরা-উপশিরায় বিশুদ্ধ রক্তের স্রোত উপলব্ধি করে। বহুকাল যে চিন্তাজাল মনকে আচ্ছন্ন করেছিল, অজানিতে কখন তা ছিন্ন হয়ে গেছে। কোথা থেকে মধুর হাওয়ার স্রোত বয়ে এসে জীবনকে মধুময় করে তুলল। মানুষের হৃদয়ের সংস্পর্শে এসে, তাদের সুখদুঃখ হাসিগানে অংশ নিয়ে, তাদের বিকচোন্মুখ জীবন ও আকস্মিক পরিসমাপ্তি চোখে দেখে, খ্রীস্টজীবনের কাহিনীগুলি স্মৃতিপথে আসত। সেগুলি যে যথার্থ সত্য সে বিষয়ে সন্দেহ থাকত না। অধ্যাপক প্রায়র কেম্‌ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের বক্তৃতামঞ্চ থেকে আমাকে অব্যাহতি দিয়ে কত বিবেচনার কাজ করেছেন তাই কেবল ভাবতাম।

কাজের অপরিসীম আনন্দের মধ্যেও দ্বিধাদ্বন্দ্বের বেদনা একটু ছিল। ভাগ্যবঞ্চিত দীনহীন নরনারীর ভালোবাসা অজস্রধারায় পেয়েও নিজের দীক্ষা-গ্রহণের ব্যাপারে তাঁকে বিবেকের দংশন ভোগ করতেই হয়েছে। যীশুখ্রীস্টকে এণ্ডরুজ নিজের প্রাণের সঙ্গী হিসাবেই কেবল পেতে চান নি; আত্মার চিরন্তন সত্যমূর্তিতে চেয়েছিলেন উপলব্ধি করতে। কিন্তু সেজন্য তো চাই আপন আত্মার একান্ত বিশুদ্ধতা; বাক্যে কর্মে চিন্তায় সত্য শুদ্ধ হতে হবে তাঁকে।

অথচ ১৮৯৭ খ্রীস্টাব্দের জুন মাসে সাউথওয়ার্ক ক্যাথিড্রেলে যখন যাজকের দীক্ষা পেলেন তিনি, সেই সময়ে প্রার্থনাপুস্তকের বিধিনির্দেশে সই করতে গিয়ে তাঁর সংশয় উপস্থিত হল। বুদ্ধি দিয়ে বিচার করলে দেখা যায় ঐ বিধিনিষেধের কয়েকটি গ্রহণের যোগ্য নয়। এণ্ডরুজ ভেবে দেখলেন, ঈশ্বরের ইচ্ছায় তিনি দরিদ্রের সেবাব্রতের বিশেষ অধিকার লাভ করছেন। তাই পুস্তকের প্রত্যেকটি নির্দেশকেই অভ্রান্ত মনে না করলেও সাধারণ স্বীকৃতির মনোভাব নিয়ে

---

১ C. F Andrews, *What I Owe to Christ*, পৃ. ১৪০।

সবটাতেই সই করে দিলেন। মনে তবু সন্দেহ জেগে রইল, আর বছরের পর বছর ধরে সে সন্দেহ চলল বেড়ে।

দীক্ষাকালের উপাসনার স্মৃতি সম্পর্কে লিখেছেন[১]—

> নিজের ধর্মবিশ্বাসের দুর্বলতার জন্য অনুতপ্ত হয়ে আমি নতজানু হয়ে প্রার্থনায় বসলাম, তার মধ্যেও সন্দেহ এসে গেল। উপাসনা এগিয়ে চলেছে। প্রার্থনা-গান শুরু হতে আমার চিত্ত ঊর্ধ্বায়িত হল। তার পর উৎসর্গ-অনুষ্ঠানের (consecration) সময় যীশুখ্রীস্টের কাছে সম্পূর্ণ আত্ম-নিবেদনের ফলে মনের ভয় কেটে গেল। আমার দেহমনপ্রাণ তাঁর সেবায় নিয়োজিত করার সংকল্প নিলাম। সে অপার আনন্দ কলেজ-মিশনের সব কাজে আমাকে প্রেরণা দিত, মনের সব উদ্‌বেগ ভাসিয়ে দিয়ে একপ্রাণে তাঁকে অনুসরণ করায় উদ্‌বুদ্ধ করত।

এণ্ডরুজের উৎসাহে গির্জায় এক নতুন জীবনের সঞ্চার হল। সান্ধ্য-উপাসনার সময় আগে ছিল সাড়ে পাঁচটা, এখন হল আটটা। তাতে বেশি সংখ্যক শ্রমিক কাজ থেকে ফিরে সেই পোশাকেই গির্জার উপাসনায় যোগ দিতে পারত। প্রথমে হত বাইবেল পাঠ, তার পরে মাত্র পাঁচ মিনিট ধরে এণ্ডরুজ বাইবেলের ঐ বিষয়ে তাঁর মন্তব্য সরল সুন্দর ভাষায় মর্মগ্রাহী করে বলতেন। গৃহকর্মে ক্লান্ত মায়েরা যারা উপাসনায় যোগ দিতে না পারত তাদের তিনি বলতেন, 'তোমরা গির্জার ঘণ্টা শুনেই মন শান্ত কোরো। জেনো যে প্রার্থনার সময় আমরা তোমাদের সকলকেই স্মরণ করব।' সাধারণ লোকের ভক্তিবিশ্বাস এত স্বাভাবিক যে তারা অন্তরের সঙ্গে সে কথা গ্রহণ করেছিল। একবার সেণ্ট টমাস হাসপাতালে রুগ্‌ণ অবস্থায় পড়ে থেকেও এই-সব শ্রমিকদের একজন বলেছিল, 'সান্ধ্য-উপাসনার আগে আমি কেবল সময় গুনি, কতক্ষণে ঘণ্টা শুরু হবে। তার পর ভাবি, এই এবার ঘণ্টা পড়ছে, সবাই গির্জায় আসবে। তখন ওরাও আমার মঙ্গল প্রার্থনা করবে, আমিও ওদের চিন্তায় মিলিত হব।'

গির্জাঘর বলতে তো আলাদা কিছু তখনো গড়ে ওঠে নি। একই ঘরের একটি কোণায় প্রথমে প্রার্থনা হত। তার পরে সেখানে পর্দা টেনে ঘরের অপর প্রান্তে ছেলেদের খেলাধুলা, বড়োদের ধূমপান গল্পসল্প চলত। নিজেদের

---

১ C. F. Andrews, *What I Owe to Christ*, পৃ. ১৪১-১৪২।

গির্জা যে নিজেদের চেষ্টাতেই গড়ে তুলতে হবে সে মনোভাবটি তিনি তাদের মধ্যে গড়ে দিতে পেরেছিলেন। অবশ্য তার সুফল ফলতে দেরি হয়েছিল।

শুধু নিজেদের প্রয়োজনে নয়, যীশুখ্রীস্টের নামে পৃথিবীর যেখানে যা কাজ হচ্ছে সবেতেই যে তাদের সাহায্য চাই সে কথা তিনি তাঁর ধর্মমণ্ডলীর শ্রোতাদের বুঝিয়ে দিয়েছিলেন। মধ্য আফ্রিকার বাগাণ্ডায়, ভারতবর্ষে দিল্লীতে তাঁর বন্ধুরা কী কাজ করছেন তারও বিশদ বর্ণনা দিতেন। একবার তাদের বলেছিলেন, ভারতের দরিদ্রদের সাহায্যের জন্য লেণ্ট[১] (Lent) উৎসবে তারা যেন কিছু কিছু সঞ্চয় করে। সেখানে অতি-দরিদ্র এক বৃদ্ধ দম্পতি সপ্তাহে মাত্র পাঁচ শিলিঙ পেন্সনে কোনোমতে চলতেন। তাঁরা যখন উৎসবশেষে একটি বাক্সে তাঁদের দান সাড়ে তিন শিলিঙ নিয়ে এলেন এণ্ডরুজ তখন আর চোখের জল সামলাতে পারেন নি।

চারি দিকে দুর্ভাগ্যপীড়িত অভাবগ্রস্ত আর অধঃপতিতের মধ্যেও এরকম কত সরল স্নেহার্দ্রপ্রাণ বালবৃদ্ধ নরনারী নিয়ে তাঁর কাজ চলত। গুড ফ্রাইডের দিনে এক দিকে শান্তস্তব্ধ গির্জার পরিবেশ, অন্যপক্ষে সামনের রাস্তাতেই চলেছে হয়তো পানোন্মত্ত দুর্বৃত্তের অসভ্য চিৎকার। আবার কোনো রুগ্ণ অসুস্থ লোককে দেখতে রাতে হয়তো তিনি কোনো কুখ্যাত পথ দিয়ে যাবেন, অমনি তাঁর সঙ্গে যাবার জন্য লোক প্রস্তুত হয়ে যেত যাতে পথে কেউ তাঁর কোনো ক্ষতি না করতে পারে। এইভাবে কত আপাত-বিপরীতের গভীরে ঈশ্বরের অলৌকিক দয়ার বিচিত্র অভিজ্ঞতা হয়েছে তাঁর।

একটি স্ত্রীলোক মদের নেশায় আচ্ছন্ন হয়ে থাকত, কিছুতেই সে তার অভ্যাস ছাড়তে পারে না। প্রার্থনাশেষে একদিন সে অসংবৃত নেশাগ্রস্তভাবে ভগবানের পায়ে আত্মনিবেদন করতে এল। এণ্ডরুজের মনে হল এ অবস্থায় তাকে দিয়ে শপথ করানো ঠিক হবে না।

দুজনে নত হয়ে একসঙ্গে বসে প্রার্থনায় মগ্ন হলেন। জীবনধারা বদলাবার আন্তরিক আকাঙ্ক্ষা নিয়ে মেয়েটি সে রাতে বাড়ি ফিরল। পরের দিন ভোরের উপাসনায় যোগ দেবার কথা এণ্ডরুজ তাকে বলে দিয়েছিলেন। সকালে সে এল সম্পূর্ণ সুস্থ অবস্থায়, এসেই অনুতপ্ত চিত্তে তার প্রার্থনা ঈশ্বরকে জানাল।

---

১ লেণ্ট— খ্রীস্টের মৃত্যুবরণের পূর্বে চল্লিশ দিন তাঁর উপবাস ও নানা দুর্গম স্থানে বিচরণের স্মরণে ধার্মিক খ্রীস্টভক্তগণ এই সময় বিলাসদ্রব্য বর্জন, দান ও ধ্যানে সময় অতিবাহিত করেন।

এই অন্তরের সংগ্রাম তাকে কিন্তু সম্পূর্ণ পরিবর্তিত করে দিল। এর পর ঈশ্বরে সমর্পিত সাধুজীবন সে যাপন করে গেছে।

এ ধরনের আনন্দের আস্বাদন এণ্ডরুজের মন থেকে দ্বিধাসংশয় সরিয়ে রাখত। মানুষের তৈরি কতকগুলি নিয়মাবলীতে সই দেওয়া অপেক্ষা এগুলিই বহন করত তাঁর ধর্মদীক্ষার যথার্থ স্বাক্ষর।

তা সত্ত্বেও অন্য কয়েকটি ক্ষেত্রে বিবেক তাঁকে স্বস্তি দিত না। খ্রীস্ট সংঘের অবশ্যপাঠ্য দুটি ছত্র আবৃত্তি করতে তাঁর সংগতিবোধ আহত হত; মনে মনে তিনি লজ্জিত হতেন। সুযোগ পেলেই ছত্র-দুটি বাদ দিতেন, অথচ শান্তি পাওয়া যেত না তাতেও।

কয়েকটি সাম্-এ (Psalm) অ-খ্রীস্টানদের প্রতি বিদ্বেষ ও প্রতিহিংসার কথা রয়েছে। সেগুলো মাসের বিশেষ বিশেষ দিনে আবৃত্তি করতে হয়। কখন সেগুলো পাঠ করতে হবে ভেবে তিনি আতঙ্কিত থাকতেন। যে সংঘের আদর্শ হল 'সারমন অন্ দ্য মাউন্ট', প্রতিবেশীকে আপনার মতো ভালোবাসার নির্দেশ যেখানে স্পষ্ট, সেখানে এমন বিসদৃশ বাক্যে ঈশ্বরের নিন্দাই করা হয় বলে তাঁর মনে হত।

দ্বিতীয় বাধা বোধ করতেন অ্যাথেনেসিয়ান-সূত্র[১] উচ্চারণের কালে। কারণ তার আরম্ভের বাক্যাংশে খ্রীস্ট-অবিশ্বাসীদের অনন্ত নরকভোগের উল্লেখ রয়েছে। এণ্ডরুজ নানাভাবে মনকে বোঝাতেন যে এটিকে ভগবৎ-আরাধনার একটি স্তবমন্ত্র হিসাবে দেখতে হবে, এর অন্য কোনো তাৎপর্য স্বীকার করার প্রয়োজন নেই। মন কিন্তু ভরত না তাতে। আবার ভাবতেন্ বিশপ ওয়েস্টকটের মতো সাধুব্যক্তিরা যদি এটি আবৃত্তি করতে পারেন তবে তাঁর দ্বিধার কারণ কী? তাতেও বিবেকের বাধা ঘোচে না। মনে হত, তিনি যে এই নির্দেশ দরিদ্র সাধারণজনের কাছে আবৃত্তি করবেন, বিশপের মতো শিক্ষিত মন তাদের নয় তো। ঐতিহাসিক অর্থ ধরবার ক্ষমতা তাদের কোথায়?

---

১ অ্যাথেনেসিয়ান-সূত্র— ৩২৫ খ্রীস্টাব্দে মিশরের আলেকজেন্দ্রিয়ার দুই খ্রীস্টান পণ্ডিত অ্যারিয়াস্ ও অ্যাথেনেসিয়াস্ -এর মধ্যে তর্কযুদ্ধ হয় যীশু ও ভগবানের সম্পর্ক নিয়ে। অ্যাথেনেসিয়াস জয়ী হন ও প্রমাণ করেন যে যীশু ভগবানের সৃষ্টি নন, তিনি ঈশ্বরেরই অবতার ও তাঁর সঙ্গে একাত্ম। এই সময় যে ধর্মবাদের নানা সূত্র প্রচারিত হয় তা খ্রীস্টভক্তদের অনেকের কাছে বিনা তর্কে গ্রহণ করার কথা।

কলেজ-মিশনের কাজের কথা বলতে গিয়ে এণ্ডরুজ বলছেন[১]—

সে সময়কার যথার্থ চিত্র দিতে গেলে এই আলোছায়া-ভরা কখনো উদ্‌বেগ-সংকুল কখনো বা আনন্দমাখা দিনগুলোর বিচিত্র অভিজ্ঞতার বর্ণনা দিতে হয়। দীনের সেবায় যীশুর সঙ্গলাভ যে অন্তহীন সুখের আকর তা পেয়ে আমার মধ্যে যা কিছু সৎ, যা কিছু সুন্দর তাই সব সম্পূর্ণভাবে আত্মপ্রকাশ করত। প্রতিদিন প্রত্যুষে খ্রীস্টপ্রসাদ গ্রহণের পুণ্য অনুষ্ঠানে নিজের অন্তরপাত্রটি অনুরাগে ভরে নিতাম। আবার এমন সময় আসত সারারাত জেগে বিবেকের দংশন ভোগ করে ভাবতাম দীক্ষাগ্রহণ আমার পক্ষে উচিত হয়েছে কি ?

মনের এ অশান্ত অবস্থায় তাঁর অবচেতনায় যে আলোড়ন দেখা দিল, তার ফলে শুরু হল শারীরিক অসুস্থতা। আর এই কারণেই ডাক্তারেরাও ধরতে পারলেন না শরীর খারাপের কী কারণ। নিদ্রাহীনতা ও স্বল্প জ্বর ছাড়া রোগের অন্য কোনো উপসর্গ নেই। লণ্ডনের রাস্তায় অনর্গল যান-চলাচলের ফলে অনিদ্রার কষ্ট আরো বাড়ল। মিশনের কাজে অবিরাম পরিশ্রমে তাঁর শরীর কিছুতেই সুস্থ হতে পারল না। বিশ্রামের জন্য তখন প্রায়র-দম্পতি ও বিশপ ওয়েস্টকটের কাছে গিয়ে বেশ কিছুদিন বাস করলেন। তবু স্বাস্থ্যের পুনরুদ্ধার হয় না দেখে ডাক্তারের নির্দেশে তাঁকে কলেজ-মিশন ত্যাগ করতে হল। ১৮৯৯ খ্রীস্টাব্দের গ্রীষ্মকালে তিনি মিশনের কাজে অবসর নিতে বাধ্য হলেন, যদিও তাঁর নিজের মনের গভীর আকাঙ্ক্ষা ছিল নিম্নবিত্ত শ্রমোপজীবীদের মধ্যে সারা জীবন অতিবাহিত করবেন।

শিক্ষকতার ব্রতে

পেম্‌ব্রোক কলেজ-মিশনে এণ্ডরুজ যে দু বছর কাজ করেছিলেন তার মধ্যে তিনটি কলেজ তাঁকে ফেলোশিপ গ্রহণের জন্য আহ্বান জানিয়েছিল এবং প্রত্যেকবারই তিনি সবিনয়ে তা প্রত্যাখ্যান করেছেন। এবার কেম্‌ব্রিজে ফিরে এসে যাজক-শিক্ষণ বিভাগের (Clergy Training House, বর্তমানে Westcott House) উপাধ্যক্ষ-পদ গ্রহণ করলেন। সেখানে তিনি ধর্মতত্ত্ব পড়াতেন। ১৮৯৯ খ্রীস্টাব্দের নভেম্বর মাসে তিনি পেম্‌ব্রোক কলেজেরই ফেলো

---

১ C. F. Andrews, *What I Owe to Christ*, পৃ. ১৪৪।

নির্বাচিত হন। এর পরবর্তী কয়েকটি বছর কাটল ইতিহাস ও ধর্মের অধ্যয়ন ও অধ্যাপনায়। এই সময়ের মধ্যে কয়েকটি শুভার্থী বন্ধু ও ঘনিষ্ঠ আত্মীয়ের বিচ্ছেদ তাঁর মনে গভীর ছায়াপাত করে।

এণ্ডরুজ কেম্‌ব্রিজে পৌঁছবার কয়েকদিনের মধ্যেই অধ্যাপক প্রায়র কঠিন রোগে পড়লেন, তাঁর ক্যানসার হয়েছিল, অপারেশনের উপায় ছিল না। প্রায়র-এর মৃত্যুই এণ্ডরুজের জীবনের প্রথম শোক।

বন্ধু বেসিল্ ওয়েস্টকট মিশনরীরূপে দিল্লী সেণ্ট স্টিফেন্স কলেজে অধ্যাপনার কাজে যোগ দিয়েছিলেন। প্রত্যেক ডাকেই তাঁর চিঠি আসত। কলেজের উপাধ্যক্ষ সুশীলকুমার রুদ্রের কথা বন্ধু এণ্ডরুজকে তিনি জানাতেন। অল্পদিন পরে এল সেই অকৃত্রিম বন্ধুর জীবনের অকস্মাৎ অবসানের খবর— এক দিকে নিদারুণ, অপর দিকে তেমনি মহান। দিল্লী দুর্গে একটি সৈনিক কলেরায় আক্রান্ত হলে বেসিল গিয়েছিলেন তাকে শুশ্রূষা করতে। ওঁর নিজের শরীরও তখন দুর্বল ছিল, ফলে তিনিও ঐ রোগে আক্রান্ত হলেন। শেষ সময়ে সুশীল ওঁর কাছে ছিলেন— প্রিয়বন্ধুর স্মরণে বেসিলের শেষ সম্ভাষণবার্তা তিনিই এণ্ডরুজকে জানিয়েছিলেন। ১৯০০ খ্রীস্টাব্দে বেসিলের মৃত্যু হয়। এর পরে তাঁর পিতা ডারহামের বিশপ ওয়েস্টকটও আর বেশিদিন বাঁচেন নি। পেম্‌ব্রোক কলেজেরও তিনজন অধ্যাপক মাত্র দু বছরের মধ্যে মারা যান। এঁরা প্রত্যেকেই এণ্ডরুজের বিশেষ শ্রদ্ধা ও ভালোবাসার পাত্র ছিলেন।

গত বারো বছর ধরে পেম্‌ব্রোক কলেজের সঙ্গে অবিচ্ছিন্ন যোগ ছিল তাঁর, তাই শিক্ষকদের মৃত্যুর পরে কয়েকমাস নানাভাবে এণ্ডরুজ কলেজের সেবা করেছেন। সহকর্মীরা তাঁর উপদেশের উপর নির্ভর করতেন। তা ছাড়া নৌকাচালনায় তাঁর উৎসাহ ও উদ্যম স্নাতক-পূর্ব বিভাগের ছাত্রসমাজে তাঁকে জনপ্রিয়ও করে তুলেছিল।

এণ্ডরুজের জীবনে দুঃখের ঘটনার শেষ হয় নি তখনো। অল্প কিছুকাল পরে দিদি ক্যাথলীনের মৃত্যু হল। যক্ষ্মারোগগ্রস্ত অবস্থায় ডাক্তারের নির্দেশে তাঁকে সুইজারল্যাণ্ড পাঠানো হয়, কিন্তু বাঁচানো গেল না। ঘনিষ্ঠ পারিবারিক বন্ধনের মধ্যে এইবার প্রথম ফাঁক পড়ল। তাই আত্মার অদৃশ্য জগতের সঙ্গে যে এণ্ডরুজের এ সময়ে গভীর যোগ হয়েছিল তাতে আশ্চর্যের কিছু নেই।

এ বিষয়ে তাঁকে বলতে শুনি[1]—

কেম্‌ব্রিজে এই কটি বছর আমি কেবল মৃত্যু-উপত্যকার ছায়া অতিক্রম করে এসেছি··· একে একে অনেক বন্ধু, অনেক সুহৃদকে এই সময়ে হারিয়েছি। তাই অদৃশ্য জগৎ ও যীশুর সান্নিধ্য তখন আমার কাছে যতটা সত্য হয়ে উঠেছিল, আগে আর কখনো তেমনটি হয় নি··· ছাত্ররা তাদের সমস্যা নিয়ে এলে আমি নিজের জীবনের অভিজ্ঞতার কথা শোনাতাম। যীশুখ্রীস্ট তখন যেন আমার সর্বস্বধন হয়ে উঠেছিলেন।

১৯০৩ সালের দীর্ঘ গ্রীষ্মাবকাশের এক সন্ধ্যায় কলেজ নির্জন শান্ত। এমন অপূর্ব এক অভিজ্ঞতা হল তখন এণ্ড্রুজের বহু বছর ধরে যা তাঁকে অপরিসীম আনন্দ ও আত্মিক শক্তি জুগিয়েছে। বিষয়টি এভাবে লিপিবদ্ধ আছে[2]—

সে সময়ে আমি অদৃশ্য জগতের সান্নিধ্যেই বাস করছিলাম। রোগীর সেবা, মুমূর্ষুর শেষ বাণী শোনা, মৃত্যুকালে উপস্থিত থাকা— এ ভাবেই দিন চলছিল। এক গ্রীষ্মসন্ধ্যায় কলেজ-প্রাঙ্গণে একা দাঁড়িয়ে আছি। গোধূলির সময়, বাতাস শান্ত। সেখানে দাঁড়িয়ে দেখলাম কেউ একজন আমার দিকে এগিয়ে আসছেন— তাঁর অঙ্গে প্রভুর ভোজ-উৎসবের (Eucharistic) পোশাক, হাতে রয়েছে পবিত্র পানপাত্র। মনে হল কলেজে হয়তো কেউ অসুস্থ হয়ে পড়েছেন,তাই সেণ্ট মেরীস্ চার্চ-এর যাজক তাঁর জন্য প্রভুর প্রসাদ (Sacrament) নিয়ে চলেছেন। তিনি আসছেন দেখতে পাচ্ছি, মনে কোনো ভয় আসে নি। আমি তাঁকে ঢুকতে দেবার জন্য একটু সরে দাঁড়াব ভাবছি এমন সময় দেখি একটি দরজার কাছে এসে সে মূর্তি হঠাৎ মিলিয়ে গেল।

পরে বুঝলাম, এই যে দর্শন, এটি আমার ভিতর থেকে এসেছে। এ নিশ্চয় আমার অবচেতন মনে ছিল, কারণ সচেতনভাবে সে মুহূর্তে আমার মনে এরূপ কোনো চিন্তা ছিল না।

ভারতের অভিমুখে

এক সময়ে মধ্য-আফ্রিকায় গিয়ে কাজ করার পরিকল্পনাও এণ্ড্রুজের মনে ছিল কিন্তু বেসিলের মৃত্যুর পরে বুঝলেন বন্ধুর স্থান তাঁকেই পূর্ণ করতে হবে। কিন্তু পেম্‌ব্রোক কলেজের দায়িত্ব থেকে মুক্তি পাবেন কেমন করে?

---

১ C. F. Andrews, *What I Owe to Christ*, পৃ. ১৪৭-১৪৮।

২ তদেব, পৃ. ১৫০।

কেম্‌ব্রিজে তাঁর এক বন্ধু ডক্টর রাইল বললেন, এখন তোমার বয়স তেত্রিশ বছর। এ বয়সে আমাদের প্রভু যীশুখ্রীস্ট এই মরজগতের কার্য সমাপন করেছেন। যদি ভারতবর্ষকে তোমার সেবার ক্ষেত্র করতে চাও তবে আর এক মুহূর্তও বিলম্ব করা চলে না। কেম্‌ব্রিজ ত্যাগ করা এর পরে প্রতি বছরই তোমার পক্ষে কঠিনতর হবে।

সেই মুহূর্তেই এণ্ডরুজ মন স্থির করে ফেললেন। বুঝলেন ভগবানের নির্দেশেই এই বাক্য উচ্চারিত হয়েছে। তাঁর নিজ জীবনে ঈশ্বরের অভিপ্রায় কী তা তাঁর কাছে স্পষ্ট হয়ে উঠল। তাই মা-বাবাকে বোঝাতে পারলেন যে এবার যথার্থই তাঁর আহ্বান এসেছে।

এণ্ডরুজের স্নেহপ্রবণ চিত্তে বিদায়-অভিনন্দন গ্রহণ অত্যন্ত কঠিন।[১] পেম্‌ব্রোক মিশনের সমস্ত নরনারী সাউথওয়ার্ক ক্যাথিড্রেলে মিলিত হয়ে ঈশ্বরের কাছে তাঁদের আন্তরিক প্রার্থনা জানালেন যাতে তিনি নির্বিঘ্নে ভারতবর্ষে পৌঁছতে পারেন। উপাসনাশেষে একটি বৃদ্ধা জলভরা চোখে অতি সরলভাবে তাঁকে বললেন, 'শুনেছি সে দেশের লোকে মানুষ খায়। আমি দিনরাত প্রার্থনা করব যাতে তোমাকে ওরা খেয়ে না ফেলে।' বাড়ি গিয়ে ছেলেবেলার মতো মায়ের পায়ের কাছে বসে হাঁটু গেড়ে প্রার্থনা করলেন এণ্ডরুজ। শেষ রবিবারটি কাটালেন কেম্‌ব্রিজে। ১৯০৪ খ্রীস্টাব্দের ২৮ ফেব্রুয়ারি, প্রবল তুষারপাতের মধ্যে লণ্ডন ত্যাগ করলেন। মনে এ ভাবনা জেগে রইল— কাজটা ঠিক হল তো?

পথে সুইজারল্যাণ্ডের মধুর সূর্যালোক আর তার অপরূপ সৌন্দর্য তাঁকে মুগ্ধ করল। ভ্রমণপথের সঙ্গী হিসেবে পকেটে ছিল সংস্কৃত অভিধানটি। পোর্ট সৈয়দে গিয়ে পেম্‌ব্রোক থেকে তার পেলেন— যে-দলকে তিনি সেবার নৌকাবাইচ খেলায় শিক্ষা দিয়েছিলেন, তারা জিতেছে।

গভীর উদ্দীপনায় ও অবিস্মরণীয় পুলকে এণ্ডরুজ পূর্বমহাদেশের দিকে মুখ ফেরালেন।

---

১ Chaturvedi & Sykes, *Charles Freer Andrews*, পৃ. ৩৩-৩৪।

২

ভারতে

দ্বিতীয় জন্ম

এণ্ডরুজ যেদিন প্রথম ভারতের মাটিতে পদার্পণ করলেন (২০ মার্চ ১৯০৪), সেই দিনটিকে নিজের দ্বিতীয় জন্মদিন বলে তিনি অভিহিত করেছেন। জীবন-সাধনার প্রথম অংশ পাশ্চাত্যে অতিবাহিত করার পর ভারতে এসে নূতনতর প্রেরণার মধ্যে তাঁর চেতনা নবীন উদ্দীপনা লাভ করে। তাই যথার্থই তিনি ছিলেন দ্বিজ।

দিল্লীতে এসে প্রথম কয়েকটি দিন কাটল বিমুগ্ধ ভাবুকতায়। ভোরে উঠে যমুনাঘাটে গিয়ে দেখতেন সাজি ভরে নানা রঙের ফুল নিয়ে মেয়েরা মন্দিরে পূজা দিতে যাচ্ছেন। সে সৌন্দর্যের কোমলতা তাঁকে স্পর্শ করত। আবার মধ্যরাত্রির অনেক পরেও তারাভরা নিঃসীম আকাশের দিকে চেয়ে মনে হত ওরা অনন্তের বার্তা নিয়ে তাঁর কাছে নেমে আসতে চায়। ভারতের সূর্যোদয়, সূর্যাস্ত ও অন্ধকারের সুস্নিগ্ধ প্রশান্তিতে তাঁর সমগ্র সত্তা সমাহিত হত।

এখানে এসে এণ্ডরুজ তাঁর পুরোনো বন্ধু অনেককে পেলেন। সেণ্ট স্টিফেন্স কলেজের অধ্যক্ষ হিবার্ট ওয়্যার কেম্‌ব্রিজে এণ্ডরুজের সমসাময়িক ছিলেন। বেসিলের স্থানে নিযুক্ত প্যাডি ডে-ও কেম্‌ব্রিজে তাঁর পূর্বপরিচিত। এণ্ডরুজ সেখানে তাঁকে ধর্মতত্ত্ব পড়িয়েছেন, নৌকা চালানো শিখিয়েছেন। দিল্লী কেম্‌ব্রিজ ভ্রাতৃসংঘের প্রধান ক্যানন অলনাটকে বিলেতে থাকতেই তিনি অত্যন্ত শ্রদ্ধা করতেন। ভারতবর্ষে এসে এঁদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা বেড়ে গেল। কিন্তু এঁদের মধ্যেও যাঁর প্রতি সবিশেষ আকর্ষণ অনুভব করলেন এণ্ডরুজ তিনি সেণ্ট স্টিফেন্স কলেজের ভারতীয় উপাধ্যক্ষ সুশীলকুমার রুদ্র। বেসিলের ঘনিষ্ঠ বন্ধু হিসাবেই যে কেবল তাঁরা পরস্পরের প্রিয় হয়েছিলেন তা নয়, সুশীলের মাতৃহীন শিশু তিনটিকে দেখে এণ্ডরুজের মধ্যে সুপ্ত মাতৃস্নেহ জাগ্রত হয়েছিল।

১৯০৪ খ্রীস্টাব্দের ১২ এপ্রিলে আনুষ্ঠানিকভাবে কেম্‌ব্রিজ ভ্রাতৃসংঘে যোগ দিয়ে এণ্ডরুজ উর্দু শিক্ষার জন্য সিমলা গেলেন। সেখানে যে যাজকের গৃহে তিনি বাস করতেন পেম্‌ব্রোকেই তাঁর সঙ্গে পরিচয় হয়েছিল। পরে ভারতের

অস্থায়ী ব্যুরোক্র্যাট অ্যাশ্‌-টুহিল্‌-এর সন্তানদের গৃহশিক্ষকরূপেও এণ্ডরুজ সিমলায় ছিলেন কিছুদিন। সে সময়ে সরকারী এবং সৈনিক বিভাগের কর্মচারীদের সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠ যোগ হয়।

নূতন অভিজ্ঞতার পটভূমি

এ দেশে আসার প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই এণ্ডরুজ লক্ষ্য করলেন জাতিগত অহংকার সহজ মানবিক সম্পর্ককে কিভাবে বিষিয়ে দেয়। সেণ্ট স্টিফেন্স কলেজের ভারতীয় ছাত্রদের জাতিগত সংস্কার তাঁকে আহত করেছিল যত, সিমলায় শ্বেতকায় জাতির আত্মগরিমার পরিচয় পেয়ে আঘাত পেলেন আরো বেশি।

ভারতীয় জাতিভেদ ও ইংরেজ-এর বর্ণবৈষম্য প্রথম থেকেই এণ্ডরুজের চোখে এ দুয়ের মধ্যে কোনো তফাত ছিল না। রেলের কামরায় ‘নেটিভ’দের সঙ্গে বসতে যে ‘সাহেব’ অস্বীকার করে, আর যে অভুক্ত পাহাড়ী ছেলেটির হাতে এণ্ডরুজ একখানি রুটি দিয়ে দেখেছিলেন সাহেবের হাত থেকে খাবার নিতে সে কিভাবে ঘৃণায় রোষে জ্বলে ওঠে— তাদের দুজনের মধ্যে তফাত কোথায়? সুশীল রুদ্রের সখ্যের প্রভাবে ও নিজস্ব নৈতিক শক্তিবশে জাতি-বিদ্বেষের বিষ এণ্ডরুজকে স্পর্শ করতে পারে নি। ভারতীয়দের সঙ্গে সংযোগ স্থাপনের জন্য তিনি ক্রমেই উদ্‌গ্রীব হয়েছিলেন। সিমলায় উর্দু শিক্ষক মৌলভী শ্যামসুদ্দীন ছাড়া আর কোনো ভারতীয়ের সঙ্গে প্রথমে তাঁর কোনো ঘনিষ্ঠ পরিচয় হয় নি। ভিন্নধর্মাবলম্বী একটি নিষ্ঠাবান ব্যক্তির সঙ্গে বন্ধুত্বের অভিজ্ঞতা তাঁর জীবনে তখনই প্রথম। তাঁরই প্রেরণায় দিল্লীতে ফিরে এসে তিনি মুসলমান ধর্মের মূলতত্ত্ব জানবার জন্য মৌলভী জাকাউল্লা ও সৈয়দ নাজির আহ্‌মেদের সঙ্গে পরিচিত হন। এঁরা দুজনে ছিলেন ধর্মনিষ্ঠ অথচ এ যুগের জ্ঞানসাধনায় অনুরাগী। উভয়েই তাই আলিগড় মুসলিম বিশ্ববিদ্যালয়ের পরম শুভার্থী ছিলেন। মুনশি জাকাউল্লার প্রতি তাঁর হৃদয়ে এমনই গভীর অনুরাগ মুদ্রিত ছিল যে তাঁর একটি স্মৃতিচিত্র লিখে এণ্ডরুজ সেটি পুস্তকাকারে প্রকাশ করেন।[১] তাঁর বিষয়ে অন্যত্র লিখেছেন[২]—

---

১ C. F. Andrews, *Zakaullah of Delhi*, Published by Hefferd & Sons, Cambridge.

২ C. F. Andrews, *What I Owe to Christ*, পৃ. ১৬৩-১৬৪।

দিল্লীতে যাঁদের মধ্যে আমি যীশুখ্রীস্টকে মূর্তিমান দেখতাম তাঁরা হলেন সুশীল ও মুনশি জাকাউল্লা। মুনশিজী আমাকে 'বেটা' বলে সম্বোধন করতেন, ছেলের মতোই স্নেহ করতেন। জীবনের শেষ দিকে প্রতিদিন তিনি আমাকে দেখবেন বলে উৎসুক হয়ে প্রতীক্ষা করতেন। আমিও তাঁর কাছে যাবার জন্য উদ্‌গ্রীব হয়ে থাকতাম। দেখা হলে আমরা ধর্মের কথাই খোলাখুলিভাবে আলোচনা করতাম কিন্তু অপরকে ধর্মান্তরিত করার কথা আমাদের মনেও আসে নি। তাঁর সান্নিধ্যে যীশুখ্রীস্টের উপস্থিতি অনুভব করে আমি অপার আনন্দলাভ করতাম।

সুশীল রুদ্রের সঙ্গে বন্ধুত্বের কথা বলতে গিয়ে এণ্ডরুজ বলেন[১]—

বেসিলের বন্ধু সুশীল দিল্লীতে আমাকে স্বাগত জানালেন। অনেকে ভাবেন— ভারতবাসীরা আমাকে এত সহজে আপন করল আর আমিও অল্পদিনে তাদের এমন অন্তরঙ্গভাবে চিনলাম কেমন করে? এর মূলে রয়েছে কিন্তু সুশীলের প্রগাঢ় বন্ধুত্ব।

দুজনে একই গৃহে বাস করতেন। তাই ভারতে এসেই ভারতীয় পরিবারের একজন হয়ে উঠেছিলেন এণ্ডরুজ। সুশীলের স্বদেশপ্রীতি তাঁকে শ্রদ্ধান্বিত করত, উভয়ের ধর্মনিষ্ঠাও পরস্পরকে একসূত্রে বেঁধেছিল। সুশীলের পিতা প্যারীমোহন রুদ্র ডাফ সাহেবের ছাত্র ছিলেন। খ্রীস্টান-ধর্মও তিনি গ্রহণ করেছিলেন; কিন্তু সে যুগের অন্যান্য খ্রীস্টানদের মতো বেশে বাসে আচরণে পাশ্চাত্য ভাব গ্রহণ করেন নি। সুশীলের সঙ্গে এণ্ডরুজ প্রতিদিন হেঁটে বেড়াতেন— কখনো শহরের মধ্যে কোনো ছাত্রের বাড়ি যেতেন, কখনো বা যমুনার উপরকার সেতু পার হয়ে কাছাকাছি গ্রামে যেতেন। সুশীল ছিলেন ভারত-ইতিহাসে বিশেষ অভিজ্ঞ। তাই গ্রামের পথে চলার সময় সেখানকার অর্থনীতি সম্বন্ধে তিনি যে-সব আলোচনা বা মন্তব্য করতেন তাতে এণ্ডরুজের জ্ঞান বাড়ত। সেই কারণেই ভারতবর্ষকে কেবল তার শহরগুলো দিয়ে বিচার করার ভুল এণ্ডরুজ কোনোদিনই করেন নি। ভারতবর্ষে এসে প্রথম যে-সব ভারতীয়ের সঙ্গে এণ্ডরুজের পরিচয় হয় সে সবই প্রায় সুশীলের মধ্যস্থতায়। সে যুগে কোনো হিন্দু বা মুসলমানের সঙ্গে খ্রীস্টানের ঘনিষ্ঠতা সন্দেহের চোখে দেখা হত। কিন্তু সুশীল রুদ্র ছিলেন নির্বিচারে ধর্মান্তরিত করার ঘোর

---

১ C. F. Andrews, *What I Owe to Christ*, পৃ. ১৫৭।

বিরোধী। এ কথা লোকে জানত বলে তাঁর বন্ধু এণ্ডরুজকেও সকলে সহজভাবে গ্রহণ করতে পেরেছিল।

মিশনরীদের দৃষ্টিভঙ্গিতে পরিবর্তন আনার যে সময় হয়েছে সে কথা সুশীল ও দিল্লীর অন্যান্য ভারতীয় খ্রীস্টানরা বুঝেছিলেন। খ্রীস্টান সাধুজীবনের পুণ্যস্পর্শে যে ফল হবে তা অজস্র প্রচারধর্মী বক্তৃতাতেও হবে না— এই ছিল তাঁদের দৃঢ় অভিমত।

পরবর্তী জীবনে মহাত্মা গান্ধীর মুখেও যখন প্রায় একই ভাষায় সুশীলের এই মত ব্যক্ত হল— এণ্ডরুজ আশ্চর্য বোধ করলেন। গান্ধীজী বলেছিলেন, 'গোলাপ যখন ফোটে সে কি তারস্বরে তার আগমন ঘোষণা করে? তেমনি যে খ্রীস্টানের জীবন গোলাপের মতো নীরবে প্রস্ফুটিত হবে, তার মধ্যেই স্বয়ং যীশুখ্রীস্ট প্রত্যক্ষ হবেন।'

বিশপ ওয়েস্টকটের সঙ্গে বিলাতে থাকতে ভারতবর্ষ সম্বন্ধে এণ্ডরুজের যে-সব আলোচনা হত তার ফলে এই দেশের ভাব গ্রহণে তাঁর বিশেষ অসুবিধা হয় নি। কিন্তু শৈশব থেকে এমন কয়েকটি সংস্কারও আবার মনের মধ্যে দৃঢ় ভাবে গেঁথে গিয়েছিল, যা ত্যাগ করা ছিল তাঁর পক্ষে কষ্টকর। ভারতবর্ষকে ব্রিটিশ-অধিকৃত রাজ্য বলে জেনেছেন পিতার কাছে অল্প বয়সে। তা সত্ত্বেও ইংরেজের জাতিগত এবং সাম্রাজ্যগত প্রাধান্যের সংস্কার এণ্ডরুজের মন থেকে ক্রমে ক্রমে দূর হতে পেরেছিল কেবলমাত্র সুশীলের সাহচর্যে। এণ্ডরুজের ব্যবহারে ঔদ্ধত্য প্রকাশ পেলে সুশীল কখনো ধৈর্যহারা হতেন না। বহু ইংরেজের সঙ্গে মেলামেশা করার ফলে এদের ধরন তাঁর জানা হয়েছিল। তিনি বলতেন, 'তোমরা ইংরেজরা অপরকে স্বমতে আনবার জন্য জোর জবরদস্তি করো। যীশুখ্রীস্ট কিন্তু সার্থকতালাভের জন্য বলপ্রয়োগের বিরোধী ছিলেন। বীজ গোপনে অঙ্কুরিত হবার কাহিনী বাইবেলে আছে। প্রাচ্যদেশই কেবল বুঝতে পারে সেই অন্তরালে বীজোদ্‌গমের কথা।'

ভারতবর্ষে এণ্ডরুজের কাজ প্রথম দিকে নানাভাবে বাধাপ্রাপ্ত হয়। এক বছরের মাথায় কর্ণরোগে আক্রান্ত হয়ে ইংলণ্ডে ফিরে গেলেন ১৯০৫ খ্রীস্টাব্দের এপ্রিলে। সেখানে গিয়ে এবারে স্পষ্টই অনুভব করেন জাতিগত অহংকার বিশ্ববিদ্যালয়গুলির কত ক্ষতি করছে। সেণ্ট স্টিফেন্স কলেজের ছাত্র হরদয়াল সরকারী বৃত্তি পেয়ে অক্সফোর্ডে পড়তে গিয়েছিলেন। সেখানকার পরিবেশের জাতিবৈষম্য তাঁকে এতদূর পীড়িত করেছিল যে জীবনে উন্নতির আশা বিসর্জন

দিয়ে তিনি বিপ্লবের পথে চলতে আরম্ভ করেন। এমন সময় এণ্ডরুজের সঙ্গে দেখা হতে দুজনের মধ্যে দীর্ঘ আলোচনা হয়। পরে ইংলণ্ডে ভারতবর্ষের সমস্যা নিয়ে এণ্ডরুজ যত বক্তৃতা বা উপদেশবাণী দিয়েছেন সর্বত্রই জাতি ও বর্ণগত কুসংস্কারের তীব্র নিন্দা করেছেন। ১৯০৪-১৯০৫ সালের অভিজ্ঞতাই পরে তাঁকে জাতি-সাম্যের একনিষ্ঠ সাধক করে তুলেছিল।

সাহিত্য ও স্বদেশচেতনার শিক্ষণে দিল্লীতে

এণ্ডরুজ যখন দিল্লী ফিরে এসে সেণ্ট স্টিফেন্স কলেজে অধ্যাপনার কাজ শুরু করলেন, রাশিয়ার বিরুদ্ধে জাপানের জয়লাভের খবরে সমগ্র দেশ তখন উৎসাহে উদ্দীপনায় মুখর। শিক্ষিত ভারতীয়ের মনে রাষ্ট্রীয় চেতনা জাগ্রত হওয়ায় রাষ্ট্রসেবার নানারূপ পরিকল্পনা প্রস্তুত হতে লাগল। গোপালকৃষ্ণ গোখলে স্থাপিত 'সারভেন্ট্স্ অফ ইণ্ডিয়া সোসাইটি'র (১৯০৫) উচ্চ আদর্শের প্রভাব সুদূরবিস্তৃত হয়েছিল। ফলে জাতি ও সম্প্রদায় -গত সংকীর্ণ বাধা অপসারিত করে এ দেশের যুবকগণ বৃহত্তর ভারতের সেবায় নামলেন। ১৯০৫ খ্রীস্টাব্দে এণ্ডরুজের একটি হিন্দু ছাত্র পাঞ্জাবে প্লেগ-ক্যাম্পে অস্পৃশ্যদের সেবা করতে যায়। ভারতীয় খ্রীস্টানসমাজেও রাষ্ট্রীয়চেতনা জাগরণের ফলে ১৯০৫ খ্রীস্টাব্দের ডিসেম্বরে 'জাতীয় মিশনরী সঙ্ঘ' প্রতিষ্ঠিত হয়। ছাত্র ও শিক্ষকের জীবনে জীবন যেখানে যুক্ত হয়, ছাত্রের মনে শিক্ষকের প্রভাব সেখানে অপরিমেয়। পরবর্তী জীবনে সুপ্রতিষ্ঠিত সেণ্ট স্টিফেন্স কলেজের বহু ছাত্রের মধ্যে প্রথম রাষ্ট্রীয় চেতনা পরিস্ফুট হয় এণ্ডরুজেরই সংস্পর্শে। ভারতের বিভিন্ন প্রান্তের সে সময়কার ছাত্রদের মনেও তাঁর বক্তৃতার প্রভাব ছিল অসাধারণ।

ব্রিটিশ শাসনের হিতকারিতায় যে বিশ্বাস এণ্ডরুজের মনে বদ্ধমূল হয়েছিল তা তখনো অটুট। শ্বেতকায় জাতি নিজ প্রাধান্য রক্ষায় অপর জাতির প্রতি অন্যায় উদ্ধত আচরণ করছে, এমন বহু তিক্ত অভিজ্ঞতা সত্ত্বেও ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের উচ্চ আদর্শে তিনি তখনো আস্থা হারান নি। শেলি, টেনিসন, ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থ, মিল্‌টন— বিশেষ করে শেক্‌স্‌পীয়র পড়াবার সময় ইংরেজি সাহিত্যের স্বাধীনতার পূজারীদের লেখা থেকে উদ্‌ধৃতি দিয়ে ভারতীয় ছাত্রদের বোঝাতেন, এরকম উচ্চচিন্তার ন্যায়সংগত উত্তরাধিকার এখন তাদেরই, কেননা তারা স্বদেশসেবার আগ্রহে নবজাগ্রত। তাঁর বক্তৃতার একটি প্রধান বিষয়

ছিল 'শেক্‌স্‌পীয়র ও জাতীয় বৈশিষ্ট্য'। যখন তিনি Henry V পড়াতেন ছাত্ররা মন্ত্রমুগ্ধ হয়ে শুনত। অভিনয় শেখাবার দক্ষতাও ছিল তাঁর অসাধারণ। রোমিও জুলিয়েট ও হ্যামলেটের অভিনয় শেখাতে গিয়ে বলতেন, 'দুর্বল ভাবাবেগ ও কল্পনাপ্রবণতার কুফল-সম্বন্ধে জাতিকে সচেতন করাই এ দুটি নাটকের অভিপ্রায়।' রাষ্ট্রের কল্যাণকর্মে সুসংহত চিন্তাশক্তি ও বলিষ্ঠ সক্রিয়তার গুরুত্ব যে কত ছাত্ররা সে শিক্ষাই তাঁর কাছে পেত। ম্যাৎসিনির বই পড়তে উৎসাহ দিতেন, কিন্তু ইউরোপীয় চিন্তাধারার অর্থহীন অন্ধ অনুকরণ যেন না ঘটে সে বিষয়ে সতর্ক করতেন সকলের আগে।

১৯০৮ খ্রীস্টাব্দের নবেম্বরে স্টিফেনিয়ান পত্রিকায় এণ্ডরুজ ছাত্রদের উদ্দেশ করে লিখলেন[১]—

> স্বাধীন ও স্বতঃস্ফূর্ত ভারতীয় জীবনের চিত্র খুঁজে দেখো তোমাদের আপন দেশের ইতিহাসে। তোমাদের স্বাধীনতার আদর্শ যেন পাশ্চাত্যের ধার-করা না হয়।··· প্রাচীন যুগের সঙ্গে দেশের বর্তমান্ অবস্থার তুলনা করো সযত্নে, বৈজ্ঞানিক উপায়ে। তার পর নিজ জীবনের বাস্তবক্ষেত্রে নেমে এসে নিজেকে প্রশ্ন করো, প্রাচীন ভারতের সমকক্ষ নব-ভারত রচনায় কোন্ কুসংস্কারের উচ্ছেদ সাধনে, কোন্ কুরীতিকে ব্যাহত করায় আমি সাহায্য করতে পারি?

'বৈজ্ঞানিক উপায়ে' কথাটি এণ্ডরুজ চিন্তা করেই লিখেছিলেন। ভারতের পুনর্জাগৃতির জন্য দেশের অধিবাসীদের মনে শুধুমাত্র জাতীয় ঐক্যের বোধ জাগানোই যথেষ্ট নয়। দেশের প্রকৃত অবস্থার যথাযথ অনুধাবন প্রয়োজন। ছাত্রদের তিনি দেখালেন দিল্লীতে তাদের চোখের সামনে মদের আর আফিমের নেশা কিভাবে মানুষের অধঃপতন ঘটাচ্ছে। বছর বছর ম্যালেরিয়া ও যক্ষ্মায় কত পরিবার নিশ্চিহ্ন হচ্ছে। একই কর্মধারা অনুযায়ী সব ধর্মের লোক মিলিত হয়ে এ-সবের বিরুদ্ধে সংগ্রাম চালানো সম্ভব। ছাত্রদের তিনি বললেন তরুণদের প্রথম কাজ ঘৃণিত লাঞ্ছিত জনসমাজের সেবা। তাদের শিশুগুলিকেই সর্বাগ্রে শিক্ষিত করে তুলতে হবে। শিক্ষাদানে অবহেলা করলে নবীন ভারতের ভিত্তি হবে চোরাবালির উপরে।

এণ্ডরুজের কয়েকজন ভারতীয় বন্ধু তাঁকে সমালোচনা করে বললেন,

---

১ Chaturvedi & Sykes, *Charles Freer Andrews*, পৃ. ৪৪।

'পাশ্চাত্যের বিজ্ঞানভিত্তিক উন্নতিতে তিনি বিশ্বাসী।' কিন্তু তাঁদের মতে ভারতের উন্নতির সময় আসবে তখনই যখন একজন গুরু এসে তাঁর আত্মদানের আদর্শে জনসমাজকে কর্মের পথে উদ্‌বুদ্ধ করতে পারবেন। এই মতের মধ্যে যে সত্য আছে এণ্ডরুজকে তা মানতেই হল। তবু তিনি বললেন, 'জনসাধারণকে শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও আর্থিক উন্নতির বাস্তবপথে চালিয়ে নিয়ে এখনই কিন্তু ক্ষেত্র প্রস্তুত করতে হবে।'

ডিসেম্বর ১৯০৬। দাদাভাই নওরোজী কলকাতার জাতীয় কংগ্রেসে সভাপতির ভাষণে প্রথম ভারতের জন্য রাষ্ট্রনীতিক স্বশাসন (Swaraj) দাবি করলেন। এণ্ডরুজ এই ভাষণ সম্বন্ধে যে মন্তব্য করেন তাতে বোঝা যায় তখনই তাঁর ধারণা হয়েছিল ভারতের সামাজিক বিভেদগুলি এ দাবির পথে বাধাস্বরূপ হয়ে দাঁড়াবে। কংগ্রেস সভাপতির দূরদৃষ্টির প্রশংসা করেও ভারতের সামাজিক বৈষম্যের প্রতি তাঁর দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। ১৯০৬ খ্রীস্টাব্দের ২৮ ডিসেম্বরে 'বেঙ্গলী' পত্রিকায় ভারতের ইংরেজ-বন্ধু পরিচয়ে এণ্ডরুজ বলছেন[১]—

> ···জাতিভেদ প্রথা যদিও শিক্ষিত স্বল্পসংখ্যক লোকের মধ্যে ক্রমশ কমে আসছে, জনসাধারণের মধ্যে তার প্রসার এত অধিক যে এক কথায় তাকে বাতিল করা যায় না। সে-সব প্রথাই রাষ্ট্রীয় স্বশাসনের প্রধান প্রতিবন্ধক।

জনসেবা। খ্রীস্টসেবা

কেম্‌ব্রিজ ভ্রাতৃসংঘের অধীনে দিল্লীর সব্‌জিমণ্ডীতে খ্রীস্টান চামার ও অন্য অস্পৃশ্যদের যে-সব বস্তি ছিল এণ্ডরুজ প্রায়ই সেখানে যাতায়াত করতেন। কেম্‌ব্রিজে পেম্‌ব্রোক কলেজ-মিশনের ছাত্ররা যেমন ওয়ালওয়ার্থের বস্তিবাসীদের উন্নয়নের চেষ্টা করে; এণ্ডরুজের একান্ত আগ্রহ যেন সেণ্ট স্টিফেন্স কলেজের ছাত্ররাও তেমনি দিল্লীর বস্তিবাসীদের সেবায় অগ্রসর হয়। অবশ্য ভারতীয়দের অবস্থা ও প্রয়োজন-অনুযায়ী এখানে পৃথক কার্যসূচী প্রস্তুত করতে হবে। কলেজে খ্রীস্টান ছাত্রের সংখ্যা তখন খুবই কম। তাদের মধ্যে যারা একটু অনুভূতিপ্রবণ তারাই আবার খ্রীস্টধর্মে বিশ্বাস ও স্বদেশপ্রেমের অন্তরায়স্বরূপ—বন্ধুদের এরূপ অভিযোগে ঈষৎ ক্ষুণ্ণ। এণ্ডরুজ তাদের বুঝিয়ে বললেন, 'খ্রীস্টান

১ Chaturvedi & Sykes, *Charles Freer Andrews*, পৃ. ৪৫-৪৬।

জাতীয়তাবোধ ভারতবর্ষকে কী দিতে পারে তা সকলকে দেখিয়ে দিতে হবে নির্বিচারে সকল জাতের সেবায় অগ্রসর হয়ে।'

ছাত্রদের তিনি আপন হাতে শিখিয়েছিলেন রোগীর সেবাপদ্ধতি। তাঁর সে সময়কার সহকর্মীদের মধ্যে একজন লিখছেন, 'হস্‌টেলের কোনো একটি ছাত্র যদি ম্যালেরিয়ায় আক্রান্ত হত, এণ্ড্রুজ ব্যস্ত হয়ে ছলছল চোখে এভাবে তার সেবা করতেন মনে হত উদ্‌বেগব্যাকুল মা যেন সন্তানসেবা করছেন। এ স্নেহ যে তাঁর কত আন্তরিক অধ্যাপকদের সে কথা বুঝতে বেশি সময় লাগে নি। কলেজের খ্রীস্টান ছাত্রদের এণ্ড্রুজ যেভাবে অনুপ্রাণিত করেছিলেন তাতেই সকলে তাঁর আন্তরিকতার পরিচয় পেয়েছেন। নিজে সামনে দাঁড়িয়ে থেকে কলেজের একটি অস্পৃশ্য রুগ্‌ণ মেথরের সেবায় ছাত্রদের প্রবৃত্ত করলেন। এই-সব খ্রীস্টান ছাত্ররা মাঝে মাঝে তাদের হিন্দু এবং মুসলমান সহপাঠীদেরও বস্তিতে যাবার সময় সঙ্গে নিয়ে যেত। সেখানকার অধিবাসীদের মদের নেশা ছাড়ানো ও স্বাস্থ্যোন্নতির চেষ্টায় তৎপর হত সবাই মিলে। হোলি উৎসবের দিনে পানোন্মত্ততা ও অসভ্য আচরণ নিরোধের জন্য তারা 'পবিত্র হোলি' সংগঠন করল। সেই ক্রীড়াপ্রদর্শন প্রভৃতি নানা সুস্থ হিতকর আমোদের ব্যবস্থা হয়েছিল সেবারে। ১৯১৫ খ্রীস্টাব্দের ২৪ জুন তারিখে সুশীল রুদ্র এণ্ড্রুজের পিতাকে লিখেছিলেন[১]—

> ...আপনার পুত্র চার্লির কাছেই ছাত্ররা শিখেছে কিভাবে ভালোবেসে জনসেবা করতে হয়।

১৯০৫ সালের শেষভাগে বিলাত থেকে দিল্লীতে ফেরার সময় এণ্ড্রুজ ডাক্তারের কাছে এই নির্দেশ পেয়েছিলেন যে প্রত্যেক বছর গ্রীষ্মকালটি তাঁকে পাহাড়ে কাটাতেই হবে। ১৯০৬ সাল থেকে তাই তাঁর কলেজের কর্মসূচী সেভাবে তৈরি হত। সানাওয়ার জায়গাটি সিমলা পাহাড়ের গায়ে। সেখানকার ব্রিটিশ সৈনিকদের পুত্রকন্যার লেখাপড়ার জন্য 'লরেন্স মিলিটারি অ্যাসাইলাম' নামে একটি বিদ্যালয় ছিল। বিদ্যালয়ের ইংরেজ অধ্যক্ষ লম্বা ছুটি নিয়ে দেশে যাবেন। তাঁর স্থানে এণ্ড্রুজ স্কুলের ভার নেবেন ঠিক হল। প্রথম কয়েক সপ্তাহ আনন্দে কাটল। কাজের চাপ বিশেষ ছিল না। গ্রীষ্মের ছুটি কাটাতে সুশীল রুদ্র পুত্র সুধীরকে নিয়ে এলেন বন্ধুর কাছে। এই সময়

---

১ Chaturvedi & Sykes, *Charles Freer Andrews*, পৃ. ৪৭।

এণ্ডরুজ মাঝে মাঝে ছবি আঁকারও অবকাশ পেতেন। আবার কখনো তাঁরা পায়ে হেঁটে কাছের পাহাড়ে উঠে যেতেন।

ব্রিটিশ টমিসৈন্য যারা কাছাকাছি বস্তিতে থাকত তাদের সঙ্গে এণ্ডরুজের আলাপ-পরিচয় হল। এদের দেখলে মঙ্কওয়্যারমাউথ আর ওয়ালওয়ার্থ ক্লাবের ছেলেদের কথা তাঁর মনে পড়ত। মাঝে মাঝে তাঁকে গির্জায় উপদেশ দিতে যেতে হত। সেখানে কখনো সেণ্ট ফ্রান্সিস, কখনো ফাদার ডেমিয়েনের জীবনকাহিনী শোনাতেন। কখনো আবার ভারতের দরিদ্রসাধারণের দুরবস্থার বর্ণনা দিয়ে বলতেন যে প্রত্যেক খ্রীস্টানের উচিত খ্রীস্টভাবে উদ্‌বুদ্ধ হয়ে তাদের সাহায্য করা। সুধীর একদিন দেখে অবাক হল যে একটি টমি কোমরবন্ধের টাকার থলিতে যা ছিল সবই সে সময় গির্জার দানের থালায় ঢেলে দিল।

বর্ণবৈষম্য-বিরোধী সংগ্রামের পুরোভূমিতে

সুধীর রুদ্র ভারতীয় ছাত্র বলে প্রথম কিছুদিন ইংরেজ সহপাঠীদের ঔদাসীন্য তাকে সহ্য করতে হয়েছিল। কিন্তু পরে সে হকি খেলা ও দৌড়ে দক্ষতার পরিচয় দিয়ে তাদের চিত্ত জয় করল। এণ্ডরুজ সানন্দে লক্ষ করলেন সুধীর সেণ্ট স্টিফেন্স কলেজের হকি টিম সানাওয়ারে নিয়ে এল। এর পরে সানাওয়ারের দুটি ছাত্র সেণ্ট স্টিফেন্স কলেজে যোগ দেয়। জাতিগত কুসংস্কার ভাঙার এও একটি উপায় ভেবে এণ্ডরুজ সুখী হলেন। কিন্তু সেবার গ্রীষ্মকালে সানাওয়ারে ইংরেজ অধ্যাপকদের জাত্যভিমানের আতিশয্যে অপ্রত্যাশিত মনোবেদনা সইতে হয় তাঁকে। বন্ধু সুশীল এসে অধ্যক্ষের বাংলোয় তাঁর সঙ্গে গ্রীষ্মযাপন করবেন এরকম কথা ছিল। কিন্তু এণ্ডরুজের সহকর্মীরা কেউ ভারতীয়ের সঙ্গে এক বাড়িতে থাকতে রাজি নন। এণ্ডরুজ তৎক্ষণাৎ পদত্যাগপত্র পেশ করতে প্রস্তুত হলেন। সুশীল রুদ্রই সেবারে তাঁকে বহু কষ্টে নিরস্ত করেন।

ঘটনাটি সে যুগের পক্ষে খুবই সাধারণ ও স্বাভাবিক। কিন্তু অগ্নিতে ঘৃতাহুতি তখনো বাকি। ঠিক সে সময়ে লাহোর সিভিল ও মিলিটারি গেজেটে একখানি পত্র প্রকাশিত হয়। স্বদেশভক্ত ভারতীয়দের সম্পর্কে একজন ইংরেজ লিখলেন[১]— 'এঁরা কুশিক্ষাপ্রাপ্ত বিদ্রোহপরায়ণ লোক, উচ্ছৃঙ্খল স্বেচ্ছাচারী স্কুলবালকের মতো ব্যবহারই কেবল এঁদের প্রাপ্য।' এণ্ডরুজ

---

১ Chaturvedi & Sykes, *Charles Freer Andrews*, পৃ. ৪৯।

আর সহ্য করতে পারলেন না। শান্ত ভদ্রভাষায় প্রতিবাদ জানিয়ে গেজেটের সম্পাদককে একখানি পত্র লিখলেন। এবার পত্রে নিজের নাম ঠিকানা দিলেন।

১৯০৬ খ্রীস্টাব্দের সেপ্টেম্বরে চিঠিখানি প্রকাশিত হলে কৌতূহলে ভারতীয়রা জানতে চাইলেন লেখকের পরিচয়। সিমলা পাহাড়ের সৈনিক বিভাগের ইংরেজ কর্মচারীর কাছ থেকে এমন পত্র যে নিতান্তই অসম্ভাব্য। এই পত্রের সূত্রে যে দুজন স্বদেশভক্ত ভারতীয়ের সঙ্গে তাঁর তৎক্ষণাৎ সৌহার্দ্য হয়ে গেল তাঁরা হলেন পাঞ্জাবকেশরী লালা লাজপত রায় আর বাংলাদেশের রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়। রামানন্দবাবু মডার্ন রিভিয়ু পত্রিকার সম্পাদনা তখনই শুরু করেছেন। তিন মাসের মধ্যে এণ্ডরুজ উত্তর-ভারতের বহু জননেতার সঙ্গে সাক্ষাৎ করে তাঁদের আস্থা ও বিশ্বাস অর্জন করলেন। এণ্ডরুজের প্রতিবাদ-পত্রের আর-একটি ফল হল, ভারতবর্ষের পত্রপত্রিকায় তাঁর যে-কোনো লেখা আগ্রহের সঙ্গে পড়তে উৎসুক অগণিত পাঠকমণ্ডলীর মানসিক সমর্থন তিনি পেয়ে গেলেন।

১৯০৬ খ্রীস্টাব্দে দাদাভাই নওরোজীর সভাপতিত্বে ভারতের জাতীয় কংগ্রেসের অধিবেশন উপলক্ষে কলকাতায় আরো কয়েকজন দেশসেবকের সঙ্গে এণ্ডরুজের ঘনিষ্ঠতা হয়। প্রবীণ খ্রীস্টান কালীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, গোপালকৃষ্ণ গোখলে ও তেজবাহাদুর সপ্রু— এঁদের প্রতি তাঁর শ্রদ্ধা ক্রমশ বাড়তে থাকে। ফেরার পথে তিনি সপ্রুর সঙ্গে এলাহাবাদে নেমে গেলেন। আর এখানেই ইংরেজ-শাসনের কুফল সম্বন্ধে প্রথম সচেতন হলেন। সপ্রুর বাড়িতে একদিন এক সভা বসেছিল। সেখানে এণ্ডরুজ অনুরোধ জানালেন, দুপক্ষে খোলাখুলি ভাবের আদানপ্রদানে হয়তো সুফল ফলতে পারে। তখন একজন বৃদ্ধ বললেন, 'আমরা আপনার কাছে অকপটে সব কথা বলতে পারি কিন্তু উপরিতন কর্তৃপক্ষের কাছে বলব না। কারণ আমরা যে পরাধীন জাতি।' এণ্ডরুজ ভাবলেন, 'এ কথা যদি সত্য হয়, বুঝতে হবে ভারতে ব্রিটিশ শাসন ব্যর্থ হয়েছে।' এর পরের বছরের ঘটনায় এ বিষয়ে তাঁর আর কোনো সংশয় রইল না।

দাদাভাই নওরোজী কলকাতা কংগ্রেসে ভারতের জনসমাজকে আহ্বান করে বলেন, স্বরাজ দাবি করে এবার শান্তভাবে বিক্ষোভ প্রদর্শনের সময় এসেছে। বিক্ষোভ শান্তভাবে হতে পারে এ কথা অবশ্য ব্রিটিশ-শাসকরা বিশ্বাস করেন নি। সিপাহী-বিদ্রোহের পঞ্চাশবর্ষ-পূর্তি উপলক্ষেও কী জানি

কী হয় এরূপ একটি আশঙ্কা তাঁদের মনে ছিল। ১৯০৭ সালের রাজনৈতিক আকাশে ঝড়ের পূর্বাভাস সূচিত হয়েছিল। বঙ্গভঙ্গের ফলে আবার গোপন ষড়যন্ত্র ও পুলিসী দমন-নীতির যুগ এল। দক্ষিণ-আফ্রিকায় ভারতীয়দের প্রতি দুর্ব্যবহারের খবরও জনসাধারণের মধ্যে ছড়িয়ে পড়ে প্রচণ্ড বিক্ষোভের সৃষ্টি করল। ছাত্রসমাজ সর্বাগ্রে জাতীয়ভাবে উদ্‌বুদ্ধ হয়, তারাই আবার সন্ত্রাসবাদ প্রচারে উৎসাহী। বেশির ভাগ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান এ দিকে ব্রিটিশ শাসনাধীনে। তাই এ আন্দোলন অচিরে জাতিবিদ্বেষের রূপ পেল।

ঠিক এই সময়ে দিল্লীর কেম্‌ব্রিজ মিশনে যে ঘটনাটি ঘটল সেও অভূতপূর্ব। সেণ্ট স্টিফেন্স কলেজের অধ্যক্ষ হিবার্ট ওয়্যার কার্যভার ত্যাগ করলে সুশীলকুমার রুদ্রকে তাঁর স্থলে নিয়োগ করা হয়। এর আগে কোনো ভারতীয় কখনো কোনো মিশন কলেজে অধ্যক্ষ নিযুক্ত হন নি। এবারের এই নিয়োগে প্রমাণ হল যে অন্তত খ্রীস্টানসমাজে জাতিগত সাম্যের আদর্শটি আন্তরিকতার সঙ্গে পালন করা হচ্ছে। এই সুযোগ্য ভারতীয় অধ্যক্ষের অধীনে বহু বিদ্বান ইংরেজ অধ্যাপক সানন্দে কাজ করেছেন।

এই অধ্যক্ষ নিয়োগের ব্যাপারে সম্পূর্ণ কৃতিত্ব ছিল এণ্ডরুজের। কলেজের অধ্যক্ষ হবেন একজন ইংরেজ— এই ছিল প্রথা। সুশীলও চেয়েছিলেন এণ্ডরুজই সে কাজের ভার নেবেন। কিন্তু এণ্ডরুজের মনে হল কুড়ি বছর যোগ্যতার সঙ্গে উপাধ্যক্ষের কাজ করার পর সুশীলের নিজের দেশে একজন ইংরেজ এসে যদি তাঁর উপরে অধিষ্ঠিত হন তবে সুশীলের প্রতি অবিচার করা হয়। লাহোরের বিশপ মনে করলেন ভারতীয় অধ্যক্ষের নিয়োগে অভিভাবকরা কলেজের শৃঙ্খলা সম্বন্ধে নিরাশ হবেন। তাঁরাও অধ্যক্ষের কর্মভার গ্রহণের জন্য এণ্ডরুজকে মনোনীত করেছিলেন। অবশেষে এণ্ডরুজ ও ওয়েস্টার্ন— এ দুজন ইংরেজ অধ্যাপক এ ব্যাপারে তাঁদের কর্মত্যাগের সংকল্প জানালে রুদ্রকে অধ্যক্ষপদে গ্রহণ করা হল। বিশপ অবশ্য অল্পকাল পরেই নিজের বিবেচনার ত্রুটি স্বীকার করেছিলেন।

১৯০৯ খ্রীস্টাব্দের কলেজ রিপোর্টে এণ্ডরুজ জানিয়েছেন, অধ্যক্ষ রুদ্রের তত্ত্বাবধানে সেণ্ট স্টিফেন্স কলেজের ছাত্র ও অধ্যাপকদের মিলিত জীবন কেমন সুশৃঙ্খল সুন্দরভাবে চলেছিল। অথচ সেই সময়ে অন্য সব মিশন কলেজের অধ্যাপকরা কোন্ দিন ছাত্রবিদ্রোহ শুরু হবে সেই ভয়ে সদা কম্পমান থাকতেন।

কলেজের শৃঙ্খলারক্ষায় উপাধ্যক্ষ এণ্ডরুজের ভূমিকা কী ছিল, সে খবর জানতে পারি তখনকার দিনের এক ইংরেজ ভ্রমণকারীর কাছ থেকে। দিল্লীতে এসে সেণ্ট ষ্টিফেন্স কলেজ দেখে তিনি বলেন, 'এণ্ডরুজের চেয়ে কম বিচক্ষণ যে-কোনো ইংরেজের চোখে যে-সব ঘটনা রাজদ্রোহ বলে বিবেচিত হতে পারত, তাঁর চোখে সেগুলিই নবজাগ্রত রাষ্ট্রচেতনার আন্তরিক উদ্দীপনা বলে প্রতিভাত হয়েছে।'

ইংরেজ আমলাতন্ত্রের সঙ্গে সংঘাতে

পাঞ্জাব গভর্নমেণ্টের কার্যকলাপে কলেজটির এ ধরনের অগ্রগতি কিছু ব্যাহত হল। ১৯০৭ খ্রীস্টাব্দের রিজলী[1] সার্কুলারে বলা হয় কোনো সরকারী বা সরকারী সাহায্যপ্রাপ্ত কলেজের অধ্যাপক ছাত্রদের সামনে রাজনীতি আলোচনা করতে পারবেন না। সেণ্ট ষ্টিফেন্স কলেজ স্থির করলেন সরকারের এই নির্দেশ অগ্রাহ্য করা হবে। তার ফলে এণ্ডরুজ একদিন হঠাৎ আবিষ্কার করলেন, স্বদেশপ্রেমের অপরাধে সন্দেহভাজন ছাত্রদের বিরুদ্ধে গুপ্তচর নিয়োগ করা হয়েছে। তখন অধ্যাপকদের অনেকেরই চিঠিপত্রের নানা গোলমাল হত। এণ্ডরুজ দেখলেন অনেকদিন ছেলের চিঠি না পাওয়ায় তাঁর মাকে অকারণ উদ্‌বেগ ভোগ করতে হচ্ছে। অবশেষে মেটল্যাণ্ড হাউসে তাঁর ডেস্কের মধ্যে কাগজপত্র ঘাঁটাঘাঁটি করার সময়ে একটি লোককে তিনি হাতেনাতে ধরলেন। অনেক বছর পরে গুপ্তচর বিষয়ে তাঁকে সাক্ষ্য প্রমাণ দিতে বলা হলে তিনি পূর্বোক্ত ঘটনাটি প্রকাশ করেন[2]—

> সেই লোকটি স্বীকার করল যে পুলিস তাকে পাঠিয়েছে। আমি অত্যন্ত ক্ষুব্ধ হয়ে পুলিসের ডেপুটি কমিশনারকে লিখে জানালাম এ কার্যের জন্য অনুতপ্ত হয়ে এখনই তার ক্ষমাপ্রার্থনা করা উচিত। সে ছিল আমার কেম্‌ব্রিজের সহপাঠী বন্ধু। তার কাছ থেকে উত্তর নিয়ে তৎক্ষণাৎ এক পুলিস চলে এল ঘোড়ায় চড়ে। উত্তরে সে লিখেছে, 'ভাই A, এ ব্যাপারের কিছুই আমি জানি না, ডি. ডি., সি. আই. ডি.-দের কাজ এটি।' যে বিশেষণ সে প্রয়োগ করেছিল তার পরে তার আর ক্ষমা চাওয়ার প্রয়োজন ছিল না।

---

১ ভারত সরকারের সেক্রেটারি।

২ *The Statesman*-এ ছাপা চিঠি, ২০ এপ্রিল ১৯১৯।

এ ধরনের ঘটনা কেবল এই একটিই নয়। অল্পবয়স্ক একটি পুলিস অফিসার এণ্ডরুজের ভাবধারায় আকৃষ্ট হয়েছিল। সে তাঁর কাছে পরে স্বীকার করে যে তাকেও এণ্ডরুজের পিছনে গোয়েন্দাগিরির কাজে নিয়োগের চেষ্টা হয়েছিল, সে রাজি হয় নি। এণ্ডরুজ যখন দেখলেন সেণ্ট স্টিফেন্স ও অন্যান্য কলেজের ছাত্রদের প্রলুব্ধ করা হচ্ছে বন্ধুদের গুপ্তচর হবার জন্য— তাতেই তিনি আঘাত পেলেন সবচেয়ে বেশি। তাঁর প্রিয় স্বদেশীয়দের সততা সম্বন্ধে মনে যে উচ্চ ধারণা ছিল, এ তিক্ততায় সমস্ত ধুলায় মিশে গেল।

১৯০৭ খ্রীস্টাব্দে এণ্ডরুজের আর একটি অভিজ্ঞতাও হল। তিনি বুঝলেন, সরকারী কর্মচারী যাঁরা দেশ শাসন করেন তাঁদের সঙ্গে শাসিতদের দূরত্ব কত ব্যাপক। ব্যক্তিগত যোগাযোগ অসম্ভব হওয়ায় শাসনকর্ম চলছিল কেবল সরকারী কাগজপত্রের সাহায্যে।

১৯০৭ সালের মে মাসে লাজপত রায়কে পাঞ্জাব ছেড়ে যাবার নির্দেশ দেওয়া হয়। ৯ নবেম্বর তাঁর মুক্তি-সংবাদে কলেজের ছাত্ররা যখন অধ্যক্ষের অনুপস্থিতিতে কলেজ-ভবনটিতে আলোকসজ্জার অনুমতি এণ্ডরুজের কাছেই চাইল, তিনি হেসে বললেন, 'দেখো, ঠিক যেন দেওয়ালি উৎসবের মতো হয়।' তার পর পকেট থেকে কিছু টাকা বের করে তাদের হাতে দিলেন। সেদিন সারা দিল্লী শহর সেই আলোকসজ্জা দেখে চমৎকৃত হয়েছিল, তবে ইংরেজ শাসকের মনে ঘটনাটি কলেজের রাজদ্রোহিতার আর-একটি প্রমাণ হয়ে রইল।

এ সময়ে এণ্ডরুজের বিরুদ্ধে রাষ্ট্রদ্রোহিতার অভিযোগ যেভাবে অতিরঞ্জিত হয়েছিল তা নিতান্তই হাস্যকর। ১৯০৭ সালের অক্টোবরে লণ্ডনের 'স্পেক্টেটর' পত্রিকায় তাঁর একখানি চিঠি প্রকাশিত হলে ভারতবাসীদের মনে প্রচণ্ড উদ্দীপনা সঞ্চার করে এবং সে চিঠি ইংলণ্ডেও অনেকের সমর্থন লাভ করে। সে চিঠিতে তাঁর আবেদন ছিল সাধারণ ইংরেজের ন্যায়বোধের কাছে।

'স্পেক্টেটর' পত্রিকায় এণ্ডরুজের লেখা প্রকাশিত হবার বছর দুয়েক পরেকার ঘটনা। র‍্যামজে ম্যাকডোনাল্ড তাঁর *Awakening of India* গ্রন্থে লিখলেন, 'ভারতের বন্ধু— কেবলমাত্র এই অপরাধে রেভারেণ্ড সি. এফ. এণ্ডরুজের নাম পাঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয়ের ফেলোশিপের তালিকা থেকে বাদ দেওয়া হয়।' লর্ড মর্লি যখন সেক্রেটারি অফ স্টেট্‌স হয়ে এ দেশে আসেন, তখনই এ বিষয়ে অনুসন্ধান করে এণ্ডরুজকে পুনর্নির্বাচিত করার ব্যবস্থা করেন। তখন তাঁকে পাঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয়ের সিণ্ডিকেটের সদস্যও করা হয়। পাঞ্জাব বিশ্ব-

বিদ্যালয়ের পাঠ্যক্রম নির্বাচনে এণ্ডরুজের জ্ঞান ও বিচক্ষণতার যথেষ্ট নিদর্শন এ সময়ে পাওয়া যায়।

১৯০৭ সালের শেষ দিকে সেণ্ট স্টিফেন্স কলেজে দেখি উৎসবের সমারোহ। রাজনৈতিক দ্বন্দ্বের কোনো ছাপ তাতে পড়ে নি। এ যাবৎ ক্রিকেট খেলায় অজেয় লাহোর সরকারি কলেজের সঙ্গে সেণ্ট স্টিফেন্স কলেজ পাঞ্জাব বিশ্ব-বিদ্যালয় ক্রিকেট শীল্ডের খেলায় যোগ দিল। সারাদিন দু-দলে খেলা চলল। শেষ পর্যন্ত সেণ্ট স্টিফেন্স কলেজ জয়ী হয়। সুধীর রুদ্র এণ্ডরুজ-পিতা জন এণ্ডরুজকে লিখলেন, 'সারা লাহোরে আমাদের টিমের সুখ্যাতি ছড়িয়ে পড়ল, আর এ দিকে দিল্লী শহর মিঃ এণ্ডরুজের প্রশংসায় মুখর, এমন ভালো টিম গড়ে তোলার কৃতিত্বের জন্য।'

বিশ্ববিদ্যালয়ের শীল্ড-বিজয়ী হওয়া খেলোয়াড়দের পক্ষে অভূতপূর্ব সাফল্য। কলেজে যোগ দেবার প্রথম দিন থেকে এ বিষয়ে এণ্ডরুজের উৎসাহ দেখা গেছে। খেলোয়াড় হিসাবে নিজে তিনি ছিলেন সাধারণ কিন্তু ক্রিকেট ও নৌকাবাইচ খেলার শিক্ষক হিসাবে তাঁর পারদর্শিতা ছিল অসাধারণ। তাঁর প্রশংসা ও উৎসাহবাক্য খেলোয়াড়দের মনে উদ্দীপনা জাগাত; আবার প্রয়োজনবোধে সাবধানবাণী উচ্চারণ করতেও তিনি ইতস্তত করতেন না।

দিল্লীতে থাকা-কালে অন্যান্য অবিবাহিত অধ্যাপকদের সঙ্গে কলেজ-সন্নিহিত মেটল্যাণ্ড হাউসে এণ্ডরুজ বাস করতেন। তাঁর ঘর আর অধ্যাপক ডে-র ঘর ছিল অবারিত। ছাত্রদের শ্রদ্ধা ও বিশ্বাস তাঁর প্রতি কত আন্তরিক ছিল তার উদাহরণ পাই নীচের এই ঘটনায়। কলেজের ছাত্ররা প্রত্যেক বছর চড়ুইভাতি করতে যেত দিল্লীর কাছে কোনো ইতিহাসবিখ্যাত স্থানে। সে রকম এক পিকনিকে গিয়ে এণ্ডরুজ আর ওয়েস্টার্ন একবার তাঁদের ভাগের স্যাণ্ডউইচ কয়েকটি খ্রীস্টান ছাত্রকে খেতে দিয়েছিলেন। কয়েকটি হিন্দু ছেলেও সেখানে ছিল, তারাও এক-আধখানা খেল। পরে জানা গেল সে-সব স্যাণ্ডউইচের ভিতরে গোরুর মাংস ছিল। দু-একজন অভিযোগ তুলল, 'এণ্ডরুজ ইচ্ছা করে তাদের ধর্মহানি করেছেন।' অন্য কলেজ হলে হয়তো বিক্ষোভ ব্যাপক হয়ে উঠত। এখানে কিন্তু ব্যতিক্রম দেখা গেল। বেশির ভাগ ছাত্র প্রতিবাদে বলল, 'দোষ আমাদের। আমাদেরই সতর্ক হওয়া উচিত ছিল।' এর পর থেকে এণ্ডরুজ আর ওয়েস্টার্ন দৃষ্টি রাখলেন গোরুর আর শুয়োরের মাংস যেন আর কখনো মেটল্যাণ্ড হাউসে না আসে।

১৯০৫ খ্রীস্টাব্দেই অধ্যক্ষ হিবার্ট ওয়্যার এবং উপাধ্যক্ষ রুদ্র লক্ষ্য করেছেন এণ্ডরুজের মধ্যে সাহিত্যপ্রতিভা ছিল যেমন স্বতঃস্ফূর্ত ব্যক্তিগত বন্ধুত্বস্থাপনের ক্ষমতাও ছিল তেমনি গভীর। তাই কলেজের পাঠসারনীতে তাঁরা এণ্ডরুজের জন্য কিছুটা অবসর সময় রাখতেন। মেটল্যাণ্ড হাউসে এণ্ডরুজের ঘরে অবিরাম অভ্যাগতদের সমাগম হত। তাঁর বন্ধুত্বে আকৃষ্ট সর্বধর্মের ও সর্বস্তরের ভারতীয়ের অকুণ্ঠ সমাবেশ সেখানে দেখা যেত। সব প্রদেশের ছাত্ররাই তাঁর কাছে উপদেশ চাইত। এদের সঙ্গে চিঠিপত্রে যোগাযোগ রক্ষার জন্য তিনি প্রতিদিন একটি ঘণ্টা সময় রেখেছিলেন। খুব ভোরে ঘুম থেকে উঠে ঠাণ্ডা হাওয়ায় বারান্দায় বসে পত্র ও প্রবন্ধ লিখে যেতেন স্বচ্ছন্দগতিতে। কোথাও একটু থামতে হত না বা কোথাও কোনো কাটাকুটি করে পরিবর্তনের দরকার হত না। ছাত্রেরা দেখে অবাক হত যে কত রকম কাজ তিনি একসঙ্গে করে যেতে পারেন। নিজের লেখার কাজ, পড়াশোনা, তার উপর থাকত কলেজের অধ্যাপনা। তা ছাড়া তাঁর স্বল্প-অবসর সময়টুকুতেও কয়েকটি ছাত্রকে আলাদা পাঠ দিতেন নিরলস উৎসাহে। নিজের কাজে এমন তন্ময় হয়ে থাকতেন যে প্রথম দিকে তাঁর সহকর্মীরা অনেকে মনে করেছেন বুঝি-বা বাড়িতে তাঁর ঘনিষ্ঠ আপনজন কেউ নেই। অথচ মায়ের কাছে চিঠি পাঠাতে এক সপ্তাহেরও বিরাম ছিল না।

লাহোর এলাহাবাদ কানপুর কলকাতা— এ-সব জায়গায় প্রায়ই ঘুরতে হত তাঁকে। যেখানেই যেতেন, বাস করতেন মিশনরী সঙ্ঘে। ভারতীয় বন্ধুদের সঙ্গে সেখানকার সহকর্মীদের পরিচয় করিয়ে দিয়ে ভারতের জাতীয়তা আন্দোলনে তাঁদেরও সংযোগ স্থাপন করে দিতেন।

অজস্রকর্মা ছিলেন এণ্ডরুজ। অথচ কোনোদিনই কোনো প্রতিষ্ঠানের রুটিনবাঁধা গতানুগতিক কাজে নিজেকে আবদ্ধ রাখতে পারেন নি। খুব আন্তরিকতার সঙ্গেই বলতেন, জাতিগঠনে শিক্ষকের দান অতুলনীয়— কিন্তু ব্যক্তিগত বন্ধুত্বের বিশেষ প্রয়োজনে, অথবা জনকল্যাণ আন্দোলনের সংকটময় মুহূর্তে কিছুতেই আর অধ্যাপনার কাজে নিজেকে মগ্ন রাখতে পারতেন না, ব্যাকুল হয়ে ছুটে বেরিয়ে পড়তেন। সে সময় যাঁরা তাঁর সহকর্মী ছিলেন তাঁদের পরস্পরের মধ্যে সহযোগিতার ভাবটিও ছিল চমৎকার। তাঁরা সকলেই এণ্ডরুজের মহৎ প্রকৃতি অনুধাবন করতে পেরেছিলেন বলে অম্লানবদনে

যে-কোনো সময়ে তাঁর নির্দিষ্ট কর্মভার গ্রহণ করতেন। হঠাৎ হয়তো একটি অধ্যাপকের ঘরে ঢুকে বললেন, 'দেখো, কাল আমাকে একবার লাহোর যেতেই হবে। বি.এ. ক্লাসের ইংরেজিটা তুমি নিয়ে নিও, কেমন?' একবার ইংলণ্ড থেকে সদ্য-আগত এক অধ্যাপক কাজে যোগ দেবার দু-তিন দিনের মধ্যে লক্ষ্য করলেন কলেজের সমস্ত ইংরেজি ক্লাসের ভার তাঁর একার উপর পড়ে গেছে। অধ্যাপক ডে আর এণ্ডরুজ কানপুর যাচ্ছেন। অধ্যাপকটি আতঙ্কিত হয়ে বলে উঠলেন, 'এত কাজ আমি কী করে পারব?' এণ্ডরুজ একটি ভালো ছাত্রের নাম করে বললেন, 'আগে ওর উত্তরগুলি পড়ে নাও। ওকে পুরো নম্বর দিয়ে অন্য খাতাগুলি তার সঙ্গে মিলিয়ে দেখে নিও। আর এই রইল অন্য সব ক্লাসের পাঠ্যপুস্তক।'

কৌতুকপর অভ্যাসও এণ্ডরুজের কত যে ছিল তার ইয়ত্তা নেই। কোনো দ্রব্যের ব্যক্তিগত অধিকার তিনি মানতে চাইতেন না। অন্যের ব্যবহৃত জামা কাপড় জুতো অনায়াসে ব্যবহার করতেন; আবার ভুলেও যেতেন যে কার কোন্ জিনিস ব্যবহার করেছেন। এ বিষয়ে একজন লিখেছেন, 'একদিন হকি খেলে এসে আমার সোয়েটার আর খুঁজে পাই না। সবাইকে জিজ্ঞেস করলাম, তার মধ্যে সি. এফ. এ-ও ছিলেন। গরম জামা না পাওয়াতে আমার তো ঠাণ্ডা লেগে গেল। অবশেষে তাঁরই গায়ে দেখি আমার সোয়েটারটি রয়েছে।' ওঁকে শিক্ষা দেবার জন্য কেউ যদি ওঁর জিনিস নিয়ে নিত তবে তার ফল হত এই যে উনি প্রথমত সেটা লক্ষ্যই করতেন না। যদি কখনো খেয়াল হত তবে অন্যকে সন্দেহ করা নয় নিজেরই ভোলা মনকে দোষ দিতেন। খাওয়ার ব্যাপারেও ছিলেন ঠিক একই রকম। খাবার একটা পেলেই হল, তার যে কোনো বৈচিত্র্যের প্রয়োজন আছে, তা তাঁর মাথাতেই আসত না।

অন্য একটি ব্যক্তিগত বৈশিষ্ট্য যা বহুকাল ধরে তাঁকে ইউরোপীয়দের চোখে সন্দেহভাজন করে রেখেছিল তা হল স্নেহ প্রীতি করুণার ভাব মনে এলে তিনি নিজেকে আর সংযত করতে পারতেন না, ভাবাবেগে অধীর হয়ে পড়তেন। সামাজিক রাজনৈতিক অর্থনৈতিক— সব দিক দিয়ে এ দেশে ভারতবাসীরাই ছিল নিপীড়িত। তাই তাদের দিকে তাঁর প্রাণমন ছুটে যেত। ভারতীয় বন্ধুরা অনেকেই বলেছেন প্রথম সাক্ষাতে তিনি যেমন উচ্ছ্বসিত প্রীতি প্রদর্শন করতেন তাতে তাঁদের অনেকের মনেই সন্দেহের উদ্রেক হত। ভারতীয়রাই

কখনো কখনো তাঁকে অবিশ্বাসের চোখে দেখেছেন। ইংরেজদের মন তো আরো বেশি সন্দিহান হয়েছে তাঁর আচরণে। কিন্তু যাঁরা তাঁর স্নেহপ্রদর্শনের আধিক্যে প্রথম বিরক্তিবোধ করতেন তাঁরাই পরে তাঁর আন্তরিকতায় আকৃষ্ট হতেন। বিষয়াভিজ্ঞ চতুর উচ্চতন রাজকর্মচারীরা পর্যন্ত এণ্ডরুজের প্রতি তাঁদের শ্রদ্ধাপ্রীতি চিরকাল অক্ষুণ্ণ রেখে এসেছেন।

সেণ্ট স্টিফেন্স কলেজে এণ্ডরুজ যতদিন ছিলেন তার মধ্যে জাতিগত স্বাতন্ত্র্য ও সামাজিক অবিচারের বিরুদ্ধে তাঁকে অবিরাম সংগ্রাম করতে হয়েছে। বিচারবিহীন নির্বাসনদণ্ড আর মুদ্রণ-নিয়ন্ত্রণের বিরুদ্ধে তিনি তীব্র প্রতিবাদ করেন। ভারতবর্ষের অবস্থা চারি দিক থেকে পুঙ্খানুপুঙ্খ বিচার করে তাঁর যে ধারণা বদ্ধমূল হল তা এই যে সম্পূর্ণ রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতা ব্যতিরেকে এ দেশের পক্ষে সুস্থ জাতীয় জীবনে উন্নয়ন সম্ভব নয়। ১৯১০ সালের মধ্যেই তাঁর মনে এই দৃঢ় অভিমত গড়ে ওঠে বটে তবে তখনই সে কথা প্রকাশ করেন নি।

খ্রীস্টসেবকের নব ধর্মানুভব

দিল্লীতে প্রথম তিন-চার বছর মিশনরী ভ্রাতৃত্ব স্বীকার করে খ্রীস্টান কলেজে অধ্যাপনার কাজেই এণ্ডরুজ সন্তুষ্ট হয়েছিলেন। সেখানে তাঁর খ্রীস্টানুরাগী জীবনের উপযোগী যথাযথ ক্ষেত্র পেয়ে কৃতার্থ বোধ করেছেন। কিন্তু ১৯০৭ খ্রীস্টাব্দের পর থেকে সেই জীবনধারায় ক্রমশ অসন্তোষ জেগে ওঠে। খ্রীস্টপ্রেমের বাণী জ্বলন্ত শিখায় অন্তরে প্রদীপ্ত হয়ে তাঁকে উদ্‌বেলিত করে তুলল সার্থকতর প্রকাশের নূতন কর্মক্ষেত্র সন্ধানে। বিদেশী ধর্মের ঐতিহ্যে পুষ্ট ভারতীয় কলেজের কর্তব্য-কর্মের সীমায় নিজেকে আর বন্দী করে রাখা সম্ভব নয়, এ কথা তিনি স্পষ্টই অনুভব করতে পারলেন।

বিশপ ওয়েস্টকটের শিষ্য হিসাবে খ্রীস্টধর্মকে তিনি ভারতীয় অধ্যাত্ম-চিন্তার বিরোধী মনে না করে বরং পরিপূরক বলেই গ্রহণ করেছিলেন। কিন্তু সেকালের মিশনরীদের লেখায় এবং উপদেশে যখন দেখতেন ভারতীয় ঐতিহ্য রীতিনীতি, এমন-কি, পোশাক-পরিচ্ছদ পর্যন্ত পরিহার্য করে ভারতীয় খ্রীস্টানদের নিজ দেশেই পরদেশী করে রাখা হয়েছে; তখন তাঁর মনে বিরক্তি বোধের অবধি থাকত না। সন্ত জনের 'প্রত্যাদেশ গ্রন্থে'র[১] একটি পঙ্‌ক্তি তাঁর বড়ো প্রিয়

---

১ *Revelation of St. John.*

ছিল, সেটি হল— 'সকল দেশের সকল জাতির মহিমময় অবদানই স্বর্গরাজ্য অলঙ্কৃত করবে।'[১]

ভারতের উৎকর্ষ এণ্ডরুজ আন্তরিকভাবে লক্ষ্য করেছিলেন; সরল গ্রামবাসীর ধর্মজীবনে তিনি সেই স্বর্গীয় দ্যুতিই দেখেছেন, এমন-কি, অখ্রীস্টান সাধুসন্তদের ধর্মকর্মেও। এ দেশের কথা বলতে গিয়ে মিশনরীরা 'ধর্মহীন' (heathen) শব্দটি ব্যবহার করলে তিনি সহ্য করতে পারতেন না। গ্রন্থসাহেব ও ধম্মপদের দুটি উদ্ধৃতি বাইবেলের 'নব সংহিতা'র মতোই প্রিয় ছিল তাঁর। 'ছাত্র আন্দোলন' (The Student Movement) ভাষণে (অক্টোবর ১৯০৯) সে দুটির উল্লেখ দেখি। একটি হল[২]—

'ফরিদ, তিনি যে প্রেমময় প্রেমসার
মানুষ আঘাত হানিলে কিছু না মানি
চরণ চুমিয়ো।'[৩]

অপরটি— 'অক্রোধেন জিনে কোধং অসাধুং সাধুনা জিনে।'[৪]

ভারতীয় ঋষিবাক্যের সঙ্গে খ্রীস্টানীর আশ্চর্য সাদৃশ্য দেখে এণ্ডরুজ মনে করতেন দৈবীশক্তির প্রভাবেই এরূপে খ্রীস্টবাণী প্রচারকের পথ এ দেশে সুগম হয়ে রয়েছে। তিনি আরো বিশ্বাস করতেন যে ভারতীয় ভক্তিসাহিত্যেও খ্রীস্টপ্রভাব এসেছে। এণ্ডরুজ তাই লিখলেন[৫]—

কবীরের সময় থেকে উত্তর-ভারতের ভক্তিসাধনায় খ্রীস্টবাণীর বহু নিদর্শন মেলে।... বহু শতাব্দী পূর্বে এশিয়ায় সে বাণীর বীজ উপ্ত হয়ে ভারতীয় বহু ধর্মে তা অঙ্কুরিত হয়েছে। তাই বর্তমান ভারতে যীশুখ্রীস্টের অমৃতবাণী প্রচারের ক্ষেত্র পূর্ব থেকেই প্রস্তুত হয়ে রয়েছে।

এ সময়ে এণ্ডরুজের মনে হয়েছিল ভারতের জাতীয় আশা-আকাঙ্ক্ষার

---

১ The glory and honour of the nations shall be brought into the Holy City of God.

২ এণ্ডরুজ লিখেছেন— Farid, if a man beat thee
Beat him not in return, but kiss his feet.

৩ এণ্ডরুজের কবিতার বাংলা অনুবাদ করেছেন অসিতকুমার ভট্টাচার্য, রবীন্দ্রপ্রসঙ্গ পত্রিকা, দীনবন্ধু এণ্ডরুজ স্মরণ সংখ্যা, পৃ. ১৬১।

৪ ক্রোধকে জয় করবে অক্রোধের দ্বারা, অশিষ্টতাকে শিষ্টতার দ্বারা।

৫ *Renaissance in India*, Appendix VII

নব-উদ্‌বোধনের মূলেও রয়েছে প্রাচ্যভূমিতে খ্রীস্টীয় চিন্তাধারার প্রসার। পশ্চিমের রাষ্ট্রীয় চেতনা জ্ঞানবিজ্ঞান, ধর্মজিজ্ঞাসার প্রেরণা ও জনজাগরণের বিপুল প্রবাহ সে পথেই এসেছে প্রাচ্যদেশে। 'স্টিফেনিয়ান' ও অন্য পত্রপত্রিকায় নানা প্রবন্ধে তিনি দেখিয়েছেন, যথার্থ স্বদেশপ্রেম ও সর্বমানবিক ঐক্যচেতনার জাগরণে খ্রীস্টবিশ্বাস জনগণকে অপরিসীম সাহায্য করেছে। ইতিহাসেই প্রমাণ মেলে, রোমান সাম্রাজ্যের অধীনস্থ দেশগুলিতে খ্রীস্টধর্ম প্রচারের সঙ্গে সঙ্গে তারা কী বৈচিত্র্যময় কর্মসাধনায় অনুপ্রাণিত হয়ে উঠেছিল।

১৯১০ খ্রীস্টাব্দে কেম্‌ব্রিজ মিশন প্রকাশিত *India in Transition* পুস্তিকাতেও একই মনোভাবটি স্পষ্ট বিস্তারিত ভাষায় রূপায়িত করেছেন এণ্ডরুজ। বর্তমানকালে ভারতের যে কী প্রয়োজন, সে বিষয়ে আলোচনা করে লিখেছেন—

> খ্রীস্টানধর্ম যদি সফলতা চায় তবে তাকে এ দেশের অতীতের ধর্মপ্রচেষ্টার বিরোধী বা প্রতিদ্বন্দ্বী হলে চলবে না। তাকে আসতে হবে সহায়করূপে, শান্তিস্থাপক বন্ধুবেশে। ধর্মান্তরিত করার কামনা আর নয় বরং হিন্দুসমাজকে তার বহুকালের অবহেলিত কর্তব্যসাধনে অনুপ্রেরণা দেওয়াই এখন খ্রীস্টধর্মের উপযুক্ত কাজ।
>
> খ্রীস্টান-মিশনরীদের প্রচেষ্টা সফল হবে যদি তাঁরা সেই আধ্যাত্মিক শক্তি জাগাতে পারেন যাতে ইংরাজ ও ভারতবাসী, ব্রাহ্মণ ও পারিয়া, হিন্দু ও মুসলমান ঐক্যবদ্ধ হয়। তা হলেই কেবল ভারতবর্ষ খ্রীস্টবাণীতে সাড়া দিয়ে জগৎসভায় দাঁড়াবার উপযুক্ত নতুন স্বদেশ গড়ে তুলতে পারবে।

আধুনিক হিন্দুধর্মের প্রবক্তা স্বামী রামতীর্থের সঙ্গে এণ্ডরুজের সাক্ষাৎভাবে পরিচয় ছিল না। কিন্তু তাঁর লেখা পড়ে তিনি আকৃষ্ট হয়েছিলেন। তাই স্বামী রামতীর্থ যখন এণ্ডরুজকে তাঁর রচনাবলীর একটি ভূমিকা লিখে দেবার অনুরোধ জানালেন এণ্ডরুজ তাতে সানন্দে সম্মত হন।

নির্বাসিত মানবধর্মের সেবায় : বিচিত্র মানুষের সংসর্গে

এই উদার সর্বমানবপ্রেমিক মনোভাবের জন্য বার বার বহু অন্যায় ও অসত্য দোষারোপের সম্মুখীন হতে হয়েছে এণ্ডরুজকে। তার মধ্যে একটি হল অখ্রীস্টান ভারতীয়দের আশা-আকাঙ্ক্ষার প্রতি সহানুভূতি দেখাতে গিয়ে তিনি সেণ্ট স্টিফেন্স কলেজের মুষ্টিমেয় খ্রীস্টান ছাত্রদের অবহেলা করেছেন।

ফেব্রুয়ারি-মার্চ ১৯১৪ খ্রীস্টাব্দের *The Church Times* পত্রিকায় এই অভিযোগ প্রকাশিত হলে অধ্যক্ষ রুদ্র ও রেভারেণ্ড ক্যানন আলনাট দুজনেই এই অন্যায় অপবাদের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করেন। খ্রীস্টান ছাত্ররা অন্যান্য ছাত্রদের থেকে পৃথক হয়ে আলাদা হস্‌টেলে বাস করলে তাদেরই ক্ষতি হয় মনে করে এণ্ডরুজ নিজে সচেষ্ট হয়ে সেটি তুলে দেন। আন্তরিকতাপূর্ণ ব্যক্তিগত বন্ধুত্বের মূল্য মানুষের জীবনে যে অপরিসীম সে কথা বুঝেছিলেন বলেই অধ্যক্ষ রুদ্র ও এণ্ডরুজ সিমলা পাহাড়ে তাঁদের সঙ্গে ছুটি কাটাবার জন্য খ্রীস্টান ও অখ্রীস্টানদের এক-একটি মিলিত ছাত্রদলকে আহ্বান করে নিতেন কতবার। সেখানে তারা শিখত, একই পরিবারের মতো থেকে কিভাবে পরস্পরের প্রাত্যহিক সান্নিধ্যে একে অন্যের সেবায় লাগতে পারে। দিল্লীতে যেমন এণ্ডরুজ ছাত্রদের উদ্‌বুদ্ধ করতেন দীনের সেবায় সিমলায়ও পথেঘাটে সেরূপ দুঃস্থ বা রুগ্‌ণব্যক্তির শুশ্রূষার বহু সুযোগ এ-সব ছাত্ররা পেত। সুধীর রুদ্রের জীবনের একটি অভিজ্ঞতার বর্ণনা শুনলে মনে হবে বাইবেলের কাহিনীই যেন আবার এ যুগে অনুষ্ঠিত হল আমাদের বাস্তব দৃষ্টির সামনে[১]—

> একদিন মিঃ এণ্ডরুজের সঙ্গে আমি কোটগড় থেকে সিমলা ফিরছি হেঁটে। এমন সময় দেখি ক্ষুধার জ্বালায় তুষার খেয়ে একটি কুলি যন্ত্রণায় অস্থির হয়ে রাস্তার ধারে পড়ে আছে। জায়গাটি সিমলার দশ এগারো মাইলের মধ্যে; পথে তাই বহু লোকই যাতায়াত করছিল। একটা রিক্‌শা ডেকে দেবার জন্য আমরা কত লোককে অনুরোধ করলাম। কেউ তাতে কর্ণপাতই করল না। সেখান থেকে প্রায় দেড় মাইল দূরে একজন ব্রিটিশ মিলিটারী অফিসারের বাড়িতে চা খেয়ে আমরা সিমলা ফিরে যাচ্ছিলাম। মিঃ এণ্ডরুজ আবার তাঁর কাছেই ফিরে গেলেন এই কুলির জন্য সাহায্য চাইতে। আমি ততক্ষণ লোকটির কাছে বসে ওর গা হাত পা ঘষে যেটুকু পারি শুশ্রূষা করতে লাগলাম। অফিসারের কাছ থেকে ব্রাণ্ডি আর কম্বল নিয়ে মিঃ এণ্ডরুজ দ্রুত ফিরে এলেন। একটু পরেই রিক্‌শা নিয়ে অফিসারটিও এলেন। সেই কুলি বেচারাকে খানিকটা গরম ও সুস্থ করে তুলে সিমলা পাঠিয়ে দেওয়া হল।

কেম্‌ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ে এণ্ডরুজের অধ্যাপকগণ যেমন করে তাঁর সুকোমল

১ Chaturvedi & Sykes, *Charles Freer Andrews*, পৃ. ৬৬, ৬৭।

প্রবৃত্তি উদ্‌বুদ্ধ করেছিলেন, তিনিও সেভাবে তাঁর ছাত্রদের আর্ত সেবায় নিত্য উৎসাহদানে ছিলেন তৎপর।

১৯০৬ খ্রীস্টাব্দের গ্রীষ্মকালে এণ্ডরুজ একবার বিশপ লেফ্রয়ের সঙ্গে কোটগড়ে গেলেন। পরদিন ভোরে তাঁরা দুজনে হাতু পাহাড়ের চড়াইপথ ধরে চললেন। পাহাড়ের চূড়ায় পৌঁছবার আগেই মেঘ নেমে এল। সেই কুয়াশায় দাঁড়িয়ে দুজনে তাঁদের ভোরের প্রার্থনা আবৃত্তি করছেন এমন সময় হঠাৎ দেখলেন আকাশ পরিষ্কার হয়ে গেল। যে মেঘ এসে উপত্যকা ঢেকে ফেলেছিল তা বিচ্ছিন্ন করে যেন তাঁদের পায়ের কাছ থেকে শুরু করে একটি প্রশস্ত আলোকরেখা ঊর্ধ্ব আকাশে চিরতুষারের রাজ্যে উঠে গেল। স্তব্ধ বিস্ময়ে তাঁরা এই আশ্চর্য দৃশ্য উপভোগ করলেন। কুয়াশা কেটে যেতেই— 'জয় হোক তব, ওগো রাজরাজ'— প্রভু যীশুর এই প্রশস্তি পাঠ করে তাঁদের প্রার্থনা শেষ হল। সেই দিন থেকে হাতু পাহাড় এণ্ডরুজের চোখে পরম পবিত্র দেবমন্দিরের রূপ পেয়েছিল। প্রতি বছর খ্রীস্টান ছাত্রদের একটি দল নিয়ে এসে পাহাড়-চূড়ায় উঠে যেতেন। সেখানে রৌদ্রধৌত শৈলখণ্ডকে প্রার্থনার বেদী করে চারি দিককার স্তব্ধ মহিমময় পরিবেশে তাঁরা খ্রীস্টপ্রসাদ গ্রহণের অনুষ্ঠান সম্পন্ন করতেন।

সেই সময় প্রার্থনা-পুস্তকের গম্ভীর বাক্যগুলি এণ্ডরুজ যখন পাঠ করতেন তার সঙ্গীদের কানে তা প্রত্যাদেশের মতোই গিয়ে বাজত; তাঁর ভিতরকার শিল্পী ও কবিসত্তা সেই কাব্যের স্পর্শে জেগে উঠে ঈশ্বর-আরাধনার গহন ঊর্ধ্বলোকে ছাত্রদের চিত্তকেও আকর্ষণ করত।

এণ্ডরুজের ঐকান্তিক সাহচর্যের আহ্বানে তরুণদলের সাগ্রহ সাড়া পেয়ে তিনি বুঝলেন ভারতের সর্বত্র মানবসেবার কাজে এ ধরনের সম্মেলনের জন্য উপযুক্ত শিক্ষক চাই। তাই ১৯০৭ খ্রীস্টাব্দে জাতীয় মিশনরী সঙ্ঘ ও খ্রীস্টান যুবসমিতির দুজন সদস্যের সঙ্গে মিলিত হয়ে এণ্ডরুজ ব্রিটিশ খ্রীস্টান ছাত্র-আন্দোলনের সেবারকার গ্রীষ্মকালীন সম্মিলনীর কাছে বিলাতে একটি তার পাঠালেন। তাতে ভারতের খ্রীস্টান ছাত্রদের পক্ষ থেকে তাঁরা ইংলণ্ডের ছাত্রসমাজকে সহযোগিতার আবেদন জানান। এর পরে রুদ্র ও এণ্ডরুজ আরো একটি নতুন পরিকল্পনা করলেন। ইংলণ্ডের তরুণ স্নাতকদল— যাদের ভবিষ্যৎ কর্মক্ষেত্র তখনো নির্দিষ্ট হয় নি, ভারতের খ্রীস্টান কলেজগুলিতে অন্তত দু বছর অধ্যাপনার ভার গ্রহণের জন্য তাদের আহ্বান করা হল। এঁরা

লিখলেন— ইংলণ্ডের ছাত্রদের প্রাণচাঞ্চল্য ও তাদের সতেজ উদ্দীপনা— এই দেশের ছাত্রসমাজে কল্যাণ আনবে।

এ আবেদনে সাড়া দিয়ে যাঁরা তখন ভারতে এসেছিলেন তাঁদের উপর এণ্ডরুজের প্রভাব ছিল খুবই গভীর ও ব্যাপক। তাঁদের প্রত্যেকেই কোনো-না-কোনো সময়ে মেটল্যাণ্ড হাউস অথবা সিমলায় তাঁর সঙ্গে দেখা করতে যেতেন। আর্থার ডেভিস লিখেছেন, 'মিশনরীদের সঙ্গে ভারতীয়দের সম্পর্ক সম্বন্ধে তখন এণ্ডরুজের সঙ্গে আমার যে-সব আলোচনা হয়, তার ফলে আমার নিজের দৃষ্টিভঙ্গী প্রসার লাভ করে।' নরম্যান টাব্‌স নামে অপর একজন লিখেছেন, 'এণ্ডরুজ আমাদের চিন্তাধারায় সম্পূর্ণ পরিবর্তন এনে দিয়েছিলেন।' এঁরা দুজনেই পরবর্তী জীবনে ইংলণ্ডে ধর্মযাজকের উচ্চপদ অলংকৃত করেন। উইন্‌স্লো নামে অপর একজন যাজক এণ্ডরুজ সম্বন্ধে বলেছেন, 'তিনি প্রকৃতই আমার গুরুস্থানীয় ছিলেন।'

ভারতীয় খ্রীস্টান-নেতা এস. কে. দত্ত তখন ব্রিটেনে খ্রীস্টধর্ম সম্প্রসারণ আন্দোলনের কর্মী ছিলেন। দেশে ফিরে আসার পর এণ্ডরুজের সঙ্গে মিলে দিল্লীর কাছে ওখলা নামক স্থানে নির্জন যমুনাতীরে ধর্মচিন্তার জন্য তিনি একটি নিভৃত আবাস স্থাপন করেন। সেখানে এণ্ডরুজ প্রথম যেদিন তাঁর তরুণ সহযোগীদের সঙ্গে ধ্যানরাজ্যে প্রবেশ করলেন নিজ জীবনের পূর্ব অভিজ্ঞতার স্মৃতি সেদিন তাঁকে ব্যাকুল করেছিল। সন্ত জন -লিখিত মঙ্গলসমাচারে খ্রীস্টের উক্তিগুলিই সেদিন তিনি বিশেষ করে উচ্চারণ করেছিলেন। সেই জায়গায় পরে যখন তিনি ধর্মোপদেশ দিতেন 'সারমন অন দ্য মাউন্ট'-এর উপদেশাবলী তখন তাঁকে প্রভাবিত করত। তরুণসমাজে তাঁর সে সময়কার ভাষণে এই যে বীজের সূচনা হয়েছিল, পরবর্তীকালে বহুশত ধর্মার্থীর জীবনে তার ফল ফলেছে নানাভাবে।

১৯১১ খ্রীস্টাব্দের মে-জুন মাসে সিমলা পাহাড়ে বেরেরি নামক স্থানে গ্রীষ্মকালীন বিদ্যাকেন্দ্র স্থাপনেও এণ্ডরুজই ছিলেন উৎসাহদাতা। ভারতের নানা স্থান থেকে তরুণ খ্রীস্টান মিশনরীরা এতে যোগ দেন। সেখানে ভারতের ধর্মসম্প্রদায়ের ইতিহাস সম্বন্ধে এণ্ডরুজের উদ্দীপনাপূর্ণ ভাষণ, তাঁর সুমধুর ব্যক্তিত্ব, খ্রীস্টপ্রেমের অমলদ্যুতি-স্নিগ্ধ চরিত্র-মাধুর্য, সর্বোপরি তাঁর প্রীতিপূর্ণ সান্নিধ্য মিশনরীদের মনে গভীর রেখাপাত করে।

সঙ্ঘবদ্ধ এক বিরাট খ্রীস্টসমাজের স্বপ্ন তখন ছিল সুদূরে। ধর্মসংস্থাগত

নিয়মে পৃথক পৃথক খ্রীস্টসমাজের সদস্যদের একই স্থানে খ্রীস্টপ্রসাদ গ্রহণে প্রবল বাধা ছিল। এবার এণ্ডরুজ বুঝলেন খ্রীস্টানসমাজে ভেদভাব সম্বন্ধে সুশীল যা বলেছিলেন তা কতদূর সত্য। পর পর কয়েকটি ঘটনায় এ বিষয়ে দ্রুত নিজের সংকল্প স্থির করতে এণ্ডরুজ বাধ্য হলেন।

একবার ডঃ চ্যাটার্জি নামে এক বৃদ্ধ প্রেসবিটেরিয়ান সাধু একটি মিশন-সঙ্ঘের খ্রীস্টপ্রসাদ গ্রহণ অনুষ্ঠানে পৌরোহিত্য করেন। এণ্ডরুজ নিজে ছিলেন অ্যাঙ্‌লিক্যান সঙ্ঘের। কিন্তু এই অনুষ্ঠানে যোগ না দেওয়া তাঁর পক্ষে অসম্ভব ছিল।

এ ধরনের আত্মসমীক্ষার মুহূর্তে দেখি অ্যাঙ্‌লিক্যান চার্চের সদস্য এণ্ডরুজের মনে সংস্কারগত গোঁড়ামি প্রথম দিকে যেটুকু ছিল, সুশীল রুদ্রের ধর্মজিজ্ঞাসার প্রভাবে ক্রমে ক্রমে তাও দূরীভূত হয়। বিভিন্ন খ্রীস্টান-সমাজের সঙ্গে একাত্ম উপাসনার বাধা নিজের জীবনে কিভাবে অতিক্রম করেছিলেন তার একটি সুন্দর দৃষ্টান্ত তাঁর জীবনীগ্রন্থে মেলে[১]।

ঘটনাটি এই। বহুবার ম্যালেরিয়ায় ভুগে এণ্ডরুজ অনিদ্রা রোগে আক্রান্ত হন। ইয়ং নামে দিল্লীর একটি তরুণ ব্যাপ্‌টিস্ট মিশনরী এণ্ডরুজকে শহরের বাইরে তাঁর মিশন বাংলোয় রেখে সযত্ন শুশ্রূষায় সেবার সুস্থ করে তোলেন। কিন্তু নিজে তিনি অসুস্থ হয়ে পড়েন। তাই সেই রবিবারে ইয়ং-এর হয়ে তিনি উপাসনা-অনুষ্ঠান পরিচালনায় উদ্‌যোগী হন। কিন্তু বিশপ লেফ্রয় এণ্ডরুজকে জানালেন, তিনি যদি ব্যাপ্‌টিস্ট মিশনে উপাসনা-অনুষ্ঠানের ভার গ্রহণ করেন তবে ভবিষ্যতে হয়তো তাঁর নিজের এলাকায় নিজের মিশনে কখনো তাঁকে এই পূত দায়িত্বভার দেওয়া হবে না। সেই সংকট মুহূর্তে এণ্ডরুজকে মন স্থির করতে হয়েছিল। তিনি বিশপকে বিনীতভাবে জানিয়েছিলেন, এ অবস্থায় মানুষের বিধান মানার চাইতে তিনি ঈশ্বরের নির্দেশই মেনে চলবেন। রেভারেণ্ড ইয়ং কিছুটা সুস্থ হয়ে ওঠাতে সেই রবিবারে ব্যাপ্‌টিস্ট মিশনে উপাসনা অনুষ্ঠানের বিশেষ সমস্যা হল না। কিন্তু এণ্ডরুজের মনের অসন্তোষ তাতে দূর হল না।

ভারতে আগমনের প্রথম দিকে একদিন পাঞ্জাবের একটি শহরে এক ভারতীয় খ্রীস্টান-বন্ধুর সঙ্গে এণ্ডরুজ বেড়াচ্ছিলেন। দেখলেন, একটি মিশনরী

---

১ C. F Andrews, *What I Owe to Christ*, পৃ. ১৬৯।

ঘোড়ার গাড়ি করে যাচ্ছেন, পথের দু পাশের লোক রাস্তা ছেড়ে সরে দাঁড়াচ্ছে। বন্ধু বললেন, 'দেখুন, এই আপনার খ্রীস্টান-ধর্ম চলেছে কেমন গাড়ি হাঁকিয়ে, এ দেশে মিশনরীরা এ ভাবেই কাজ করে। এবার আমার সঙ্গে আর-এক জায়গায় চলুন'— এই বলে তাঁকে এক হিন্দু সাধুর কাছে নিয়ে গেলেন। সাধুটি মাটিতে বসেছিলেন। বন্ধু বললেন, 'আমি জানি আজকাল অনেক ভণ্ডলোক সাধু সেজে থাকে। কিন্তু ইনি সত্যিই সৎলোক। দূর দূর থেকে এঁকে দেখতে হাজার হাজার লোক আসে।'

সেণ্ট স্টিফেন্স কলেজের কাছে বড়ো একটি গাছের তলায় একজন সাধু বসে থাকতেন। এণ্ডরুজ মেটল্যাণ্ড হাউস্ -এর জানলা দিয়ে তাঁকে দেখে দেখে ভাবতেন, আমাদের প্রভু যীশুরও তো মাথা রাখার ঠাঁই ছিল না কোথাও। আর ভারতীয় ধর্মের আদর্শ হল ত্যাগব্রত। এ আদর্শ থেকে যদি খ্রীস্টভক্তরা এত দূরে সরে যায় তবে তাদের ধর্মপ্রচার করতে এ দেশে আসার প্রয়োজন কী ?

মনে যখন এ-সব প্রশ্ন জাগ্রত হয়েছে তখন তিনি খবর পেলেন দুজন খ্রীস্টান সাধু সন্ত ফ্রান্সিসের মতো গৃহহীন দরিদ্র জীবন বরণ করে পাঞ্জাবের প্লেগ-অধ্যুষিত অঞ্চলে দীনের সেবায় নিযুক্ত আছেন। এঁদের মধ্যে একজন আমেরিকান, অপরজন ভারতীয়। স্যামুয়েল স্টোক্স্ ছিলেন কোয়েকার্-সম্প্রদায়ভুক্ত জার্মান্স্-টাউনবাসী এক তরুণ, আর সাধু সুন্দর সিংকে তখন বালক বললেও চলে।

ক্ষীণ স্বাস্থ্যের কারণে গ্রীষ্মকালে এণ্ডরুজকে পাহাড়ে যেতে হত। সেই অবকাশে এঁদের সঙ্গে তাঁর পরিচয় ঘনিষ্ঠ হয়েছিল। এঁরা আবার শীতকালে যখন নীচে নেমে আসতেন তখন দিল্লীতে এলেই সুশীল রুদ্রের গৃহে এঁদের অভ্যর্থনা হত। এঁরা যখন মেটল্যাণ্ড হাউসে এণ্ডরুজের কাছে আসতেন, এঁদের ত্যাগনন্দিত পুণ্যজীবনের সংস্পর্শ-সমৃদ্ধ খ্রীস্টান-পরিবারের ছেলেদের মনেও আলোড়নের সৃষ্টি করত।

স্যামুয়েল স্টোক্স্ ও সাধু সুন্দর সিং -এর জীবনের কয়েকটি ঘটনা সংক্ষেপে লিপিবদ্ধ করি। একবার এঁরা দুজনে শীতকালে পাহাড়ে উঠছেন। অতিরিক্ত ঠাণ্ডায় সুন্দর সিং কাতর হয়ে পড়লেন দেখে স্টোক্স্ তাঁকে পিঠে নিয়ে খানিকটা অগ্রসর হলেন। তার পরে দুজনেই যখন নিস্তেজ হয়ে শেষ মুহূর্তের

প্রতীক্ষা করছেন স্টোক্‌স্‌ তাঁর আরাধ্য দেবতাকে চোখের সামনে দেখতে পেলেন। দেখলেন তিনি তাঁকে আশ্বাস দিচ্ছেন আর তাঁর মধ্যে নবশক্তি সঞ্চার করছেন। সে পথে কিছুক্ষণের মধ্যেই একদল পথিক এসে যাওয়ায় সেবার এদের প্রাণরক্ষা হয়।

আর-একবার এণ্ডরুজ আর সুশীলচন্দ্র পাহাড়ে তাঁদের সঙ্গেই ছিলেন। সেখানকার পাহাড়ীরা স্যামুয়েল স্টোক্‌স্‌কে সেবার প্রায় হত্যা করেই ফেলছিল। একটি পাহাড়ী বালক তাঁর সঙ্গে বহুকাল বাস করার পরে খ্রীস্টধর্ম গ্রহণ করতে চায়; এবং তিনি তাকে খ্রীস্টধর্মে দীক্ষা দিয়েছিলেন। পাহাড়ীরা এ খবরে ক্রোধে উন্মত্ত হয়ে উঠল। সুশীল রুদ্র ও এণ্ডরুজ একদিন তাদের চিৎকার শুনে বাইরে এসে দেখেন সুধীর আর দীননাথ তাদের বাধা দিচ্ছে। কিন্তু তার আগেই তারা স্টোক্‌স্‌-এর মাথায় গুরুতর আঘাত করে তাঁকে অচৈতন্য করে ফেলেছিল। সারারাত যন্ত্রণায় অস্থির হয়ে জ্ঞান ফিরতেই তিনি প্রথম অস্পষ্ট কথা উচ্চারণ করলেন হিন্দীতে। বললেন, 'যারা তাকে মারতে গিয়েছিল তাদের বিরুদ্ধে যেন কোনো অভিযোগ না আনা হয়।' সুস্থ হয়ে উঠেই তিনি সিমলা গিয়ে পুলিসের ডেপুটি কমিশনারকে বলে অভিযুক্তদের মুক্তির ব্যবস্থা করেন।

বালক-সন্ন্যাসী সুন্দর সিং-এর অন্তরের কামনা ছিল তিব্বতে গিয়ে খ্রীস্টধর্ম প্রচার করবেন। গোঁড়া শিখ-পরিবার থেকে তিনি বহিষ্কৃত হয়েছিলেন বিজাতীয় ধর্মগ্রহণ করার ফলে। তার পর থেকে তাঁর জীবন কাটে নীরব ধ্যানে এবং আর্তসেবায়। হিন্দুস্থান থেকে তিব্বতের পথে তিনি যে যাত্রা শুরু করেন তার শেষ কোথায় হয়েছিল সে সংবাদ কেউ পায় নি।

কিন্তু কেম্‌ব্রিজ ভ্রাতৃসঙ্ঘকে কী করে এঁদের ভাবে অনুপ্রাণিত করা যায় এণ্ডরুজের মনে তখন সেই একমাত্র চিন্তা। যদি বছরের কোনো একটা সময়ে দুজন করে সদস্য যীশুখ্রীস্টের প্রথম ভক্তদের মতো নিঃসম্বল হয়েই জগতের সেবায় বেরিয়ে পড়েন, তা হলে কেমন হয়? যীশুখ্রীস্টের নামে দারিদ্র্যের পুণ্যব্রত গ্রহণের আকাঙ্ক্ষা কি কারো মনে জাগ্রত হবে না? অথচ ঠিক এই ধরনের সেবাই তো ভারতবাসীর চিত্ত জয় করবে।

একজন সহকর্মী লিখেছেন, তখন মিশন-হাউসের শান্ত আবহাওয়ায় এণ্ডরুজকে মনে হত যেন প্রচণ্ড ভূকম্পনবেগ। পাশ্চাত্য সংস্কার ও মোহের বহিরাবরণমুক্ত হয়ে ভারতীয় খ্রীস্টসঙ্ঘ কিভাবে ভারতসেবার উদ্‌যোগে ঝাঁপিয়ে

পড়তে পারে, সে সুযোগের জন্য তাঁর প্রাণ তখন উৎসুক। ১৯০৯ সালের ২০ নবেম্বরে আগ্রায় বিদেশাগত তরুণদের উদ্দেশে বললেন[১]—

যীশুখ্রীস্টের আদেশ— তোমরা পাশ্চাত্য সংস্কারমুক্ত হয়ে ধর্মবিশ্বাসে দৃঢ়-প্রতিষ্ঠ হও। তোমরা যদি ত্যাগমন্ত্রে দীক্ষা নাও তবেই কেবল শিক্ষিত ভারতীয়ের কাছে তোমাদের বাণী পৌঁছবে। আমাদের অর্থপ্রতিপত্তি নয়, আমাদের সংগঠনশক্তি নয়, একমাত্র আমাদের ধর্মজীবনের গভীরতার আবেদনই ভারতীয়দের কাছে মূল্যবান।

১৯০৭ খ্রীস্টাব্দে স্টোক্‌স্‌, এণ্ড্রুজ আর ওয়েস্টার্ন— এঁরা তিনজনে মিলে একটি নবীন আন্তর্জাতিক ভ্রাতৃসঙ্ঘ গঠনের স্বপ্ন দেখছিলেন। সেবা ও ত্যাগ হবে তার মূলমন্ত্র। পরের বছর স্টোক্‌স্‌ বেরিয়ে পড়লেন ইংলণ্ড ও আমেরিকায় তাঁদের ভাবধারা প্রচারের কাজে। সেখানে তিনি বহুলোকের সহানুভূতি ও আগ্রহ আকর্ষণ করেন। তাঁর ফেরার পর 'যীশুখ্রীস্টের অনুসরণে ভ্রাতৃসঙ্ঘে'র (Brotherhood in Imitation of Jesus Christ) পরিকল্পনা নিয়ে তিন বন্ধুতে বহু আলোচনা হয়। সুন্দর সিং কোনো সঙ্ঘে যোগ দেবেন না। খ্রীস্টান সাধুর একক জীবন যাপন করে নিজস্ব সাধন-পথে যাবারই সংকল্প তাঁর। এণ্ড্রুজের উন্মুখ চিত্ত তখনই কিন্তু ছুটে চলেছে এই নব প্রচেষ্টায় যুক্ত হতে। দিল্লীর প্রান্তসীমায় সবজিমণ্ডীতে চামারদের সঙ্গে বাস করবেন— এ যে তাঁর বহুকালের স্বপ্ন। কিন্তু অলনাট আর রুদ্র এ প্রস্তাব অনুমোদন করতে পারলেন না। কেননা ম্যালেরিয়ায় ভুগে এণ্ড্রুজের শরীর দুর্বল হয়েই ছিল, এই পরিশ্রমে তিনি একেবারে ভেঙে পড়বেন বলে তাঁদের ভয় হল। স্টোক্‌স্‌ সিমলা পাহাড়ে সাবাথুতে কুষ্ঠসেবাশ্রমের রোগীদের নিজ হাতে সেবার ভার নিলেন। সাধু সুন্দর সিং খালি পায়ে পাঞ্জাবের গ্রামে গ্রামে ঘুরে সেখানকার দরিদ্রদের সঙ্গে বাস করতে লাগলেন। ওয়েস্টার্ন দিল্লীতে তাঁর অধ্যাপনার কাজ করতে লাগলেন দীনের মধ্যে দীন জীবন বরণ করে। ১৯১০ খ্রীস্টাব্দের ২২ ফেব্রুয়ারি তারিখে লাহোরের বিশপ লেফ্রয় এই নব ভ্রাতৃসঙ্ঘের প্রতিষ্ঠা করলেন। পাঞ্জাবে তাঁর যাজকতাকালের সর্বাপেক্ষা মহৎ ঘটনা বলে তিনি এর উল্লেখ করে সদস্যদের আশীর্বাদ করেন।

পরের বছর এণ্ড্রুজ এই ভ্রাতৃসঙ্ঘের আদর্শ নিয়ে *The East & West*

---

১ Chaturvedi & Sykes, *Charles Freer Andrews*, পৃ. ৭২।

পত্রিকায় একটি প্রবন্ধ লেখেন। খ্রীস্টধর্মের প্রবর্তনায় হিন্দুধর্মের পরিপূর্ণতা-সাধন বলতে এণ্ডরুজ কী বুঝেছেন এই প্রবন্ধে অতি সুন্দরভাবে বিবৃত হয়েছে। তাঁর মতে, এ দেশে মিশনরীদের প্রধান কর্তব্য খ্রীস্টানধর্মের পাশ্চাত্য সাজ খসিয়ে ফেলা। কিন্তু তখনই যে তাকে আবার হিন্দু পোশাকেই সাজাতে হবে তাও নয়। সর্বপ্রথমে মিশনরীরা পাশ্চাত্য প্রভাব বর্জন করবে, তারা কোনো বিশেষ দেশের অধিবাসী নয়। তাদের একমাত্র পরিচয় হবে তারা যীশুখ্রীস্টের প্রথম শিষ্যদের মতোই খ্রীস্টভক্ত।

এণ্ডরুজ বললেন[১]—

> একবার খ্রীস্টজীবনের যথার্থ উদ্ভব এ ভারতেই ঘটুক। তখন আমরা ভারতের অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে সজাগ করে দিয়ে ভারতীয় খ্রীস্টমণ্ডলীকে বলতে পারব, এ-সবই তোমাদের, কেননা তোমরা যে স্বয়ং প্রভু যীশুখ্রীস্টের।

১৯১১ খ্রীস্টাব্দে এণ্ডরুজ অসুস্থ হয়ে সিমলায় পড়ে আছেন, সেই সময় স্টোক্‌সের সঙ্গে কৌমারজীবন যাপন সম্বন্ধে তাঁর আলোচনা হয়। যীশুর উপদেশে বিবাহিত এবং অবিবাহিত জীবনের সম্পর্ক সম্বন্ধে কী বলা হয়েছে সে বিষয়ে আবার নতুন করে চিন্তা করার অবকাশ এণ্ডরুজেরও এল। স্টোক্‌স্ যখন বললেন, ভারতবাসীরা কুমারজীবনকেই উচ্চতর জীবনযাত্রা মনে করে তখন এণ্ডরুজের মনে পড়ে যায় যীশুখ্রীস্ট গৃহস্থজীবনকে কত পবিত্র জেনে শিশুদের সম্বন্ধে বলতেন, 'ধরায় স্বর্গের প্রতীক এরা।'

স্টোক্‌স্ যখন পাহাড়ীদের ভালোবেসে মনেপ্রাণে তাদের সেবা করছেন তারা কিন্তু মনে করছে যে নিজের আধ্যাত্মিক উন্নতি চেষ্টাতেই তিনি এ কাজ করে চলেছেন। তারা সরল ভাবেই তাঁকে বলে, তোমাকে তো স্ত্রীপুত্রপরিবারের দায়িত্ব নিতে হয় না, তুমি সহজে স্বর্গে চলে যাবে। আমাদের এ জন্মে সংসার চালাবার টাকাও রোজগার করা চাই; আবার এ পাপের পৃথিবীতে ফিরে ফিরে জন্মাতেও হবে। স্টোক্‌স্ বুঝলেন, এরা মনে করেছে সাংসারিক দুঃখ-দুর্দশা এড়াবার জন্যই তাঁরা কৌমারজীবন বরণ করেছেন। জনগণের দুঃখ-লাঘবের জন্যই যে তাঁরা প্রাণপাত করছেন তার আবেদন লোকে তখনই বুঝবে যখন তাঁরা গৃহস্থজীবন যাপন করবেন। ভারতসেবার কাজে এখন

১ Chaturvedi & Sykes, *Charles Freer Andrews*, পৃ. ৭৩।

বিশেষ প্রয়োজন খ্রীস্টধর্মপরায়ণ পারিবারিক জীবনের আদর্শ। এণ্ডরুজের মনে পড়ে ডারহামের বিশপ ওয়েস্টকটের কথা। তিনিও বলেছিলেন, 'দেশকে ধর্মভাবে পুনরুজ্জীবিত করতে গেলে ধর্মনিষ্ঠ খ্রীস্টান পরিবারগোষ্ঠী নতুন করে সংগঠিত করতে হবে।' স্টোক্স্ যখন খবর দিলেন যে তিনি একজন ভারতীয় খ্রীস্টান রাজপুত মহিলাকে বিবাহ করার সংকল্প গ্রহণ করেছেন তখন এণ্ডরুজ সানন্দে তাঁর সমর্থন জানালেন।

যীশুখ্রীস্টের অনুসরণে যে ভ্রাতৃসঙ্ঘ গঠিত হয়েছিল স্টোক্স্-এর বিবাহের সঙ্গে সঙ্গে তার অবসান ঘটল। তবে সেই অল্পদিনের মধ্যেই কিন্তু তার আদর্শ চারি দিকে ছড়িয়ে গেছে। এণ্ডরুজের কয়েকটি খ্রীস্টান ছাত্র পাঞ্জাবের জাতীয় মিশনরী সঙ্ঘে কাজ করত। তারা খ্রীস্টের প্রথম ভক্তদের অনুকরণে জীবন যাপন করতে লাগল। ১৯১২ খ্রীস্টাব্দের এপ্রিলে সেই সোসাইটির একটি সভাতেই এণ্ডরুজ বললেন, 'ভারতে এখন খ্রীস্টান আশ্রম গঠনের প্রয়োজনীয়তা খুবই বেশি।' এর ফলে ভারতবর্ষের চারি দিকে নতুন নতুন ভ্রাতৃসঙ্ঘ গড়ে উঠতে লাগল।

এণ্ডরুজ তাঁর *North India* পুস্তকে উত্তর ভারতের ধর্মসমস্যা নিয়ে আলোচনা করে দেখিয়েছেন যে যীশুখ্রীস্ট নিজেই তাঁর শিষ্যদের তৈরি করে গেছেন যাতে তাঁর মৃত্যুর পরে জনগণের মধ্যে তাঁর কর্মধারা ব্যাহত না হয়। ভারতীয় খ্রীস্টমণ্ডলীও তাদের কলেজগুলির সাহায্যে সে কাজ করতে পারে। খ্রীস্টযাজকের জীবন যাঁরা বরণ করতে চান সে-সব ভারতীয় ছাত্রদের পাঠ্যক্রমের তালিকা নির্বাচনে এণ্ডরুজ দূরদর্শিতার প্রমাণ দেন। যে পাঠ্যসূচী তাদের এতদিন অনুসরণ করতে হত ভারতীয় খ্রীস্টানের প্রাত্যহিক জীবনধারা থেকে তার পার্থক্য এত অধিক ছিল যে, সে শিক্ষা তাদের কাছে সম্পূর্ণ অবাস্তব হয়ে পড়েছিল। এণ্ডরুজের মতে পাশ্চাত্য বিষয়গুলি একেবারে বাদ দিয়ে ছাত্রদের অধ্যয়নের কেন্দ্রস্থলে রাখতে হবে বাইবেল ও খ্রীস্টানধর্মের আদিযুগের ইতিহাস। আর সমসাময়িক হিন্দু ও ইসলাম চিন্তাধারার সঙ্গে খ্রীস্টান মতবাদের সম্পর্কটিকেও স্পষ্ট করে তুলতে হবে পাঠার্থীর সামনে।

সেণ্ট ষ্টিফেন্স কলেজে খ্রীস্টান ধর্মশিক্ষা সম্বন্ধেও তিনি অনেক চিন্তা করেছেন। ধর্মকে কেবল পাঠ্যক্রমের একটি বিষয়রূপে না রেখে তাকে জীবনের সঙ্গে মেলাবার কাজে তিনি ছিলেন একান্ত উৎসুক। ধর্মশিক্ষা কতখানি স্বাধীন আর কতদূর পর্যন্ত বাধ্যতামূলক হতে পারে— এ বিষয়ে বহু

তথ্যপূর্ণ প্রবন্ধাদি রয়েছে এণ্ডরুজের লেখা। তাঁর অধিনায়কত্বে কলেজের অখ্রীস্টান অধ্যাপক ও ছাত্রগণও সেখানকার ধর্মজীবনের সঙ্গে একান্ত আন্তরিক যোগ রক্ষা করে চলতেন, সে যুগের সন্দিগ্ধচিত্ত লোকেরা তাতে বিস্মিত হয়েছেন অপরিসীম।

১৯১১ খ্রীস্টাব্দের ১২ ডিসেম্বরে দিল্লী দরবার অনুষ্ঠিত হয়। এণ্ডরুজ এতে উপস্থিত ছিলেন। রাজা পঞ্চম জর্জ ঘোষণা করলেন ভারতের রাজধানী কলকাতা থেকে দিল্লীতে স্থানান্তরিত হবে। আসাম বিহার ও উড়িষ্যা থেকে পৃথক করে নিয়ে বিভক্ত বাংলাদেশের ঐক্য স্থাপিত হল। এণ্ডরুজ আশ্চর্য দূরদর্শিতার সঙ্গে ভবিষ্যদ্‌বাণী করলেন, এই রাজকীয় ঘোষণার ফলে প্রদেশগুলি আর প্রাদেশিক রাজধানীগুলি সংখ্যায় বেড়ে যাবে। তাঁর পরামর্শ হল খ্রীস্টান সঙ্ঘগুলিও এবার সেভাবে পরিকল্পিত হোক। বিভিন্ন প্রদেশের বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী তাদের সংগঠিত হওয়া চাই। দিল্লীতে যিনি মেট্রোপলিটন থাকবেন, তাঁকে কেবল একটি ছোটো এলাকার ভার দিলে, তবেই তিনি অন্য কাজের অবসর পাবেন। সে সময় অনেকে মনে করেছিল বিশপ লেফ্রয়ের পরে এণ্ডরুজই লাহোরের বিশপ হবেন এবং ভবিষ্যতে তিনিই হবেন ভারতের মেট্রোপলিটন।

যাই হোক, রাজঘোষণার ফলে সেণ্ট স্টিফেন্স কলেজের গুরুত্বও গেল বেড়ে। কেননা দিল্লীর প্রাধান্য বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে কলেজের ও মিশনের কাজের ক্ষেত্র প্রশস্ততর হল। খ্রীস্টান ছাত্রদের পূর্ণাঙ্গ শিক্ষার জন্য এণ্ডরুজ ও রুদ্র অধিকসংখ্যক ছাত্র ও অধ্যাপকযুক্ত একটি আবাসিক কলেজের নূতন পরিকল্পনা গড়ে তুললেন। কেম্‌ব্রিজ মিশন কর্তৃপক্ষের কাছে প্রস্তাবটি পেশ করবার জন্য ১৯১২ খ্রীস্টাব্দে এপ্রিল মাসে তাঁরা দুজনে ইংলণ্ডে যাত্রা করলেন। এই নতুন কলেজের সংবিধান গঠন এণ্ডরুজের এক মহৎ কীর্তি। ইংলণ্ডে গোঁড়া ও দ্বিধাগ্রস্ত কমিটি সদস্যদের কাছ থেকে অখ্রীস্টান অধ্যাপক নিয়োগের সমর্থন পাবার জন্য এঁদের দুজনকে অক্লান্ত পরিশ্রম করতে হয়। শেষ পর্যন্ত দুজনের মিলিত পদত্যাগের ভয়ে কমিটি সম্মত হন। ইংলণ্ডে কর্তৃপক্ষের এই সংকীর্ণতা এণ্ডরুজের মনে এত গভীর আঘাত হেনেছিল যে অল্পদিন পরেই তাঁর জীবনের কর্মধারা আমূল পরিবর্তিত হয়ে যায়। বৃহত্তর কর্মক্ষেত্রে নূতনতর আহ্বান এল এবার খ্রীস্টসেবকের জীবনে।

৩

পূর্ব-পশ্চিমে

ইংলণ্ডে : রবীন্দ্র-সন্নিধানে প্রথম

১৯১২ খ্রীস্টাব্দের জুন মাসে লণ্ডনে ব্রিটিশসাম্রাজ্যের বিশ্ববিদ্যালয় মহাসভার অধিবেশন বসে। এণ্ডরুজ তখন কেম্‌ব্রিজে। সেখান থেকে লণ্ডনে গেলেন ওই অধিবেশনে যোগ দিতে। লেখক ও সাংবাদিক হেনরি উড নেভিনসন দিল্লীতে একবার এণ্ডরুজের অতিথি হয়েছিলেন। লণ্ডনে তাঁর সঙ্গে দেখা হতেই এণ্ডরুজকে তিনি বললেন, 'আপনি কি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সঙ্গে দেখা করতে চান? রবিবার সন্ধ্যায় হ্যামস্টেডে শিল্পী উইলিয়াম রোটেনস্টাইনের বাড়িতে যাবার আমন্ত্রণ পেয়েছি। সেখানে রবীন্দ্রনাথ থাকবেন। আইরিশ কবি উইলিয়াম ইয়েট্‌স রবীন্দ্রনাথের লেখার ইংরেজি অনুবাদ কিছু পড়ে শোনাবেন। আসুন-না, সেদিন একসঙ্গে যাওয়া যাবে।'

এণ্ডরুজকে আর দ্বিতীয়বার অনুরোধ করার প্রয়োজন ছিল না। কারণ রবীন্দ্রনাথ ইংলণ্ডে এসেছেন— কেম্‌ব্রিজে এ খবর পাবার পর থেকেই তিনি সুযোগ খুঁজছিলেন কী করে কবির সঙ্গে দেখা করা যায়। হ্যামস্টেডে সেই রবিবারের সন্ধ্যা তাঁর জীবনের দিক্‌-নির্দেশ করে দিল।[১] এণ্ডরুজের নাম শুনেই রবীন্দ্রনাথ এগিয়ে এলেন। যদিও এর আগে কখনো তাঁদের দেখা-সাক্ষাৎ হয় নি, দুজনেই তবু দুজনের লেখার প্রতি আকৃষ্ট ছিলেন। ভারতের জাতীয় অভ্যুত্থানের আশা-আকাঙ্ক্ষা তখনই উভয়কে এক যোগসূত্রে বেঁধেছিল।

ইংরেজ সাহিত্যিক মহলে রবীন্দ্রকবিতাকে পরিচিত করে দেবার উদ্দেশেই সেদিন রোটেনস্টাইনের গৃহে বসেছিল সাহিত্যিক আসর। ইংরেজি গীতাঞ্জলি পাঠের ঐতিহাসিক ঘটনা শুরু হল। সেই সান্ধ্য আসরে উপস্থিত ছিলেন মে সিনক্লেয়ার, চার্লস ট্রেভেলিয়ান, ইভলিন আণ্ডারহিল, আর্নেস্ট রীস, হেনরি নেভিনসন, এজরা পাউণ্ড, অ্যালিস মেনেল ও আরো অনেকে।

আধো-অন্ধকার সেই অস্পষ্ট গ্রীষ্মগোধূলিতে এণ্ডরুজ বসেছিলেন জানালার ধারে। নীচের উপত্যকায় শহরের অজস্র দীপের ঝিকিমিকি আলো। আর

---

১ ৩০ জুন ১৯১২, দ্র. *Rabindranath Tagore Centenary Volume*: A Chronicle *of Eighty Years*, Sahitya Akademi, পৃ ৪৬৮।

তাঁর চারি দিকে গভীর নিস্তব্ধতা ক্রমশ পুঞ্জীভূত হয়ে উঠেছিল। কেননা ঘরে বসে সেদিন যাঁরা কবিতা শুনছিলেন তাঁদের কানে যেন এক অনাস্বাদিত সুধারস ঝরে পড়েছিল। গীতাঞ্জলি কাব্যের সরল মাধুর্য, তার উদার মানবিকতা ও মহান আদর্শ এণ্ডরুজের চিত্তেও সঞ্চারিত হল। বুঝলেন, এ কবিতার যে বাণী তা শতসহস্র মাইলের ব্যবধান ও বহুযুগসঞ্চিত ঐতিহ্য-বোধের সীমা অতিক্রম করে ইংরাজ জাতির অন্তরে গিয়েও ঝঙ্কার তুলবে। তিনি তো অনেক আগেই বলেছেন, পূর্ব ও পশ্চিমে আধ্যাত্মিক মিলন আসতে পারে কেবল শিল্প সংগীত ও কাব্যের মাধ্যমে। তখন অবশ্য প্রাচ্যদেশে ইংরেজি কাব্যের প্রভাবের কথাই তাঁর মনে ছিল। ভারতীয় কাব্যের প্রভাব পাশ্চাত্যচিত্তে কত গভীর হতে পারে তাও আজ মনেপ্রাণে অনুভব করলেন। কবিতা শুনতে শুনতে ভাবাবেগে তাঁর দুই চক্ষু অশ্রুপ্লাবিত হল।[১] সেদিনের কথা পরে লিখেছেন[২]—

হ্যামস্টেড হীথের পথ দিয়ে নেভিনসনের সঙ্গে যখন ফিরে যাচ্ছি তখন কথাবার্তা বিশেষ হয় নি, কারণ আপনমনে সেই কাব্যরস আস্বাদনের আবেগে ছিলাম আচ্ছন্ন। নেভিনসনকে ওঁর বাড়িতে পৌঁছে দিয়ে আবার হীথের পথ ধরে ফিরে চললাম। মেঘমুক্ত আকাশে সূর্যাস্তের রক্তরাগ।

চেয়ে দেখেন আর ফিরে ফিরে মনে আসে, 'জগৎ-পারাবারের তীরে ছেলেরা করে মেলা।'

ইংরেজি ছন্দে এ পঙ্‌ক্তিটির সুরের অনুরণন তাঁকে ভাসিয়ে নিয়ে যায় শৈশবের ধ্বনিজগতে। সে রাত কেটে গেল খোলা আকাশের তলে— প্রত্যুষ-সূর্যের উদয়কাল পর্যন্ত।

গীতাঞ্জলির গভীরে এণ্ডরুজ যে কেবল ভারতের নিভৃত ভাবরূপটিকে খুঁজে পেলেন তা নয়। মনে হয়, শৈশবে মায়ের কোলে বসে যে গানের সুরে মগ্ন হয়েছিলেন তারই অনুভবের সঙ্গে এসে মিলল নরদাম্ব্রিয়ার সাগরের কলধ্বনি। ভাবতে ইচ্ছে করে, হয়তো এই সে মোহন মন্ত্র এণ্ডরুজকে সেদিন যা অভিভূত করেছিল।

---

১ দ্র. "An Evening with Rabindra", *The Modern Review*, August 1912, পৃ. ২২৮।

২ "With Rabindra in England", *The Modern Review*, January 1913, পৃ. ৭১, ৭২।

রবীন্দ্রনাথ তখনো লণ্ডনে প্রায় নূতন আগন্তুক মাত্র। তাঁর চেহারায় শারীরিক দুর্বলতার চিহ্ন দেখতে পেলেন এণ্ডরুজ। কবিকে তাঁর বড়ো সুকুমার একা অসহায় মনে হল। কেম্‌ব্রিজে ফিরে এসেও তাঁর জন্য উদ্‌বেগে মন ভরেই রইল। কবির দুর্বল স্বাস্থ্যে অকস্মাৎ খ্যাতির আনুষঙ্গিক অত্যাচার কি সইবে? জুলাইয়ের শেষে তাই তিনি আবার একবার কবির কাছে না গিয়ে পারলেন না। দেখলেন, যা ভেবেছিলেন তাই হয়েছে। অপরিসীম ক্লান্তিতে কবি প্রায় ভেঙে পড়েছেন। এবার শান্তিতে একটু বিশ্রাম চান।

সুশীল রুদ্র ও তাঁর মেয়ে ইলা তখন এণ্ডরুজের পেম্‌ব্রোকের বন্ধু বিল উট্রামের[১] শান্ত পল্লীযাজকভবনে স্ট্যাফোর্ডশিয়ারে বাটারটন নামক স্থানে বাস করছিলেন। এণ্ডরুজের অনুরোধে উট্রাম-দম্পতি কবিকেও আমন্ত্রণ জানালেন। অগস্ট মাসে এণ্ডরুজ তাঁকে নিয়ে বাটারটনে এলেন। এমনি করে দুজনের যে বন্ধুত্বের শুরু হল এণ্ডরুজের পক্ষ থেকে তাতে এক দিকে ছিল গুরুর প্রতি শিষ্যের ভক্তি আর অন্য দিকে মাতৃহৃদয়ের স্নেহচ্ছায়াবিস্তার। সেপ্টেম্বর-অক্টোবরে রবীন্দ্রনাথ ছিলেন লণ্ডনে। এণ্ডরুজ প্রায়ই কেম্‌ব্রিজ থেকে সেখানে যেতেন তাঁকে দেখতে। সারা সকাল দুজনে বসে ইংরেজি গীতাঞ্জলির প্রুফ সংশোধন করতেন। বিকেলে রোটেনস্টাইনের বাড়িতে বসে আবার গল্পসল্প হত। সে সময় রোটেনস্টাইন কবির প্রতিকৃতি আঁকছিলেন।

এরকমই হয়তো কোনো-এক দিনের শেষে ট্রেনে কেম্‌ব্রিজ ফেরার পথে এণ্ডরুজের মনে যে কয়েকটি উজ্জ্বল স্বপ্ন ভেসে উঠেছিল তার মধ্যে একটি হল— এ বন্ধুত্বের ফলে তিনি বাংলা শেখার সুযোগ পাবেন আর কবির অন্যান্য বইয়ের ইংরেজি অনুবাদেও সাহায্য করতে পারবেন। সে-সব বই নিশ্চয় ভবিষ্যতে সমগ্র পৃথিবীর কাছে ভারতসংস্কৃতির তাৎপর্য বহন করতে সক্ষম হবে। এণ্ডরুজের আরো একটি আন্তরিক কামনা ছিল কবির তত্ত্বাবধানে তিনি ভারতের আধ্যাত্মিক চিন্তাধারার সংস্পর্শে আসবেন। তবে সেণ্ট স্টিফেন্স কলেজের কাজ ছাড়ার কোনো ইচ্ছা তখনো তাঁর মনে আসে নি। রুদ্র তাঁকে উপাধ্যক্ষ মনোনীত করেছেন।

---

১ ইংলণ্ডের পল্লীগ্রাম ও পাদ্রি, পথের সঞ্চয়, পৃ. ১৩৪।

১৯১২ খ্রীস্টাব্দের নবেম্বর মাসে দিল্লী ফিরে নবীনতর উৎসাহে এণ্ডরুজ কাজে নামলেন। খ্রীস্ট-প্রণোদিত শিক্ষা ভবিষ্যৎ ভারতে যে মহান্ ঐশ্বর্য নিয়ে আসবে তার সংগঠনে তখন তাঁর আপ্রাণ প্রয়াস। রবীন্দ্রনাথ সে সময় ইংলণ্ড থেকে আমেরিকায় গেছেন। তাঁকে এণ্ডরুজ লিখলেন[১]—

> এখন আমার কাজ কেবল শিক্ষার ক্ষেত্রে। আমার মিশনরী কর্ম, খ্রীস্ট প্রেম ও ভারতভক্তির সম্পূর্ণ সার্থকতা এর মধ্যেই আমি পাব।

ভারতের স্বাজাত্যবোধের পূর্ণ পরিণতির একটি আদর্শ ১৯১০ খ্রীস্টাব্দ থেকেই তাঁর মনে গড়ে উঠেছে। তাই কবিকে এই পত্রেই এণ্ডরুজ লিখছেন—

> …আমার প্রাণ চায় যথার্থ স্বাধীন ভারতের মূর্তিটি দেখব। অথচ দেশের বর্তমান অবস্থায় তা কি সম্ভব? পরাধীনতা ও দুর্নীতির পাপচক্র কেবলই আবর্তিত হয়ে চলেছে শাসিত ও শাসকের মধ্যে।…

স্বাধীন ভারত! সে যুগে এই দাবি এণ্ডরুজই সর্বাগ্রে উপস্থিত করেছেন।

এই পত্রে যদিও দেখি যে মিশন-সেবাকেই এণ্ডরুজ তাঁর জীবনের ব্রতরূপে দেখছেন তবু এ কথাও সত্য যে এণ্ডরুজের মন তখন ছিল সংশয়ে দ্বিধা-বিভক্ত। ভারতবর্ষে ফিরে তাঁকে পাঞ্জাব চার্চের জাতিপার্থক্যগত ক্ষুদ্র বিধিনিষেধের সম্মুখীন হতে হয়েছিল। বারে বারে তাঁকে ক্লান্ত শরীরে দিল্লী-লাহোর যাতায়াত করতে হয়েছে শান্তি-স্থাপকের বেশে। কখনো ভারতীয় ও ইংরেজ ধর্মযাজকদের বিরোধ মেটাতে হচ্ছে, কখনো-বা ইংরেজ ও ভারতীয় খ্রীস্টান সমাধিস্থান পৃথক করার মতো হাস্যকর। বিতর্কের মীমাংসা করতে হচ্ছে। পূর্বেই ইংলণ্ডের মিশন কমিটির সদস্যদের সঙ্গে রুদ্র ও এণ্ডরুজের মতের যখন অমিল হয়েছিল তখন থেকেই এণ্ডরুজ জানতেন কমিটি-সদস্যদের সঙ্গে তাঁদের চিন্তাধারার কত পার্থক্য! এক-একদিন সারারাত জেগে এণ্ডরুজ ভাবতেন যাঁদের সঙ্গে আদর্শগত তফাৎ এতখানি তাঁদের কাছ থেকে বেতন ভোগ করা উচিত হচ্ছে কি?

এরই মধ্যে খ্রীস্ট-জন্মোৎসব এসে গেল। প্রেমে ভক্তিতে পূর্ণ অন্তরে এণ্ডরুজ চার্চে এসেছেন। উপাসনার মধ্যে ধর্মসংগীত-গায়ক ভারতীয় ছেলের

---

১ ১২ ডিসেম্বর ১৯১২। দ্র. *Visva-Bharati News*, March 1967। মূল চিঠি শান্তিনিকেতন রবীন্দ্রসদনে রক্ষিত।

দল গেয়ে উঠেছে অ্যাথেনেসিয়ান-সূত্রের প্রথম চরণ, 'যে লোক এই ধর্ম-বিশ্বাসের পূর্ণ শুদ্ধ রূপ রক্ষা না করবে তার চিরতরে পতন অবশ্যম্ভাবী।' এণ্ডরুজ ভাবলেন, 'এ বাক্য যারা মানে তাদের চোখে তো স্বয়ং রবীন্দ্রনাথও ঈশ্বর-কৃপার অযোগ্য। যাঁর কাব্য তাঁকে নতুন ধর্মজগতের পথ দেখিয়েছে, প্রথম দর্শনে যাঁর পবিত্র হৃদয়ের পরিচয় তিনি পেয়েছেন তাঁর কথা তো এভাবে চিন্তা করাই যায় না।' সবচেয়ে কঠিন আঘাত পেলেন এ কথা চিন্তা করে, 'যে সুকুমার-চিত্ত শিশুদের প্রতি কবির অপার স্নেহদৃষ্টির কথা পাই তাঁর কাব্যে— সেই অবোধ শিশুদের মুখে ঈশ্বর-নিন্দার সমতুল্য এ উক্তি কি শোভা পায়?'

এ বাক্যাংশটি বাইবেলের যে অধ্যায়ে রয়েছে তা ধর্মমতের দিক থেকে গ্রহণযোগ্য কি না— এ প্রশ্ন সেই অন্তর্বিদ্রোহের মুহূর্তে এণ্ডরুজের মনে উদিত হল। কবির সঙ্গে দেখা হবার পর থেকে হিন্দু ও বৌদ্ধ ধর্মগ্রন্থগুলি আবার নতুন উৎসাহে তিনি পড়তে শুরু করেছিলেন। তাঁর মনে প্রশ্ন এল— পিতা পুত্র ও পবিত্র আত্মা— ত্রিরূপা এই আরাধনা বিশেষভাবে খ্রীস্টান মতেই কি কেবল পাই? তবে কি যীশুখ্রীস্টের কামহীন জন্মকথাও কেবল লোকপ্রবাদ? জনসাধারণের অপরিমাণ ভক্তি হয়তো বুদ্ধ ও কৃষ্ণের জন্মকথার মতো এতেও অলৌকিকত্ব আরোপ করেছে। এ-সব তত্ত্ব-জিজ্ঞাসায় কিছুদিন মন এতই ভারাক্রান্ত হয়ে রইল যে তাঁর জীবনযাত্রায় স্বভাববিরুদ্ধ নির্জনপ্রিয়তা প্রবল হয়ে উঠল। জাতিগত সাম্যে আর সন্ত ফ্রান্সিসের সেবাধর্মে বিশ্বাসী তাঁর একান্ত অন্তরঙ্গদের কাছ থেকেও তিনি কিছুদিন বিচ্ছিন্ন হয়ে রইলেন।

গুরুকুলে : লালা মুনশিরাম (স্বামী শ্রদ্ধানন্দ) সংসর্গে

এর ফলে নতুন বন্ধুত্বের দিকে তাঁর মন একান্ত উন্মুখ হয়ে এগিয়ে গেল। চিত্ত যখন নিঃসঙ্গ ও সংশয়াকুল সেইক্ষণে ১৯১৩ সালের জানুয়ারি মাসে আর্যসমাজের শক্তিমান নেতা লালা মুনশিরামের সঙ্গে দিল্লীতে এণ্ডরুজের আলাপ হল।

হরিদ্বারের কাছে কাংড়ি নামক স্থানে আর্য-সমাজ প্রবর্তিত গুরুকুলের শিক্ষা-পদ্ধতি ও লালা মুনশিরামের কর্মসাধনার বিষয় শুনেই তাঁর মনে শ্রদ্ধা জেগেছিল। তাই কালবিলম্ব না করে এই মহাত্মার সঙ্গে দেখা করতে তিনি একবার গুরুকুলে গেলেন। ১৯১৩ সালের প্রথম দিকে তিনি কয়েকবারই সেখানে গিয়ে সপ্তাহের পর সপ্তাহ মুনশিরাম ও তাঁর ছাত্রদের সঙ্গে গঙ্গার ধারে ছোটো ঘরটিতে কাটিয়ে এসেছেন।

প্রথমবারে সুধীর রুদ্র ও জন হয়ল্যাণ্ডকে তিনি সঙ্গে নিয়েছিলেন। এ বিষয়ে হয়ল্যাণ্ড লিখেছেন[১]—

আমাদের তখন তরুণ বয়স, সন্ত ফ্রান্সিসের নীতিতে শান্তির দূত হিসেবে কাজ করার যে দৃষ্টান্ত তখন এণ্ডরুজের মধ্যে দেখেছি, সে অভিজ্ঞতার প্রতিটি মুহূর্ত আমাদের জীবনে মহা মূল্যবান।

গুরুকুলে গিয়ে তিনি ভারতীয় খাদ্য গ্রহণ করতেন, ভারতীয় রীতিনীতি মেনে চলতেন। লালা মুনশিরামের সঙ্গে আলোচনায় ধীর বিনম্রভাবে তাঁর কথা শুনতেন, নিজে খুব কমই বলতেন।

সুদূর অতীতের স্মৃতিতে মুগ্ধ হয়ল্যাণ্ড বলছেন, গুরুকুলে বাসকালে হিমালয়ের তুষার গিরিশিখরমালা তাঁর মনে যে অপূর্ব বিস্ময়ের সঞ্চার করেছিল এণ্ডরুজের সাহচর্যে পাওয়া নতুন জীবনদর্শনের বিস্ময়ও তার চেয়ে কম নয়।

লালা মুনশিরামকে এণ্ডরুজ বড়দাদার মতো দেখতেন। তাঁর ব্যক্তিত্ব, তাঁর তেজ, তাঁর রহস্যপ্রিয়তা ও সহজ জীবনযাত্রা এণ্ডরুজকে মুগ্ধ করেছিল। পূতসলিলা গঙ্গানদী ও পবিত্র ভারতভূমির প্রতি মুনশিরামের একাগ্র অনুরাগ; এবং মাতৃভাবে তাঁর ঈশ্বর-আরাধনা রীতিতে এণ্ডরুজের শ্রদ্ধা জাগ্রত হয়।

মডার্ন রিভিয়ু পত্রিকায় তাঁর সেই ভ্রমণের বর্ণনা প্রসঙ্গে উৎসাহভরে লিখলেন[২]—

এখানে এই গুরুকুলেই নবভারতের মহান রূপের দর্শন মেলে। তরুণ ভারতীয় জীবনের অনাবিল অকলঙ্ক সুধাধারার উৎসমুখ এইখানে।

এণ্ডরুজ খ্রীস্টান ছাত্রদের উৎসাহিত করতে গুরুকুলের ছাত্রদের বন্ধু হতে। দিল্লীর মিশনরীরা কিন্তু তাঁদের বিরুদ্ধ-মতাবলম্বী আর্যসমাজীদের সঙ্গে এণ্ডরুজের এই ঘনিষ্ঠতাকে বিশেষ সন্দেহের চোখেই দেখতেন। আবার আর্যসমাজেরও কেউ কেউ তাঁকে মিশনরী গুপ্তচর আখ্যা দিয়েছিলেন। এই ভুল বোঝাবুঝিতে আহত হয়ে মুনশিরামকে চিঠি লিখলেন এণ্ডরুজ। মুনশিরাম লিখলেন, এণ্ডরুজের সৌহার্দ্যে যত আনন্দ তিনি পেয়েছেন বহু বছর এত আনন্দ কোথাও পান নি। এর ফলে তাঁর ভগবৎ-বিশ্বাসও বহুগুণ বেড়ে

১ J. S. Hoyland, C. F. *Andrews— Minister of Reconciliation*, পৃ. ১৭।

২ Hardwar And its Gurukula, *The Modern Review*, March 1913, পৃ. ৩৩৪।

গেছে। শুনে এণ্ডরুজ অভিভূত হয়ে গেলেন। লালা মুনশিরাম তাঁকে আরো জানালেন[১]—

> তুমি আর আমি— এই দুই পাপাত্মায় মিলে আমাদের ভাইদের মনে শেষ পর্যন্ত এই দৃঢ় বিশ্বাস জাগাব যে মা কোনো বিশেষ দেশের বা বিশেষ জাতির নন, তাঁর স্নেহময় বাহু সব সন্তানের জন্য সমভাবে প্রসারিত।

এ পত্র পেয়ে এণ্ডরুজ কৃতার্থ হয়ে মুনশিরামকে আবেগভরে লিখলেন, তিনি যেন শুধু ভাই না বলে চার্লি বলেই তাঁকে সম্বোধন করেন, কারণ চার্লি ডাকের অর্থ— অতি প্রিয়জন বলে স্বীকার করা।

গুরুকুলের প্রতি এক আন্তরিক আগ্রহ এণ্ডরুজের নানা কাজে প্রকাশ পেত। তিনি সেখানকার বাগানের জন্য পাঠালেন গোলাপচারা, স্কুলের জন্য ইংরেজির পাঠ্যসূচী তৈরি করে দিলেন। তা ছাড়া গুরুকুলের প্রতি সরকার পক্ষের যে অকারণ সন্দেহ ছিল তার নিরাকরণে যত্নশীল হলেন। ভাইসরয় লর্ড হার্ডিঞ্জের সঙ্গে তাঁর প্রগাঢ় বন্ধুত্ব থাকার ফলে তা করা সম্ভবও হয়েছিল।

লর্ড ও লেডি হার্ডিঞ্জের সঙ্গে এণ্ডরুজের বন্ধুত্বের পর্যালোচনা করলে দেখা যায় তাঁর মধ্যে ধর্ম ও রাজনীতি কেমন করে এক হয়ে মিলে গিয়েছিল। ১৯১১ খ্রীস্টাব্দের মে মাসে হার্ডিঞ্জ-দম্পতি একবার সিমলার ক্রাইস্ট চার্চে উপাসনায় যোগ দিয়েছিলেন। সেখানে তখন আচার্য ছিলেন এণ্ডরুজ। এঁরা দুজনে তখন কোনো ব্যক্তিগত কারণে শোকার্ত; এণ্ডরুজের বাক্যে ও ব্যক্তিত্বের স্পর্শে তাঁদের শোকের উপশম হয়। পরে একদিন এঁরা তাঁকে দ্বিপ্রহরের আহারে আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন। সে সময় থেকেই এণ্ডরুজ তাঁদের বন্ধু হলেন।

১৯১২ খ্রীস্টাব্দের ২৩ ডিসেম্বরে লর্ড হার্ডিঞ্জ দিল্লী নগরীর নতুন রাজধানীতে প্রবেশের মুখে বোমা বিস্ফোরণে আহত হন। তা হলেও প্রতিশোধ গ্রহণের পথেই তিনি গেলেন না। জনসাধারণকে উৎপীড়ন না করে বিশ্বাস ও বন্ধুত্বের আদর্শে পূর্ণ আস্থা স্থাপন করলেন। সপ্রশংস বিস্ময়ে এ-সব লক্ষ্য করে এণ্ডরুজ সেই উদ্বেগের মুহূর্তে লেডি হার্ডিঞ্জকে শুশ্রূষার কাজে আপ্রাণ সাহায্য করেছিলেন। এর ফলে তাঁদের বন্ধুত্ব চিরস্থায়ী হয়েছিল। স্বাস্থ্য পুনরুদ্ধারের

---

১ এণ্ডরুজকে লেখা লালা মুনশিরামের চিঠি, ২৫ এপ্রিল ১৯১৩।

জন্য দেরাদুন গিয়ে লর্ড হার্ডিঞ্জ রাজনৈতিক অবস্থা সম্বন্ধে আলোচনার উদ্দেশে এণ্ডরুজকে সেখানে আমন্ত্রণ জানালেন।

ভাইসরয়ের রোগমুক্তিতে কৃতজ্ঞ-অন্তরে আনন্দ-অনুষ্ঠানের জন্য ভারতীয়রা কিছু অর্থসংগ্রহ করে। সে অর্থ কিভাবে ব্যয় করা সংগত— এ বিষয়ে লেডি হার্ডিঞ্জ এণ্ডরুজের পরামর্শ নেবার সুযোগ পেলেন দেরাদুনে। এণ্ডরুজ বললেন, ১৯১৩ খ্রীস্টাব্দের ২০ জুনে লর্ড হার্ডিঞ্জের জন্মদিনে হাসপাতাল ও অনাথ আশ্রমের শিশুদের আমোদপ্রমোদ ও ভোজের ব্যবস্থা করলে সবচেয়ে ভালো হয়। ভারতের দরিদ্রতম লোকও এ অনুষ্ঠানে আনন্দিত হবে। লেডি হার্ডিঞ্জ সেই অনুসারে কাজে নামলেন। এণ্ডরুজও তাঁকে যথাসাধ্য সাহায্য করেছিলেন। সরকারি মহলে কেউ কেউ অবশ্য চমক-লাগানো আড়ম্বর-অনুষ্ঠানের পক্ষপাতী ছিলেন। কিন্তু তাঁরাও পরে সবিস্ময়ে লক্ষ্য করেছেন এই ঘটনার সাফল্য। সেই আনন্দের দিনে সমস্ত গ্রামে গ্রামে শিশু-উৎসবের ধুম লেগে গিয়েছিল।

এই কর্ম-সম্পাদনে এক দিকে হার্ডিঞ্জ-দম্পতি এবং অপর দিকে ভারতীয় নানা প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে এণ্ডরুজের ঘনিষ্ঠ যোগ রাখতে হয়। ভারতীয় প্রতিষ্ঠানের মধ্যে আর্যসমাজও ছিল। সেই বন্ধুত্ব ও সহযোগিতার সুযোগে মুনশিরামের সঙ্গে ভাইসরয়ের সাক্ষাৎকার ঘটালেন এণ্ডরুজ। যুক্তপ্রদেশের গভর্নর জেমস মেস্টনকেও একবার গুরুকুল দেখে আসতে রাজী করালেন তিনিই।

শান্তিনিকেতনে: এণ্ডরুজ-মনের রূপান্তর

১৯১৩ সালের ১৯ ফেব্রুয়ারিতে এণ্ডরুজ প্রথম শান্তিনিকেতন বিদ্যালয় দেখতে এলেন।[১] রবীন্দ্রনাথ তখন বিদেশে। আশ্রমের ছাত্র অধ্যাপক মিলে আশ্রমগুরুর বন্ধু হিসাবে অভ্যর্থনা জানালেন তাঁকে। কবির জ্যেষ্ঠভ্রাতা দ্বিজেন্দ্রনাথ, অধ্যাপক অজিতকুমার চক্রবর্তী, সন্তোষচন্দ্র মজুমদার ও পণ্ডিত ক্ষিতিমোহনের সঙ্গে এণ্ডরুজ তখনই একান্ত ঘনিষ্ঠ হয়ে উঠেছিলেন। ১৯১৩ খ্রীস্টাব্দের ৮ মার্চে দিল্লী ফিরে এণ্ডরুজ গুরুদেবকে একটি পত্র দেন।[২] তার

---

১ শ্রীপ্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়, রবীন্দ্রজীবনী ২য় খণ্ড দ্বিতীয় সংস্করণ, পৃ. ৩৩০ এবং তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা ১৩১৯, পৃ. ২৯৩।

২ রবীন্দ্রনাথ-এণ্ডরুজ পত্রাবলী, পৃ. ২১৫-২২১।
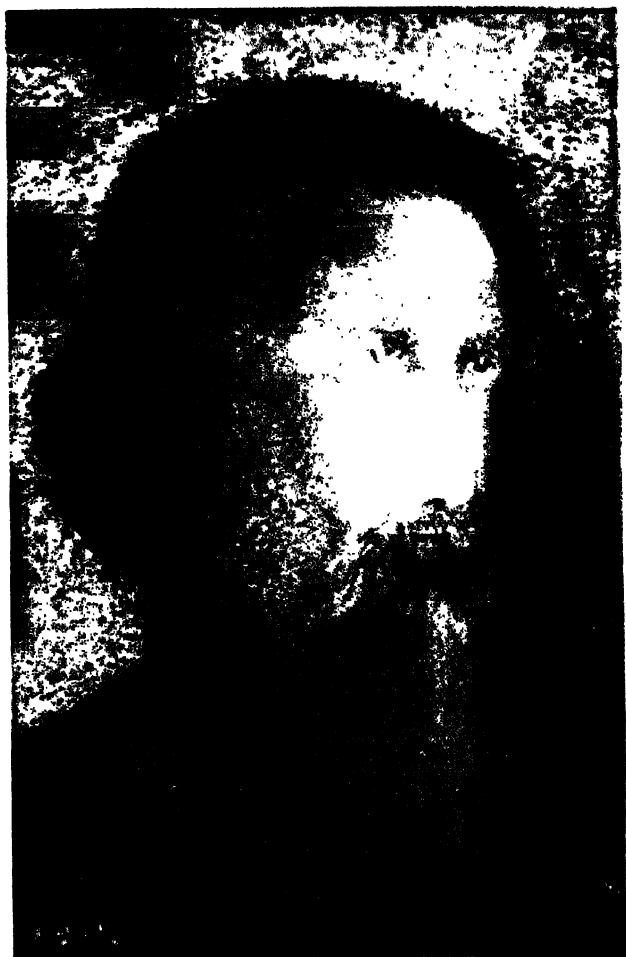
রবীন্দ্রনাথ

সি. এফ. এণ্ডরুজ - অঙ্কিত

থেকে জানতে পারি বাঁধের পাড়ে তালগাছের একখানি ছবি এঁকে পত্রের সঙ্গে তিনি গুরুদেবকে পাঠিয়েছিলেন। ছাত্রদের কাছ থেকে রঙ আর কাগজ নিয়ে ছবিখানি শান্তিনিকেতনে বসেই এঁকেছিলেন। এখনো সেখানি কলাভবনে সযত্নে রক্ষিত। কলাভবনে এণ্ডরুজের আঁকা একখানি গুরুদেবের প্রতিকৃতিও রয়েছে। সেখানি তিনি স্মৃতি থেকে এঁকেছিলেন ১৯১২ সালে বিলাত থেকে ভারতে ফেরার পথে জাহাজে।[১]

এণ্ডরুজ এই পত্রে গুরুদেবকে অনুরোধ জানালেন তিনি যেন আরো কিছুদিন ইউরোপ ও আমেরিকায় থেকে স্বাস্থ্যের উন্নতি হলে তবে দেশে ফেরেন। আশ্রমে তাঁর অনুপস্থিতিকালে এণ্ডরুজ নিজে এসে অধ্যাপক ও ছাত্রদের সঙ্গে বাস করেন— এই আগ্রহও প্রকাশ পেয়েছিল সেই পত্রে।

ভারতবর্ষে বহুবার শান্তিস্থাপনের ভূমিকা গ্রহণ করতে হয়েছে এণ্ডরুজকে। এই সময়েই তাঁর প্রস্তুতি শুরু হয় তাঁর জীবনে। সিমলায় ভাইসরয়-গৃহে একটি বক্তৃতা দেবার জন্য লর্ড হার্ডিঞ্জ তাঁকে আহ্বান করেছিলেন। বহু পরিশ্রমে ভাষণটি এণ্ডরুজ প্রস্তুত করেছিলেন। তার বিষয় ছিল, 'রবীন্দ্রনাথ ও বাংলার নবজাগরণ।' গণ্যমান্য সরকারি কর্মচারীদের উপস্থিতিতে ১৯১৩ সালের মে মাসে এণ্ডরুজ ভাষণটি দেন। সেই সময় থেকে ইংরেজ বা ভারতীয়দের কাছে কোনো আবেদন জানাতে গেলেই তিনি গীতাঞ্জলির উল্লেখ করেছেন পূর্বপশ্চিমের যোগসূত্ররূপে।

জুলাই মাসে এণ্ডরুজ দিল্লী কলেজের দীর্ঘ অবকাশে আবার শান্তিনিকেতনে এলেন। এখানে বিদ্যালয়-জীবনের স্বতঃস্ফূর্ত সজীবতা তাঁকে আকর্ষণ করে।[১] সেবার তিনি শান্তিনিকেতন থেকে কলকাতা গিয়ে ঠাকুর-পরিবারের মাধ্যমে কলকাতার ব্রাহ্মসমাজের সংস্পর্শে এসেছিলেন। প্রবাসী-সম্পাদক রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়ের সঙ্গে তখনই তাঁর সাক্ষাৎ পরিচয় হয়।[২] মডার্ন রিভিয়ু পত্রিকায় কিন্তু পূর্ব থেকেই এণ্ডরুজের প্রবন্ধ প্রকাশিত হতে শুরু করেছে।

একদিন ব্রাহ্মসমাজের সভায় এণ্ডরুজকে কিছু বলতে হল। সে বিষয়ে পরে মুনশিরামকে জানিয়েছিলেন যে সেদিন তাঁর বক্তব্য বিষয় ছিল— ব্রাহ্মসমাজ, আর্যসমাজ ও অন্যান্য সংস্কারকরা সবাই ঐক্যবদ্ধ হলে গোঁড়ামি ও

---

১ ১২ ডিসেম্বর ১৯১২। দ্র. *Visva-Bharati News*, March 1967।

২ Chaturvedi & Sykes, *Charles Freer Andrews*, পৃ. ৮৯।

পৌত্তলিকতার প্রভাব থেকে হিন্দুসমাজকে মুক্ত করা সম্ভব। কেননা শান্তি এবং সামঞ্জস্যেই ধর্ম ; বিচ্ছিন্নতায় ধর্ম নেই।

এবার শান্তিনিকেতনে বাসকালে নিজের জীবনের আসন্ন পরিবর্তনের একটি সূচনা তিনি তীব্রভাবে অনুভব করেছিলেন। তাই ২৮ জুলাই তারিখে মুনশিরামকে লিখছেন[১]—

> আমি সর্বত্যাগী সন্ন্যাসী হবার আহ্বান পেয়েছি। এবার ঈশ্বরের হাতে নিজেকে সম্পূর্ণ সমর্পণ করে দিয়ে তিনি আমাকে যেখানে পাঠাবেন সেখানে যাব, যে কাজে নিযুক্ত করবেন তাই সমাপন করব।

সেইদিনই আবার গুরুদেবকে লিখলেন যে, এক দিকে ভারতীয় চিন্তাধারার অনুধাবন আর পাশ্চাত্যে তার প্রচার, আর অন্য দিকে বেতনভোগী প্রচারকের কাজ ছেড়ে প্রাচ্যদেশে স্বাধীনভাবে যীশুর জীবনবেদ প্রকাশ— এ দুটি হবে তাঁর সাধনা। এবিষয়ে দ্বিজেন্দ্রনাথ, রবীন্দ্রনাথ ও মুনশিরাম— এঁরা প্রত্যেকেই পরামর্শ দিলেন— হঠাৎ কিছু না করে ধৈর্যভরে তিনি যেন অন্তর হতে যথার্থ আহ্বান লাভের প্রতীক্ষা করে থাকেন।

সেই প্রতীক্ষাকালে তাঁর হাতে পড়ল অ্যালবার্ট সোয়াইটজারের লেখা গ্রন্থ— 'যীশুখ্রীস্টের ইতিহাসসম্মত পরিচয় সন্ধানে'।[২] বইটি পড়ে যীশুখ্রীস্টের ঐতিহাসিকতা সম্বন্ধে তাঁর এতদিনকার যত দ্বিধাদ্বন্দ্ব এক মুহূর্তে কেটে গেল।

এ সম্বন্ধে তাঁর একটি ক্ষুদ্র জীবনীগ্রন্থে লিখেছেন[৩]—

> সোয়াইটজারের ভক্তিসাধনার বিশেষ প্রভাব পড়ে আমার জীবনে। সোয়াইটজার সর্বস্ব ত্যাগ করেই যীশুকে অনুসরণ করেছেন। খ্রীস্টের নামে সর্বস্ব দান করেছেন পীড়িত ও মুমূর্ষুর সেবায়। আফ্রিকার গ্রীষ্মপ্রধান অংশ ল্যাবেরেনের ম্যালেরিয়া-অধ্যুষিত অঞ্চলে বাস করেছেন দিনের পর দিন। তাঁর নিজ জীবনের উদাহরণই আমার প্রাণকে দরিদ্রের দুঃখনিগ্রহের দিকে ঠেলে দিল। তাঁর জীবনাদর্শ আমাকে নম্রনত দীনহীনের আবাসে নিয়ে গেছে, যারা কাজ করে যারা ভার বয় তাদের সাথে হাত মেলাতে ডাক

---

১ Chaturvedi & Sykes, *Charles Freer Andrews*, পৃ. ৮৯।

২ *The Quest of the Historical Jesus*।

৩ C. F Andrews, *A Pilgrim's Progress*, পৃ. ২৮।

দিয়েছে। এই-সব দীনদুঃখীরাই প্রীতির ডোরে বেঁধে খ্রীস্টের দিকে আমাকে ফিরিয়ে নিয়ে গেছে।

সোয়াইটজারের এই পুস্তকের শেষ অনুচ্ছেদটি এণ্ডরুজ তাঁর জীবনে বারে বারেই উচ্চারণ করেছেন। সেটি হল[১]—

যীশুখ্রীস্ট আজও আসেন নামহীন পরিচয়হীন, সেই যেমন এসেছিলেন হ্রদের তীরের মানুষগুলির কাছে, কিন্তু তারা তাঁকে চিনল না। আমাদেরও তিনি সেই একই কথা বলেন— আমাকে অনুসরণ করো। এ যুগেও তিনি তাঁরই কাজে আমাদের আহ্বান করেন। তাঁর আদেশ ধ্বনিত হয় কালে কালে। যাঁরা তাঁকে মেনে তাঁরই সঙ্গে চলেন— জ্ঞানী বা অজ্ঞান যাই হোন— তাঁদের শ্রমে, তাঁদের সংগ্রামে, তাঁদের দুঃখদহনে তিনিই প্রকাশিত হন। আপনি তাঁরা জানতে পান 'কে তিনি' সেই রহস্য।

খ্রীস্টপ্রেম : মানবপ্রেম : রাজনীতির পথ

এণ্ডরুজের খ্রীস্ট-অনুরাগের শিখা পুনরায় প্রদীপ্ত হয়ে উঠল। নবযাত্রাপথে আহ্বানের আশায় তিনি কান পেতে রইলেন। আহ্বান এল।

বহু বছর ধরে এণ্ডরুজ ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের অন্যান্য অংশে ভারতীয়দের অবস্থা লক্ষ্য করছেন। ১৮৯৬ খ্রীস্টাব্দে গান্ধী যখন ভারতে প্রত্যাবর্তন করেন তখনই দক্ষিণ-আফ্রিকার ভারতীয়দের দুরবস্থা ভারতবাসীরা প্রথম জানল। ১৯০৯ সালে দক্ষিণ-আফ্রিকা থেকে হেনরি পোলক এসে ভারতসরকার ও ভারতীয় জনগণের কাছে দক্ষিণ-আফ্রিকার ভারতীয়দের দুঃখদুর্দশার কথা জানিয়ে নাটালে চুক্তিবদ্ধ শ্রমের যে পদ্ধতি বর্তমান তার অবসাদ ঘটাবার জন্য আবেদন জানালেন। আসলে ১৮৬০ সালে দক্ষিণ-আফ্রিকার ইংরেজ ঔপনিবেশিকদের অনুরোধেই এই চুক্তির পত্তন; ইংরেজেরা সেদিন চুক্তিবদ্ধ

---

১ Christ comes to us as, One Unknown, without a name, just as of old by the lakeside. He came to those men who knew Him not. He speaks to us the same words, 'Follow thou Me, and sets us to those tasks which He has to ulfil for our time. He commands. And to those who obey Him, whether they be wise or simple. He will reveal Himself in the toils, the conflicts, the sufferings, which they shall pass through in His fellowship. And as an ineffable mystery they shall learn in their own experience who He is.

ভারতীয় শ্রমিকদের সমানাধিকারের প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন। কিন্তু পোলকের কাছেই ভারতীয়রা জানতে পারলেন চুক্তিবদ্ধ শ্রমিকদের প্রতি আচরণে ইংরেজ ঔপনিবেশিকরা কত নৃশংস। আরো জানা গেল, ১৯০৭ সালে ভারতীয়দের অহিংস প্রতিরোধ-আন্দোলনে গান্ধীজির নেতৃত্বের কথা। এই আন্দোলনের ফলে নাটালের জন্য নতুন শ্রমিক সংগ্রহে বাধা পড়ল। গোপালকৃষ্ণ গোখলেও এই আন্দোলনে যোগ দেন। এণ্ডরুজ পোলকের সঙ্গে দেখা করে সব ঘটনা বিশদরূপে শুনলেন। দু বছর পরে আবার যখন পোলক ভারতে এলেন এণ্ডরুজ আগ্রহভরে শুনলেন, চুক্তিবদ্ধ শ্রমের অবসান ঘটাবার জন্য গান্ধীজির নেতৃত্বে কী অনমনীয় সংগ্রাম তাঁরা চালিয়ে যাচ্ছেন— তারই আদ্যন্ত কাহিনী।

১৯১৩ সালে সেপ্টেম্বর মাসে মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধী দক্ষিণ-আফ্রিকার ভারতীয়দের নিয়ে অহিংস প্রতিরোধ সংগ্রাম শুরু করেন। সংগ্রামের উদ্দেশ্য দক্ষিণ-আফ্রিকার ভারতীয় শ্রমিক ও অন্যান্য ভারতীয়দের প্রতি দক্ষিণ-আফ্রিকা সরকারের অন্যায় আচরণ ও শোষণ রোধ করা। দক্ষিণ-আফ্রিকা সরকার নানাভাবে ভারতীয়দের উৎপীড়ন করছিল। প্রত্যেক ভারতীয় শ্রমিকের মাথাপিছু তিন পাউণ্ড কর ধার্য করা হয়; আর ভারতীয় ধর্মমতে অনুষ্ঠিত সকল বিবাহই আইনত অসিদ্ধ বলে ঘোষণা করা হয়।

এই-সব অবিচারের প্রতিরোধে যে আন্দোলন গড়ে ওঠে তারই সহযোগিতায় গোখলে ১৯১২ সালে দক্ষিণ-আফ্রিকায় গিয়েছিলেন। ফিরে এসে তিনি ভারতব্যাপী ঝটিকাভ্রমণে ঘুরে বেড়ালেন আন্দোলনকারীদের পক্ষে জনমত সংগঠন ও অর্থসাহায্যের সংগ্রহে। এই সময়েই লাহোরে প্রথম সাক্ষাৎকারে এণ্ডরুজকে তিনি জানালেন— দক্ষিণ-আফ্রিকার কাজের জন্য তাঁকে তাঁদের প্রয়োজন।[১] গোখলে নবেম্বর মাসে যখন দিল্লীতে এলেন এণ্ডরুজ মনেপ্রাণে তাঁর কাজের আহ্বানে সাড়া দিলেন। দিনরাত এরই মধ্যে ডুবে রইলেন তিনি। প্রথমে তাঁর সঞ্চিত সকল অর্থ, সর্বসমেত তিনশত পাউণ্ড, ফাণ্ডে জমা দিতে নিয়ে এলেন। গোখলে কিন্তু এক হাজার টাকার বেশি নিতে অসম্মত হলেন। দিল্লীর লোকে যখন দেখলেন মিশনরীর স্বল্প আয় থেকেও এণ্ডরুজ এত টাকা দিলেন তাঁরাও তখন দানের ব্যাপারে উৎসাহ বোধ

১ M. K. Gandhi, *Satyagraha in South Africa*, পৃ. ৪৮৫।

করলেন। শুধু সেণ্ট ষ্টিফেন্স কলেজ থেকেই আরো ষোলো শো টাকা উঠল। তবু এই ব্যাপারে চাঁদা দেওয়াটাই এণ্ড্রুজের একমাত্র সাহায্য নয়। লর্ড হার্ডিঞ্জ ১৯১৩ সালেরই ২৮ নবেম্বরে তাঁর মাদ্রাজের বক্তৃতায় দক্ষিণ-আফ্রিকার ভারতীয়দের প্রতি যে গভীর সহানুভূতি জানালেন, তাতে এণ্ড্রুজের হাত ছিল অবশ্যই। কিন্তু গোখলে এণ্ড্রুজকে যখন বললেন, আরো ইউরোপীয়ের সমর্থন এ কাজে প্রয়োজন, সঙ্গে সঙ্গে সেইদিনই এণ্ড্রুজ চলে এলেন হাজার মাইল পথ অতিক্রম করে কলকাতায়। সেখানে তাঁর পরিচিত বন্ধু বিশপ লেফ্রয় তখন ভারতের মেট্রোপলিটন। লেফ্রয় চাঁদা তো দিলেনই তা ছাড়া এ আবেদনে সাড়া জাগাবার জন্য তিনি পত্রপত্রিকায় চিঠি ছাপালেন। এতে দক্ষিণ-আফ্রিকার নির্যাতিত ভারতীয়দের প্রতি ইংলণ্ডের ও ভারতের খ্রীস্টান-সমাজ গভীর সমবেদনায় ব্যথিত হয়ে রইল।

এণ্ড্রুজ ভাবলেন, তিনি নিজে ইংরেজ, প্রায়শ্চিত্ত হিসাবে এ কাজের সাহায্যে দক্ষিণ-আফ্রিকায় তাঁরই যাওয়া উচিত। অথচ দিল্লীতে গোখলের সঙ্গে দেখা হবার মাত্র কয়েকদিন আগে ইংলণ্ডে যাবার জন্য টিকেট সংরক্ষণ করে এসেছিলেন। বৃদ্ধা মাকে লিখে জানিয়েছেন ১৯১৪ সালের মার্চের মাঝামাঝি তাঁর সঙ্গে দেখা হবে। চিন্তা করে দেখলেন এখনই যদি দক্ষিণ-আফ্রিকায় যান তবে কেপটাউন থেকে ঠিক সেই সময়মত ইংলণ্ডে পৌছতে পারবেন। গোখলেকে তার করে এণ্ড্রুজ দক্ষিণ-আফ্রিকা যাবার আগ্রহ প্রকাশ করলেন। তার পরে তিনি চলে এলেন শান্তিনিকেতনে।'

রবীন্দ্র-সংগমে : ভারতে

কবির নোবেল প্রাইজ পাবার সংবাদে ১৯১৩ সালের ২৩ নবেম্বরে কলকাতা থেকে নানা প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধিরা তাঁকে সম্বর্ধনা জানাতে শান্তিনিকেতনে এলেন। আম্রকুঞ্জে তাঁদের অভ্যর্থনা-সভার আয়োজন হল। সেদিন সে সভায় এণ্ড্রুজও উপস্থিত ছিলেন। প্রতিনিধিদের ভাষণের উত্তরে কবির প্রত্যভি-ভাষণের ভাষা তাঁর অধিগম্য না হলেও কবির আসল বক্তব্যটি এণ্ড্রুজ ঠিকই বুঝে নিয়েছিলেন।

কবি সেদিন বলেছিলেন, 'সমস্ত দেশের প্রতিনিধিরূপে আপনারা আমাকে সম্মান-উপহার দিতে প্রবৃত্ত হয়েছেন, সে সম্মান কেমন করে আমি অসংকোচে

গ্রহণ করব ?··· যা সত্য তা কঠিন হলেও আমি মাথায় করে নেব, কিন্তু যা সাময়িক উত্তেজনার মায়া, তা আমি স্বীকার করে নিতে অক্ষম।'

ভিড়ের প্রান্ত থেকে এণ্ডরুজ লক্ষ্য করলেন কবির দীর্ঘ দেহচ্ছন্দের দৃপ্তভঙ্গী, তাঁর তেজোদীপ্ত মুখাবয়ব ও স্পর্শসচেতন চিত্ত। কবির প্রতি নতুন এক শ্রদ্ধায় তিনি অভিভূত হলেন। লণ্ডনে যে রুগ্ণ দুর্বলস্বাস্থ্য কবিকে দেখেছিলেন, এ তো তিনি নন। ইনি তো রাজমহিমামণ্ডিত।

সভা শেষ হতে কবি জনতার সম্মুখ থেকে বিদায় নিলেন। এণ্ডরুজ শান্তিনিকেতন বাড়ির সামনে গিয়ে তাঁকে দেখতে পেলেন একাকী দাঁড়িয়ে আছেন। এণ্ডরুজ ভক্তিনম্রচিত্তে তাঁর পাদস্পর্শ করতেই কবি দু হাত বাড়িয়ে তাঁকে বুকে জড়িয়ে ধরলেন। এণ্ডরুজ বুঝলেন, এবার তাঁর কাজের আহ্বান যথার্থই এসেছে।

২৩ নবেম্বর একটি দিন মাত্র শান্তিনিকেতনে থেকে পরদিন ভোরে আশ্রম ত্যাগের সময় কবিকে একখানি পত্র লিখে আবার অনুরোধ জানালেন আশ্রম-বিদ্যালয়ে সেবার অধিকার যেন তাঁকে দেওয়া হয়। সঙ্গে এ কথাও লিখলেন, গোখলের সম্মতি পেলে শীঘ্রই একবার তিনি দক্ষিণ-আফ্রিকায় যাবেন।

দিল্লী ফিরে গিয়ে গোখলের সঙ্গে দেখা হলে তিনি তাঁকে আলিঙ্গন করে বললেন, 'তোমার টেলিগ্রাম ঈশ্বরের আশীর্বাদের মতোই এল। দক্ষিণ-আফ্রিকার অবস্থা, এখন অতি সংকটজনক। কোন্ দিন যাবে স্থির করেছ ?' এণ্ডরুজ উত্তর দিলেন, 'আজ রাতেই যেতে পারি।'

এণ্ডরুজ : পিয়রসন

স্থির হল, সে রাতের গাড়িতেই দিল্লী ছাড়বেন এণ্ডরুজ; মেটল্যাণ্ড হাউসের অধিবাসীরা এণ্ডরুজের যাবার প্রস্তুতিতে তৎক্ষণাৎ নিযুক্ত হলেন। অধ্যাপকরা কলেজের কার্যভার নিজেদের মধ্যে ভাগ করে নিলেন। প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র বাক্সে গুছিয়ে দিতে বসলেন কয়েকজন— কেউ বা দিলেন কয়েকটি শার্ট, কেউ দিলেন কয়েকখানি রুমাল, দু-এক জোড়া মোজা। কিন্তু সুশীল রুদ্র জানেন এখন তাঁর সবচেয়ে প্রয়োজন একজন সমব্যথী সাথীর। লালা সুলতান সিং আর তাঁর পুত্রের গৃহশিক্ষক পিয়রসনের সঙ্গে এ বিষয়ে সুশীল রুদ্র পরামর্শ করলেন। কিছুক্ষণ পরে এণ্ডরুজ যেখানে বসে বাক্স গোছাচ্ছেন সেখানে এসে দাঁড়ালেন বন্ধু পিয়রসন। বললেন, 'দক্ষিণ-আফ্রিকায় তোমার সঙ্গে নিয়ে

যাবার জন্য একটি উপহার নিয়ে এলাম।' এণ্ডরুজ চোখ তুলে তাকাতেই হো হো করে হেসে বললেন, 'এই যে আমি, আমাকেই নিয়ে চলো-না।'

এণ্ডরুজের বন্ধু উইলিয়াম উইনস্ট্যানলি পিয়রসন ১৮৮১ সালের ৭ মে তারিখে জন্মগ্রহণ করেন।[১] মাঞ্চেস্টারের ডঃ স্যামুয়েল পিয়রসনের পুত্র তিনি, তাঁর মা ছিলেন কোয়েকার সম্প্রদায়ের। কেম্‌ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ে বিজ্ঞান ও অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে দর্শন অধ্যয়ন করে তিনি লণ্ডন মিশন সোসাইটিতে যোগ দেন এবং মিশনের কলকাতা শাখার একটি বিদ্যালয়ে উদ্ভিদবিদ্যার অধ্যাপনার কাজে নিযুক্ত হন। এ সময় থেকেই বাংলাদেশ ও বাংলা ভাষার প্রতি তাঁর শ্রদ্ধা জাগ্রত হয়। মিশন-কর্তৃপক্ষের সঙ্গে মতবিরোধ ও স্বাস্থ্যভঙ্গের কারণে তিনি ইংলণ্ডে ফিরে যান।

সেখানে ১৯১২ সালে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে সাক্ষাৎ হতে কবির ব্যক্তিত্বে তিনিও মুগ্ধ হন। এণ্ডরুজ ভাবলেন শীতকালে দিল্লীতে থাকলে পিয়রসনের স্বাস্থ্যের উপকার হবে। তাই তাঁর মধ্যস্থতায় দিল্লীর বিখ্যাত ধনী লালা সুলতান সিং-এর পুত্রের গৃহশিক্ষকের কার্যভার পিয়রসন গ্রহণ করলেন। এণ্ডরুজ ও পিয়রসন দুজনেই শান্তিনিকেতনের আশ্রমবিদ্যালয়ে যোগ দেবার ইচ্ছা কবির কাছে প্রকাশ করেন। তিনি দেশে ফেরার আগেই ১৯১২ সালের শেষভাগে পিয়রসন আশ্রম পরিভ্রমণে আসেন।

দক্ষিণ-আফ্রিকা যাত্রার পূর্বে কবির আশীর্বাণী নেবার জন্য এণ্ডরুজ পিয়রসন দুজনই এবার একসঙ্গে শান্তিনিকেতনে এলেন। সেবার যে কদিন তাঁরা আশ্রমে ছিলেন, দুজনেই ধুতিচাদর পরতেন। যাত্রার পূর্বে মঙ্গলবার সন্ধ্যায় তাঁদের জন্য মন্দিরে বিশেষ উপাসনা হয়। রবীন্দ্রনাথ তাতে আচার্যের আসন গ্রহণ করেন।[২]

রাত্রে তাঁদের বিদায় উপলক্ষে আশ্রমবাসী ছাত্র অধ্যাপক মিলিত হলেন। স্রকচন্দনে তাঁদের ভূষিত করে কিছু বলতে অনুরোধ করা হলে পিয়রসন বাংলায় বলেন[৩]— 'আমি এবং আমার বন্ধুর পক্ষ হইতে একটিমাত্র কথা তোমাদিগকে বলিতেছি যে এই শান্তিনিকেতন আশ্রম হইতে যে শান্তি

---

১ উইলিয়ম পিয়রসন, শান্তিনিকেতন-স্মৃতি, অনুবাদক শ্রীঅমিয়কুমার সেন, পৃ. ৩৯-৪০।

২ তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা, ১৮৩৫ শক, পৃ. ১৯১।

৩ তদেব।

সঙ্গে করিয়া লইয়া যাইতেছি, তাহা দক্ষিণ-আফ্রিকার কার্যে আমাদিগকে সাহায্য করিবে।'

দক্ষিণ-আফ্রিকার পথে উইলি আর চার্লি : কবির আশীর্বাদ

১৯১৩ সালের ৩০ নবেম্বর বুধবারে তাঁরা শান্তিনিকেতন ত্যাগ করেন। দক্ষিণ-আফ্রিকা যাত্রার পূর্বে শান্তিনিকেতন থেকে কলকাতা এসে জোড়াসাঁকো বাড়িতে তাঁরা আবার কবির সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। যাত্রার আগের দিন রাতে মহর্ষির ঘরে নিয়ে গিয়ে বসিয়ে কবি তাঁদের উপনিষদের দুটি মন্ত্র লিখে দিয়ে মর্মার্থ বুঝিয়ে দেন।

প্রথমটি হল—

ওঁ সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম আনন্দরূপমমৃতং যদ্বিভাতি। শান্তং শিবমদ্বৈতম্।

তিনি সত্যস্বরূপ, জ্ঞানস্বরূপ, অনন্তস্বরূপ পরব্রহ্ম; তিনি আনন্দরূপে অমৃতরূপে প্রকাশ পাচ্ছেন। তিনি শান্ত, মঙ্গল, অদ্বিতীয়।

দ্বিতীয়টি— অসতো মা সদ্গময় তমসো মা জ্যোতির্গময় মৃত্যোর্মামৃতং গময়। আবিরাবির্ম এধি। রুদ্র যত্তে দক্ষিণং মুখং তেন মাং পাহি নিত্যম্।

অসত্য থেকে আমাকে সত্যে নিয়ে যাও, অন্ধকার থেকে আলোতে নিয়ে যাও, মৃত্যু থেকে অমৃতে নিয়ে যাও। হে প্রকাশ, আমার মধ্যে তোমার প্রকাশ সম্পূর্ণ হোক। রুদ্র, তোমার প্রসন্ন মুখের দ্বারা আমাকে নিয়ত রক্ষা করো।

এ দুটি ছিল মহর্ষি ও কবিগুরুর নিত্য ধ্যানের মন্ত্র। মন্ত্র দুটি বিদেশী ভারতভক্ত বন্ধু এণ্ড্রুজ ও পিয়রসনের শুভযাত্রাপথের পাথেয় হয়ে রইল।

দক্ষিণ-আফ্রিকায় গিয়েও এঁরা দুজনে কবির আশীর্বাণী লাভ করেছেন। দক্ষিণ-আফ্রিকায় প্রবাসী ভারতীয়দের সংগ্রামে নিযুক্ত বন্ধুদের কবি তাঁর অন্তরের অনুরাগ ও শুভেচ্ছা জানিয়ে পত্র দিতেন।

১৯১৪ সালের ১ জানুয়ারি জাহাজ এসে ডারবানে ভিড়ল। সেদিন সকালে জাহাজে বসেই কবিকে এণ্ড্রুজ লিখলেন, নববর্ষের দিনে তাঁর জীবন একটি নতুন অধ্যায়ের সূচনা তিনি অনুভব করছেন। সে জীবন হবে একটি পথিকের, এক তীর্থযাত্রীর জীবন। জীবনের পুরোনো নোঙর পিছনে ফেলে এই এতদিনে যেন বিপুল সমুদ্রে পাড়ি জমালেন। তার মধ্যে তিনি একটি মুক্তির স্বাদ পাচ্ছেন।

দক্ষিণ-আফ্রিকায় গণ-আন্দোলন পরিচালনার অপরাধে গান্ধী, কালেনবাক ও পোলক কারারুদ্ধ ছিলেন। তাঁরা যে মাত্র বারো দিন পূর্বে কারামুক্ত হয়েছেন এ খবর এণ্ডরুজ ও পিয়রসনের জানা ছিল না। পোলক ছিলেন এণ্ডরুজের পূর্বপরিচিত। তাঁকে জাহাজঘাটে প্রতীক্ষারত দেখতে পেয়ে এণ্ডরুজ এগিয়ে গিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, মিঃ গান্ধী কোথায়? পোলক তাঁর পাশে মোটা ধুতি ও কুর্তা -পরা কৃশতনু তপস্বীমূর্তির দিকে তাকাতেই এণ্ডরুজ নিচু হয়ে গান্ধীর পা-দুখানি স্পর্শ করলেন। তাঁর শ্রদ্ধা জানাবার এই ভঙ্গিটিতে শ্বেতাঙ্গ পত্রিকায় বিক্ষোভ প্রদর্শন শুরু হল। ১৯১৪ সালের ৬ জানুয়ারি তারিখে গুরুদেবকে লেখা চিঠিতে দেখি জনৈক পত্রিকা-সম্পাদক সম্বন্ধে এণ্ডরুজ লিখছেন[১]—

> এখনো তাঁকে যেন চোখের সামনে দেখতে পাচ্ছি। আতঙ্কে হাত-দুখানি তুলে বলছেন, 'সত্যি বলছি মিঃ এণ্ডরুজ, আমরা নাটালে কখনো এ ধরনের কাজ করি না, বিশ্বাস করুন আপনি। এ আপনার খুবই অন্যায় হয়েছে।' হেড-মাস্টারের আপিসে গিয়ে বেত্রাঘাতের অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে-থাকা ছেলের যেমন অবস্থা হয়, আমার অবস্থাও তখন ঠিক তেমনি।
>
> …একজন ইংরেজ হয়ে আমি এশিয়াবাসীর পা ছুঁয়েছি, এতে তাঁদের ক্ষোভের অন্ত ছিল না। তাঁদের আমি মনে করিয়ে দিলাম, যীশুখ্রীস্ট, সন্ত পল ও সন্ত জন— এঁরা সবাই তো ছিলেন এশিয়াবাসী।

ডারবানে পৌঁছবার পর এণ্ডরুজ ও পিয়রসনকে সেখানকার ধর্মযাজক তাঁর বাড়িতে নিয়ে গেলেন। তিনি তাঁদের কাছে অপরিচিত কিন্তু তাঁর টেবিলের উপর ইংরেজি 'গীতাঞ্জলি' দেখামাত্রই পরিচয় হয়ে গেল। নাটালের শ্বেতকায় সমাজের দ্বার তিনিই এণ্ডরুজের সামনে মুক্ত করে দিলেন। এণ্ডরুজ ও পিয়রসন দুজনে প্রথম থেকেই নিজেদের কাজ ভাগ করে নিলেন। নাটালের আখের খেত-খামারে ভারতীয় শ্রমিকদের অবস্থা তদন্ত করতে শুরু করলেন পিয়রসন। এণ্ডরুজ যোগ দিলেন গান্ধীজির রাজনৈতিক আন্দোলনে। সে আন্দোলনের কাহিনী দ্রুত দৃশ্যপট পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে ক্রমে চরম সন্ধিক্ষণে উপনীত হয়ে ইতিহাসকেও উপন্যাসের মতো রোমাঞ্চকর করে তুলেছিল।

---

১ Chaturvedi & Sykes, *Charles Freer Andrews*, পৃ. ৯৮।

এই সময়ে কয়েকটি অতি ব্যাপক নীতিগত প্রশ্নের সমাধান প্রয়োজন হয়ে পড়ল। ডিসেম্বর মাসে জেনারেল স্মাট্স্ ভারতীয়দের প্রতি উৎপীড়নের বিষয়ে তদন্ত করার জন্য একটি কমিশন নিযুক্ত করলেন। গান্ধীজি ও তাঁর সহকর্মীদের কারামুক্ত করা হল যাতে তাঁরা সেই কমিশনের সামনে সাক্ষ্য দিতে পারেন। এর আগের ছয় মাসের মধ্যে র‍্যাণ্ড খনিকর্মচারী ও রেলের শ্রমিকদের দাবির বিষয়ে তদন্ত করার জন্যও অনুরূপ আরো দুটি তদন্ত কমিশন বসে। সে-সব ইউরোপীয় রেলকর্মচারী ও খনিকর্মচারীদের মধ্যে অনেকে হিংসাত্মক কর্ম করা সত্ত্বেও তারা নিজেদের প্রতিনিধি-নির্বাচনের অধিকার পেল। এ দিকে ভারতীয়দের সংগ্রাম ছিল শেষ পর্যন্ত অহিংস অথচ তাঁরা সেই সুযোগ থেকে বঞ্চিত হলেন। সেই কারণে গান্ধীজি জেনারেল স্মাট্স্‌কে জানিয়ে দিলেন যে এই তদন্ত কমিশনের সামনে সাক্ষ্য দিতে ভারতীয়দের আত্মসম্মানে বাধে। এতে তিনি স্বীকৃত হতে পারেন না।

কিন্তু কমিশনে সাক্ষ্য না দেওয়া গান্ধীজির পক্ষে সুবিবেচনার কাজ নয়। কারণ আলাপ-আলোচনায় এর নিষ্পত্তি না হলে অহিংস প্রতিরোধ সংগ্রাম আবার শুরু করতে হত। এ দিকে নাটালের ইউরোপীয়রা এণ্ডরুজকে খোলাখুলি জানিয়ে দিয়েছিলেন যে এবার সত্যাগ্রহ আন্দোলন শুরু হলে নিশ্চয় গোলাগুলি চলবে। গোখলে খবর পাঠালেন গান্ধীজি যেন বিষয়টি পুনর্বিবেচনা করেন; অন্যথায় ভাইসরয় ও ভারতস্থ অন্যান্য ইংরেজ সমর্থকদের বিষম অসুবিধায় ফেলা হবে।

ভারতীয় নেতারা এ বিষয়ে আলোচনার জন্য যখন মিলিত হলেন এণ্ডরুজও তাঁদের সঙ্গে ছিলেন। কয়েক মিনিট কথাবার্তার পরে এণ্ডরুজ গান্ধীজিকে বললেন, 'এখানে ভারতীয়দের সম্মানের কথাটাই বড়ো, তাই না?' গান্ধীজি উত্তর দিলেন, 'আপনি ঠিকই ধরেছেন, সেটিই আসল প্রশ্ন।' এণ্ডরুজ বললেন, 'তা হলে আপনি উচিত কাজই করেছেন। আত্মসম্মান কিছুতেই বিসর্জন দেওয়া চলে না।' এই মর্মগ্রাহিতার সূত্রে সেই শুভ মুহূর্তে দুজনের বন্ধুত্বের সংযোগ ঘটল। দু-চারদিনের মধ্যেই পরস্পরের মধ্যে শুরু হল 'মোহন' ও 'চার্লি' সম্বোধন।

গোখলেকে একটি লম্বা তার পাঠানো হল সব অবস্থার বিবরণ দিয়ে। লর্ড হার্ডিঞ্জ আর তিনি এ বিষয়ে গান্ধীজির মত গ্রহণ ও সমর্থন করলেন। জেনারেল স্মাট্স্ যদি এবার একটা মীমাংসায় রাজি হন তবেই হয়। গান্ধীজির

সঙ্গে এণ্ডরুজ ফিনিক্স আশ্রমে গিয়ে জেনারেল স্মাট্‌সের উত্তরের প্রতীক্ষা করতে লাগলেন। আশ্রমে একটি চুক্তিবদ্ধ শ্রমিকের দুর্দশা তিনি নিজ চোখে দেখতে পেলেন। আখের আবাদক্ষেত্র থেকে একটি তামিল কুলি পালিয়ে এসে ফিনিক্স আশ্রমে আশ্রয় নিয়েছিল। তার শীর্ণ দেহে বেত্রাঘাতের চিহ্ন। এই নির্যাতিত কুলির প্রতি গান্ধীজির স্নেহব্যবহার দেখে এণ্ডরুজের চক্ষু অশ্রুপ্লাবিত হল। এখানে এবার তাঁদের বেশিদিন থাকা হল না। কেননা এর মধ্যে জেনারেল স্মাট্‌সের তার এল যে প্রিটোরিয়ায় তিনি গান্ধীজির সঙ্গে দেখা করতে চান।

দক্ষিণ-আফ্রিকায় চারি দিকে তখন ঘোর বিশৃঙ্খলা। ডারবানের স্টেশন-মাস্টার তাঁদের পরামর্শ দিলেন কাফের[১] মেলের জন্য অপেক্ষা না করে তাঁরা যেন ইউরোপীয় মেলে চলে যান। কেননা রেলকর্মচারীদের ধর্মঘট শুরু হবার কথা রাত বারোটায়। তাঁর কথামত গান্ধীজি ও এণ্ডরুজ ট্রেনে চাপলেন। তখনই যাত্রা না করলে বিপদ হত; কেননা তার পরে পনেরো দিনের মধ্যে প্রিটোরিয়ায় আর ট্রেন চলাচল করে নি।

প্রিটোরিয়ায় পৌঁছবামাত্র প্রিটোরিয়া নিউজের সম্পাদক গান্ধীজিকে এসে জিজ্ঞাসা করলেন, 'দক্ষিণ-আফ্রিকার এই রেলধর্মঘটে প্রবাসী ভারতীয়রাও কি যোগ দেবে?' গান্ধীজি উত্তর দিলেন, 'কিছুতেই না। আমরা ন্যায়যুদ্ধে নেমেছি। যতদিন ধর্মঘট চলবে ততদিন আমরা সত্যাগ্রহ আন্দোলন শুরু করব না।' সম্পাদক বললেন, 'এ খবর তবে আমি পত্রিকায় ছেপে দিচ্ছি।' গান্ধীজি বললেন, 'না না, তার কিছু দরকার নেই।' সম্পাদক আবার বললেন, 'দশ-বারো ঘণ্টার মধ্যেই কিন্তু সামরিক আইন জারি হবে।' সম্পাদকের অফিসের সামনে পায়চারি করতে করতে এণ্ডরুজ বার বার গান্ধীজিকে বোঝাতে লাগলেন, সামরিক আইন জারি হবার পর যদি ঘোষণা করা হয় যে প্রবাসী ভারতীয়রা ধর্মঘটে যোগ দেবে না, তবে ভারতীয় ন্যায়বুদ্ধির উদারতা ইউরোপীয় শাসকগোষ্ঠীর চোখে প্রতিভাত হবে না। তারা মনে করবে এরা ভয়ে পিছিয়ে গেল। তাতে আমরা সাধারণের শুভেচ্ছাও হারাব।

গান্ধীজি শেষ পর্যন্ত এণ্ডরুজের মতে মত দিলেন। প্রিটোরিয়া নিউজে সে খবর সারা পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড়ল।

---

১ কৃষ্ণকায় জাতি।

দিনের পর দিন গান্ধীজি ও এণ্ডরুজ প্রিটোরিয়ার গভর্নমেণ্ট হাউসে জেনারেল স্মাট্সের সঙ্গে আলোচনার জন্য প্রতীক্ষা করতে লাগলেন। স্মাট্সের কিন্তু আর মুহূর্তের অবসর নেই। ধর্মঘটে তখন চতুর্দিক বিপর্যস্ত। এক-একদিন তিনি এসে গান্ধীজিকে বলতেন, 'তোমাকে সময় দিতে পারছি না বলে খুব খারাপ লাগছে, কিন্তু কী করব?' গান্ধীজি সর্বদা এই উত্তরই দিতেন, 'আমি বুঝতে পারছি, আপনি এখন খুবই ব্যস্ত।' সম্ভবত গান্ধীজির এই ধৈর্য ও সৌজন্যের ফলেই পরে তাঁদের পরস্পরের মধ্যে চুক্তি হতে পেরেছিল এত সহজে।

দীনের সেবায় দীনবন্ধু

গ্ল্যাডস্টোন পরিবারের সঙ্গে এণ্ডরুজের পরিচয় কেম্ব্রিজে। তখন লর্ড গ্ল্যাডস্টোন দক্ষিণ-আফ্রিকার গভর্নর জেনারেল। তাঁর বোন মিসেস ড্রু সেই সময় প্রিটোরিয়ায় রয়েছেন। সেখানকার সরকার-পক্ষের নেতাদের সঙ্গে এণ্ডরুজের যোগাযোগ ঘটল মিসেস ড্রুর সাহায্যে। ভারতীয়দের সম্পর্কে তাঁদের অনমনীয় মনোভাব এণ্ডরুজ ক্রমশ অনেকটা সহজ করে আনলেন। তাঁদের উপকরণবহুল আড়ম্বরপূর্ণ গৃহ থেকে প্রতি সন্ধ্যায় এণ্ডরুজ ফিরে যেতেন তাঁর স্বনির্বাচিত আবাসে শহরের বাইরে দুর্গত ভারতীয় বস্তিতে।

মডার্ন রিভিয়ু পত্রিকায় পরে লিখেছেন[১]—

সেখানে প্রিটোরিয়ার ধোবাদের সঙ্গে আমার ঘনিষ্ঠ বন্ধুত্ব হয়েছিল।··· আমাকে একটি 'খানা' দিতে পারলে তারা আর কিছুই চাইত না।·· আমার পরবার জামাকাপড়, জুতো, চটি সবই আমায় ওরা জোগাড় করে দিত। প্রতিদিন আমার জামাকাপড় কেচে ইস্ত্রি করে দিতে ওদের কত যে আগ্রহ দেখতাম। আমিও তাই আর তাদের বাধা দিতে পারতাম না। মনে হত রূপকথার জাদু আংটি বুঝি এবার আমার হাতে। কেবল মুখ ফুটে একটি জিনিস চাইবার অপেক্ষা, তৎক্ষণাৎ সে জিনিস এসে যেত।

এক রবিবার চারশো সাতাত্তর টাকা এনে ওরা বলল,[২] সত্যাগ্রহী

---

১ "A Tirtha in South Africa", *The Modern Review*, August 1914, পৃ. ১৫৯।

২ এক ভারতীয় হৃদয় [বনারসীদাস চতুর্বেদী], ভারতভক্ত এণ্ডরুজ, পৃ. ১৬১।

ভাইদের সাহায্যের জন্য এই টাকা নিয়ে যান। কখনো সোনারুপার জিনিস, কখনো হাতের ঘড়িও দিয়ে যেত। তখন ওদের মুখে কী যে উৎফুল্ল ভাব দেখেছি। জেনারেল স্মাট্‌সের সঙ্গে চুক্তি শেষ হলে যখন প্রিটোরিয়া ছেড়ে চলে যাচ্ছি, একশো পঁয়তাল্লিশ টাকা চাঁদা তুলে নিয়ে ওরা স্টেশনে এসেছে। আমি তখন অত্যন্ত ক্লান্ত, গায়েও আমার খুব জ্বর। কিন্তু দয়ার্দ্রহৃদয় ধোবাদের দেখে আমি ক্লান্তি ভুলে গেলাম। জ্বরের কথা মনেও এল না। এখনো রেলযাত্রাকালে বা সমুদ্রধারে দাঁড়িয়ে দূরদিগন্তে চোখ মেললে আমার মনে পড়ে প্রিটোরিয়ার ধোবাভাইদের কথা।

অনেকদিন প্রতীক্ষার পরে জেনারেল স্মাট্‌সের সঙ্গে গান্ধীজির কিছু কিছু আলাপ-আলোচনা শুরু হল। সেই সময় তার এল, গান্ধীপত্নী কস্তুরবা অত্যন্ত অসুস্থ। উনি চিন্তিত হয়ে পড়লেন। আবার পোলকের তার এল যে কস্তুরবা অন্তিম শয়নে, স্বামীকে দেখতে চান। গান্ধীজি বললেন, এখন তো আমার যাবার অবসর নেই। এণ্ডরুজ টেলিগ্রামটি পড়ে গান্ধীজির অলক্ষ্যে জেনারেল স্মাট্‌স্‌কে খবরটি শুনিয়ে এলেন।

জেনারেল স্মাট্‌স্‌ তখন অন্য কাজ ফেলে রেখে গান্ধীজির সঙ্গে আলাপ-আলোচনা শুরু করলেন। অন্য সব বিষয়ে দুজনে একমত হলেন কিন্তু চুক্তি-পত্রের একটি বাক্যে গান্ধীজি কিছুতেই সম্মত হতে পারলেন না। এণ্ডরুজ বুঝতে পারেন না সে বাক্যে আপত্তির কারণ কী থাকতে পারে। সেদিন রাত একটায় দুজনে যখন শুতে যাবেন এণ্ডরুজ গান্ধীজিকে বললেন, 'জেনারেল স্মাট্‌সের বাক্যটির স্থানে আমি যদি অন্য একটি বাক্য বসাই আপনার আপত্তি হবে কি?' গান্ধীজি বাক্যটি শুনে বললেন, 'না, জেনারেল স্মাট্‌স্‌ যদি তাঁর বাক্যের পরিবর্তে এটি রাখতে সম্মত হন তবে সব গোলমাল মিটে যায়।' শুনে এণ্ডরুজ শুতে গেলেন।[১]

খুব ভোরে কাউকে না জানিয়ে এণ্ডরুজ আবার জেনারেল স্মাট্‌সের সঙ্গে দেখা করতে গেলেন। বেলা আটটায় তাঁকে একা পেয়ে বললেন, 'গান্ধীজির স্ত্রী মরণাপন্ন, তাই শীঘ্রই একটা মীমাংসা হওয়া দরকার।' জেনারেল বললেন, 'আমিও তো তাই চাই।' তখন এণ্ডরুজ চুক্তিপত্রটি তাঁকে পড়ে শুনিয়ে

১ Chaturvedi & Sykes, *Charles Freer Andrews*, পৃ. ৯৬-৯৭।

বললেন, 'আপনার এই বাক্যটি যদি কিছুটা পরিবর্তিত আকারে দেওয়া হয় আপনার তাতে অমত নেই তো?' এণ্ডরুজের বাক্যটি তিনবার পড়ে দেখে স্মাট্‌স্ কিছুক্ষণ ভাবলেন। পরে বললেন, 'কই এ দুটি বাক্যে তফাত কিছু তো চোখে পড়ছে না।' এণ্ডরুজ বললেন, 'তবে দয়া করে আগের বাক্যটি কেটে এটি লিখে দিন; আর তার নীচে আপনার সইটি।'

কাগজের টুকরোটি নিয়ে গান্ধীজির কাছে এলে তিনি দেখে আনন্দিত হলেন এই ভেবে যে তবে আর সত্যাগ্রহ আন্দোলনের প্রয়োজন হবে না। তিনি সেই কাগজে সম্মতিসূচক স্বাক্ষর দিলে এণ্ডরুজ সেটি জেনারেলের হাতে দিয়ে এলেন। এই বিজয়ের মুহূর্তেও গান্ধীজিকে আশ্চর্য শান্ত ও সংযত দেখে এণ্ডরুজ বিস্মিত হলেন। এগারোটার গাড়িতে তাঁরা প্রিটোরিয়া ছাড়বেন। গাড়ি ছাড়বার একটু আগে তার এল, গান্ধীপত্নী পূর্বাপেক্ষা সুস্থ হয়েছেন।

এণ্ডরুজ ম্যালেরিয়ায় ভুগে উঠেছেন মাসকয়েক আগে। ট্রেনে উঠেই আবার জ্বরে পড়লেন। গান্ধীজি বললেন, 'একটি তীর্থক্ষেত্রে যাব, চলো তুমিও আমার সঙ্গে যাবে।'[১] এণ্ডরুজ জানতে চাইলেন, জায়গাটি কোথায়? গান্ধীজি বললেন, 'জোহান্সবার্গে মিসেস ডোক থাকেন, তাঁর কাছে।' জোহান্সবার্গে গিয়ে যখন তাঁরা পৌছলেন, তখন খুব ঠাণ্ডা পড়েছে, এণ্ডরুজ জ্বরে কাঁপছেন। সারা সকাল কাটল সাংবাদিকদের সঙ্গে কথাবার্তায়। জোহান্সবার্গের প্রবাসী ভারতীয়রা জেনারেল স্মাট্‌সের সঙ্গে গান্ধীজির চুক্তির কথা শুনে খুশি হলেন। সন্ধ্যায় গান্ধীজি ও এণ্ডরুজ মিসেস ডোকের বাড়ি পৌছলেন। একবার এক পাঠান দক্ষিণ-আফ্রিকায় গান্ধীজিকে লাঠির ঘায়ে অর্ধমৃত করে রাস্তায় ফেলে পালিয়েছিল। মিঃ ডোক ছিলেন গান্ধীজির বন্ধু, এই খবর পেয়ে তিনি ছুটে গেলেন। গান্ধীজিকে কোলে করে গাড়িতে তুলে নিজের বাড়ি নিয়ে এলেন। সেখানে স্বামী-স্ত্রীতে মিলে দিনরাত শুশ্রূষা করে তাঁকে সুস্থ করে তুললেন। গান্ধীজি এণ্ডরুজকে বললেন, 'যতবার জ্ঞান ফিরেছে, চোখ মেলেই মিসেস ডোকের মাতৃমূর্তি দেখতে পেয়েছি।'

এ ঘটনার কয়েক বছর পরে মিঃ ডোক রোডেশিয়ার পশ্চিম অরণ্যখণ্ডে অরণ্যবাসীদের মধ্যে খ্রীস্টধর্ম প্রচার করতে বেরিয়েছিলেন। সেখানকার

---

১ "A Tirtha in South Africa", *The Modern Review*, August 1914, পৃ. ১৫৯।

জলবায়ু সহ্য না হওয়ায় অনেকবার জ্বরে ভুগে অবশেষে ফিরে আসছিলেন। পথেই তাঁর মৃত্যু হয়। তারযোগে স্বামীর মৃত্যুসংবাদ এল মিসেস ডোকের কাছে। দুটি ছোটো ছোটো ছেলেমেয়ে নিয়ে তিনি অনাথ হয়ে পড়লেন।

এণ্ডরুজ লিখছেন[১]—

গান্ধীজি ভারতীয় রীতিতে মিসেস ডোককে নমস্কার করলেন। দেখলাম মায়ের চোখ জলে ভরে এল। গান্ধীজিকে তিনি বললেন, তোমার শরীর দেখছি খুব রোগা হয়ে গেছে, শরীরের যত্ন নিয়ো। গান্ধীপত্নীর অসুখের কথা শুনে ভারি চিন্তিত হয়ে পড়লেন। কিন্তু লক্ষ্য করলাম নিজের দুঃখ-কষ্টের কথা তিনি কিছুই বললেন না।

তখন সামরিক আইন জারি ছিল বলে তাড়াতাড়ি তাঁদের সেখান থেকে বেরিয়ে পড়তে হল। কিন্তু এই পবিত্র তীর্থযাত্রায় মাতৃসন্দর্শনের পুণ্যসঞ্চয়ে এণ্ডরুজের মনও ভরে রইল।

মাতৃহীনের মাতৃলাভ : এণ্ডরুজ-ভাবনায় ভারতীয় নারীত্ব

জোহান্সবার্গ থেকে তাঁরা ডারবানের দিকে যাত্রা করলেন। তখনো এণ্ডরুজের গায়ে জ্বর। ডারবান স্টেশনে পিয়রসন তাঁকে বাড়ির চিঠি দিলেন। তাতে লেখা— খ্রীস্টোৎসবের উপাসনায় যোগ দিতে গিয়ে হঠাৎ ঠাণ্ডা লেগে মা অত্যন্ত অসুস্থ হয়েছেন, এখন দিন দিন অবস্থা খারাপের দিকে যাচ্ছে।

এ দিকে স্টেশনে হাজার হাজার লোক সমবেত হয়েছে। গান্ধী-স্মাট্‌স্ চুক্তির কথা তারা শুনতে চায়। এণ্ডরুজকেও সেখানে কিছু বলতে হল।

পরদিন দুপুরে তাঁর তারের উত্তর এল। ৯ জানুয়ারি মায়ের দেহান্ত হয়েছে।

সেই তারখানি এণ্ডরুজ গান্ধীজির কাছে পাঠিয়ে দিলেন। অল্পক্ষণ পরেই কস্তুরবা এলেন এণ্ডরুজের কাছে— সঙ্গে কয়েকজন ভারতীয় মহিলা। গভীর সহানুভূতিভরে তাঁরা বললেন, 'এখন থেকে আমাদের তোমার মা বলে জেনো।' তাঁদের দেখে তাঁদের কথা শুনে এণ্ডরুজের শোকার্ত হৃদয়ে সান্ত্বনা এল। তিনি জানতেন, মৃত্যুর আগে মা এ কথা ভেবে শান্তি পেয়েছেন যে তাঁর ছেলে ভারতীয় মেয়েদের সম্মানরক্ষার জন্য দক্ষিণ-আফ্রিকায় কাজে

১ এক ভারতীয় হৃদয় [বনারসীদাস চতুর্বেদী] ভারতভক্ত এণ্ডরুজ, পৃ. ১৬৪-১৬৫।

নিযুক্ত আছেন। পরবর্তী জীবনেও দেখি মায়ের স্মৃতিপূত কার্য বলে ভারতীয় নারীর সেবা চিরকালই তাঁর চোখে বিশেষ পুণ্যকর্ম বলে প্রতিভাত হয়েছে। মায়ের মৃত্যুসংবাদ পেয়ে ১৯১৪ সালের ২৭ জানুয়ারি ডারবান থেকে গুরুদেবকে লিখছেন[১]—

…অনেক সময় অবাক হয়ে ভেবেছি ভারতের প্রতি এই গভীর প্রেম আমার মনে কোথা থেকে এল।… আজ এই শান্ত মধুর ক্ষণে আমার পরমারাধ্যা মায়ের সুন্দর জীবনটির স্মৃতি সম্মুখে রেখে বুঝতে পারছি ভারতের প্রতি আমার প্রেমের মূলে রয়েছে মায়ের ভক্তিপ্লুত চিত্তের গভীর অনুরাগ। ভারতীয় নারীর মাতৃত্বের কথা যত পড়েছি, যত শুনেছি ও যত দেখেছি ততই নিজের মায়ের কথা আমার মনে পড়েছে… এ ঠিক আমার মায়ের প্রাণের স্নেহেরই অনুরূপ। আমার মায়ের মৃত্যুতে এখন ভারতবর্ষই আমার নিজের বাসভূমি হয়ে উঠবে, ভারতের ঘরে ঘরেই এখন আমি তাঁকে পাব। ভারতবাসীর দৃষ্টিতে আমার মায়ের চোখের দৃষ্টি আর ভারতের মাতৃমুখে আমার মায়ের মুখখানি দেখতে পাব।

…এখানে প্রথম আমাকে সান্ত্বনা দিতে এলেন ভারতীয় মায়েরা। তাঁদের নম্রমধুর মুখের দিকে তাকিয়ে আমার মাকে দেখতে পেলাম। আমার মন তাতে আশ্বাসে ভরে উঠল।

ভারতসেবকের ভারতপ্রেম

এই ঘটনার ছয় মাস পরে ইউনিয়ন পার্লামেণ্টে ইণ্ডিয়ান রিলিফ অ্যাক্ট পাস হল। 'ইণ্ডিয়ান ওপিনিয়ন' পত্রিকা মন্তব্য করল: 'সেদিনকার অধিবেশনে ভারতভক্ত এণ্ডরুজের আত্মা স্বয়ং যেন উপস্থিত থেকে সভার কার্য পর্যবেক্ষণ ও পরিচালন করেন।' অথচ এণ্ডরুজ মাত্র সাত সপ্তাহ দক্ষিণ-আফ্রিকায় উপস্থিত ছিলেন। কেপটাউনের ইংরেজ সাংবাদিক লিখলেন, 'এণ্ডরুজের একাগ্র নিষ্ঠা ও বিনম্র ভাব দক্ষিণ-আফ্রিকার হৃদয় জয় করেছিল।' সুশীল রুদ্র জন এণ্ডরুজকে লিখলেন[২]—

আপনার পুত্র চার্লি দক্ষিণ-আফ্রিকায় যে কাজ করেছেন সারা ভারতের,

---

১ রবীন্দ্রনাথ-এণ্ডরুজ পত্রাবলী, পৃ. ২৩০-২৩২।

২ Chaturvedi & Sykes, *Charles Freer Andrews*, পৃ. ৯৮।

এমন-কি, সমগ্র ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের মধ্যেও অন্য কোনো একটি লোকের পক্ষে তা করা সম্ভব ছিল না।

১৯১৪ সালের ২ জানুয়ারি ডারবানে তাঁর অভ্যর্থনা-সভায় এণ্ডরুজ বলেন[১]—

…এখানে এসে অসংখ্য ভারতীয় মুখ দেখে আমাদের আনন্দের আর অবধি নেই।… ভারতবাসীরা আপনাদের কল্যাণকামনায় সর্বদাই উদ্‌গ্রীব। মায়ের প্রবাসী সন্তানদের জন্য আমরা মাতৃভূমির অগাধ প্রেম আহরণ করে এনেছি। কবি রবীন্দ্রনাথ আপনাদের জন্য উপনিষদের একটি মন্ত্র[২] পাঠিয়েছেন।

ফিনিক্স আশ্রমের একটি বিশেষ রাত্রির স্মৃতির বর্ণনা এণ্ডরুজ বহু জায়গায় দিয়েছেন।[৩] দৃশ্যটিকে বিশ্বভ্রাতৃত্বের প্রতীক হিসাবে নেওয়া যায়। এণ্ডরুজের চোখে সেটি ভারতাত্মার প্রেমময় প্রকাশ।

…গোধূলির শান্ত আলোকে মহাত্মা গান্ধী খোলা আকাশের নীচে বসেছেন। তাঁর কোলে একটি অসুস্থ মুসলমান ছেলে। তাঁর পাশেই একটি খ্রীস্টান জুলু মেয়ে বসে আছে। ভগবৎপ্রেমের বর্ণনা দিয়ে কয়েকটি গুজরাটি গান পড়ে মহাত্মা সেগুলি আমাদের ইংরেজিতে বুঝিয়ে দিলেন। তার পরে সেগুলি ছোটো ছেলেমেয়েরা গাইল। যখন অন্ধকার ঘন হয়ে এল তখন গান্ধীজি আমাকে Lead, Kindly Light গানটি গাইতে বললেন।…

তখন একটি হিন্দু ছেলে উৎসুক হয়ে আমাকে জিজ্ঞাসা করল, 'ভারতবর্ষ দেখতে কী রকম?' আমি উত্তর দিলাম, 'ঠিক এইরকম। আজ সন্ধ্যায় আমরা সবাই ভারতবর্ষেই বসে আছি।'

দক্ষিণ-আফ্রিকায় ভারতের সাহায্যকারী ইউরোপীয় যাঁরা ছিলেন মিস মল্‌টেনো তাঁদের মধ্যে অন্যতম। তাঁর ভাই ছিলেন বিধানসভার অধ্যক্ষ।

---

১ এক ভারতীয় হৃদয় [বনারসীদাস চতুর্বেদী], ভারতভক্ত এণ্ডরুজ, পৃ. ১৬৮।

২ সত্যম্ জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম। আনন্দরূপমমৃতং যদ্বিভাতি। শান্তং শিবমদ্বৈতম্।

৩ "Mr. Gandhi at Phoenix", *The Modern Review*, May 1914, পৃ. ৫৬৫-৫৬৬। অপিচ দ্রষ্টব্য *Mahatma Gandhi's Ideas* (এণ্ডরুজ-সম্পাদিত); Chaturvedi & Sykes, *Charles Freer Andrews*, পৃ. ৯৯।

তিনি এণ্ডরুজকে বুঝিয়ে দিলেন যে দক্ষিণ-আফ্রিকার বর্তমান ও ভবিষ্যৎ সমস্যা সম্বন্ধে আরো গভীর চিন্তা প্রয়োজন। ডারবানে এণ্ডরুজের অভ্যর্থনা-সভায় মিস্ মল্‌টেনো ভারতীয়দের বলেছিলেন, 'তোমরা যদি আফ্রিকাকে তোমাদের মাতৃভূমি বলে বুঝতে শেখ তবেই তোমরা এই ভূমিখণ্ডের যথার্থ সন্তানের যোগ্যতা লাভ করবে। যদি আগন্তুকের মতো তফাতে থাক, তা হলে তোমাদের ভবিষ্যৎ কিছুমাত্র সুখের হবে না।'

মিস্ মল্‌টেনোর বাক্যের তাৎপর্য এণ্ডরুজ তৎক্ষণাৎ ধরতে পারলেন। সেদিন অপরাহ্ণে ইণ্ডিয়ান মিশন চার্চে সন্ত পলের প্রেমধর্মের কথা বললেন গভীর ভাবাবেগে। ভাষণশেষে মিস্ মল্‌টেনো তাঁর কাছে এসে দীপ্ত চক্ষুদুটি মেলে বললেন, 'আজ সম্মিলিত আফ্রিকার চিত্র যেন আপনি আমার চোখের সামনে তুলে ধরেছিলেন। মনে হচ্ছিল তাকে যেন আমি হাতে ছুঁতে পারি। এই বাণী নিয়ে এগিয়ে যান। বুয়র, ইংরেজ, কাফের— সকলেই এর জন্য যেন পিপাসার্ত হয়ে রয়েছে। দেখবেন প্রেমই একদিন জয়ী হবে।'

রাজনীতি : ধর্মনীতি

এণ্ডরুজ এগিয়ে চললেন ঠিকই। সে কাজ কিন্তু তাঁর পক্ষে মোটেই সহজ ছিল না। চারি দিকে এমন-সব ঘটনা চোখে দেখতেন ক্ষোভে অপমানে তাঁর সর্বাঙ্গ যেন জ্বলে যেত। তবে বুঝতে পারলেন সর্বসমক্ষে অভিযোগ এনে দু-পক্ষের বিচ্ছেদ বুঝি তিনি গভীরতর করছেন।

বরং সেই প্রতিকূলতার প্রাচীর ভাঙতে সাহায্য করল গুরুদেবের দুখানি বই— ইংরেজি গীতাঞ্জলি ও দি ক্রেসেণ্ট মুন।[১] ইউনিয়নের সর্বত্র শিক্ষিত বুয়র ও ইংরেজগৃহে এ বই-দুখানি তিনি দেখতে পেয়েছেন।

তাই ১৪ জানুয়ারি প্রিটোরিয়া থেকে কবিকে লিখছেন[২]—

> মনে পড়ছে দক্ষিণ-আফ্রিকা আসার সময় আক্ষেপ করে বলেছিলেন, 'যদি আপনাদের সঙ্গে যেতে পারতাম।' কিন্তু এই তো আমি আসার বহুপূর্বেই আপনি এখানে পৌঁছে গেছেন··· ডারবান ও প্রিটোরিয়ার ভদ্রলোকদের টেবিলে ইংরেজি গীতাঞ্জলি দেখে আমার কত যে আনন্দ হল।

---

১ শিশু কাব্যগ্রন্থের কয়েকটি কবিতার অনুবাদ এতে আছে।

২ রবীন্দ্রনাথ-এণ্ডরুজ পত্রাবলী, পৃ. ২২৭।

এঁরা বলছেন, আপনার বই পড়ে ভারতবর্ষ ও ভারতীয়দের সম্পর্কে এঁদের ধারণা একেবারেই বদলে গেছে। প্রেমের মধ্যেই আপনি নিজের শক্তিকে প্রত্যক্ষ করেছেন।

গির্জায় বা বিশ্ববিদ্যালয়ে, গভর্নর জেনারেলের সামনে বা কেপটাউনের শিক্ষিত ভদ্রসমাজে, বায়োস্কোপ হলে বা কাফের-গির্জায়, বস্তির খোলা জায়গায় বা অন্য যেখানেই এণ্ডরুজকে বলতে বলা হয়েছে তিনি বলেছেন কবিগুরুর মহামানবিক বৈশিষ্ট্যের কথা, বলেছেন ভারতের জাতীয় আদর্শ, কাংড়ি গুরুকুল ও লালা মুনশিরামের কথা। ভারতীয় সংস্কৃতির জাগ্রত মহান উত্তরাধিকারের ফলে যে আজও সে দেশে এরূপ ঋষিকল্প ব্যক্তির উদ্ভব হয় সে বিশ্বাসই তখন তিনি ব্যক্ত করেছেন বার বার। গান্ধীজি সেই সময় তাঁকে হেসে বলেছিলেন, 'সুশীল রুদ্র, মুনশিরাম ও রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর— এ তিন-জনই তোমার জীবনের পরমারাধ্য যথার্থ ত্রিমূর্তি (Trinity)।' কেপটাউন সিটি হলে তাঁর ভাষণের পরেই যে দক্ষিণ-আফ্রিকার জনমত ভারতীয়দের স্বপক্ষে যেতে শুরু করল সেটি এণ্ডরুজ নিজেও লক্ষ্য করেছেন। সিমলায় যা বলেছিলেন প্রায় সে-সব কথাগুলোই তিনি কেপটাউনেও বলেন।

সেখানে এমিলি হব্‌হাউসের সঙ্গে তাঁর পরিচয় হল। এই ইংরেজমহিলা বুয়রযুদ্ধের সময় বুয়র মহিলা ও শিশুদের বন্দীশিবিরে রাখার বিরুদ্ধে প্রবল প্রতিবাদ জানিয়েছিলেন। উপস্থিত সংকটকালে ভারতীয়দের প্রতি তাঁর গভীর সহানুভূতিরও বিশেষ মূল্য ছিল; কেননা বুয়র নেতাদের উপর তাঁর অসীম প্রভাবের ফলে ভারতীয় ও ইংরেজ ঔপনিবেশিকদের মধ্যে শান্তি-সংস্থাপনের পথ তিনি অনেকটা সুগম করতে পেরেছিলেন। তাঁর সংস্পর্শে এসে স্বধর্মনিষ্ঠ দেশপ্রেমিক বুয়রদের প্রতিও এণ্ডরুজের আগ্রহ জেগে উঠেছিল। তাই মিস্ হব্‌হাউসের প্রভাবেই দক্ষিণ-আফ্রিকার যথার্থ সমস্যা সম্পর্কে এণ্ডরুজের ধারণা দৃঢ়সম্বদ্ধ হল।

একদিন একটি ভাষণের পরে রাত্রে ফেরার পথে একদল জুলু এণ্ডরুজের সঙ্গে আসছিল। তারা তখন তাঁকে প্রশ্ন করল[১], 'আমরা বুঝতে পারি আপনি ভারতীয়দের জন্য প্রাণ দিতে প্রস্তুত, কিন্তু আমাদের জন্য কি আপনি প্রাণ দিতে পারেন?' এ ঘটনার স্মৃতি এণ্ডরুজ কোনোদিনই ভুলতে পারেন নি।

---

১ Chaturvedi & Sykes, *Charles Freer Andrews*, পৃ. ১০০।

এর পরে যতবার দক্ষিণ আফ্রিকায় গেছেন, সেখানকার আদিবাসীদের প্রতি গভীর মমতা তাঁর সব কাজেই ব্যক্ত হয়েছে।

দক্ষিণ-আফ্রিকা যাবার পূর্ব পর্যন্ত ভারতের শিক্ষিত সমাজই কেবল এণ্ডরুজের নাম জানত। ও দেশে ভারতীয়দের স্বাধীনতাপ্রচেষ্টায় অংশগ্রহণে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের সর্বত্র এবার তাঁর নাম ছড়িয়ে পড়ল। তিনি দেখলেন কেবল প্রবাসী ভারতীয়ের রাষ্ট্রীয় মর্যাদার প্রশ্ন নয়, ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের হিতের দিক চিন্তা করেও সমস্যাটি সুবিবেচনার যোগ্য। সত্যাগ্রহ সম্বন্ধে খবর বিভিন্ন পত্রপত্রিকায় ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের সর্বত্র প্রচারিত হল। এর আগে অন্য কোনো ভারতীয় প্রশ্ন নিয়ে পার্লামেণ্টকে এতখানি চিন্তিত হতে হয় নি। সেই উত্তেজনার মুহূর্তেও যে এণ্ডরুজ কিভাবে নিজেকে শান্ত ও স্থির রেখেছিলেন সে বিষয়ে বলছেন[১]—

…তিনটি কারণে সে সময়ে আমি মনের শান্তি বজায় রাখতে পেরেছিলাম। প্রথমত শান্তিনিকেতন আশ্রমের শান্তির চিত্র আমার হৃদয়ে সর্বদা উজ্জ্বল থাকত। যাত্রার পূর্বে কবি রবীন্দ্রনাথ আমাকে যে দুটি সংস্কৃত মন্ত্র দিয়েছিলেন রোজ উপাসনার সময়ে সে দুটি আমি আবৃত্তি করতাম। তাতে হৃদয়ে অপূর্ব শান্তিলাভ হত।

…দ্বিতীয় কারণ, গান্ধীজির সৎসংসর্গ। এই সংগ্রামে তিনি স্থির প্রশান্ত থাকতেন, কখনো উত্তেজিত হন নি। শ্রীকৃষ্ণ যেভাবে অর্জুনের দ্বন্দ্ব-চঞ্চল হৃদয়কে শান্ত ও কর্তব্যরত করেন গান্ধীজিও তেমনি প্রবাসী ভারতীয় জনগণের নিরুদ্ধ শক্তি ধৈর্যের সঙ্গে সঞ্চালিত করেছিলেন। সেই কঠিন সংগ্রামের মধ্যেও তিনি সর্বদা প্রসন্ন চিত্তে থাকতেন। পিয়রসন ও আমি বলতাম, সত্যিই গীতার নিষ্কাম কর্মের আদর্শ জগৎসমক্ষে উপস্থাপিত করার জন্য গান্ধীজি সংসারে অবতীর্ণ হয়েছেন। ডারবানের একটি দৃশ্য এখনো আমার স্মরণে আছে। প্রায় একহাজার তামিল স্ত্রীলোক গান্ধীজির আশীর্বাদ নেবার জন্য নিজ নিজ সন্তান কোলে নিয়ে এসেছে। গান্ধীজি যখন শিশুদের কোলে নিয়ে আশীর্বাদ করছেন তাঁর সুকোমল মুখকান্তি দেখে স্বয়ং প্রভু খ্রীস্টের কথা আমার মনে পড়েছিল।

আমার মন শান্ত থাকার তৃতীয় কারণ হল, সেই রাজনৈতিক আন্দোলনের

১ एक भारतीय हृदय [बनारसीदास चतुर्वेदी], भारतभक्त एण्डरूज, पृ. १७१-१७३।

মধ্যেও আমার চিত্ত দৃঢ়নিবদ্ধ ছিল কয়েকটি আধ্যাত্মিক প্রশ্নের মীমাংসায়। সেই সময়ে খ্রীস্টধর্ম বিষয়ে আমার বিচার-বিবেচনায় কিছু কিছু পরিবর্তন আসছিল। তাই যখনই অবসর পেতাম ধর্মের তত্ত্বগুলি নিয়ে চিন্তা করতাম। গান্ধীজির অনুগামী হিন্দু ও মুসলমান আন্দোলনকারীরা আনন্দে অত্যাচার সহ্য করছেন দেখে খ্রীস্টধর্মের প্রথম দিককার ইতিহাস আমার স্মরণে আসত।… খ্রীস্টভক্তগণ কিভাবে অত্যাচারীদের প্রতি প্রেমভাব জাগ্রত রেখে পীড়ন সহ্য করেছিলেন, এ কথা মনে করে গান্ধীজির অনুচরদের অহিংস আচরণে তাঁদেরই কর্মের পুনরাবর্তন লক্ষ্য করতাম।… দক্ষিণ-আফ্রিকায় আসার সময় গোখলে আশঙ্কা প্রকাশ করেছিলেন যে এখানকার অভিজ্ঞতা আমার খ্রীস্টধর্মচেতনায় নির্মম আঘাত হানবে। এক হিসাবে তা সত্য। কিন্তু বিস্ময়ের সঙ্গে লক্ষ্য করলাম খ্রীস্টমতের প্রত্যক্ষ উদাহরণ গান্ধীজি ও তাঁর অনুবর্তীদের জীবনে, তাঁদের অহিংসনীতিতে খ্রীস্টমতের প্রকাশ। বুঝলাম বাইবেলের 'সারমন অন দ্য মাউন্ট' আর বুদ্ধধর্মের শিক্ষা সর্বতোভাবে এক। বহু বছর ধরে নানা পুস্তক অধ্যয়নে ও ধর্মের যে জ্ঞান সঞ্চয় হয় নি, এখানে তা আমার চোখের সামনে সজীব হয়ে উঠল।

দক্ষিণ-আফ্রিকা থেকে এণ্ডরুজ যত চিঠি লিখেছেন তাতে তাঁর আধ্যাত্মিক অনুভূতির কথাই বেশি। আবার বিলেতে গিয়ে যখন দেখলেন গোখলে মরণাপন্ন রোগে শয্যাশায়ী, তাঁর কাছেও রাজনৈতিক সংগ্রামের বৃত্তান্ত সংক্ষেপে বলে ধর্মসম্বন্ধীয় চিন্তাধারারই অধিক আলোচনা করলেন।

একবার ডারবানের ধর্মযাজক সেখানকার গির্জাঘরে ভাষণ দেবার জন্য এণ্ডরুজকে আমন্ত্রণ জানান। 'পূর্বদেশ থেকেই জ্ঞানীদের প্রথম আগমন'— বাইবেলের এই সুন্দর বাক্যটি সেদিন এণ্ডরুজের বক্তৃতার বিষয় ছিল।

নাটাল 'অ্যাডভার্টাইজার' পত্রিকা সমালোচনায় লিখলেন: 'রেভারেণ্ড এণ্ডরুজ ও পিয়রসন প্রাচ্য ভারতবর্ষ থেকে এসেছেন জানি, তবু তাঁরা যেন মনে না করেন যে তাঁরাই একমাত্র জ্ঞানী ব্যক্তি। পৃথিবীর অন্যত্রও জ্ঞানী ব্যক্তি রয়েছেন।'

সেদিন গির্জা থেকে বেরবার মুখে এণ্ডরুজ শুনলেন, গান্ধীজি তাঁর ভাষণ শুনতে এসেছিলেন পিয়রসনের সঙ্গে। গির্জায় প্রবেশের অনুমতি না পেয়ে ফিরে গেছেন। তখন তাঁর চোখের সামনে ভেসে উঠল ফিনিক্স আশ্রমের দৃশ্য। সেখানে ভারতীয়, ইউরোপীয়, আফ্রিকার অধিবাসী পাশাপাশি বসে সহজ

সৌজন্যভরে বাক্যালাপ করছেন, জাতিগত বিদ্বেষের লেশমাত্র নেই। চিন্তা করলেন, যথার্থ খ্রীস্টধর্ম তবে কোথায়? সেই আশ্রমে, না এই গির্জাঘরে? এখান থেকে গান্ধীজির বহিষ্কার কি তবে যীশুখ্রীস্টের বহিষ্কারের সমার্থক নয়?

পরে কেপটাউনের গির্জায় একদিন তিনি বললেন[১]—

পাশ্চাত্যদেশে কেবল দুটি দেবতার পূজা হয়— এক হল ধন আর অন্যটি হল শ্বেতাঙ্গ প্রাধান্যে বিশ্বাস। শহরের বাইরে নির্ধন ভারতীয় ও আফ্রিকাবাসীর আলয়েই আমি যীশুখ্রীস্টের উপস্থিতি অনুভব করেছি। তখন এই প্রশ্নই আমার মনে জেগেছে, আধুনিক অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত ঐশ্বর্যবান দুর্ধর্ষ মানুষদের হৃদয়ে প্রেমের দূত যীশুর স্থান কী হতে পারে? হয়তো তিনি এঁদের প্রতি বিমুখ হয়ে ধরণীর নির্যাতিত দীনের প্রাণে আশা ও আশ্বাসের আহ্বান জানান।

স্বদেশে প্রত্যাবর্তন

'ব্রিটন' জাহাজে এণ্ডরুজ কেপটাউন থেকে বিলাতে রওনা হলেন ১৯১৪ সালের ফেব্রুয়ারির শেষভাগে। গান্ধীজি ও কস্তুরবা এসেছিলেন তাঁকে জাহাজে তুলে দিতে। কস্তুরবা তখন সুস্থ হয়ে উঠেছেন। ভাঙা ভাঙা ইংরেজিতে এণ্ডরুজকে বললেন, 'আপনি চলে যাচ্ছেন, আমাদের খুব খারাপ লাগছে। আপনাকে আমরা অতি আপন জেনে ভালোবাসি।'

জাহাজ ছাড়ল। এণ্ডরুজ তাকিয়ে দেখলেন— সম্মুখে অসীম সমুদ্রের বিস্তার। তীরের দিকে একখানি বড়ো পাথর অনেকটা জলের মধ্যে এগিয়ে আছে। সে পাথরের শেষ প্রান্তে দাঁড়িয়ে স্বামি-স্ত্রী উভয়ে ঊর্ধ্বমুখে হাত জোড় করে ঈশ্বরের কাছে তাঁর মঙ্গল প্রার্থনা করছেন।

মার্চ মাসের প্রথম সপ্তাহে বিলাত পৌঁছেই দেখেন ওয়াটারলু স্টেশনে তাঁকে সম্বর্ধনা জানাবার জন্য বহু ভারতীয় সমবেত হয়েছেন। শ্রীমতী সরোজিনী নাইডু ফুলের মালা হাতে সকলের সামনে। ভারতীয়দের এই স্বতঃস্ফূর্ত সম্বর্ধনায় এণ্ডরুজ অভিভূত হয়ে গেলেন। বিভিন্ন পত্রিকার সাংবাদিকগণ ছুটে এসেছেন দক্ষিণ-আফ্রিকার বিষয় জানতে। টাইমস্ ও অন্যান্য প্রসিদ্ধ পত্রিকার সম্পাদকগণ অনুরোধ জানালেন তিনি যেন সে বিষয়ে প্রবন্ধ লেখেন।

---

১ एक भारतीय हृदय [बनारसीदास चतुर्वेदी], भारतभक्त एण्डरूज, पृ. १७६-१७७।

এণ্ডরুজ প্রথম গেলেন গোখলেকে দেখতে। তাঁকে দক্ষিণ-আফ্রিকার কথা সংক্ষেপে শোনালেন। পাছে উত্তেজিত হয়ে ওঠেন সেই কারণে ডাক্তারের নিষেধ ছিল গোখলে যেন রাজনীতি আলোচনা না করেন। সত্যাগ্রহ সংগ্রামে গান্ধীজি বিজয়ী হয়েছেন শুনে তিনি আনন্দিত হলেন।

এর পরে এণ্ডরুজ গেলেন পিতার সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে। সেখানে ভ্রাতা-ভগ্নীদের সঙ্গেও দেখা হল। তাঁরা জানালেন, মৃত্যুর পূর্বে মা তাঁর কথা প্রায়ই বলতেন। তাঁর চার্লি নিজের কর্তব্য পালন করছে জেনে তাঁর মন আনন্দে ভরে থাকত। পিতা তখন অত্যন্ত দুর্বল হয়ে পড়েছেন। কিন্তু দক্ষিণ-আফ্রিকার কথা তিনি খুব মন দিয়ে শুনতেন।

লণ্ডনে যতদিন ছিলেন এণ্ডরুজ প্রতিদিন গোখলেকে দেখতে যেতেন। ইংরেজ আইন-সভায় রোজ যেতে হত ভারতের উপ-সচিব চার্লস রবার্টসের সঙ্গে দেখা করার জন্য। তা ছাড়া দক্ষিণ-আফ্রিকার ব্যাপারে ভারত-সংক্রান্ত অফিস ও ঔপনিবেশিক অফিসেও যেতে হত।

এবার মাত্র তিন সপ্তাহ লণ্ডনে ছিলেন। এরই মধ্যে দুটি মহামূল্য স্মৃতি নিয়ে ভারতে ফিরলেন। একটি স্মৃতি রোগশয্যায় গোখলের, আর অপরটি বৃদ্ধ পিতার। গোখলে তাঁকে অনুনয় করে বলেছিলেন রাজনীতিকেও যেন তিনি তাঁর ধর্মের অঙ্গ হিসাবে নেন। তাঁর কর্মযোগ এবং অন্তরের সাধনার মধ্যে যেন কোনো তফাত না থাকে। অন্য দিকে সাধুস্বভাব বৃদ্ধ পিতা দুঃখে শোকে কাতর, ধর্মসম্বন্ধে কোনো তর্কবিতর্কে আর গেলেন না। গান্ধীর জীবনকাহিনী চার্লির মুখে শুনে বললেন, 'ঈশ্বর স্বয়ং প্রেমস্বরূপ, মানবের প্রতি যাঁর অনুরাগ গভীর তাঁকে তিনি আপন করে নেন।'

এণ্ডরুজের সাথী পিয়রসনও দক্ষিণ-আফ্রিকায় প্রবাসী ভারতীয়দের সেবায় আত্মনিয়োগ করেন। মডার্ন রিভিয়ু পত্রিকায় তাঁর সেখানকার কাজের প্রতিবেদন প্রকাশিত হয়।[১] দক্ষিণ-আফ্রিকায় বাসকালে তাঁর একটি মজার অভিজ্ঞতা ঘটে। একবার একটি গ্রামে গিয়ে ফিরতে দেরি হওয়ায় পিয়রসন রাতটি সেখানে কাটাবেন স্থির করেন। কাছেই একটা বাড়ি দেখে গৃহকর্ত্রী বৃদ্ধার কাছে সেখানে রাত্রিবাসের অনুমতি চাইলেন। বৃদ্ধা খুশি হয়ে তাঁকে

---

১ 'Report on My Visit to South Africa', *The Modern Review*, June 1914, পৃ. ৬২৯-৬৪২।

রাখতে সম্মত হলেন। খাবার সময় পিয়রসন তাঁকে জানালেন যে তিনি ভারতবর্ষ থেকে এসেছেন। শুনে বৃদ্ধা বললেন, 'আচ্ছা, তুমি কি এণ্ডরুজ নামে লোকটার কথা কিছু জান? তাকে সামনে পেলে আমি একবার দেখে নিতাম। সে কিনা একটি এশিয়াবাসীর পায়ে হাত দেয়! এমন কথা কখনো শুনেছ তুমি?'

পিয়রসন এ কথা শুনে উচ্চহাস্যে মুখর হয়ে বললেন, 'এণ্ডরুজ যে আমার বন্ধু। আমরা দুজন একই সঙ্গে এখানে এসেছি। সে যা করেছে আমিও ঠিক তাই করতেই যে চাই।'

বৃদ্ধা শুনে অবাক। তবে পিয়রসনের মধুর স্বভাবে তিনি মুগ্ধ। দক্ষিণ-আফ্রিকায় যে সব ইউরোপীয় গৃহে তিনি বাস করেছেন, তাঁর প্রভাবে সেখানকার অধিবাসীরা সকলেই প্রবাসী ভারতীয়দের সুহৃদ হয়ে উঠেছিলেন।

বিলাত যাবার সময় টলস্টয়ের একটি জীবনী এণ্ডরুজকে পড়তে দিয়েছিলেন গান্ধীজি।[১] তা ছাড়া তাঁর কাছে ছিল ইংরেজি 'সাধনা'র পাণ্ডুলিপির পিয়রসন-কৃত একটি কপি।[২] বিলাতের পথে আর সেখান থেকে ভারতে ফেরার সময়ে জাহাজে এ দুটি বই এণ্ডরুজ বার বার পড়েছিলেন। টলস্টয়ের জীবনসাধন-সংগ্রাম, বিচিত্র তাঁর দুঃখবিপর্যয়ের কাহিনী এণ্ডরুজের শোক ও সংশয়সন্তপ্ত প্রাণ সঞ্জীবিত করে। ইংরেজি 'সাধনা' বইটির আধ্যাত্মিক প্রবন্ধগুলিও তাঁকে শাশ্বত ধর্মসাধনায় গভীর প্রেরণা দেয়।

পুনরায় ভারতভূমিতে

এণ্ডরুজ যখন দিল্লী ফিরলেন, সুশীল রুদ্র তাঁকে দেখে চমৎকৃত হন। ২১ মে তারিখে জন এণ্ডরুজকে সুশীল রুদ্র লিখলেন, 'চার্লির মুখে আশ্চর্য একটি আনন্দোজ্জ্বল আভা ফুটে উঠেছে। যে দেখে সেই বিস্ময়ে বিমুগ্ধ হয়— অন্তরে নিবিড় আধ্যাত্মিক অনুভূতি না এলে এমন হয় না।'

---

১ ক্যালিডোনিয়া জাহাজ থেকে ১৯১৪ সালের ১৩ এপ্রিল তারিখে গান্ধীজিকে লেখা এণ্ডরুজের অপ্রকাশিত পত্র গান্ধী স্মারক সংগ্রহালয় সমিতির (নিউ দিল্লী) সৌজন্যে প্রাপ্ত।

২ ইংরেজি 'সাধনা'— *Sadhana : The Realisation of Life* নামে প্রকাশিত গ্রন্থে আমেরিকা ও ইংলণ্ডে প্রদত্ত কাবর কয়েকটি বক্তৃতা মুদ্রিত হয়। ধর্ম ও শান্তিনিকেতন উপদেশমালা অবলম্বনে পাশ্চাত্য শ্রোতার উপযোগী করে লেখা ভাষণ।

ভারতে ফিরেও এণ্ডরুজ কিন্তু তখনই দিল্লী ছাড়তে পারেন নি। তখনো পাঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষার খাতা দেখা বাকি, গান্ধী-স্মাট্‌স্‌ চুক্তি বিষয়ে সিমলার সরকারি কর্মচারীদের সঙ্গে আলাপ-আলোচনা প্রয়োজন। তা ছাড়া দিল্লীতে সেণ্ট স্টিফেন্স কলেজের সব দায়িত্ব থেকে মুক্ত হয়ে তিনি শান্তি-নিকেতনের কাজে যোগ দেবার জন্য প্রস্তুত হচ্ছিলেন।

মনের প্রবল আবেগে সহজে উচ্ছ্বসিত হয়ে পড়ার স্বভাব এণ্ডরুজের তখনো একটুও বদলায় নি। সেণ্ট স্টিফেন্স কলেজের ছাত্রদের কাছে দক্ষিণ-আফ্রিকার কথা বলতে গিয়ে রাগে ক্ষোভে অস্থির হয়ে পড়তেন। সহকর্মীদের মধ্যে একজন বললেন, 'তুমি ইউরোপীয়দের প্রতি বোধ হয় একটু অবিচার করছ।' সঙ্গে সঙ্গে উত্তর এল, 'সুবিচার তো আমি করতে চাই নি।' পরে অবশ্য সে বিষয়ে কোথাও বলতে গিয়ে তাঁর ভাষা আগের চেয়ে সংযত ও উদার হয়েছে।

এণ্ডরুজ সিমলায় গেলেন। সেখানকার অবস্থা দক্ষিণ-আফ্রিকার চেয়েও দুঃসহ ঠেকল। এণ্ডরুজ ভারতবর্ষে ফিরে এসে যেন এক প্রচণ্ড ঘূর্ণিঝড়ের মধ্যে পড়ে গেলেন। লর্ড হার্ডিঞ্জ ও অপর কয়েকজন সরকারি কর্মচারী চিরকালই তাঁর মিত্র ছিলেন। কিন্তু সরকারি মহলের ও খ্রীস্টান সমাজের একটি বড়ো দল তাঁর বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ালেন। দক্ষিণ আফ্রিকা থেকে ফেরার আগেই তাঁর হিন্দুপ্রীতি নিয়ে ইংরেজি পত্রিকায় তাঁর বিরুদ্ধে কটূক্তি-বর্ষণ শুরু হয়েছিল।[১] কেম্‌ব্রিজ ব্রাদারহুডের প্রধান রেভারেণ্ড অলনাট সে সময়ে এণ্ডরুজের পক্ষ সমর্থন করেছিলেন। কিন্তু পরে তিনিও এণ্ডরুজের কাছ থেকে লিখিত স্বীকারোক্তি চাইলেন, স'ত্যই তিনি নিজেকে খ্রীস্টান বলে মানেন কি না। এণ্ডরুজ তার কোনো উত্তর না দিয়ে চুপ করে রইলেন। ১৯১৪ সালের ২২ মে তারিখে মুনশিরামকে এণ্ডরুজ লিখেছিলেন[২]—

> যথার্থ খ্রীস্টধর্ম যদি আমার আচরণে বা কর্মে প্রকাশ না পায়, কেবল কথায় কি তার প্রমাণ হবে?

আরো একটি মিথ্যা অপবাদ তাঁর বিরুদ্ধে চারি দিকে ছড়িয়ে পড়ল যে দিল্লী ষড়যন্ত্র মামলার অপরাধীদের সঙ্গে তাঁর যোগ আছে। তার কারণ হল

---

১ ক্যালিডোনিয়া জাহাজ থেকে গান্ধীজিকে লেখা এণ্ডরুজের অপ্রকাশিত পত্র।

২ Chaturvedi & Sykes, *Charles Freer Andrews*, পৃ. ১০৪।

মামলায় জড়িত এক ব্যক্তির সঙ্গে কোনো এক সময়ে তাঁর বন্ধুত্ব হয়েছিল; আর স্বামী রামতীর্থের যে বইখানির ভূমিকা তিনি লিখেছিলেন সে বইয়ের মধ্যে গোয়েন্দা বিভাগের লোকেরা রাজদ্রোহের আভাস আবিষ্কার করেছিলেন।

লাহোর বিশ্ববিদ্যালয়ের ফেলোশিপ ত্যাগ করতে গিয়ে এণ্ডরুজ লক্ষ্য করলেন সিণ্ডিকেটের কর্মীদের মধ্যে স্বল্পসংখ্যকই বিশ্ববিদ্যালয়ে তাঁর কাজের জন্য কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করলেন এবং পদত্যাগে দুঃখ জানালেন। এ দিকে তিনি বৃটিশ সরকারের গুপ্তচর— এই মিথ্যা অপবাদও লাহোরের হিন্দুসমাজে প্রচণ্ড আলোড়ন তুলেছিল।

এণ্ডরুজ যে এ-সব ঘটনায় কী বেদনাবোধ করেছিলেন তা কেবল ঘনিষ্ঠ বন্ধুদের কাছে লেখা চিঠিতেই প্রকাশ পেয়েছে। গান্ধীজির জীবনেও যে অনুরূপ ঘটনা বহু ঘটেছে সে কথা ভেবে তিনি মনে সাহস সঞ্চয় করেছিলেন। তাঁকে লিখেছেন[১]—

> আমি এ-সবে বিচলিত হই না কারণ যথার্থ শান্তি এ-সবের ঊর্ধ্বে।… লোকে কী বলে তাতে কান না দিয়ে সহজ সরল এবং সৎ পথেই আমাকে চলতে হবে।

দিল্লীর বন্ধুদের কাছে ফিরে এসে তাঁর মনে শান্তি এল। কেম্‌ব্রিজ ভ্রাতৃসংঘের সদস্যরা তাঁর চিন্তাধারা অনুধাবন করতে না পারলেও তাঁর প্রতি তাঁদের অনুরাগ এক তিলও কমে নি। মিশনের কর্ম পরিত্যাগ করে এণ্ডরুজ মিশন-কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে মাসোহারা গ্রহণেও নিবৃত্ত হলেন। কিন্তু ধর্মযাজকের কর্তব্য তখনো তিনি ত্যাগ করতে চান নি। ভারতের মেট্রোপলিটান বিশপ লেফ্রয়ের অনুমতি নিলেন যে বোলপুর বাসকালে মধ্যে মধ্যে বর্ধমান গির্জার উপাসনা-অনুষ্ঠান তিনি পরিচালনা করবেন।[২] এ বিষয়ে রবীন্দ্রনাথের সম্মতিও তিনি পেলেন।

১৯১৪ সালের মে মাসে কবি নৈনিতালের কাছে রামগড়ে যান।[৩] সেখান

১ ক্যালিডোনিয়া জাহাজ থেকে গান্ধীজিকে লেখা এণ্ডরুজের অপ্রকাশিত পত্র।

২ সুশীল রুদ্রের পিতা সে গির্জায় ধর্মযাজক ছিলেন; সুশীলও শৈশবে সেখানে উপাসনা করেছেন। এ কথা চিন্তা করে সেই গির্জাতেই ধর্মযাজকের কাজ করার আগ্রহ এণ্ডরুজের মনে জাগে।

৩ রবীন্দ্রনাথ-এণ্ডরুজ পত্রাবলী, পৃ. ১।

থেকে এণ্ডরুজকে লিখিত পত্রগুলি সম্বন্ধে *Letters to a Friend* গ্রন্থের ভূমিকায় এণ্ডরুজ লিখেছেন[১]—

> গ্রীষ্মের ছুটিটা পাহাড়ে কাটাবেন বলে তিনি বেশ সুস্থ শরীরেই সেখানে গিয়েছিলেন,… সেখানে পৌঁছবার পর থেকেই যে মানসিক কষ্ট ভোগ করেছেন সে প্রায় মৃত্যুযন্ত্রণারই সমতুল্য।… হিমালয়ের অপরূপ সৌন্দর্যে মুগ্ধ হয়ে শরীরে মনে অশেষ তৃপ্তি অনুভব করছেন তখনই এই আঘাতটা হঠাৎ এল।

অন্তরের সুহৃদ এণ্ডরুজকে লেখা এই পত্রগুচ্ছে কবির অন্তর্বেদনা অপরূপ প্রকাশ লাভ করেছে।

ওই-সব পত্রে গুরুদেবের দুঃসহ মানসিক সংগ্রামের কথা জেনে এণ্ডরুজও প্রতিদিন দিল্লী থেকে তাঁকে একখানি করে পত্র লেখেন।[২] সেগুলি পড়ে উভয়ের আত্মিক যোগের রূপটি আমাদের চোখে স্পষ্ট প্রতিভাত হয়। এণ্ডরুজ এক দিকে যেমন তাঁকে গুরু বলে মেনেছিলেন অন্য দিকে মায়ের মতো ব্যাকুল অন্তরে যে তাঁর শুভকামনা করতেন এ চিঠিগুলোর প্রতি পঙ্‌ক্তিতে তা লিপিবদ্ধ রয়েছে। ১৯১৪ সালের ২৩ মে তারিখের চিঠিতে এণ্ডরুজ লিখছেন—

> এ সময়ে বড়ো ভয় যেটি আমার মনে লাগে তা হল এই। আপনার জীবনে সেই পরম দিন যখন আসবে, যখন চিত্তের দুঃসহ মন্থনব্যথা সইতে হবে; তখন আমি হয়তো আপনার প্রতি প্রগাঢ় ভালোবাসাতেই চেষ্টা করব সেই বেদনাকে আড়াল করতে। তা যেন কখনো না করি; সে সম্বন্ধে আমায় বিশেষ সাবধান হতে হবে।

তার পরে নিজের কথা বলতে গিয়ে সে চিঠিতেই বলছেন—

> জীবনের যে অধ্যায় রচনা এবার থামিয়ে দিলাম— তা যে অকারণ কর্মব্যস্ততা ও ভাবোচ্ছ্বাসে ভারাক্রান্ত হয়েছিল, তা আজ ধরা পড়ছে। এখন প্রায় শেষ করে এসে স্বস্তির নিশ্বাস ফেলছি।

জুন মাসের প্রথম দিকে কবির অনুরোধে রামগড়ে গিয়ে এণ্ডরুজ তাঁর সঙ্গে দশ দিন বাস করেন। রথীন্দ্রনাথ তাঁর 'পিতৃস্মৃতি' গ্রন্থে এণ্ডরুজের রামগড় বাসের একটি মনোজ্ঞ বর্ণনা দিয়েছেন।[৩]

---

১ রবীন্দ্রনাথ-এণ্ডরুজ পত্রাবলী, পৃ. ১।

২ ইংরেজি পত্র অপ্রকাশিত, বাংলা অনুবাদ রবীন্দ্রনাথ-এণ্ডরুজ পত্রাবলী, পৃ. ২৩৩-২৪১।

৩ রথীন্দ্রনাথ ঠাকুর, পিতৃস্মৃতি, পৃ. ২৬৬-২৬৮।

…সাহেব আসাতে বাবা খুশি হলেন।… সাহেব অত্যন্ত ছটফটে লোক। তাঁকে যথেষ্ট কাজের খোরাক দিতে না পারলে তিনি কোন্ দিন কোনো একটা কাজের অজুহাতে South Africa Fiji Islands বা পৃথিবীর আর কোনো সুদূর প্রান্তে উধাও হবেন। *Fruit Gathering* কবিতা বইয়ের সম্পাদনার ভার পেয়ে তিনি নিশ্চিন্ত মনে সেই কাজেই মশগুল হয়ে আর-সব কথা ভুলে রইলেন। সমস্ত দিন ধরে বাবার খাতা থেকে কবিতা বাছাই করে নিয়ে একবার একভাবে সেগুলি সাজান, আবার বদলে অন্যভাবে সাজান। সন্ধেবেলায় সকলে মিলে যখন একত্র হই, এণ্ডরুজ সাহেব বাবার পায়ের কাছে বসে তাঁর হাতে খাতা তুলে দিয়ে অনুরোধ করেন কয়েকটা কবিতা পড়ে শোনাতে। বাবা পড়তে লাগলে সাহেব মুখ উজ্জ্বল করে তাঁর আবৃত্তি নিবিষ্ট মনে শোনেন। মাঝে মাঝে যখন কোনো কবিতা বিশেষ ভালো লাগে, লাফিয়ে উঠে বাবাকে জড়িয়ে ধরেন। অনেক সময় তাঁর চোখ দিয়ে দরদর করে জল পড়ছে আমরা দেখতুম, শুনতে শুনতে তিনি এতই বিচলিত হয়ে পড়তেন।

…সময় হল নামবার।… কমিশনারের কাছে আবেদন… পেশ করা সত্ত্বেও একটিমাত্র ডাণ্ডি পাওয়া গেল। অবস্থা দেখে এণ্ডরুজ সাহেব বললেন, 'গুরুদেবের বক্তৃতার দিন স্থির হয়ে গেছে, তাঁকে আজ রওনা হতেই হবে। যে একটা ডাণ্ডি এসেছে তাতে গুরুদেব যাবেন, আমি তাঁর সঙ্গে হেঁটে যাব।… বাবা এ-প্রস্তাবে রাজি ছিলেন না। সাহেব নাছোড়বান্দা। শেষ পর্যন্ত বাবাকে ডাণ্ডিতে উঠেই রওনা হতে হল, সাহেব সঙ্গে হেঁটে যেতে লাগলেন। খানিকটা গিয়েই— আমরা দূর থেকে দেখলুম— বাবা ডাণ্ডি থেকে নেমে সাহেবের সঙ্গে হাঁটতে আরম্ভ করেছেন। পরে জানতে পারলুম দুই বন্ধু সমানে কাঠগুদাম পর্যন্ত ষোলো মাইল গল্প করতে করতে হেঁটে গেছেন আর ডাণ্ডিটা পিছনে পিছনে চলেছে, তাতে আরোহী কেউ ছিল না।…

১৫ জুন এণ্ডরুজ শান্তিনিকেতনে উপস্থিত হলে উইলি পিয়রসনের সঙ্গে তাঁর দেখা হল। পিয়রসন দক্ষিণ-আফ্রিকা থেকে সরাসরি চলে এসেছিলেন শান্তিনিকেতনে।

প্রতীচীর তীর্থ হতে প্রাণরসধার
হে বন্ধু, এনেছ তুমি, করি নমস্কার।

প্রাচী দিল কণ্ঠে তব বরমাল্য তার,
হে বন্ধু, গ্রহণ কর, করি নমস্কার।

খুলেছে তোমার প্রেমে আমাদের দ্বার,
হে বন্ধু, প্রবেশ কর, করি নমস্কার।

তোমারে পেয়েছি মোরা দানরূপে যাঁর
হে বন্ধু, চরণে তাঁর করি নমস্কার।

শান্তিনিকেতনে এণ্ডরুজের অভ্যর্থনা উপলক্ষে রচিত। এপ্রিল ১৯১৪

৪

শান্তিনিকেতনে

শান্তিনিকেতনে : মানবধর্মলোকে মুক্তি

প্রতীচীর তীর্থ হতে প্রাণরসধার
হে বন্ধু, এনেছ তুমি, করি নমস্কার।
প্রাচী দিল কণ্ঠে তব বরমাল্য তার,
হে বন্ধু, গ্রহণ করো, করি নমস্কার।
খুলেছ তোমার প্রেমে আমাদের দ্বার
হে বন্ধু, প্রবেশ করো, করি নমস্কার।
তোমারে পেয়েছি মোরা দানরূপে যাঁর
হে বন্ধু, চরণে তাঁর করি নমস্কার।[১]

১৯১৪ খ্রীস্টাব্দের ১৯ এপ্রিলে (৬ বৈশাখ ১৩২১) শান্তিনিকেতন আম্রকুঞ্জের এক সভায় পঠিত এই কবিতায় আশ্রমগুরু রবীন্দ্রনাথ এণ্ডরুজকে স্বাগত জানালেন। সেবার নববর্ষের দিন কবি তাঁর সদ্যঃপ্রকাশিত 'উৎসর্গ' কাব্যগ্রন্থ এণ্ডরুজকে উৎসর্গ করেন।[২]

গুরুদেব থাকেন দেহলির উপরতলাকার ছোটো ঘরে; এণ্ডরুজ পিয়রসন থাকেন তার পাশে নতুন বাড়িতে। মনে হয় এতদিনে এণ্ডরুজের মনের কামনা চরিতার্থ হয়েছে। কর্মের ঘূর্ণাবর্তে পড়ে নিদারুণ উদ্‌বেগ ও অশান্তি ভোগের পরে যেন শান্তির আশ্রয় পেলেন। নিস্তব্ধ ধ্যানের অবকাশে অন্তরের পুণ্য প্রদীপটি উজ্জ্বল হয়ে উঠল।

স্কুলের ছোটো ছোটো ছেলেদের নিয়ে চাঁদের আলোয় অভিনয় করলেন আইরিশ নাটক *The King*। 'অচলায়তন' নাটকের অভিনয় প্রথম হয় (১৩ বৈশাখ ১৩২১) এণ্ডরুজের সম্বর্ধনাতেই। রথীন্দ্রনাথ লিখেছেন[৩]—

…বাবা হয়েছিলেন আচার্য। এই অভিনয়ের সবচেয়ে চমকপ্রদ ঘটনা হল শোণপাংশু দলে পিয়ার্সনের আবির্ভাব। সাহেব সুন্দর বাংলা বলতেন,

---

১ তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা, ১৩২১, পৃ. ৮৫।

২ রবীন্দ্রজীবনী ২য় খণ্ড (২য় সং), পৃ. ৩৪৮।

৩ রথীন্দ্রনাথ ঠাকুর, পিতৃস্মৃতি, পৃ. ১৩৫।

কিন্তু 'আর খেঁসারির ডাল' বলতে গিয়ে রোজই তাঁর জিভে কেমন জড়তা এসে যেত— উপস্থিত শ্রোতা ও দর্শকেরা তা শুনে হেসে গড়িয়ে পড়ত।···

১৯১৪ সালের অগস্ট মাসে মহাযুদ্ধ বাধল। ইংলণ্ড সে যুদ্ধের এক প্রধান অংশীদার। এণ্ডরুজের মন দোলায়িত হল ভালোমন্দের দ্বন্দ্বে। খ্রীস্ট-করুণামৃতের সঙ্গে এই বীভৎসতার যোগসাধন হবে কী করে! এ বিষয়ে আপন জীবন-গ্রন্থিকায় লিখেছেন[১]—

আমার নিজের দেশ যখনই এতে জড়িত হল, তখনই দেখি আমার মন দ্বিধান্বিত, নানা সংশয়ের প্রশ্নে দোলায়িত। যুদ্ধের নৃশংসতা, নীচতা ও মিথ্যাচার আমার বিরোধিতার উদ্রেক করবে এই ছিল স্বাভাবিক। তার পরিবর্তে একটি গোপন ঔৎসুক্য মনে জাগতে লাগল যেন কোনোমতে আমার নিজের দেশের জয় হলেই ভালো হয়।

সে ভাবনা মনের উপরতলায় স্পষ্ট হয়ে উঠতেই আতঙ্কিত হয়ে উঠলাম আমি। ধিক্কার দিতে লাগলাম নিজেকে অমন প্রবণতাও আমায় অধিকার করেছিল ভেবে। কিন্তু ধীরে ধীরে চোখের উপর থেকে পর্দা যেন সরে গেল। অবশেষে দেখলাম যুদ্ধ কী বীভৎস ব্যাপার, যীশুখ্রীস্টের অমরনীতির সম্পূর্ণ বিরুদ্ধাচরণ। তাই যুদ্ধে যোগদানে ভারতবর্ষের বাধ্যতার প্রশ্ন যখন এল তাতে আমি অসম্মত হই।

আসলে দ্বিধা এবং আন্তরিক মুক্তির সংগ্রাম চলেইছিল মনে পূর্বাবধি। এণ্ডরুজ বলেছেন, দক্ষিণ-আফ্রিকার কর্তব্যঘন দিনগুলির গভীরে জীবন সম্পর্কে এক ব্যাপকতর মূল্যচেতনা তাঁর অনুভবকে স্পর্শ করেছিল। ভারতে ফিরে এসে স্পষ্ট বুঝলেন দিল্লীর কেম্‌ব্রিজ ভ্রাতৃসংঘের সীমিত গণ্ডীতে নিজেকে আর বেঁধে রাখা তাঁর পক্ষে সম্ভব নয়। মিশনের প্রধান রেভারেণ্ড অলনাট ছিলেন সহৃদয়; তিনি অনুভব করেছিলেন, জীবনের বৃহত্তর কর্মক্ষেত্র এণ্ডরুজের মন টেনেছে। তাই শুভকামনা জানিয়ে কেম্‌ব্রিজ ভ্রাতৃসংঘ থেকে মুক্তির অধিকার তিনি অর্পণ করেছিলেন এণ্ডরুজকে।[২]

তার পরেও আর-একটি ঘটনা ঘটে গেল যার ফলে এণ্ডরুজ বুঝলেন ধর্মযাজকের পদে থাকাও তাঁর পক্ষে আর কোনোমতেই সংগত নয়। ঘটনাটি

---

১ C. F. Andrews, *A Pilgrim's Progress*, পৃ. ২৮, ২৯।

২ তদেব, পৃ. ১৯।

এই।[১] রবীন্দ্রনাথ চেয়েছিলেন, এণ্ডরুজ শান্তিনিকেতনের কাজ করেও তাঁর ধর্মগত কর্তব্যগুলি যথাসম্ভব পালন করবেন। ট্রিনিটি রবিবারে বর্ধমানের গির্জায় এণ্ডরুজের অ্যাথানেসিয়ান-সূত্র পাঠ করার কথা। অকস্মাৎ তাঁর মনে হল অ-খ্রীস্টানদের অনন্ত নরকভোগের অংশ তিনি পাঠ করতে পারবেন না। ভারতীয় খ্রীস্টান সমাবেশে ওই অভিশাপ-বাণী উচ্চারণ করে তিনি আবার নিঃসংকোচে শান্তিনিকেতনে ফিরে আসবেন, প্রতারণার সেই অপরাধ তাঁর বুকে বিষম বাজবে। তাই যথাকালে সে অংশ বাদ দিয়ে পড়লেন। অথচ বিবেকের সঙ্গে চাতুরী করছেন ভেবে তখনই মন ধিক্কারে ভরে গেল।[২]

প্রার্থনাশেষে শান্তিনিকেতনে ফিরে কবির পবিত্র মুখচ্ছবি দেখে লজ্জায় মাথা নত হল; তাঁর কাছে সব স্বীকার করে এণ্ডরুজ বললেন, আর কখনো এ অপরাধ হবে না; বিবেকের সঙ্গে ছলনা আর নয়। আন্তরিক সহানুভূতি-ভরে কবি বুঝিয়ে বললেন, হঠাৎ যেন তিনি কিছু না করে বসেন। তবে এণ্ডরুজ যখন তাঁকে বললেন, তাঁর আচরণ মিথ্যার কত কাছে গিয়েছিল, তখন কার্যত নিজস্ব সুস্থির সিদ্ধান্ত গ্রহণে কবি তাঁকে বিরত করেন নি।

বহু বছরের অন্তরের সংগ্রাম এভাবে ক্ষান্ত হল; কিন্তু তার গভীর ক্ষত মিলিয়ে যেতে আরো বহুদিন লেগেছিল। বিশপ লেফ্রয় ছিলেন তখন ইংলণ্ডে। এণ্ডরুজ তাঁকে জানালেন ধর্মযাজকের কাজ করতে তাঁর বিবেকে বাধে— তিনি মুক্তি চান। বন্ধুদের সবাইকে সে কথা জানিয়ে প্রেসে বিজ্ঞপ্তি দিলেন— কেউ যেন না মনে করেন যে তিনি খ্রীস্টানধর্ম ত্যাগ করেছেন। এ কাজের জন্য তাঁকে কিছুকাল পর্যন্ত অসহ মনোবেদনা পেতে হয়েছে। তাতে তাঁর শরীর গেল ভেঙে। কলকাতার নার্সিং হোমে চিকিৎসা চলতে লাগল স্নায়ুগত উদরাময়ের। একটু নড়াচড়া করতে সক্ষম হতেই চলে গেলেন সিমলা হাসপাতালে। কয়েক সপ্তাহ পরে দিল্লীতে ফিরে সেণ্ট স্টিফেন্স কলেজের খ্রীস্টান ছাত্রদের আহ্বান করলেন। খুব নম্রভাবে ধৈর্যভরে ছাত্রদের সক্ষোভ প্রশ্ন আগে শুনলেন। তার পর তাদের জানালেন কত বছরের আত্মজিজ্ঞাসা ও সংগ্রামের ফলে তিনি যাজকবৃত্তি ত্যাগে মন স্থির করেছেন। পরে সস্নেহে

---

১ C. F. Andrews, *A Pilgrim's Progress*, পৃ. ২০, ২১।

২ এই বিষয়টি সম্পর্কে অন্য একটি বিবৃতি আছে। দ্র. Chaturvedi & Sykes, *Charles Freer Andrews*, Appendix II, পৃ. ৩২৩-৩২৪।

অনুরোধ করলেন তাঁর প্রিয় ছাত্ররা যেন তাঁকে তাদের প্রেমে ও সহানুভূতিতে চিরজীবন সজীব ও সতেজ করে রাখে।

এ অন্তর্দ্বন্দ্বের কালে এণ্ডরুজ তাঁর অ-খ্রীস্টান বন্ধুদের আন্তরিক সাহায্য পেয়েছিলেন। গান্ধীজি সে সময়ে তাঁর পিতাকে লিখেছিলেন[১]—

> চার্লি আমাকে লিখেছে, ওর যাজকবৃত্তি পরিত্যাগের খবরে আপনি হয়তো দুঃখিত হবেন।... আমার মনে হয় চার্লির এ আশঙ্কা অমূলক। চার্লি যা করতে যাচ্ছে ওর চিত্তের প্রেরণাই রয়েছে তার মূলে। সে প্রেমধর্ম প্রচার করছে আপন জীবন দিয়ে।... তাই আমি প্রার্থনা করি তার সর্বকার্যে সে যেন আপনার আশীর্বাদ লাভ করতে পারে। তার কোনো কাজেই আপনি দুঃখ পান নি জানলে সে সান্ত্বনা পাবে।

এ সময় এণ্ডরুজ গুরুদেবের প্রতি গভীর শ্রদ্ধায় একান্ত আসক্ত হয়ে পড়েন। তিনি কিছুদিনের জন্য চোখের আড়াল হলেই এণ্ডরুজ তাঁর স্বাস্থ্যের জন্য উদ্‌বেগে কাতর হতেন। কবি অকৃত্রিম অনুরাগে সাদরে বন্ধুকে বোঝাতেন যে মানুষের প্রতি ভালোবাসা নিষ্কাম ও নিরাসক্ত হওয়া চাই। ঈশ্বরে আত্মসমর্পণ, খ্রীস্টপ্রেমে শরণাগতি সম্পর্কে সনির্বন্ধ অনুরোধ জানাতেন।[২]

১৯১৪ সালের ১৮ ডিসেম্বরে এলাহাবাদ থেকে কবি তাঁকে লিখছেন[৩]—

> যে স্বপ্নাতীতকে মুহুর্মুহু আমার জীবনে প্রত্যাশা করছি তার জন্যে স্থান রাখতে হবে তো। বিশ্বাস করুন, মানুষের প্রতি আকর্ষণ আমার খুব প্রবল; তবু অন্যের সঙ্গে এমন সম্পর্ক আমি গড়তে পারি নে যাতে আমার জীবনের স্রোত বাধাপ্রাপ্ত হয়।...

বলাকার 'উপহার' কবিতা (১০-সংখ্যক)এ সময় লেখা হয়। এর মধ্যেও কবির নৈর্ব্যক্তিক মনোভাব স্পষ্ট হয়ে উঠেছে।

> আমার যা শ্রেষ্ঠধন সে তো শুধু চমকে ঝলকে,
> দেখা দেয়, মিলায় পলকে।...
> বন্ধু, তুমি সেথা হতে আপনি যা পাবে
> আপনার ভাবে,

---

১ Chaturvedi & Sykes, *Charles Freer Andrews*, পৃ. ১০৭।

২ *The Visva-Bharati Quarterly*, October 1925, পৃ. ২৯৪।

৩ রবীন্দ্রনাথ-এণ্ডরুজ পত্রাবলী, পৃ. ১৫-১৬।

না চাহিতে, না জানিতে, সেই উপহার
সেই তো তোমার।

'উপহার' কবিতার দু দিন পরে লেখা হয় 'বিচার' (১১-সংখ্যক)।

১২ পৌষ ১৩২১ মহাযুদ্ধের নৃশংসতায় ক্ষুব্ধ কবি লিখলেন—

হে রুদ্র আমার,
মার্জনা তোমার
গর্জমান-বজ্রাগ্নি-শিখায়,
সূর্যাস্তের প্রলয়লিখায়,
রক্তের বর্ষণে,
অকস্মাৎ সংঘাতের ঘর্ষণে ঘর্ষণে।

'বিচার' কবিতাটির ইংরেজি তর্জমা সেবার খ্রীস্টজন্মদিনের স্মরণলিপিরূপে এণ্ডরুজকে উপহার পাঠান।[১]

প্রথাগত খ্রীস্টধর্ম থেকে এণ্ডরুজ নিজেকে বিচ্ছিন্ন করতে চাইলেও রবীন্দ্রনাথ তাঁকে বলেন, তাঁর ইষ্টদেব যীশুখ্রীস্টের প্রতি দৃঢ়বিশ্বাস রেখে খ্রীস্টপ্রদর্শিত পথেই যেন তিনি চিত্তের ভারসাম্য সন্ধান করেন।[২]

ফ্রান্সের Y. M. C. A.-তে যুদ্ধকালীন সেবাকার্যে যোগ দিতে যাবার আগে এণ্ডরুজের কাছে বিদায় নিতে শান্তিনিকেতনে এসেছেন সুধীর রুদ্র। এণ্ডরুজকে বললেন, এখানে খ্রীস্টপ্রসাদ অনুষ্ঠানে যোগ দেবার তো আপনার আর কোনো উপায় নেই।

পাশেই আশ্রমের ছেলেরা খেলছিল। তাদের দেখিয়ে এণ্ডরুজ উত্তর দিলেন, 'কেন, এই যে এ-সব শিশুরাই তো আমার খ্রীস্টের প্রতীক।' ফ্ল্যাণ্ডার্স রণক্ষেত্রে সুধীর যখন কাজ করেছেন তখন আর্ত মানবের সেবায় তিনি যীশুখ্রীস্টের সাহচর্য অনুভব করতেন। তখনই এণ্ডরুজের এই উপলব্ধি তাঁর মনে পড়ে যেত।

বিশপ লেফ্রয় এণ্ডরুজের পদত্যাগপত্র স্বীকার করে নেন নি। এণ্ডরুজের মনে যখন প্রশ্ন জেগেছে, দ্বিধা জন্মেছে, তেমন অবস্থায় কিছুকালের জন্য উপাসনা-অনুষ্ঠান থেকে বিরত থাকার পরামর্শই বিশপ তাঁকে দিয়েছিলেন।

---

১ *Letters to a Friend*, পৃ. ৫২।

২ *The Visva-Bharati Quarterly*, October 1925, পৃ. ২৯৪।

কিন্তু নিজে ইচ্ছা করলে ভবিষ্যতে এণ্ডরুজ আবার যাজকের কাজ করতে পারবেন; চিরতরে তাঁর সেদিককার পথ বন্ধ করে দিতে রাজি হন নি তিনি কিছুতেই। বহু বছর পরে বিশপ লেফ্রয়ের এই সুবিবেচনার কথা কৃতজ্ঞচিত্তে স্বীকার করেছেন এণ্ডরুজ।

রবীন্দ্রনাথ, গান্ধী, এণ্ডরুজ

কবি রবীন্দ্রনাথ ও মহাত্মা গান্ধী— ভারতমাতার এ দুটি মহাপ্রাণ সন্তানের মধ্যে চিরবন্ধুত্বের সংযোগ স্থাপন করেন চার্লি এণ্ডরুজ। জেনারেল স্মাট্সের সঙ্গে রফানিষ্পত্তি হবার পর গান্ধীজি বিলাত গেলেন ইংরেজ ঔপনিবেশিক দপ্তরের সচিবের সঙ্গে দক্ষিণ-আফ্রিকার বিষয়ে আলাপ-আলোচনার জন্য। আফ্রিকা ত্যাগ করার আগে তিনি স্থির করেছিলেন বিলেত থেকে ভারতে ফিরে আসবেন। কিন্তু ফিনিক্স বিদ্যালয়ের ছাত্র ও শিক্ষকদের কোথায় রেখে যাবেন সেটিই ছিল সমস্যা।

এ বিদ্যালয়ের ছাত্রদের কোনো পরীক্ষার জন্য প্রস্তুত হতে হত না, কঠিন কায়িক পরিশ্রমের সঙ্গে ধর্ম ও নীতিশিক্ষা আর সাধারণ পাঠাভ্যাস করতে হত। গান্ধীজির পুত্রেরাও এখানকার ছাত্র। ছাত্র-অধ্যাপকে সবশুদ্ধ আঠারো-জন। ভারতে এসে এঁরা প্রথম গেলেন হরিদ্বার গুরুকুলে। সেখান থেকে এণ্ডরুজের মধ্যস্থতায় তাদের শান্তিনিকেতনে আনা হয় নভেম্বরের শেষভাগে (১৯১৪)।[১] মগনলাল গান্ধীর অধিনায়কত্বে তাঁরা এখানে থাকতেন। এই বিদ্যার্থীরা ও শিক্ষকগণ শান্তিনিকেতন আশ্রমে এক নূতন প্রাণ জাগিয়ে তোলেন।

সে সময় একটি পত্রে কবি গান্ধীজিকে জানান, ফিনিক্স আশ্রমের ছাত্রদের পেয়ে তিনি বিশেষ আনন্দিত হয়েছেন। উভয় বিদ্যালয়ের ছাত্রগণ একসঙ্গে বাসের ফলে তাঁদের যুক্তজীবনের সাধনার যোগসূত্র স্থাপিত হবে বলে তিনি এ পত্রে আশা প্রকাশ করেছেন। সম্ভবত এখানিই গান্ধীজিকে লেখা রবীন্দ্রনাথের প্রথম পত্র।[২]

---

১ রবীন্দ্রজীবনী ২য় খণ্ড (২য় সং), পৃ. ৩৯৬।

২ তদেব। গান্ধী-জয়ন্তী (অক্টোবর ১৯৪৪) উপলক্ষে প্রকাশিত *Gandhiji, His Life & Work* গ্রন্থে রবীন্দ্রহস্তাক্ষরের প্রতিলিপি মুদ্রিত (পৃ. ৩৭)।

১৯১৪ খ্রীস্টাব্দের ১৩ নবেম্বরে এণ্ডরুজ গান্ধীজিকে জানাচ্ছেন[১] যে, গুরুদেব তাঁকে লিখেছেন, ফিনিক্সের ছাত্রদের কাছে পেয়ে গান্ধীজির কাছে ধন্যবাদের ঋণ স্বীকার করা তাঁরই কর্তব্য, এ ঋণ পরিশোধের ক্ষমতা তাঁর নেই।

ছাত্রদের সম্বন্ধে গান্ধীজিকে নিরুদ্‌বিগ্ন রাখার জন্য তাঁকে আশ্বাস দিয়ে এণ্ডরুজ লিখছেন[২]—

> তোমার জীবনে যাই ঘটুক মনে রেখো এ-সব ছাত্ররা এখন আমার সবচেয়ে আপনার, আর চিরকালই তাই থাকবে।

দু বছর আগে গুরুদেবের ইউরোপ ও আমেরিকায় অবস্থানকালে ঠিক এই ভাবেই এণ্ডরুজ শান্তিনিকেতনের শিক্ষক ও ছাত্রদের দেখাশোনার ভার নিয়েছেন— বার বার দিল্লী থেকে এসে।

শান্তিনিকেতনের কাজে যোগ দেবার পর এখানকার কোনো কোনো সহকর্মীদের ব্যবহারে তিনি আঘাত পেয়েছিলেন। সরকারি গুপ্তচর মনে করে প্রথম দিকে শান্তিনিকেতনের কর্মীরা এণ্ডরুজ ও পিয়রসনের সহযোগিতাকে স্বচ্ছন্দচিত্তে গ্রহণ করতে পারেন নি। রবীন্দ্রনাথ সহকর্মীদের এই মনোভাবে অত্যন্ত ক্ষুব্ধ ও অসন্তুষ্ট হয়েছিলেন। আশ্রমে এই বিমুখতার হাওয়া তখনো বইছে। এমন সময় ১৯১৫ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে গান্ধীজি এলেন এখানে। তিনি এণ্ডরুজকে জানালেন যে, শান্তিনিকেতনের অনেকেই তাঁকে তখনো আপন বলে অন্তরে মেনে নেন নি। সে বিষয়ে সুধাকান্ত রায়চৌধুরী লিখেছেন[৩]—

> সেদিন এণ্ডরুজ সাহেবের কি নিদারুণ মর্মবেদনা।··· সারারাত্রি এণ্ডরুজ সাহেব ঘুমোতে পারেন নি··· শয়নগৃহের সামনের রাস্তায় পায়চারি করেই রাত কাটিয়ে দিলেন। কিন্তু পরে ধীরে ধীরে গান্ধীজিই তাঁকে নানা কাজে টেনে নিয়ে বুঝিয়ে দিলেন যে, সত্য স্বপ্রকাশ হলেও মানুষ ভ্রান্ত ধারণার দ্বারা চালিত হয়ে সত্যের দানকে গ্রহণ করতে পারে না— যে গ্রহণ করতে পারে না ক্ষতি হয় তারই।

ক্রমে এণ্ডরুজ তাঁর স্নেহশীল ব্যবহারে অধ্যাপকদের চিত্ত জয় করেন। যতই দিন যেতে লাগল আশ্রমবিদ্যালয়ের সঙ্গে তাঁর প্রীতির যোগ ততই ঘনিষ্ঠ

---

১ গান্ধীজিকে লেখা এণ্ডরুজের অপ্রকাশিত পত্র।

২ তদেব।

৩ 'রবীন্দ্র-প্রসঙ্গ', দীনবন্ধু এণ্ডরুজ স্মরণ সংখ্যা, পৃ. ১৯৫।

হয়ে উঠল। তাঁকে নিয়ে হাসিঠাট্টাও কম চলত না। নিজের জিনিস এবং অপরের জিনিস হারাবার তাঁর এক অসাধারণ ক্ষমতা ছিল। গুরুদেব বলতেন, 'এণ্ডরুজ নদীর মতো, এক পাড় ভাঙে অন্য পাড় গড়বার জন্য। তোমরা যদি কোনো জিনিস হারাতে চাও তো এণ্ডরুজকে দিয়ো।'

এণ্ডরুজ একবার দিল্লী যাবেন। রাতে গিয়ে সুধাকান্তবাবুর কাছ থেকে কম্বল চেয়ে এনেছেন।[১] দিল্লী থেকে ফেরার পর তাঁর বাবুর্চি জহুরি গিয়ে কম্বল ফেরত দিয়ে এল। কম্বল খুলে সুধাকান্তবাবু দেখেন, কোনায় নাম লেখা এস. কে. রুদ্র। এণ্ডরুজকে সে কথা জানাতেই হেসে বললেন, কম্বল দিয়েছিলে কম্বল ফেরৎ পেয়েছ, ব্যস, তোমার কম্বল কোথায় হারিয়েছি জানি না।··· রুদ্র সাহেবের কম্বলের অভাব নাই।

বড়দাদা দ্বিজেন্দ্রনাথের সঙ্গে এণ্ডরুজ প্রায়ই সন্ধ্যাযাপন করতেন।[২] দুজনেই ওয়াল্টার স্কটের ভক্ত এই যোগে তাঁদের বন্ধুত্ব। সদাপ্রসন্ন এই বৃদ্ধের উচ্চহাস্যের কলরোল, তাঁর রঙ্গরহস্যের চমক আর অকিঞ্চিৎকর বর্তমান যুগের প্রতি তাঁর অপরিসীম বিরূপতা এণ্ডরুজকে মুগ্ধ করত। বিশেষ করে তাঁর চিত্তের সরলতায় ও জ্ঞানের নিরভিমান প্রকাশে এণ্ডরুজ বিস্মিত ও অভিভূত হতেন। এই বৃদ্ধ দার্শনিকটি মধ্যে মধ্যে উপনিষদ্, ভগবদ্গীতা ও সারমন্ অন দ্য মাউণ্ট সম্বন্ধে তাঁর সঙ্গে আলোচনা করতেন। তাতেই এণ্ডরুজের চিত্ত তৃপ্তিতে ভরে উঠত।

প্রতি সপ্তাহে মন্দিরে ভাষণের পর রবীন্দ্রনাথ সে বিষয়ে এণ্ডরুজের সঙ্গে আলোচনা করতেন। মাঝে মাঝে তাঁর কাছে হিন্দু ঐতিহ্য ও উপনিষদের তাৎপর্য ব্যাখ্যা করতেন। রবীন্দ্রনাথের গান ও তাঁর গীতিকাব্যের চর্চা নিয়েও এণ্ডরুজ অনেক সময়ে কাটাতেন। সেই-সব রচনার সৌন্দর্যে মুগ্ধ হয়ে মাঝে মাঝে আশ্রমের বাইরে মাঠে গিয়ে তারাভরা আকাশের নীচে উচ্চকণ্ঠে গান গাইতে গাইতে এণ্ডরুজ একাকী হেঁটে বেড়াতেন। রবীন্দ্রকাব্য-সুধাপানে বিভোর হয়ে এণ্ডরুজের কবিচিত্ত উদ্‌বেল হয়ে উঠত। শুধু যে শব্দসংগীত তাঁর মনে দোলা লাগাত তা নয়, কবিতাগুলির ভাবৈশ্বর্যও তাঁকে অভিভূত করত। রবীন্দ্রসংগীতের গীতি-অর্ঘ্য, উপনিষদের মন্ত্র ও খ্রীস্টধর্মের বচনগুলি তাঁর মনে

১ 'রবীন্দ্র-প্রসঙ্গ', দীনবন্ধু এণ্ডরুজ স্মরণ সংখ্যা, পৃ. ১৯৫, ১৯৬।

২ Chaturvedi & Sykes, *Charles Freer Andrews*, পৃ. ১০৯।

একাকার হয়ে যেত। মাঠের মধ্যে একাকী ভ্রমণকালে সেগুলি মনে সংহত রূপ পেত। তাঁর এই ধ্যানগত উপলব্ধি থেকে পরে রচিত হয়েছিল Christ in the Silence (নীরবসাধনায় যীশুখ্রীস্ট) আর Christ & Prayer (যীশুখ্রীস্ট ও উপাসনা)। ১০ পৌষ ১৩২১ খ্রীস্টোৎসবের দিন আশ্রমে কবি সেবার "খ্রীস্টধর্ম" নামে প্রবন্ধটি পাঠ করেন।

১৯১৫ সালের ১৭ ফেব্রুয়ারি শ্রীযুক্তা কস্তুরবাকে নিয়ে গান্ধীজি শান্তিনিকেতনে আসেন। তখন কবি ছিলেন কলকাতায়। কিন্তু তাঁর নির্দেশমত আশ্রমের ছাত্র ও অধ্যাপকেরা গান্ধীদম্পতির যোগ্য অভ্যর্থনা করেছিলেন। স্টেশনে প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীর কামরায় তাঁদের না পেয়ে শান্তিনিকেতনের ছাত্ররা যখন নিরাশ হয়ে ফিরে আসছেন তখন এঁরা দুজন খালি পায়ে তৃতীয় শ্রেণীর কামরা থেকে নামলেন।[১] মাত্র দু দিন শান্তিনিকেতনে থেকে সেবার তাঁদের পুনা চলে যেতে হয় গোখলের মৃত্যুসংবাদে। পরে পুনা থেকে ৬ মার্চ যখন গান্ধীজি আবার শান্তিনিকেতনে এলেন সেদিনই ইতিহাসের সেই অবিস্মরণীয় ঘটনাটি ঘটে— গান্ধী-রবীন্দ্রনাথের প্রথম সাক্ষাৎকার।

আশ্রম পরিদর্শন করতে গিয়ে সেখানকার কতকগুলি বিধি-ব্যবস্থার প্রতি গান্ধীজির দৃষ্টি আকৃষ্ট হল। রান্না এবং যাবতীয় কাজকর্মে ভৃত্য ও পাচকের উপর নির্ভর না করে ছাত্র ও অধ্যাপকদের স্বাবলম্বী হবার উপদেশ দিলেন তিনি। ব্রাহ্মণ ছাত্রদের পৃথক পঙ্‌ক্তিতে ভোজন করতে দেখে গান্ধীজি বললেন, 'এ আচরণ আশ্রমধর্মবিরোধী।' রবীন্দ্রনাথ তাঁকে বলেন, কোনো ছাত্রের ধর্ম বা সমাজবিষয়ক কোনো মতে বা আচরণে তিনি কোনো বাধ্যবাধকতা দাবি করেন নি। কেননা অন্তর থেকে যে জিনিস গৃহীত না হয় বাইরের চাপে গ্রহণ করালে তার ফল ভালো হয় না। এ বিষয়ে এণ্ডরুজও রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে একমত ছিলেন। গান্ধীজির নির্দেশে ছাত্র-অধ্যাপকে মিলে যখন রান্নাবান্না ও বাসনমাজায় লেগে গেলেন— এণ্ডরুজও তাতে উৎসাহে যোগ দিয়েছিলেন। কিন্তু কোনোপ্রকার শপথ গ্রহণে তাঁর যে বিরুদ্ধ মত ছিল, সে কথাও তিনি সেবার গান্ধীজিকে জানিয়ে দিয়েছিলেন।

সবরমতী আশ্রমের একখণ্ড নিয়মাবলী গান্ধীজি এণ্ডরুজকে দেখতে পাঠালেন। অন্য নিয়ম সম্বন্ধে কিছু না বললেও চিরকুমারব্রত গ্রহণের

১ *The Modern Review*, March 1915, পৃ. ৩৬১।

শপথে এণ্ডরুজের আপত্তি ছিল। তিনি লিখলেন, 'হিন্দুধর্মের আদর্শ হল চতুরাশ্রমের মধ্য দিয়ে সন্ন্যাসে উপনীত হওয়া। জীবনটাকে নিঃস্ব রিক্ত নির্বীর্য করা নয়।'

১৯১৫ সালের ৮ মে রবীন্দ্রনাথের জন্মোৎসব উপলক্ষে এণ্ডরুজ কলকাতায় এসেছিলেন। সেদিনই একা শান্তিনিকেতনে ফিরে এসে অসুস্থ হয়ে পড়লেন। শোনা যায় পথে কাটা তরমুজ খেয়েছিলেন। তার ফলে আশ্রমে এসেই এশিয়াটিক কলেরায় আক্রান্ত হন। তাঁর বাবুর্চি জহুরি ও আশ্রমের চার-পাঁচটি ছাত্র তাঁর সেবাশুশ্রূষা করে। বোলপুরে তখন কোনো ডাক্তার ছিলেন না। বর্ধমান থেকে ডাক্তার এলেন পরদিন সকালে। সেবার অবস্থা এমন সংকটাপন্ন হয়েছিল যে তাঁর কবরস্থান পর্যন্ত নির্দিষ্ট করা হয়েছিল। 'তার' পেয়ে, কলকাতা থেকে রবীন্দ্রনাথ এসে পৌঁছলেন। অসহ্য যন্ত্রণা থেকে মুক্তি হবে ভেবে এণ্ডরুজ যখন মনে মনে মৃত্যুকামনা করছিলেন, ঠিক সেই সময় কবির শান্ত মুখশ্রী দেখে তাঁর বাঁচার ইচ্ছা ফিরে এল। কবি রোজ কয়েক ঘণ্টা করে এণ্ডরুজের কাছে এসে বসতেন। কিছু সুস্থ হলে পর কলকাতার উড স্ট্রীট নার্সিং হোমে তাঁকে পাঠানো হল। সেখানে গিয়েও মাঝে মাঝে কবি তাঁকে দেখে আসতেন। তার পরে স্বাস্থ্য-পুনরুদ্ধারের জন্য তাঁকে সিমলা পাঠানো হয়।

সিমলায় তাঁকে সেবার বহুদিন থাকতে হয়। সুশীল রুদ্র সে সময় তাঁর সঙ্গে ছিলেন। চিরদিনের চঞ্চল চার্লির স্বভাবের পরিবর্তন দেখে তিনি অবাক হলেন। কী ধীর গাম্ভীর্য, কী শান্ত সমাহিত ভাব। মৃত্যু-উপত্যকার ছায়া পেরিয়ে যীশুর প্রতি প্রেম তাঁর আরো গভীর হল, পেলেন পরম আনন্দ ও শান্তি। জুন ও অক্টোবরের মধ্যে এণ্ডরুজ কবিকে সেবারে যত চিঠি লিখেছেন তার মধ্যে তাঁর ঈশ্বরানুভূতিই বিশেষভাবে লক্ষ্য করি।

ইনভেরার্ম, সিমলা থেকে ১৯১৫ সালের ১৫ জুন লিখেছেন[১]—

মৃত্যুর পরেও মৃতব্যক্তির ব্যক্তিগত সংস্পর্শ এবং পূর্বপরিচিতির নিদর্শনের জন্য ইংরেজ কবি টেনিসনের মনে যে আকাঙ্ক্ষা ছিল— তা যে সম্পূর্ণ অর্থহীন ও অসুস্থ মনের পরিচায়ক— সে আপনি ঠিকই বলেছেন। এতে করে যে-প্রেম বস্তুতঃ অসীম, তার উপরে সীমারেখা টেনে দেওয়া হয়।··· সত্য ও সহজ

১ রবীন্দ্রনাথ-এণ্ডরুজ পত্রাবলী, পৃ. ২৪৩।

প্রেমের যিনি দেবতা, তিনি একে বন্ধনমুক্ত করতে চান। অবশেষে অহং-এর বন্ধন থেকেও তা মুক্ত হবে।

ধীরে ধীরে মনে এল আন্তরিক ঈশ্বরানুভবের রহস্যগভীরে প্রত্যক্ষ কর্ম-যোগের সমন্বয় সাধনের আগ্রহ। অনন্ত অক্ষর পুরুষের ধ্যানে নিবিষ্ট হয়ে তাঁর সৃজনবেদনাসঞ্জাত লীলা উপলব্ধি করার প্রয়াসী ছিলেন এণ্ডরুজ।[1]

একটি পত্রে গুরুদেবকে লিখলেন[2]—

আমার মনে হয় প্রেমই নিত্য সত্য— স্থান, কাল, রূপের অতীত— অথচ গতিনৃত্যপরতায় স্বপ্রকাশ।… এই প্রেমের প্রকাশ পাশ্চাত্যদেশে তীব্র আবেগে আর ভারতবর্ষে শান্তদাক্ষিণ্যে। ঈশ্বরের সম্বন্ধে আমাদের ধারণাও এই। সৎ বলতে কী বুঝি? এক দিকে গতি এবং অন্য দিকে স্থিতিশীল অনন্তস্বরূপের একের মধ্যে শান্তসমাহিতির সেই চিরন্তন রহস্য।

ক্রমশ শরীর যত সবল সুস্থ হয়ে উঠতে লাগল সেই চিরন্তন রহস্যের ভাবনা নব নব কর্মের এষণায় উদ্‌বুদ্ধ করল তাঁকে। ১৯১৫ সালের ৮ জুলাই তারিখে সিমলা থেকে কবিকে লিখছেন[3]—

সমগ্র ভারতের জনসাধারণকে যত রকম অন্যায়, অবিচার ও অত্যাচার সহ্য করতে হয় তার সবই দেখা যাবে এই সিমলাতে। এর নিষ্ঠুরতা চোখে দেখার দুঃখ থেকে আমি কেবল সাময়িক সান্ত্বনা পাই কর্মে ঝাঁপিয়ে পড়ে।… তবু এই যে অনন্ত দুঃখসমুদ্র— এর তীরে দাঁড়িয়ে দু-একটি বালুকা-কণা ইতস্তত নিক্ষেপ করা ছাড়া বেশি কিছু করার আমার সাধ্যই বা কি!

ফিজির আহ্বান

পরিস্থিতি অনুকূল না হলেও আপন যথাসাধ্য প্রয়াসে নিরস্ত হলেন না এণ্ডরুজ। আর-একবার মন টানতে লাগল ভারত-সীমার বাইরে নিপীড়িত ভারতীয়ের সেবা এবং ত্রাণব্রতে। এবারকার আত্মিক আহ্বান ফিজি দ্বীপে ভারতীয় চুক্তিদাসদের নির্যাতনমুক্তি সাধনায়।

---

১ ১০ সেপ্টেম্বর ১৯১৫ এলাহাবাদের পথে ট্রেনে বসে কবিকে লেখা পত্রের সংক্ষেপিত রূপ। দ্র. Chaturvedi & Sykes, *Charles Freer Andrews*, পৃ. ১১১।

২ তদেব।

৩ তদেব, পৃ. ১১১, ১১২। রবীন্দ্রসদনে রক্ষিত মূল পত্র।

গোপালকৃষ্ণ গোখলে একদিন এণ্ডরুজের মনকে টেনেছিলেন এ পথে। নিজে তিনি আফ্রিকার চুক্তিদাস-প্রথার বিরুদ্ধে সংগ্রামে লিপ্ত হয়েছিলেন। তাঁরই প্রেরণায় এণ্ডরুজ গিয়েছিলেন মহাত্মা গান্ধীর সহযোগিতার জন্য দক্ষিণ-আফ্রিকায়। আজ গোখলে নেই; দেশজননীর সেবায় নিবেদিতপ্রাণ সেনানী ক্লান্তজর্জর দেহে প্রাণ বিসর্জন দিয়েছেন। এণ্ডরুজ আবার পথ চলতে লাগলেন, যেন গোখলের অসমাপ্ত যাত্রার পরিসমাপ্তি কামনা করে।

ফিজির খবর এণ্ডরুজের কাছে পৌচেছিল এবার রোগশয্যায়— দুখানি বইয়ের আকারে। একটি বই *Fiji of Today*[১]। সে পুস্তকে প্রশান্ত মহাসাগরে ফিজি দ্বীপের অবস্থানের ভৌগোলিক গুরুত্ব এবং সেখানে ভারতীয়দের বসবাস সম্বন্ধে নানা তথ্য ও চুক্তিদাসদের অবস্থার যথাযথ বর্ণনা পড়ে স্তম্ভিত হন এণ্ডরুজ। অপর বইটি হিন্দী; নাম 'ফিজিতে আমার একুশ বছর'। লেখক তোতিরাম সনাধ্যায়কে শৈশবে বেনারস থেকে ভুলিয়ে ফিজি নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। তাঁরই অভিজ্ঞতার কাহিনীতে বইটি ভরা। ফিজিতে ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক কারখানাগুলির মালিক ছিলেন অস্ট্রেলিয়ারই ধনী ব্যক্তিগণ। এঁদেরই হাতে ছিল শ্রমিকচালনারও যথেচ্ছ অধিকার।

খ্রীস্টনির্দেশেই যেন আর্তমানবমুক্তির নূতন সাধনপথে তাঁর যাত্রা শুরু হল —ভ্রূক্ষেপহীন। রোগদুর্বল শরীর নিয়েও এণ্ডরুজ সে সময় দুঃসাধ্য পরিশ্রম করে গেছেন। শর্তবন্দী কুলিপ্রথার বিরুদ্ধে নিজের হাতে লিখে স্মারকলিপি পাঠিয়েছেন স্বয়ং ভাইসরয় এবং নানা প্রাদেশিক গভর্নরদের কাছে। দুর্বল শরীরে লাঠি ভর দিয়ে চলে গেলেন ভাইসরয় লর্ড হার্ডিঞ্জের কাছে। জানালেন, তিনি নিজেই ফিজি যাবেন, ওখানকার চুক্তিবদ্ধ শ্রমিকের অবস্থা স্বচক্ষে দেখে এসে রিপোর্ট জানাবেন ভাইসরয়কে।

এ-সব কাজে এণ্ডরুজ যখন প্রায় মগ্ন, এমন সময় একটি জাগ্রতস্বপ্ন তাঁকে তাঁর কর্তব্য সম্বন্ধে সচেতন করল। তাঁর নিজের বর্ণনায় ঘটনাটি হল এই[২]—

> সিমলায় একদিন মধ্যাহ্নে এ-সব কথা চিন্তা করতে করতে বারান্দায় ইজিচেয়ারে শুয়ে আছি। তখন কিন্তু ঘুমোই নি আমি। খোলা চোখে স্পষ্ট দেখতে পেলাম সেই কুলিটাকে— নাটালে মহাত্মা গান্ধীর কাছে যে আশ্রয়

---

১ লেখক Rev. J. W. Burton (১৯১০)।

২ एक भारतीय हृदय [बनारसीदास चतुर्वेदी], भारतभक्त एण्डरूज, पृ. १८७।

নিয়েছিল। পিঠে তার বেত্রাঘাতের চিহ্ন। ওর মুখের দিকে আমি তাকিয়ে রয়েছি, দেখি যে সে মুখ বদলে গিয়ে দেখা দিল আমার প্রভু যীশুর বেদনা-কাতর মুখ। তিনি অনেকক্ষণ একদৃষ্টে আমার দিকে চেয়ে রইলেন। ক্রমে ধীরে ধীরে সেই দৃশ্য মিলিয়ে গেল। তখনই বুঝলাম চুক্তিবদ্ধ দরিদ্র ভারতীয় শ্রমিকই আমার যীশুখ্রীস্ট, এখন এর সেবাই হবে আমার জীবনের প্রধান কর্ম।

সেদিনই (জুলাই ১৯১৫) এণ্ড্রুজ লিখলেন 'The Indentured Coolie' কবিতাটি—

There he crouched.
Back and arms scarred, like a hunted thing,
Terror-stricken.
All within me surged towards him,
While the tears rushed.
Then, a change.
Through his eyes I saw thy glorious face—
Ah, the wonder!
Calm, unveiled in deathless beauty
Lord of sorrow.

এর পর ফিজি যাবার ব্যাপারে এণ্ড্রুজ গুরুদেবের মত চাইলে সানন্দে তিনি তাঁকে আশীর্বাদ জানালেন। পিয়রসন এবারেও সঙ্গে যাবার জন্য তৈরি হয়ে নিলেন। গরমের ছুটিতে তিনিও রোগে ভুগেছেন এবার। তাই উভয়েরই স্বাস্থ্যের জন্য গুরুদেব চিন্তিত রইলেন। তবু তাঁদের এই যাত্রা আর কবির নিজের বিশ্বমৈত্রী ও ভ্রাতৃত্বের আদর্শ— উভয়ের উদ্দেশ্যই যে এক তা তিনি গভীরভাবে অনুভব করেছিলেন। তাই অভিযাত্রীযুগল কবির কাছে বিদায় নিতে গেলে এবারও তিনি উপনিষদের দুটি শ্লোক উপহার দিলেন এণ্ড্রুজকে। শ্লোক দুটি হল—

১ আনন্দাদ্ধ্যেব খল্বিমানি ভূতানি জায়ন্তে, আনন্দেন জাতানি জীবন্তি, আনন্দং প্রয়ন্ত্যভিসংবিশন্তি।[১]

১ 'ব্রহ্ম আনন্দস্বরূপ। সেই আনন্দ হতেই সমস্ত উৎপন্ন, জীবিত, সচেষ্ট এবং রূপান্তরিত হচ্ছে।' দ্র. "কর্ম", শান্তিনিকেতন প্রথম খণ্ড, পৃ. ৮৯।

২ ওঁ ভূর্ভুবঃ স্বঃ তৎসবিতুর্বরেণ্যং ভর্গো দেবস্য ধীমহি ধিয়োযোনঃ প্রচোদয়াৎ।[১]

১৯১৫ খ্রীস্টাব্দের ১৭ সেপ্টেম্বরে এঁরা দুজনে ফিজি যাবার জন্য শান্তিনিকেতন ত্যাগ করেন।[২] যাবার সময় লর্ড হার্ডিঞ্জের কাছ থেকে কোনো সুপারিশপত্র তাঁরা নেন নি। কেননা সরকারি প্রতিনিধিরূপে নয়, সম্পূর্ণ স্বাধীনভাবেই তাঁরা ফিজি যেতে চেয়েছিলেন। লর্ড কারমাইকেল তার কিছুদিন পূর্বে অস্ট্রেলিয়া থেকে এসেছেন। তিনি অস্ট্রেলিয়ার কয়েকজন প্রসিদ্ধ লোকের কাছে এঁদের পরিচয়পত্র লিখে দিলেন এই বলে যে, এঁরা দুজন মানবসেবার প্রেরণায় উদ্‌বুদ্ধ হয়ে ফিজি যাচ্ছেন, সেখানকার অবস্থা নিজেদের চোখে দেখতে।[৩]

এ চিঠিগুলি পেয়ে এণ্ডরুজ ও পিয়রসনের কাজের সহায়তা হয়েছিল খুব। ভারত ত্যাগ করার পূর্বে এণ্ডরুজ একবার প্রাথমিক পরিক্রমায় বেরিয়ে পড়লেন। উদ্দেশ্য— এলাহাবাদ ও কলকাতার মধ্যে বিদেশে শ্রমিক চালান দেবার যত কেন্দ্র আছে, সব পর্যবেক্ষণ করে আসবেন স্বচক্ষে। আড়কাটিরা[৪] কত রকম হীন উপায়ে সরল গ্রামবাসীদের প্রবঞ্চিত করে তারই খোঁজ নিয়ে এলেন। প্রয়োজন হলে সম্মোহনবিদ্যার সাহায্য নিতেও তারা ইতস্তত করে না।[৫] শিক্ষিত ছেলেদের শিক্ষক বা কেরানীর 'পদ লাভের প্রতিশ্রুতি দিত— তরুণ শিখদের পুলিসের চাকরির! আর হতভাগ্য সরল চাষী যুবকের দল! তারা জানতই না, ফিজির বারো-আনা আসলে ভারতের চার-আনা রোজের সমান। শ্রমিক নারী চালানের জন্য আড়কাটিরা আরো বেশি টাকা পেত। তাই তাদের হয় চুরি করত, নয় তো ভয় দেখিয়ে হাত করত।

১ 'বিশ্বসবিতা এই-সমস্ত ভূলোক ভুবর্লোক স্বর্লোককে যেমন প্রত্যেক নিমেষেই প্রকাশের মধ্যে প্রেরণ করিতেছেন, তেমনি তিনি আমার বুদ্ধিবৃত্তিকে প্রতি নিমেষে প্রেরণ করিতেছেন, তাঁহার প্রেরিত এই জগৎ দিয়া সেই জগদীশ্বরকে উপলব্ধি করি, তাঁহার প্রেরিত এই বুদ্ধি দিয়া সেই চেতনস্বরূপকে ধ্যান করি।' দ্র. "নববর্ষ", ধর্ম, পৃ. ৯৮।

২ রবীন্দ্রজীবনী ২য় খণ্ড (২য় সং), পৃ. ৪৩২।

৩ এক ভারতীয় হৃদয় [বনারসীদাস চতুর্বেদী], ভারতভক্ত এণ্ডরুজ, পৃ. ১৮৯।

৪ আড়কাটি— খনি, কারখানা ও চা-বাগানের জন্য মজুর-সংগ্রহকারী।

৫ Chaturvedi & Sykes, *Charles Freer Andrews*, পৃ. ১১৩, ১১৪।

১৯১৫ খ্রীস্টাব্দের সেপ্টেম্বরে এণ্ডরুজ ও পিয়রসন যাত্রা করলেন জাহাজ-পথে। জাহাজে নানা অভিজ্ঞতার বর্ণনা করে গুরুদেবকে চিঠি লেখেন এণ্ডরুজ একের পর এক। সমুদ্রপীড়ায় আচ্ছন্ন হয়েছিলেন তিনি, পিয়রসন তাঁর নতুন হোমিওপ্যাথি বিদ্যা প্রয়োগ করেও বন্ধুকে সারাতে পারলেন না। কিন্তু উইলির সঙ্গে লঘু মেজাজে রবীন্দ্রকবিতা আবৃত্তি করতেই যেন বেশি ভালো লাগে। সব ভুলে দুই বন্ধুতে মিলে আবৃত্তি করতে লাগলেন—

ভালোমন্দ যাহাই আসুক

সত্যেরে লও সহজে।

জাহাজে প্রথম রাতে যে স্বপ্নটি দেখলেন সে বিষয়ে গুরুদেবকে লিখেছেন[১]—

শান্তিনিকেতনে বিদায়-সংবর্ধনার সময় আমাকে সাদা ফুলের মালাটি পরাতে গিয়ে আপনি যেন বললেন— 'এই তোমার যজ্ঞোপবীত, আমি তোমাকে দ্বিজত্বে বরণ করে নিলাম।' তার পরে আপনি আমাকে গায়ত্রী মন্ত্র দান করলেন। গুরু হিসাবে আপনাকে কিছু দেবার জন্য ব্যগ্র হয়ে আমি জিজ্ঞাসা করলাম— 'আপনাকে আমি কী দেব?' স্পষ্ট শুনতে পেলাম আপনি হেসে বললেন, 'এই যাত্রাশেষে ফিরে এসে তুমি আমাকে গুরুদক্ষিণা দেবে।' ঘুম ভেঙে গেল।

জাহাজে ইংরেজ-দুহিতাদের উগ্র আধুনিকতা ও অশালীন চালচলন লক্ষ্য করে বিবাহ সম্পর্কে এণ্ডরুজ তাঁর স্পষ্ট অভিমত ব্যক্ত করে গুরুদেবকে এক পত্র লেখেন ৫ অক্টোবর তারিখে।[২] তিনি লিখছেন—

চিন্তায় ধর্মে কর্মে ইউরোপীয় ও ভারতীয়ের যে পার্থক্য তার মূলে রয়েছে উভয়ের বিবাহপ্রথা। ভারতীয় খ্রীস্টান-সমাজ প্রেম ও বিবাহ ব্যাপারে পাশ্চাত্য ধারণাগুলি যেরূপ দ্রুত আয়ত্ত করছেন, তা দেখে আমার আতঙ্ক হয়। অথচ ভারতীয় হিন্দুসমাজের বিবাহব্যবস্থা যেমন সুস্থ, তেমনি সুন্দর। প্রাপ্তবয়স্ক ছেলেমেয়ের বিবাহ-অনুষ্ঠানের আয়োজন করছেন মাতাপিতা— এতে সহজেই অন্তরে প্রেমের স্ফুরণ হয়।

১ শান্তিনিকেতন রবীন্দ্রসদনে রক্ষিত পত্রটি এখনো অপ্রকাশিত।

২ ৫ অক্টোবর ১৯১৫ 'মেডিনা' জাহাজ থেকে রবীন্দ্রনাথকে লেখা চিঠির সংক্ষেপিত তথ্য। অপ্রকাশিত পত্রটি রবীন্দ্রসদনে রক্ষিত।

নিজের সম্বন্ধে চিন্তা করে এই পত্রেই গুরুদেবকে লিখছেন—

আপনার সঙ্গে কথা বলে বুঝেছি বিবাহ সম্বন্ধে আপনার আদর্শও মাতৃত্বের সঙ্গে জড়িত। আমি জানি বিবাহ যদি আমি কখনো করি, —এই মনোভাব থেকেই করব, পাশ্চাত্য চিন্তাধারার প্রেরণায় কখনোই নয়। নারীত্বের প্রতি আমার মনে শ্রদ্ধা রয়েছে— কন্যা নির্বাচন যদি যথার্থ হয় তবে বিবাহের পরে ক্রমশ প্রেমের মধ্যে আমার অন্তর জাগ্রত হয়ে উঠবে— এ বিষয়ে আমার সন্দেহ নেই।

জাহাজে বসে, আমার দেশের মেয়েদের কাছে থেকে দেখে, বিবাহ বিষয়ে চিন্তা করে বুঝেছি— ভারতে যদি আমাকে থাকতে হয় তবে স্বদেশের মেয়ে বিয়ে করা আমার চলে না। আমার বয়স এখন চুয়াল্লিশ। অন্যের জীবনের সঙ্গে নিজেকে জড়ানো বোধ হয় আর উচিত হয় না। ভারতবর্ষকে যখন নিজের দেশ বলে মেনেছি, এমন কোনো কিছু করব না, যাতে আমার ভারতসেবার কাজে বাধা পড়ে।

তবে যদি কোনো ভারতীয় কন্যাকে বিবাহ করার সম্ভাবনা থাকে, সে বিষয়ে একটি কথা আমার মনে এসেছে। কথাটি আপনাকে ছাড়া পৃথিবীর কোনো দ্বিতীয় ব্যক্তিকে আমি জানাই নি। ভারতীয় খ্রীস্টান ডাক্তার মিস্ দত্তর কথা ভাবছি। আপনার কি কখনো মনে হয়েছে যে আমি তাঁকে বিবাহ করতে পারি? আপনার প্রতি তাঁর শ্রদ্ধা ভক্তি বিশ্বাস দেখে আমি মুগ্ধ হয়েছি। তা ছাড়া তাঁর সেবাভাব, আত্মত্যাগ ও সংসারে অনাসক্তি— এ-সব গুণেও আমি আকৃষ্ট। আপনাকে আমি পিতার অধিক করে মানি, তাই আমার এই গোপন চিন্তাটি আপনার কাছে প্রকাশ না করে পারলাম না। যদি বিবাহ সম্ভব মনে করেন, তবে তাঁর সম্বন্ধে খোঁজখবর নেবেন, যোগাযোগ রক্ষা করবেন। এবার কলকাতায় যখন আপনি তাঁর কথা বলেছিলেন তখনই চিন্তাটা আমার মাথায় জেগেছিল। আর জাহাজে ইংরেজ মেয়েদের দেখে তুলনায় তাঁর কথা মনে পড়ছে। তবে বিবাহ-ব্যাপারে এটি একটি চিন্তা মাত্র— বিশেষ কোনো আগ্রহ বা ইচ্ছা নয়।

১০ অক্টোবরের চিঠিতেও দেখি এ বিষয়ে গুরুদেবকে আবার লিখেছেন; নিজের রুগ্‌ণ স্বাস্থ্য ও অনিশ্চিত আয়ের কথা চিন্তা করে কোনো ঝুঁকি নিতে দ্বিধা করছেন মনে হয়।[১] গুরুদেব বুঝেছিলেন যে বিবাহের দায়িত্ব নেওয়া

---

১ ১০ অক্টোবর ১৯১৫, জাহাজ থেকে কবিকে লেখা রবীন্দ্রসদনে রক্ষিত অপ্রকাশিত পত্র।

এণ্ডরুজের পক্ষে সম্ভব নয়। কারণ তিনি সম্পূর্ণ আপনভোলা সন্ন্যাসী প্রকৃতির মানুষ। আর্তের ক্রন্দন চিরদিনই তাঁকে সংসার থেকে বিচ্ছিন্ন করে রাখবে। শোনা যায়, তিনি নাকি হেসে বলেছিলেন— 'একটি চিররুগ্ণ স্ত্রী হলে বরং চার্লিকে ঘরে টানতে পারবে। তাঁর সেবার প্রয়োজনে তিনি গৃহে আবদ্ধ থাকবেন।'

জাহাজের যাত্রীরা বেশির ভাগ অস্ট্রেলিয়াবাসী। এণ্ডরুজ-পিয়রসনের ভারতীয় পোশাক-পরিচ্ছদ তাদের চোখে মোটেই কেতাদুরস্ত নয়। তা ছাড়া দু-বন্ধুতে মিলে এমন-সব কথাবার্তা বলতেন যাতে রীতিমাফিক-আচরণে-অভ্যস্ত পাশ্চাত্য মনে হঠাৎ ধাক্কা লাগত। অথচ সহযাত্রীদের যত অবাক করে দিতেন ততই এঁরা মজা পেতেন।

ফিজির কর্মক্ষেত্রে

মেলবোর্ন আর সিডনিতে পৌঁছে কিন্তু তাঁরা প্রচুর আদর-আপ্যায়ন পেয়েছিলেন। এণ্ডরুজ লিখছেন তিনি সেখানে বিস্মিত আনন্দে আবিষ্কার করেন যে, সুশিক্ষিত অস্ট্রেলিয়ানদের অনেকেই রবীন্দ্রনাথের ইংরেজি গীতাঞ্জলির সঙ্গে পরিচিত। আর তাঁরা দুজনে রবীন্দ্রবন্ধু এ কথা জানামাত্র সে দেশের বিদগ্ধ সমাজের দ্বার তাঁদের কাছে উন্মুক্ত হয়ে গিয়েছিল।[১]

অন্যপক্ষে এত-সব সত্ত্বেও চিনিশোধনের ঔপনিবেশিক কারখানার অফিসারদের ব্যবহারে কিন্তু জাতিগত ঔদ্ধত্য ও সন্দেহই প্রকাশ পেয়েছিল। ভারতের জাতীয় কংগ্রেসের বন্ধু হিসেবে তাঁরা এসেছেন শুনে ওই-সব অফিসাররা বলেন, 'পরাধীন জাতির কোনো অধিকার নেই এভাবে আন্দোলন সৃষ্টি করার।'[২]

---

১ 'মেলবোর্নের চিঠি', শিবনারায়ণ রায়, দেশ পত্রিকা, ১০ জানুয়ারি ১৯৭০।

মেলবোর্ন থেকে পত্রলেখক জানিয়েছেন— 'শঙ্খ' কবিতার রবীন্দ্রনাথের স্বহস্ত-লিখিত ইংরেজি অনুবাদের খসড়াটি পিয়রসন মেলবোর্নের রবীন্দ্রানুরাগী দার্শনিক অধ্যাপক গিব্‌সনকে উপহার দেন। এণ্ডরুজ ও পিয়রসন বুঝেছিলেন ফিজিতে কুলিদের অবস্থার উন্নতির জন্য যদি জনমত গড়ে তুলতে হয় তবে অস্ট্রেলিয়ার চিন্তাশীল হৃদয়বান অধিবাসীদের তাঁদের দায়িত্ব সম্বন্ধে সচেতন করে তুলতে হবে, কেননা ফিজির চিনির ব্যাবসা অস্ট্রেলিয়ান চিনিশোধন কোম্পানির দখলে।

২ দ্র. ২৩ অক্টোবর ১৯১৫ কবিকে লেখা পত্র, Chaturvedi & Sykes, *Charles Freer Andrews*, পৃ. ১১৫।

একদিন পাঁচ ঘণ্টা ধরে এরকম বাদানুবাদের পর ব্যর্থতাবোধ প্রবল হলে শহরের এক উদ্যানে গোলাপ ও লাইলাকের সারির মাঝখানে বসে এণ্ডরুজ বিক্ষুব্ধ চিত্তের প্রশান্তি সন্ধানে মগ্ন হলেন। সারারাত তবু কাটল তাঁর বিনিদ্র যন্ত্রণায়।

অস্ট্রেলিয়া থেকে যাত্রা শুরু ফিজির পথে। নবেম্বর মাসের এক সূর্যালোকিত প্রভাতে ফিজির পাহাড়গুলি উত্তর দিগন্তে তাঁদের চোখের সামনে ভেসে উঠল। জাহাজ যত তীরের দিকে ভিড়তে লাগল ততই দ্বীপটির সৌন্দর্য স্পষ্ট প্রতীয়মান হয়ে উঠল আত্মভোলা দুই বন্ধুর মুগ্ধ চোখের সামনে।

এণ্ডরুজ ও পিয়রসন যখন ফিজি পৌছলেন ঠিক সেই সময় কিছুদিনের জন্য সেখানকার গভর্নর হয়েছিলেন হাট্‌সন্। স্থায়ী গভর্নর অ্যাস্‌কট তখন বিলাত গেছেন। হাট্‌সন্ লোক ভালো, তাই এঁদের দুজনকে ফিজিতে কাজ করার পুরো স্বাধীনতা দিয়েছিলেন।[১]

যে বিশপের গৃহে এঁরা অতিথি হয়েছিলেন, তিনিও ছিলেন অতি সজ্জন। ভারতীয় কুলিরা তাঁর গৃহে এসে এণ্ডরুজ ও পিয়রসনের কাছে নিজেদের অবস্থা বিবৃত করে যেতে পারত। এতে বিশপ কখনো কোনো আপত্তি করেন নি।[২]

প্রথমে কিন্তু অবস্থা ছিল বিপরীত। এণ্ডরুজ ও পিয়রসন ফিজি পৌছতেই সেখানকার ভারতীয় শ্রমিকদের মধ্যে এক বিচিত্র ভয়ের সঞ্চার হয়েছিল। তারা জিজ্ঞাসা করতে লাগল, 'সাহেব, আপনারা কি কুলি এজেণ্ট?' পরে যখন পরিচয় জানতে পারল তখন 'কলকাতার সাহেব' বলে এঁদের তারা ডাকত— আর দূর দূর থেকে আসত নিজেদের দুঃখের কথা শোনাবার জন্য।

এণ্ডরুজ ও পিয়রসন ফিজিতে মাত্র পাঁচ সপ্তাহ ছিলেন। আফ্রিকার মতো এখানেও পরস্পরের মধ্যে কাজ ভাগ করে নিয়েছিলেন তাঁরা যাতে অল্প সময়ে বেশি কাজ করতে পারেন। কাজের শেষে একটি পূর্ণাঙ্গ প্রতিবেদন তাঁরা ঔপনিবেশিক সংঘের কর্মসমিতিতে উপস্থিত করলেন ৭ ডিসেম্বরে। উদ্‌ধৃত কোনো সাক্ষ্য প্রমাণ নিয়ে সংশয় উপস্থিত হলে তা পুনর্বিবেচনার প্রতিশ্রুতিও

---

১ एक भारतीय हृदय [बनारसीदास चतुर्वेदी], भारतभक्त एण्डरूज, पृ. १८९।

২ Report of Indentured Labour in Fiji by C. F. A. & W. W. P., *The Modern Review*, June 1916, পৃ. ৬২০।

এণ্ডরুজ প্রথমাবধি দিয়ে রেখেছিলেন। তা ছাড়া চুক্তিমুক্ত ভারতীয় শ্রমিক ফিজিতেই থেকে যেতে চাইলে তার জন্য জমি বিলি করবার সুষ্ঠু ব্যবস্থা করেছিলেন কোনো কোনো চিনিশোধনের ঔপনিবেশিক কোম্পানি ; ভারতীয় সমাজে পানবিরোধী আইন প্রবর্তনেও তাঁরা উদ্‌যোগী হয়েছিলেন। শুধু তাই নয়, কোনো কোনো মালিক চুক্তিবদ্ধ শ্রমিককেও অপ্রত্যাশিত উদার আচরণে তৃপ্ত রেখেছেন ; এ-সব তথ্যই এণ্ডরুজ অকপটে উল্লেখ করেছিলেন ওই অভিযোগমূলক প্রতিবেদনের পৃষ্ঠায়। সব কিছু মিলে এণ্ডরুজের নিরপেক্ষ তদন্তের সত্যতা ফিজি সরকারেরও অস্বীকার করার উপায় ছিল না।

ফিজি থেকে ফেরার পথে পিয়রসনের সাহায্যে রিপোর্ট লেখা শুরু করেন। ভাইসরয়ের কাউন্সিলে তাঁদের বক্তব্য পেশ করতে হবে। তাই তাড়াতাড়ি রিপোর্টটা ছাপানো দরকার। সিডনি পৌঁছতে তার পেলেন পিতার অবস্থা উদ্‌বেগজনক। তখনই মনে পড়ে গেল দক্ষিণ-আফ্রিকায় থাকাকালীন মায়ের মৃত্যুসংবাদ পাবার কথা। মেলবোর্নে গিয়ে খবর পেলেন পিতার জীবনের সংকটকাল পেরিয়ে গেছে।

ভারত-প্রত্যাবর্তন : ফিজি প্রয়াসের জয়

ফিজির কাজ সমাপ্ত করে এণ্ডরুজ ও পিয়রসন ভারতে ফিরলেন। একটা দিন কলকাতায় অবস্থান করে কবির সঙ্গে সাক্ষাতের পর এণ্ডরুজ দিল্লী চলে যান। লর্ড হার্ডিঞ্জকে রিপোর্টটি দেখালে তিনি বললেন চুক্তিবদ্ধ শ্রমের পদ্ধতি রদ করার অনুমতি চেয়ে তিনি ইণ্ডিয়া অফিসে তার করবেন।[১] অতঃপর গোপালকৃষ্ণ গোখলের স্মৃতিতে উৎসর্গ করে এণ্ডরুজ-পিয়রসনের এই ঐতিহাসিক প্রতিবেদনটি প্রকাশিত হল ১৯১৬ খ্রীস্টাব্দের ১৯ ফেব্রুয়ারি তারিখে।[২] এর প্রতি পৃষ্ঠায় লিপিবদ্ধ রয়েছে ফিজিবাসী ভারতীয়ের নৈতিক অধঃপতনের অজস্র প্রত্যক্ষ উদাহরণ। কী অপরিসীম দুঃখবেদনায় ক্লিষ্ট হয়ে একদা উন্নত চরিত্রের এই অবমানিত লোকগুলি ক্রমশ হত্যাকারী বা আত্মঘাতীতে পরিণত হল তারই সুস্পষ্ট যথার্থ বর্ণনা। স্বার্থান্ধ কর্তৃপক্ষের অধীনে শ্রমিকমজুরদের প্রবঞ্চিত জীবন, দৈবদুর্ঘটনায় আহত পঙ্গু শ্রমিকদের ক্ষতিপূরণদানের দায়িত্বে

---

১ एक भारतीय हृदय [बनारसीदास चतुर्वेदी], भारतभक्त एण्डरूज, पृ. १२४।

২ Chaturvedi & Sykes, *Charles Freer Andrews*, পৃ. ১১৭।

পর্যন্ত তাদের নিষ্ঠুর অস্বীকৃতি— এ-সবের বিরুদ্ধে তীব্রকঠোর সমালোচনায় তাঁদের লেখনী মুখর হয়েছে। এণ্ডরুজের বীরহৃদয় ফিজিদ্বীপে নারীত্বের অবমাননা দেখে কাতর হয়েছিল। রিপোর্টে তিনি লিখছেন[১]—

নাবিকহীন ছোটো একখানি খেয়াতরী নদীর প্রবল প্রবাহে ধাক্কা খেয়ে অতলে নেমে যাচ্ছে— এই রূপকেই কেবল ফিজির হিন্দু শ্রমিক রমণীর জীবনের সাদৃশ্য মেলে। একটি পুরুষকে ত্যাগ করে এরা অন্য পুরুষের কাছে চলে যায়। হিন্দু পুরুষদের সমাজও এখানে ছিন্নভিন্ন, গ্রাম্যজীবনের সংগঠন ভেঙেচুরে গেছে।··· হিন্দু ধর্মমতে যে বিবাহ সম্পন্ন হয়েছে তার প্রতি এদের বিন্দুমাত্র শ্রদ্ধা নেই। স্ত্রী এখানে ক্রয়বিক্রয়ের জিনিস হয়েছে। এর ফলে নরহত্যা ও আত্মহত্যার পাপে তারা লিপ্ত হচ্ছে।

ভারতীয় আইন-সভায় ১৯১৬ সালের ২০ মার্চ তারিখে লর্ড হার্ডিঞ্জ ঘোষণা করেন, 'মহামান্য ব্রিটিশ সরকারের প্রতিশ্রুতিক্রমে চুক্তিদাসত্বের সম্পূর্ণ বিলোপ ঘটানো সম্ভব হবে। অন্তর্বর্তীকালে কেবল বিকল্প ব্যবস্থা কার্যকর করারই অপেক্ষামাত্র।'[২]

ফিজিতে এণ্ডরুজের দোভাষী ছিলেন মিঃ এন. বি. মিত্র। লর্ড হার্ডিঞ্জের ঘোষণাটির খবর শুনে সেইদিনই এণ্ডরুজ তাঁকে লিখলেন, 'আজ আমরা ঈশ্বরের অপার করুণায় মুগ্ধ ও অভিভূত। তাঁর মহান কর্মে যোগ দেবার অধিকার দিয়ে তিনি আমাদের ধন্য করেছেন।' ১৯১৬ খ্রীস্টাব্দের ২৪ মার্চ পিয়রসন শান্তিনিকেতন থেকে লিখছেন— 'কাল খবরটি আসা মাত্র আশ্রম-বিদ্যালয়ের ছুটি হয়ে গেল। তখন শুরু হল আমাদের সঙ্গে মিলে ছাত্রদের আনন্দোৎসবের পালা। সেই সময় আমার প্রাণও উৎসাহে গান গেয়ে ওঠে Joy Joy Joy Jai Jai Jai— কী আনন্দ, কী আনন্দ, জয়, আমাদের জয়।'[৩]

কিন্তু এত সবের পরেও এণ্ডরুজকে সর্বাপেক্ষা ব্যাকুল করে তোলে কুলি লাইনের শিশুদের ভবিষ্যতের চিন্তা। এ-সব আর্ত মানবসন্তান শৈশব থেকেই রোগভোগে, দুঃখে তাপে জীর্ণ। তখন নিজের একান্ত-প্রিয় শিশুদের সঙ্গে প্রতিতুলনার কথা মনে এসে যায়। ফিজি আসার পথে নিউজিল্যাণ্ডের

---

১ এক ভারতীয় হৃদয় [বনারসীদাস চতুর্বেদী], ভারতভক্ত এণ্ডরুজ, পৃ. ১৯০, ১৯১।

২ Chaturvedi & Sykes, *Charles Freer Andrews*, পৃ. ১১৬।

৩ তদেব।

ক্রাইস্টচার্চে কনিষ্ঠতমা ভগ্নী ম্যাগির সংসারে এণ্ডরুজ তিনদিন বাস করেছিলেন।[1] তিনটি ক্ষুদ্র শিশু পরিবৃত ম্যাগিকে দেখে তাঁর নিজ শৈশবস্মৃতি জাগ্রত হত। ম্যাগির হাবভাব, কথাবার্তা, চোখের চাউনিটি পর্যন্ত পরলোকগত মাতাকে স্মরণ করিয়ে দেয়। চার্লিমামার গায়ের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে উৎসুক উজ্জ্বল চোখ মেলে শিশুরা শুনতে চাইত মায়াপুরী ভারতের অপূর্ব কাহিনী। সুখে স্বাস্থ্যে পরিপূর্ণ চেহারা তাদের। কুলি লাইনের ছেলেদের দেখে ম্যাগির ছেলেদের আনন্দময় শৈশবের চিত্র তাঁর চোখে ভেসে উঠত। বিচলিত হতেন ভারতীয় শ্রমিক শিশুগুলির দুরবস্থা ভেবে। শৈশবের সরলতা পর্যন্ত তারা হারিয়ে বসেছে— তবে আর কী রইল তাদের ?[2]

মনে পড়ে যায়, শিশুদের যারা কষ্ট দেয় তাদের সম্বন্ধে প্রভু যীশু বলেছেন— গলায় পাথর বেঁধে এদের সমুদ্রের জলে নিক্ষেপ করা প্রয়োজন। মানবপুত্রের করুণাতুর চোখ-দুটিতে যেন ক্রোধের অগ্নি বিস্ফুরিত হয়। এ-সব স্মৃতি প্রতিদিন এণ্ডরুজকে এমন ভাবে দগ্ধ করেছে যে, ১৯১৭ সালে আবার একবার ফিজি না গিয়ে তাঁর স্বস্তি ছিল না। লর্ড হার্ডিঞ্জের ভাষণে যে বিকল্প ব্যবস্থার উল্লেখ ছিল, এণ্ডরুজ ভেবেছিলেন, তা কার্যকর হতে হয়তো বড়োজোর দু-চার মাস দেরি হতে পারে— তার বেশি কিছুতেই নয়। কিন্তু এখানে তাঁর ভুল হয়েছিল।

শান্তিনিকেতন থেকে কবির সঙ্গে জাপানে

কিন্তু সে-সব আরো পরের কথা। মাঝখানে ১৯১৬ সালের কয়েকটি মাস এণ্ডরুজ বড়ো আনন্দে কাটালেন। পিয়রসন ও তিনি তখন শান্তিনিকেতনে। পিয়রসন ছাত্রদের নিয়েই উৎসাহে মেতে থাকেন। তাঁর পরিচালনায় সমাজ-সেবার কাজে ছাত্ররা অগ্রসর হয়— সাঁওতালপাড়া, ভুবনডাঙায় ছেলেদের পড়ানো, খেলা ও রোগীর পরিচর্যায়। এণ্ডরুজ গুরুদেবের বইয়ের অনুবাদের কাজে তাঁকে সাহায্য করেন। তাঁদের ঘর থেকে যে উচ্চহাসের রোল ভেসে আসে তাতে চারি দিকের আকাশ-বাতাস ধ্বনিত হয়। রবীন্দ্রনাথ যখন ক্লাস নেন সেখানে উপস্থিত থেকে ছাত্রের মতো এণ্ডরুজ শেলির কাব্যের বাংলা ব্যাখ্যা শোনেন ; নিজে আবার ছাত্রদের ইংরেজি রচনার ক্লাস নেন।

---

১ শান্তিনিকেতন রবীন্দ্রসদনে রক্ষিত অপ্রকাশিত পত্র, ২৮ অক্টোবর ১৯১৫। ক্রাইস্টচার্চ থেকে লেখা।

২ Chaturvedi & Sykes, *Charles Freer Andrews*, পৃ. ১১৭।

উইলি পিয়রসন যেভাবে শিশুদের একান্ত আপন হতে জানতেন, এণ্ডরুজের সে ক্ষমতা ছিল না। তিনি দূর থেকে তাদের কাজকর্ম উৎসাহ লক্ষ্য করতেন। বিদেশ থেকে খেলনা এনে তাদের দিতেন। কিন্তু অধিকক্ষণ শিশুদের সঙ্গ তাঁকে ক্লান্ত করত। অথচ কখনো কোনো ছাত্র অসুস্থ হলে আবার তাঁর মনোযোগ তার উপরই গিয়ে পড়ত। কোনো বিশেষ ছাত্রকে নিয়ে সমস্যা উপস্থিত হলে হয়তো তাকে বিদ্যালয় থেকে বিতাড়নের প্রস্তাব উঠত। এণ্ডরুজ সঙ্গে সঙ্গেই তার দায়িত্ব নিজে নিয়ে চেষ্টা করতেন ছেলেটাকে স্বাভাবিক পথে ফিরিয়ে আনার। সাধারণভাবে একটু বয়স্ক ছাত্র ও অধ্যাপকদের সঙ্গেই তাঁর মেলামেশা ছিল বেশি।

১৯১৬ সালের মে মাসে রবীন্দ্রনাথ জাপান যাত্রা করেন। এণ্ডরুজ পিয়রসন ও শিল্পী মুকুল দে তাঁর সঙ্গে যান। জাপানীরা প্রথমে মহা উৎসাহে কবিকে আন্তরিক অভ্যর্থনা জানায়। কিন্তু কবি দেখলেন সেখানে কঠোর সাম্রাজ্যবাদ উদগ্র হয়ে উঠেছে। খুব জোরের সঙ্গে তার প্রতিবাদ করে তিনি পূর্ব-পশ্চিমের মিলনের আদর্শ সবার চোখের সামনে মেলে ধরলেন। জাপানীরা মনে করল যুদ্ধের সময় এ শিক্ষা তাদের পক্ষে ক্ষতিকর হবে। ভারতীয় কবিকে পরাজিত জাতির মুখপাত্র বলে তাঁদের ধারণা হল। যে উদ্দেশ্য নিয়ে কবি দূরপ্রাচ্যে গেলেন তা অপূর্ণই রয়ে গেল। যুদ্ধের আগে কবির মন যেরূপ বেদনায় ভারাক্রান্ত হয়েছিল আবার সে অবস্থা ফিরে এল। *Nationalism* বইখানির প্রথম কয়েকটি অধ্যায় এই বিক্ষুব্ধ উত্তেজনার সময় জাপানেই লেখা হয়েছিল।[১] জাপান পৌঁছে এণ্ডরুজের কাজ হল অসংখ্য রিপোর্টারের কবল থেকে কবিকে উদ্ধার করা। সে সময়ে গগনেন্দ্রনাথ ঠাকুরকে লিখেছিলেন[২]—

> বহু দ্রষ্টব্য স্থান দেখার আনন্দে উইলি ও মুকুল মেতে আছে, আমার মন কিন্তু ছেয়ে আছে নানা সমস্যায় ও চিন্তায়।

সমস্যাগুলির মধ্যে প্রধান হল জাপানের জাতীয় জীবনের পরিবর্তন। এণ্ডরুজ লক্ষ্য করলেন, চিরকাল সৌন্দর্যপ্রীতির জন্যই জাপানীরা প্রসিদ্ধ; অথচ বাণিজ্যপ্রবৃত্তি এসে সে স্থান ক্রমশ অধিকার করছে। জাপানে সামুরাই

---

১ রবীন্দ্রনাথ-এণ্ডরুজ পত্রাবলী, পৃ. ৩১, ৩২।

২ Chaturvedi & Sykes, *Charles Freer Andrews*, পৃ. ১১৯।

জীবনাদর্শের পটভূমিতে ছিল সত্য সরলতা ও পবিত্রতা। এখন প্রবল যুদ্ধস্পৃহা জাগ্রত হয়ে এ-সব গুণ বিনষ্ট হয়ে যাচ্ছে। জাপানের দুটি ঘটনা এণ্ডরুজের মনে গেঁথে ছিল। একটি হল— দেশের দুটি বীরপুরুষ দ্বন্দ্বযুদ্ধে নিহত হবার ঘটনাটিকে চিরস্মরণীয় করে রাখার চেষ্টায় জাপানীরা কবিকে অনুরোধ করে একটি কবিতা লিখে দিতে। তখনই কবি লিখে দিলেন—

They hated and killed and men praised them. But God in shame hastened to hide its memory under the green grass.

ওরা রোষে ভাইয়ের বুকে ছুরি হানল— তবু মানুষ সেই বীরত্বের জয়ধ্বনি করল। কিন্তু সৃজনবিধাতা সেই কলঙ্কস্মৃতি অন্তরাল করার জন্যে সবুজ ঘাসের আস্তরণ বিছিয়ে দিতে ব্যগ্র হলেন।

কোনোরূপ হিংস্রতাকে চিরস্থায়ী করার প্রস্তাবে কবিমন কিরূপ ক্ষুব্ধ হত, এণ্ডরুজ এখানে তা লক্ষ্য করলেন। জাপানে তখন কঠোর সাম্রাজ্যবাদের প্রভাব। এই সময়ে কবি *The Song of the Defeated*[১] কবিতাটি লেখেন। পরবর্তী জীবনে এণ্ডরুজ ভারতের জাতীয়তা আন্দোলনে যে ভূমিকা গ্রহণ করেন তার মূলেও এই ঘটনার প্রভাব দেখতে পাওয়া যায়।

বৌদ্ধধর্মের সঙ্গে এণ্ডরুজের প্রত্যক্ষ পরিচয় প্রথম হয় জাপানে। সে সময়কার একটি ঘটনা তিনি আনন্দের সঙ্গে স্মরণ করেন। পথে একটি ছোটো স্টেশনে গাড়ি থামিয়ে কবিকে অভ্যর্থনা জানালেন কয়েকজন বৌদ্ধভিক্ষু। এণ্ডরুজের মনে পড়ে; যে পথ দিয়ে তিনি জাপানে এলেন, সেই পথ দিয়েই তো ভারতবর্ষ থেকে বৌদ্ধধর্মপ্রচারকেরা চীন-জাপানে এসেছিলেন।[২]

জাপানে পৌঁছবার কিছুদিন পরে এক পত্রে অবগত হলেন ঔপনিবেশিক অফিস এবং ভারত-সচিবের ইণ্ডিয়া অফিসের মধ্যে এরূপ চুক্তি হয়েছে যে শর্তবন্দী শ্রমিকপ্রথা (চুক্তি-দাসত্ব) ফিজিতে আরো পাঁচ বছর কায়েম থাকবে। তার পরে হবে তার উচ্ছেদসাধন। এ চিঠি পেয়ে এণ্ডরুজের মন যে কিরূপ নিরাশাকাতর হল বলা নিষ্প্রয়োজন। গুরুদেব ও পিয়রসন বললেন, 'এতে

১ কবিতাটির আরম্ভ— My master bids me, while I stand at the wayside, to sing the song of defeat. For that is the bride whom He woos in secret.— *Fruit Gathering* LXXXV.

২ Chaturvedi & Sykes, *Charles Freer Andrews*, পৃ. ১১৯।

এখন তোমার আর কী করার আছে?' কিন্তু এণ্ডরুজের মনে হল কিছু একটা করা চাই-ই। এভাবে কোনোমতেই ছেড়ে দেওয়া চলে না।[1]

জাপানে খুব অসুস্থ হয়ে পড়ায় কিছুদিন এণ্ডরুজকে হাসপাতালে থাকতে হয়। শরীর সুস্থ হলে তিনি ভারতে ফিরলেন, আর রবীন্দ্রনাথ পিয়রসন মুকুল দে— এঁরা চললেন আমেরিকার পথে। ভারতবর্ষে ফিরে আসার সময় এক সপ্তাহ যবদ্বীপে কাটল এণ্ডরুজের। সেখানে বোরোবুদুরের বৌদ্ধসংস্কৃতির ধ্বংসাবশেষ পরিদর্শন করতে গিয়ে পূর্ণিমাচাঁদের আলোয় সারারাত একাকী বিচরণ করে ফিরলেন বুদ্ধদেবের প্রস্তরনির্মিত সৌম্য প্রশান্ত মূর্তিগুলির মধ্যে। ভারত-ইতিহাসের পটভূমিতে এই মহান ধর্মদূতের ভূমিকা কী, সে বিষয়ে এণ্ডরুজের ধ্যানদীপ্ত চিন্তাধারাগুলি পরে প্রকাশিত হয় মডার্ন রিভিয়ুর একটি প্রবন্ধে।[2] শুধু হীনপতিতের মধ্যে বুদ্ধদেব তাঁর বাণী প্রচার করেন নি— সন্ত ফ্রান্সিসের মতো পশুপক্ষী বৃক্ষলতার মধ্যেও প্রেমধর্ম বিতরণ করেছেন। বোরোবুদুরের এই অভিজ্ঞতার ফলে দক্ষিণ-আফ্রিকা ও শান্তিনিকেতনে যে-সব ধর্মজিজ্ঞাসা তাঁকে ব্যাকুল করে; অন্তরে তার সমাধান তিনি খুঁজে পেলেন। ইউরোপীয় ধর্মদর্শনের ভাবনালোক পেরিয়ে এমনি করে এগিয়ে চললেন ক্রমশ জীবনসংগ্রামে।[3]

আবার ভারতে: চুক্তিদাসপ্রথা-বিরোধী সংগ্রামে

এণ্ডরুজ ভারতে ফিরেছেন। ১৯১৬ সালের শেষার্ধে লর্ড হার্ডিঞ্জের কার্যকাল সমাপ্ত হয়েছে। তাঁর স্থানে এসেছেন লর্ড চেম্‌স্‌ফোর্ড। এণ্ডরুজ তাঁকে চিঠি লিখে জানতে চাইলেন চুক্তিদাসপ্রথা সম্বন্ধে তাঁরা কোন্ সমাধানে এসেছেন। তিন মাস অপেক্ষা করার পরও ভাইসরয়ের কাছ থেকে কোনো উত্তর না পাওয়ায় এণ্ডরুজ 'পায়োনিয়র' পত্রিকায় একখানি পত্র প্রকাশ করে সরকারের বিরুদ্ধে অভিযোগ আনয়ন করেন। কয়েক দিনের মধ্যেই ভারত-সরকারের এক বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয় যে ভারতবাসীদের ধৈর্যধারণ করতে হবে।

---

১ এক ভারতীয় হৃদয় [বনারসীদাস চতুর্বেদী], ভারতভক্ত এণ্ডরুজ, পৃ. ১৯৬।

২ "Buddhism & Christianity", *The Modern Review*, September 1922, পৃ. ২৭৯, ২৮০।

৩ Chaturvedi & Sykes, *Charles Freer Andrews*, পৃ. ১২০।

এণ্ডরুজ বুঝতে পারলেন, ভারত-সরকার এখনো কিছুকাল প্রথাটিকে চালু রাখতে চান। তখনই তিনি সিদ্ধান্ত করলেন সারা ভারতে এবার প্রবল আন্দোলন গড়ে তুলতে হবে, এই কুখ্যাত কুলি-চালান ব্যবস্থা যাতে বন্ধ হয়।

এণ্ডরুজ তখন আছেন শান্তিনিকেতনে, আর রবীন্দ্রনাথ বিদেশে। এই পরিবেশে এক দিকে আশ্রম বিদ্যালয়ের কাজকর্ম পরিদর্শন আর অন্য দিকে রবীন্দ্র-জমিদারির কর্মচারীদের সুখসুবিধার প্রতি তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখাও এণ্ডরুজের কর্তব্যের অঙ্গ ছিল। ১৯১৪ সালে কালীগ্রামের কর্মকেন্দ্রে অতুলচন্দ্র সেন তাঁর কর্মীসংঘ নিয়ে যোগ দেন।[১] কবির গ্রামোন্নয়ন পরিকল্পনাকে রূপ দেবার জন্য যাঁরা আত্মনিয়োগ করেছিলেন, ১৯১৬ সালে নেতা অতুলচন্দ্র সেন -সহ তাঁরা সকলেই রাজরোষে পতিত হয়ে অনির্দিষ্টকালের জন্য অন্তরায়িত ও নজরবন্দী হয়েছিলেন।[২]

জাপান থেকে ফিরে এসে এণ্ডরুজ এ খবর পান এবং তৎক্ষণাৎ তাঁদের মুক্তির চেষ্টায় তৎপর হন। বাংলাদেশের গভর্নর লর্ড কারমাইকেল ও তাঁর প্রাইভেট সেক্রেটারি মিঃ গুর্লির (Gourlay) সঙ্গে এ বিষয়ে তিনি আলোচনা করেন।

অতুলচন্দ্র সেনের পত্নী কিরণবালা দেবীর পত্রের উত্তরে ১৯১৭ সালের জানুয়ারি মাসে এণ্ডরুজ লিখছেন (১২ মাঘ ১৩২৩)[৩]—

> … আমি এ পর্যন্ত যাহা করিতে চেষ্টা করিয়াছি তাহা আপনাকে যথাযথরূপে লিখিতেছি।… প্রথমত আমি মিঃ কামিং-এর সহিত

---

১ রবীন্দ্রনাথ উত্তরবঙ্গের কালীগ্রাম পরগনার জমিদার। অতুলচন্দ্র সেন প্রধান কর্মীরূপে এখানে এলেন। কালীগ্রামেরই পতিসর, কামতা, রাতোয়াল প্রভৃতি গ্রামের উন্নয়নের কর্মে তিনি ও তাঁর সহকর্মীরা যোগ দেন। প্রকৃতপক্ষে তিনি পতিসর বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষকপদে নিযুক্ত হন। কিন্তু শুধু শিক্ষকতা তাঁর কর্ম ছিল না। অবৈতনিক স্কুল, হাসপাতাল ও ঔষধালয় স্থাপন, সালিশী-বিচার, চাষীদের ঋণদান ইত্যাদি ব্যবস্থায় তিনি ও তাঁর সহকর্মীরা তৎপর হন। দ্র. রবীন্দ্র-জীবনী ২য় খণ্ড (২য় সং), পৃ. ৪৩৯ ও ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ৩৩০।

২ দ্র. "রবীন্দ্র-জীবনীর নূতন উপকরণ", শনিবারের চিঠি, আশ্বিন ১৩৪৮।

৩ শান্তিনিকেতন থেকে বাংলায় লেখা চিঠিখানি এণ্ডরুজ কিরণবালা দেবীকে পাঠান। অপ্রকাশিত পত্রখানি অতুলচন্দ্র সেনের ভ্রাতা প্রতুলচন্দ্র সেন ও ভ্রাতুষ্পুত্রী বীণা সেনের সৌজন্যে প্রাপ্ত।

অনেকবার দেখা করিয়াছি, প্রস্তাব করিয়াছিলাম যে আপনার স্বামীকে মুক্তি দিয়া যাহাতে আমার কাছে দেওয়া হয়। আমি তাহার জন্য দায়ী থাকিব। তাহার পর আমি মিঃ গুর্লির সঙ্গে দেখা করি, তাঁহাকে এ বিষয়ে বিস্তৃতরূপে জানাই।... অতঃপর আমি মহামান্য লর্ড কারমাইকেলের সঙ্গে দেখা করি। তিনি আমাকে কথা দিয়েছিলেন এ বিষয়ে কাগজপত্র তলব করিয়া নিজে সেগুলি দেখিবেন। ইহা প্রায় এক মাসের কথা। তার পর হইতে আমি উত্তরের আশার অপেক্ষা করিতেছি।...

নির্যাতিত ভারতবাসীকে সর্বপ্রকারে রক্ষা করা, সান্ত্বনা দেওয়া তাঁর ধর্মের অঙ্গ ছিল। ব্রিটিশ রাজশাসনে উৎপীড়িত, বিশেষত রবীন্দ্রনাথের গ্রামসেবার আদর্শে অনুপ্রাণিত কর্মীর অন্তরীণমুক্তির জন্য এণ্ডরুজ যে আপ্রাণ চেষ্টা করবেন এতে আর আশ্চর্যের কী আছে?

শান্তিনিকেতনেও তিনি ভারতসেবার জাগ্রত সেনানী। ফিজিতে কুলি-চালান বন্ধ করার আন্দোলনে ভারতভ্রমণে বেরবার আগেও এণ্ডরুজ শান্তিনিকেতনের শিক্ষকদের সঙ্গে পরামর্শ করলেন। তাঁরা প্রসন্নচিত্তে তাঁর নতুন কর্মপথে উৎসাহ ও শুভেচ্ছা জানালে তিনি কিছুকালের জন্য আশ্রম ত্যাগ করেন।

এ সময় দেশের নেতৃত্ব গান্ধীজিরই হাতে। তিনি ঘোষণা করলেন, ১৯১৭ সালের ৩১ মে-র মধ্যে যদি বিদেশে কুলি-চালান রদ করা না হয় তবে কুলি জাহাজে ধর্মঘট শুরু করবেন। তাঁর অনুচরদের নিয়ে তিনি প্রস্তুত হলেন। মিঃ পোলক বহু পূর্ব থেকেই চুক্তিদাসত্বের বিরুদ্ধে ভারতের সর্বত্র প্রচারকার্য চালিয়ে যাচ্ছেন। এবার এণ্ডরুজও শারীরিক দুর্বলতা সম্পূর্ণ অগ্রাহ্য করে সে কাজে নামলেন।

১৯১৫ সালে এশিয়াটিক কলেরায় আক্রান্ত হওয়ার পর থেকে প্রায়ই তিনি অসুস্থ হয়ে পড়তেন। এবারেও তাই হল। প্রয়াগ থেকেই তিনি কাজ শুরু করবেন বলে ভেবেছিলেন, অথচ সেখানেই কঠিন উদরাময়ে আক্রান্ত হলেন। তেজবাহাদুর সপ্রুর গৃহে ডাক্তার ললিতমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর চিকিৎসা করেন। পোলক ও ললিতবাবু সারারাত শুশ্রূষা করে ভোরের দিকে তাঁকে খানিকটা সুস্থ করে তুললেন। তবু আন্দোলনের আরম্ভে এই প্রথম সভায় এণ্ডরুজ উপস্থিত থাকতে পারেন নি। সৌভাগ্যবশত শ্রীযুক্তা সরোজিনী নাইডু

সেদিনই এসে পৌঁছলেন, এণ্ডরুজের অনুরোধে সে সভায় প্রাণস্পর্শী ভাষার আবেদনে তিনি শ্রোতাদের উদ্‌বুদ্ধ করেন।[1] বিছানায় শুয়ে শুয়ে এণ্ডরুজ ভারতীয় নারীদের কাছে এক আবেদনপত্র লিখলেন ফিজির শর্তবন্দী নারীদের মুক্তির প্রার্থনা জানিয়ে। বিভিন্ন ভারতীয় ভাষায় সেই আবেদনের অনুবাদ প্রকাশিত হয়। তারই পঞ্চাশ হাজার কপি প্রয়াগের মাঘ-মেলায় বিতরণ করে স্বয়ং সেবকদল। ফলে সমগ্র ভারতে কুলিপ্রথার বিরুদ্ধে আন্দোলন শুরু হল ; এলাহাবাদে স্থাপিত হল চুক্তিশ্রমবিরোধী সংঘ।

যুক্তপ্রদেশ ও মাদ্রাজ থেকেই বেশির ভাগ কুলি চালান যেত। তাই যুক্তপ্রদেশে কাজ শুরু করেই দুর্বল শরীর নিয়ে এণ্ডরুজ রওনা হলেন মাদ্রাজের পথে। সেখানে তিনি শ্রীযুক্তা অ্যানি বেসাণ্টের সাহায্য পান। মেয়েদের দুঃখদুর্দশার কথা শুনে শ্রীযুক্তা বেসাণ্ট ক্রোধে ক্ষোভে কাঁপতে শুরু করলেন। তার পর অতিকষ্টে অশ্রুদমন করে বসে রইলেন, যেন এক পাথরের মূর্তি।[2]

এণ্ডরুজের কথা শেষ হলে দৃঢ়কণ্ঠে শ্রীমতী বেসাণ্ট বললেন— এ অবস্থায় চুক্তিদাসত্বের উচ্ছেদসাধনের জন্য আমাদের প্রত্যেককে যদি কারাবরণ করতে হয় তাও ভালো। শ্রীকস্তুরঙ্গ আয়ারের সহায়তায় এণ্ডরুজ মাদ্রাজে চুক্তি-শ্রমবিরোধী সংঘ স্থাপন করলেন।

এণ্ডরুজ ও পিয়রসন -কৃত ফিজি তদন্ত রিপোর্টের তামিল ও তেলেগু সংস্করণ এখানে ছাপা হয়। অল্পদিনের মধ্যে চুক্তিদাসত্বের বিরুদ্ধে মাদ্রাজেও ঘোরতর আন্দোলন শুরু হয়ে যায়। তার পর এণ্ডরুজ গেলেন পুনাতে।[3] সেখানে আর. জি. ভাণ্ডারকরকে সব ঘটনা শোনালেন। টিলকও এণ্ডরুজকে সাহায্য করতে স্বীকৃত হলেন। পুনার চুক্তিশ্রমবিরোধী সংঘের সভাপতি হলেন লোকমান্য টিলক। পুনা থেকে এণ্ডরুজ গেলেন আহমেদাবাদে।[4] সেখানে মহাত্মা গান্ধী বললেন যে, অন্য সব কাজ ছেড়ে এবার তিনি এ কাজটিই হাতে নেবেন। ভারত-সরকারের মতে মহাযুদ্ধের সময় জাতীয় বিদ্বেষ উৎপন্ন করার চেষ্টায় এণ্ডরুজের এই আন্দোলন অত্যন্ত অপরাধজনক। তিনি ভাইসরয় লর্ড চেম্‌স্‌ফোর্ডের সঙ্গে দেখা করলেন। ভারতীয় নারীদের একটি দলও এই

১ এক ভারতীয় হৃদয় [বনারসীদাস চতুর্বেদী], ভারতভক্ত এণ্ডরূজ, পৃ. ১৯৮।

২ তদেব, পৃ. ২০০।

৩ তদেব, পৃ. ২০১।

৪ তদেব, পৃ. ২০২।

সময় ভাইসরয়ের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে নারীশ্রমিকপ্রথার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানালেন। মহাত্মা গান্ধীর সঙ্গেও ভাইসরয়ের আলোচনা হল এণ্ডরুজের মধ্যস্থতায়। এ দিকে কিন্তু এণ্ডরুজ ও গান্ধীজি মুহূর্তের জন্যও তাঁদের আন্দোলন শিথিল হতে দেন নি। অবশেষে ১৯১৭ সালের ১২ এপ্রিল তারিখে লর্ড চেম্‌স্‌ফোর্ড ঘোষণা করলেন, ভারতরক্ষা আইন অনুযায়ী যুদ্ধের সময় ভারতবর্ষ থেকে বিদেশে কুলি চালান বন্ধ থাকবে।[১]

দ্বিতীয়বার ফিজি

এই ঘোষণা পড়ে অনুমান হয় যুদ্ধের পরে চুক্তিদাসপ্রথা আবার কার্যকর হতে পারে। এ বিষয়ে প্রত্যক্ষ অনুসন্ধান করার উদ্দেশে এণ্ডরুজ দ্বিতীয়বার ফিজি যাবার জন্য প্রস্তুত হলেন। এবার পথের সাথী ছিল কেবল ফাল্গুনী নাটকের নতুন প্রকাশিত ইংরেজি অনুবাদ-গ্রন্থটি।[২]

কলম্বো পৌঁছানোর পর একদিন জাহাজের সিঁড়ি থেকে পিছলে পড়ে এণ্ডরুজ পায়ে গুরুতর আঘাত পান। সেই আঘাতের ব্যথা এক বছর ছিল। ১৯১৭ সালের ২৫ মে তারিখে অস্ট্রেলিয়ায় সেবার মায়ের জন্মদিন পালন করছেন, এমন সময় ইংলণ্ড থেকে সুসংবাদ এল যে চেম্বারলেন হাউস অব কমন্‌সে ঘোষণা করেছেন চুক্তিদাসত্বের পুনরুজ্জীবন আর হবে না।[৩]

ফিজিতে এসে সেখানকার অবস্থা দেখে কিন্তু এণ্ডরুজ নিরাশ হলেন। যুদ্ধকালীন শ্রমিকদের অবস্থা ছিল অবর্ণনীয়। আত্মঘাতের চেষ্টায় বন্দী এক ব্যক্তি বিচারের সময় বলেছিল যে শিশুদের ক্ষুধার কান্না তার অসহ্য হয়েছিল। যে-সব শ্রমিকের শর্তকাল অতিক্রান্ত হয়ে গেছে তারাও জাহাজের অভাবে দেশে ফিরতে পারছে না। একজন দেশে তার কন্যাকে ফেলে এসেছে। সে বারবার এণ্ডরুজকে জিজ্ঞাসা করে, জাহাজ কখন আসবে? এণ্ডরুজের চোখে জল আসে। তিনি তাকে বুকে জড়িয়ে ধরে ভরসা দেন।

ফিজি-প্রবাসী ভারতীয়ের উন্নতিসাধনে এণ্ডরুজ এবার মনপ্রাণ ঢেলে দিলেন। চুক্তিবদ্ধ শ্রমিকের বেতন বাড়ানোই হল তাঁর প্রথম প্রচেষ্টা।

---

১ Chaturvedi & Sykes, *Charles Freer Andrews*, পৃ. ১২১।

২. তদেব, পৃ. ১২১।

৩ তদেব।

১৯১৭ সালের অগস্ট মাস থেকে তা বেড়ে দাঁড়াল দৈনিক তিন পেন্স। তা ছাড়া, স্বামীর তুলনায় যেখানে কোনো শ্রমিক-পত্নীর শর্তকাল দীর্ঘতর হবার সম্ভাবনা, সেখানেও স্বামীর সঙ্গেই তাকে মুক্তি দেবার ব্যবস্থায় সম্মতি-সংগ্রহের প্রয়াসে রত হলেন এণ্ডরুজ। আর এই দ্বিতীয় কর্তব্যসাধনেও তাঁকে বহু বাধার সম্মুখীন হতে হয়েছে। তাঁর তৃতীয় প্রচেষ্টা ছিল ১৯২০ সালের ১ জানুয়ারির মধ্যে চুক্তি-দাসত্বের সম্পূর্ণ উচ্ছেদসাধন। শত বাধাবিপত্তি উপেক্ষা করেও এণ্ডরুজ এ তিনটি বিষয়ে ন্যায়বিচার লাভের জন্য সংগ্রাম করেই চললেন। তাই ১৯১৭ সালে ফিজির ভারতীয়রাই তাঁকে সর্বপ্রথম 'দীনবন্ধু' আখ্যায় সম্মানিত করেন।[১]

ভারতে: চুক্তিশ্রমিকপ্রথার বিলোপ

১৯২৮ সালের মার্চ মাসে, এণ্ডরুজ তখন দিল্লী ফিরেছেন; আর ভারতসচিব মণ্টেগুও সে সময় দিল্লীতে বাস করছিলেন ভাইসরয়-গৃহে। ফিজি-সরকারের মেডিক্যাল রিপোর্ট এনে এণ্ডরুজ তাঁর সামনে উপস্থিত করলেন। সেখানে লেখা রয়েছে, প্রতিটি ভারতীয় চুক্তিবদ্ধ নারীশ্রমিককে গড়ে তিনটি পুরুষ শ্রমিক ও বহু অজ্ঞাত লোককে দেহদান করতে হয়; যার ফলে দুরারোগ্য ব্যাধিতে দেশ ছেয়ে গেছে।

মণ্টেগু এটুকু দেখেই বললেন, 'আমার আর কিছুই জানবার প্রয়োজন নেই।' ১৯২০ সালের ১ জানুয়ারির শেষ চুক্তিশ্রমিকটিও মুক্তি পেল।[২] ফিজি, ব্রিটিশ গিয়ানা, ত্রিনিদাদ, সুরিনাম এবং জামাইকা অঞ্চলেই ভারতীয়রা আখ-আবাদের খেতে চুক্তিশ্রমিকের কাজ করত, তাই চুক্তিশ্রমিকের মুক্তি ঘোষিত হলে তাদের মধ্যে আনন্দের কলধ্বনি জাগল।[৩]

১৯২০ সাল থেকে ফিজির ভারতীয় সমাজের জীবনযাত্রায় যে আশ্চর্য পরিবর্তন এসেছিল তাতে এণ্ডরুজের দান অনস্বীকার্য। তাঁর মৃত্যুর পরে ১৯৪০ সালের 'স্টিফেনিয়ান' পত্রিকার এণ্ডরুজ স্মারকসংখ্যায় লেখা হয়[৪]—'

ঝানু শিল্পপতিদের সঙ্গে আলোচনায় হয়তো শান্তকোমলপ্রাণ ব্যক্তিটি

---

১ Chaturvedi & Sykes, *Charles Freer Andrews*, পৃ. ১২৪।

২ তদেব, পৃ. ১২৩।

৩ Pattabhi Sitaramayya, *The History of the Congress*, পৃ. ৩৩৩।

৪ T. G. Spear-এর লেখা প্রবন্ধ। দ্র. Chaturvedi & Sykes, *Charles Freer Andrews*, পৃ. ১২৬।

এঁটে উঠতে পারবেন না— এ কথা স্বাভাবিকভাবে লোকের মনে আসত, অথচ শেষ পর্যন্ত দেখা যেত এই খদ্দরধারী দেবাদিষ্ট সজ্জনটির কাছে পাকা সংসারী লোকগুলিও তর্কে পরাস্ত হত।…

যেমন তাঁর বুদ্ধি তেমন স্মরণশক্তি, আবার তেমনই ছিল বিচার্য বিষয়ে তাঁর তীক্ষ্ণ উপলব্ধি। সর্বোপরি দীন অবমানিতের প্রতি তাঁর স্বতঃ-উৎসারিত ও অবারিত স্নেহপ্রীতি তাঁকে তাদের আপন করে তুলেছিল।

নিপীড়িতের সেবায় : অন্যায়ের প্রতিরোধে ভারতে

ফিজির পরে আবার ভারতে। এ দেশের শিল্পনগরীগুলিতে যে পঙ্কিল জীবনের ধারা বইত, সে দিকে এণ্ডরুজের দৃষ্টি ক্রমশ আকৃষ্ট হল।

যুদ্ধোত্তর পর্বে ভারতের কটনমিল শ্রমিকদের আয়ের অনুপাতে দ্রব্যমূল্য অত্যধিক বেড়ে গেল। মাদ্রাজ শ্রমিক ইউনিয়নের সঙ্গে বাকিংহাম কার্নাটিক মিলের কর্তৃপক্ষ কোনোরূপ আপস মীমাংসায় আসতে স্বীকৃত না হওয়ায় ইউনিয়নের অন্যতম সংগঠক শ্রীযুক্ত ওয়াদিয়া এণ্ডরুজকে মাদ্রাজে আহ্বান করে আনলেন। ১৯১৮ সালের শেষভাগে কয়েক সপ্তাহ এণ্ডরুজ শ্রমিকদের সঙ্গে বাস করে অবশেষে কর্তৃপক্ষকে রাজি করালেন ইউনিয়নটিকে স্বীকৃতি দেওয়ায়। ফিজিতে কুলি-লাইনের যে দুরবস্থা লক্ষ করেছেন ভারতবর্ষে শ্রমিকদের অবস্থা যে-কোনো অংশেই তার চেয়ে ভালো নয় তা বুঝতে পারলেন এণ্ডরুজ। শিক্ষিত দায়িত্বশীল যুবকদের পরিচালনায় সারা ভারতে ট্রেড ইউনিয়ন গঠনের বিশেষ প্রয়োজনীয়তা তখনই তিনি হৃদয়ঙ্গম করলেন। ফিজির চুক্তিদাসপ্রথার বিরুদ্ধে সংগ্রামই তাঁকে ভারতের শিল্পশ্রমিকের সর্বাঙ্গীণ উন্নয়নের অনুপ্রেরণায় আগ্রহী করেছিল।

ফিজির সিদ্ধকাম সৈনিক এবার শান্তিনিকেতনে ফিরলেন ভারতের নব-জাগরণে রবীন্দ্রনাথ ও গান্ধীজিকে সাহায্য করার আকাঙ্ক্ষা নিয়ে। জাপানে ও আমেরিকায় ১৯১৬ সালে কবি যে বক্তৃতাগুলি করেন, পার্সোন্যালিটি (মে ১৯১৭) ও ন্যাশন্যালিজ্‌ম্ (১৯১৭) গ্রন্থদ্বয়ে সেগুলি প্রকাশিত হয়। ‘পার্সোন্যালিটি’তে দেখি বিশ্ববোধের মধ্যেই ব্যক্তিমানসের পূর্ণপ্রকাশ ও মুক্তি আর ‘ন্যাশন্যালিজ্‌ম্’ গ্রন্থে পাই নগ্ন সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে কবির তীক্ষ্ণ সমালোচনা। কবিশিষ্য এণ্ডরুজের জীবনেও এ দুটি আদর্শের আশ্চর্য প্রতিফলন দেখতে পাই। গ্রন্থ-দুটিই কবি এণ্ডরুজকে উৎসর্গ করেছিলেন।

১৯১৪ সালের অগস্ট মাসে মহাযুদ্ধ যখন শুরু হয়েছিল, ইংলণ্ড তখন ভারতের পূর্ণ সমর্থন লাভ করে। যুদ্ধশেষে ভারতবাসীরা সাম্রাজ্যের স্বাধীন নাগরিকের সম্মান পাবে— এ বিষয়ে সেদিন কোনো ভারতীয়ের মনে কোনো সংশয় ছিল না। ১৯১৭ সালের ২০ অগস্ট তারিখে ভারতসচিব মণ্টেগু হাউস অব কমন্‌সে ব্রিটিশনীতি সম্বন্ধে তাঁর ইতিহাস-প্রসিদ্ধ বিবৃতিতে বলেন, ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের অংশরূপে ভারতকে দায়িত্বপূর্ণ স্বশাসন ক্রমশ গড়ে তুলতে সাহায্য করা হবে। পরবৎসর শীতকালে ভাইসরয়ের সঙ্গে এ বিষয়ে আলোচনা করতে তিনি ভারতে এলেন। তার ফলে ১৯১৮ সালের ১২ জুলাই মণ্টেগু-চেম্‌স্‌ফোর্ড রিপোর্ট প্রকাশিত হল।

দুর্ভাগ্যের বিষয় ভারতের সন্ত্রাসবাদী বিপ্লবীদের কার্যকলাপ সম্বন্ধে আলোচনা করার জন্য যে রাউলট কমিশন বসে তার রিপোর্টও প্রায় একই সময়ে প্রকাশিত হয়। এই কমিশনের প্রস্তাব ছিল সন্দেহভাজন সকল বিপ্লবীরই বিচার হবে, অথচ এ-সম্পর্কিত সাক্ষ্যপ্রমাণগুলি কোথাও প্রকাশিত হবে না।

এ দুটি রিপোর্ট একই সঙ্গে প্রচারিত হলে শিক্ষিত ভারতবাসীরা দেখলেন সরকার পক্ষে ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের বিরুদ্ধে কেবল দমননীতি প্রয়োগের নূতন নূতন আইনেরই উদ্‌ভাবনা চলেছে। যুদ্ধবিরতি ঘোষণার পর ভারতের চারি দিকে ক্রমবর্ধিত নিরাশা ও ক্ষোভের সঞ্চার হল। ভারতবাসীরা বুঝে নিলেন যে, ব্রিটিশ জাতি ভারতের স্বাধীনতা বিষয়ে বিশেষ কিছু না করার সংকল্পই নিয়েছে।

জালিয়ানওয়ালাবাগ প্রসঙ্গে

১৯১৮ সালের ডিসেম্বর মাসে ভারতের জাতীয় কংগ্রেস দিল্লী অধিবেশনে রাউলট বিলের প্রতিবাদ করে ঘোষণা করল এ বিল কার্যকর হলে ভারতবাসীর ন্যায্য অধিকার যথেষ্ট পরিমাণে খর্বিত হবে। তা সত্ত্বেও ১৯১৯ সালের মার্চ মাসে আইনসভায় সে বিল পাস করা হয়। সঙ্গে সঙ্গে গান্ধীজি রাউলট বিলের বিরুদ্ধে আইন-অমান্য আন্দোলন শুরু করলেন। ৩০ মার্চ তারিখে দিল্লীতে হরতাল পালন করা হয়। জাতীয়তাবাদী মুসলমানগণ জুমা মসজিদের ইতিহাসে সর্বপ্রথম যে হিন্দুকে ভাষণ দেবার জন্য আহ্বান জানালেন, তিনি এণ্ডরুজ-বন্ধু স্বামী শ্রদ্ধানন্দ।[১]

---

১ Chaturvedi & Sykes, *Charles Freer Andrews*, পৃ. ১২৯।

পরের রবিবার ৬ এপ্রিল সারা ভারতে হরতাল পালন করা হয়। সেদিন বোম্বাই শহরের এক মসজিদে ভাষণ দিয়েছিলেন মহাত্মা গান্ধী ও সরোজিনী নাইডু। ক্ষোভ প্রদর্শন শান্তভাবেই চলছিল। কেবল দিল্লীর একটি ঘটনায় পুলিসকে গুলি চালাতে হয়। কিন্তু পরের সপ্তাহে পাঞ্জাবের জনপ্রিয় নেতাদের বন্দী করায় দাঙ্গাহাঙ্গামা শুরু হয়। ১৩ এপ্রিল ছিল হিন্দুদের নববর্ষের উৎসব। সেদিন নিষেধাজ্ঞা সত্ত্বেও অমৃতসরে জালিয়ানওয়ালাবাগের এক আবদ্ধ প্রাঙ্গণে একটি বিরাট জনসভা আহূত হয়। সেখানে জেনারেল ডায়ারের আদেশে ইংরেজ-সৈন্যের বর্বরোচিত গুলিচালনা সভার নিরস্ত্র জনতাকে বিধ্বস্ত করে; বহুলোক নিহত হয়।

পরদিন পাঞ্জাবে গুজরানওয়ালায় প্রচণ্ড দাঙ্গা শুরু হলে আকাশযানে বোমা ও মেশিনগানের গুলিবর্ষণ চলে। পাঞ্জাবের নানা স্থানে সামরিক আইন জারি হয়। গান্ধীজি তাঁর আন্দোলন নিরস্ত করেন। অহিংস সংগ্রামে শিক্ষিত হবার পূর্বে জনসাধারণকে আন্দোলনে আহ্বান করা তাঁর পক্ষে মহা অবিবেচনার কাজ হয়েছে বলে তিনি স্বীকার করেন।

রাউলট বিলের আলোচনাকালে এণ্ডরুজ কবির সঙ্গে দক্ষিণ-ভারত পরিক্রমা করছিলেন। সেখান থেকে তিনি গান্ধীজিকে লিখেছিলেন, এই বিলের বিরুদ্ধে সত্যাগ্রহ প্রয়োগই একমাত্র পন্থা। পাঞ্জাবের খবর শান্তিনিকেতনে পৌঁছবার আগে পর্যন্ত এণ্ডরুজ প্রত্যক্ষভাবে আন্দোলনে যোগ দেন নি।

জালিয়ানওয়ালাবাগ হত্যাকাণ্ডের সময়ে কবির সঙ্গে তিনি শান্তিনিকেতনেই রয়েছেন। পাঞ্জাবের ফৌজীশাসনের কাহিনী অস্পষ্টভাবে কানে আসছে। সঠিক কিছুই জানা যাচ্ছে না। এণ্ডরুজ অধীর হয়ে পাঞ্জাবে যাবেন ভেবে বেরিয়ে পড়লেন। ১৭ এপ্রিলে এসে পৌঁছলেন দিল্লীতে।[১]

সুশীল রুদ্র, স্বামী শ্রদ্ধানন্দ ও অন্যান্য বন্ধুরা সবাই মিলে বললেন, তিনি যেন দিল্লীতে উপস্থিত থেকে সেখানে যাতে সামরিক আইন জারি না হয় সেই চেষ্টাই করেন। আতঙ্কিত ইউরোপীয়রা তখন দমননীতি গ্রহণের জন্য সরকারকে কেবলই প্ররোচিত করছিল।

দিল্লীতে কয়েকদিন ধরে এণ্ডরুজ গভীর রাত্রি পর্যন্ত আপ্রাণ পরিশ্রম করলেন। যেখানে হরতাল হয়েছিল সেখানকার সব তথ্য আহরণ করলেন।

---

১ Chaturvedi & Sykes, *Charles Freer Andrews*, পৃ. ১৩০।

জেলা কমিশনার ও পুলিসের অধিকর্তার সঙ্গে সংযোগ রক্ষা করে শেষপর্যন্ত সরকার পক্ষের আস্থাভাজন হন। দিল্লীতে সেবার সামরিক আইন জারির প্রস্তাব তিনি রদ করতে সক্ষম হয়েছিলেন।

ইতিমধ্যে অমৃতসরে শৃঙ্খলারক্ষার জন্য সরকার কী কী উপায় অবলম্বন করছেন সে বিষয়ে নানা কুৎসিত কাহিনী দিল্লীতে এসে পৌছতে লাগল। সর্বসমক্ষে বেত্রাঘাত একটি দণ্ড হিসাবে প্রচলিত হয়েছিল। এক রাস্তায় বিক্ষুব্ধ জনতার এক অংশ একজন ইংরেজ মহিলাকে আক্রমণ করে। যদিও জনতার অন্য অংশ মহিলাকে উদ্ধার করেন, তবুও সে পথে ভারতীয়দের সকলকে পশুর মতো হাতে-পায়ে চলতে বাধ্য করা হয়। এ-সব কথা শুনেই অধীর এণ্ডরুজ প্রতিবিধানের চেষ্টায় সিমলা চলে গেলেন।

সেখানে অতিকষ্টে কর্তৃপক্ষের সঙ্গে সাক্ষাতের সুযোগ আদায় করে সব ঘটনা বিবৃত করলেন। পাঞ্জাবে বেত্রাঘাত বন্ধ করার অঙ্গীকার তিনি তখনই পেয়ে গেলেন। কিন্তু এণ্ডরুজ কর্তৃপক্ষকে জানালেন, শুধু অর্থহীন প্রতিবাদ জানাতেই তিনি আসেন নি, দু পক্ষের বিরোধ দূর করার উপায় হিসাবে চিন্তা করে একটি কর্মসূচীও প্রস্তুত করে এনেছেন।[১] তাঁর পরামর্শ ছিল, রাউলট আইন কোনো প্রদেশে কার্যকর করার পূর্বে প্রাদেশিক আইনসভার স্বীকৃতি যেন অবশ্যই গ্রহণ করা হয়। তা ছাড়া প্রেস-আইনের অপক্ষপাত ব্যবহার, মুসলিম নেতা মহম্মদ আলি সৌকত আলির অন্তরীণমুক্তির আর পাঞ্জাবে গভর্নর হিসাবে স্যর এডওয়ার্ড ম্যাকলেগনের দ্রুত নিয়োগ— এগুলিও ছিল এণ্ডরুজের প্রস্তাব। কিন্তু এ-সব কথায় সরকারি কর্মচারীরা কর্ণপাতই করলেন না। দুঃখিত অন্তরে এণ্ডরুজ দিল্লী প্রত্যাবর্তন করলেন।

এর মধ্যে সরকারি মতে রাজদ্রোহী বলে কয়েকটি ভারতীয় পত্রিকার প্রচার বন্ধ করে দেওয়া হল। এণ্ডরুজ তৎক্ষণাৎ লাহোর অভিমুখে যাত্রা করলেন। ১৯১৯ সালের ১২ মে তারিখে ট্রেন যখন অমৃতসরে পৌছল এণ্ডরুজ সবিস্ময়ে দেখলেন তিনি সামরিক বন্দী। তাঁকে বলা হল পাঞ্জাবের নিরাপত্তার জন্যই তাঁকে এখন সেখানে প্রবেশ করতে দেওয়া হবে না। বিকেলের দিকে তাঁকে জেরা করে আবার দিল্লী পাঠিয়ে দেওয়া হল। অথচ যে কমিশনার জেরা করেন, পেমব্রোকে তিনি এণ্ডরুজের সহপাঠী ছিলেন। অন্যপক্ষে

১ Chaturvedi & Sykes, *Charles Freer Andrews*, পৃ. ১৩১।

'ট্রিবিউন' পত্রিকার সম্পাদক কালীনাথ রায়ের পক্ষ সমর্থনের জন্য আগত কলকাতার ব্যারিস্টার মিঃ নর্টনকে সামরিক আইনভুক্ত এলাকায় প্রবেশে বাধা দেওয়া হল। ব্রিটিশজাতির এ-সব সুবিচার-বিরোধী কার্যকলাপে এণ্ডরুজ অত্যন্ত বেদনা পেলেন। পাঞ্জাবে শৃঙ্খলাস্থাপনে অসমর্থ হয়ে মে মাসের শেষভাগে নিরাশহৃদয়ে তিনি ফিরে এলেন কলকাতায় কবিগুরুর সান্নিধ্যে।[১]

পাঞ্জাবের কথা অল্প অল্প করে আসছে লোকমুখে, কিছু খবরের কাগজে, কিছু চিঠিতে।[২] আর রবীন্দ্রনাথের মন ক্রমশই উত্তেজিত হয়ে উঠছে, ঐ-সব কানাঘুষো খবরে। অবশেষে এণ্ডরুজকে কবি পাঠিয়ে দিলেন গান্ধীজির কাছে, সুনির্দিষ্ট এক প্রস্তাব দিয়ে। মহাত্মাজি যদি রাজি থাকেন তবে তিনি আর কবি— দুজনে একসঙ্গে পাঞ্জাব প্রবেশের চেষ্টা করবেন। ওঁদের দুজনকেই তা হলে গ্রেপ্তার করতে হবে। এই হবে ওঁদের প্রতিবাদ। গান্ধীজি এ প্রস্তাবে রাজি হলেন না। কারণ তিনি তখন সরকারকে বিব্রত করতে চান না। তার পরে কবি নিজে গেলেন চিত্তরঞ্জন দাশের কাছে। তাঁকে অনুরোধ করলেন প্রতিবাদ-সভা আহ্বানের জন্য; কবি সে সভায় নিজেই সভাপতি হতে চাইলেন। চিত্তরঞ্জন বললেন, 'তবে সবচেয়ে ভালো হয় শুধু আপনার নামে সভা ডাকা।' কবি ভাবলেন, 'আমি একাই যদি কিছু করি তবে লোক জড়ো করবার দরকার কি?' কবি নিজের কর্তব্য স্থির করে ফেললেন।[৩] ২৮ মে কথা হল রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়ের সঙ্গে, ২৯ মে সারারাত জেগে ভাইসরয় লর্ড চেম্‌স্‌ফোর্ডের কাছে এক পত্র লিখে পরদিন এণ্ডরুজকে সেটি দিলেন। এণ্ডরুজ ১৯১৯ সালের ৩০ মে তারিখে ভাইসরয়কে পত্রখানি তারে পাঠিয়ে সংবাদপত্রের জন্য তার প্রতিলিপি তৈরি করলেন। এই পত্রে কবি নাইটহুডের প্রতীক তাঁর 'স্যর' উপাধি প্রত্যাখ্যান করেন।

কবিকণ্ঠে স্পষ্টোচ্চারিত প্রতিবাদের সংযত মহিমা এণ্ডরুজের মনকে অভিভূত করেছিল। কিন্তু বেদনার বড়ো একটা উপশম হল না তাতে।

---

১ Chaturvedi & Sykes, *Charles Freer Andrews*, পৃ. ১৩২।

২ সরলা দেবী ভারতবর্ষ পত্রিকায় লিখেছেন যে একটি স্বরলিপির মাধ্যমে তিনি পাঞ্জাবের খবর পাঠিয়েছিলেন তাঁর মাকে।

৩ প্রশান্তচন্দ্র মহলানবিশ, 'লিপিকা'র সূচনা', শারদীয়া দেশ, ১৩৬৭। অপিচ দ্র. অমল হোম, পুরুষোত্তম রবীন্দ্রনাথ, পৃ. ৭৪।

নানা দিক থেকেই এসময়ে ব্রিটিশ আমলাতন্ত্রের অনাচার মনকে তাঁর বিক্ষিপ্ত করে তুলছিল। ১৯১৮ সালের ডিসেম্বরে দিল্লীতে জাতীয় কংগ্রেসের অধিবেশন বসে। প্রথম বিশ্বযুদ্ধ সবে তখন শেষ হয়েছে ; য়ুরোপে চলেছে শান্তিসম্মেলনের ব্যাপক আয়োজন। ভারতের অপরিসীম সহযোগিতার স্বীকৃতি হিসাবে মিত্র-পক্ষে ভারতীয় সদস্যেরও যোগ দেবার কথা হয় ঐ সম্মেলনে ; দিল্লী কংগ্রেস সিদ্ধান্ত করেন ভারতবর্ষই তার নিজস্ব সভ্যদের মনোনীত করবে। কিন্তু এ প্রস্তাব অগ্রাহ্য করে ভারতীয় প্রতিনিধিদের মনোনীত করলেন ইংরেজ সরকার। ইংরেজদের প্রতারণা সম্বন্ধে এই সময়ে যে সন্দেহ এণ্ডরুজের মনে জেগেছিল, পরে শান্তিমহাসভার কার্যকলাপের খবর জেনে তা দৃঢ়বিশ্বাসে পরিণত হল। তাই শান্তি ঘোষণার পর ভাইসরয় যখন আনন্দোৎসবের জন্য দেশবাসীকে আহ্বান জানালেন এণ্ডরুজ ঘোষণা করেন যে শান্তির সে চুক্তি-পত্রটি ভারতের পক্ষে অসম্মানের।[১]

আর-এক দিকে মহাযুদ্ধ শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গেই দক্ষিণ-আফ্রিকাতে আবার গোলযোগের সৃষ্টি হল। এণ্ডরুজের মতে ট্রান্সভাল ও পাঞ্জাবের সমস্যা একই। তিনি বলেন[২]—

> ভারতবর্ষে ও দক্ষিণ-আফ্রিকায় এখন মানব-অধিকারের ঘোষণাই সর্বাপেক্ষা বড়ো দাবি। অন্য কোনো রকম সংস্কারসাধন সেখানে এখন নিষ্প্রয়োজন।

ভার্সাই থেকে ফিরে এসে সরকার-নির্বাচিত ভারতীয় প্রতিনিধিরা যখন জানালেন তাঁরা শান্তিমহাসভায় কেমন সসম্মান অভ্যর্থনা পেয়েছেন, এণ্ডরুজ তাঁদের স্পষ্টভাষায় বিদ্রূপ করে লিখলেন[৩]—

> ...ভারতীয় প্রতিনিধিরা ভারতসচিবের পিছনে গিয়ে বসলেন। হতভাগ্য কোরিয়া বা চীনের বিষয়ে একটি প্রতিবাদবাক্য তো এঁরা উচ্চারণ করেন নি। অথবা মানবমহাসভায় সর্বজাতির সমকক্ষতার কথাও বলেন নি। শান্তির চুক্তিপত্র স্বাক্ষর করতে পর্যন্ত কোনো ভারতীয় অস্বীকার করেন নি।

---

১ *The Modern Review*, August 1919।

২ *Bombay Chronicle*, 3rd August 1919। দ্র. Chaturvedi & Sykes, *Charles Freer Andrews*, পৃ. ১৩৩।

৩ *Bombay Chronicle*, 5th August 1919। দ্র. Chaturvedi & Sykes, *Charles Freer Andrews*, পৃ. ১৩৪।

আশ্চর্য যে বিকানীরের মহারাজা যেদিন ব্রিটিশসাম্রাজ্যে ভারতের সম্মান-জনক স্বীকৃতির উল্লেখ করে ভাষণ দিচ্ছেন ঠিক সেইদিনই ট্রান্সভালের ভারতীয়দের প্রতি সরকারের দুর্ব্যবহারের প্রতিবাদে ভারতের নানাস্থানে সভা আহ্বান করতে হয়েছে।

কিন্তু তর্ক নয়, অবিচারের মুখে কর্মে ঝাঁপিয়ে পড়াই ছিল এণ্ডরুজের স্বভাব ; অত্যাচারের সূচীমুখ নানা দিকে হাঁ করে রয়েছে ; এণ্ডরুজও তাই এসময়ে অক্লান্তকর্মা। সিংহলে গিয়েছিলেন সেখানকার শ্রমিক-সমস্যার প্রত্যক্ষ তদন্ত করতে, ১৯১৯ সালের অগস্ট মাসে ফিরে এসে দেখেন পাঞ্জাব প্রবেশে তাঁর আর কোনো বাধা নেই। পাঞ্জাবের তদন্তের জন্য ভাইসরয় হাণ্টার কমিশন নিয়োগের চেষ্টা করেন ৪ সেপ্টেম্বর তারিখে। ভারতীয়দের পক্ষে পণ্ডিত মদনমোহন মালবীয় কংগ্রেস কমিটির প্রধান হিসাবে সাক্ষ্যপ্রমাণ সংগ্রহে নিযুক্ত হলে এণ্ডরুজকেও তিনি কমিটির সদস্যপদে নির্বাচিত করেন। কমিটির সদস্য হিসাবে এণ্ডরুজের প্রথম কাজ হল করাচীতে 'তার' পাঠিয়ে গুরুদয়াল মল্লিককে আহ্বান করা। বম্বের স্যার নারায়ণ চন্দাওয়রকরের ছাত্র গুরুদয়াল।[১] ১৯১৬ সালে ফিজি থেকে প্রথমবার ফিরে এসে একদিন চন্দাওয়রকরের ক্লাস দেখতে গিয়েছিলেন এণ্ডরুজ। সাহেবকে তিনি ক্লাসের ছাত্রদের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেন। ছাত্র গুরুদয়াল এণ্ডরুজকে সেদিন বলেছিলেন, 'ভারতবর্ষ আপনার কাছে চিরঋণী।' এণ্ডরুজ তার উত্তরে বলেন, 'আজ আমি যেভাবে গড়ে উঠেছি, তার জন্যে যে ভারতবর্ষের কাছেই আমার ঋণ স্বীকার করা উচিত।' এ কথা শুনে গুরুদয়াল তাঁর উদারতায় মুগ্ধ ও অভিভূত হয়ে পড়েন। লেখাপড়া শেষ করে গুরুদয়াল শান্তিনিকেতনে বেড়াতে গিয়েছিলেন। তখনো তিনি এণ্ডরুজের স্নেহ ও সাহচর্য পান। তার কয়েকদিন পরে সেই এণ্ডরুজের কাছ থেকেই পাঞ্জাব যাবার আহ্বান পেয়ে তিনি কৃতার্থ চিত্তে এগিয়ে আসেন।

লাহোরে আর অমৃতসরে এণ্ডরুজের সাদর অভ্যর্থনা হয়। যে বাড়িতে তিনি বাস করেন সেখানে দিনরাত লোকে লোকারণ্য ; সবাই এসে নিজ নিজ দুঃখের কাহিনী তাঁর কাছে বিবৃত করে। লাহোরে তিনি অনেক কাজ করার সুযোগ পান। ফিরোজপুর রোডে তদন্ত কমিটির দপ্তর। গভর্নমেণ্ট

---

১ Gurdial Mallik, 'Reminiscences of C. F. Andrews', *The Visva-Bharati Quarterly*, 1940।

হাউস ও ফিরোজপুরে অনবরত যাতায়াত করে এণ্ডরুজ কখনো আর্তের বেদনা বিবৃত করেন, কখনো বা প্রতিকারের অনুরোধ জানান। গভীর রাত্রি পর্যন্ত চিন্তা করে হয়তো একটি পরিকল্পনা মাথায় এসেছে, তখনই নোংরা ড্রেসিং গাউন প'রে একখানি সাইকেল নিয়ে চললেন গভর্নমেণ্ট হাউসে। তাই মাঝে মাঝে সেখানে প্রবেশের অনুমতি পেতেও তাঁর অনেক সময় লেগে যেত। এ দিকে তিনি সরকারের এতদূর আস্থাভাজন হন যে পাঞ্জাবের বিভিন্ন দাঙ্গাবিধ্বস্ত অঞ্চলে যে পিটুনি কর বসানো হয়েছিল, তার হিসাবপত্র পর্যন্ত দেখার সুযোগ দেওয়া হয় তাঁকে। পাঞ্জাবের দেশপ্রিয় নেতা ভাই পরমানন্দকে আন্দামান থেকে মুক্তি দেওয়ার ব্যাপারে এণ্ডরুজের ভূমিকা ছিল সুনিশ্চিত।

জালিয়ানওয়ালাবাগ জাতীয় তদন্ত কমিটির সদস্য হিসাবে গ্রামে গ্রামেও ঘুরে বেড়িয়েছিলেন, প্রায়ই সঙ্গে থাকতেন গুরুদয়াল। তাঁদের প্রধান উদ্দেশ্য ছিল নির্যাতিত ভীরু মনে ভরসা ফিরিয়ে আনা, অবমানিতের মনে আত্ম-সম্মানকে আবার জাগরূক করে তোলা। এমনি এক তদন্ত সফরে গিয়ে জানা গেল— রামনগরে ভারত-সম্রাটের কুশপুত্তলী দাহ করা হয়েছে। জন-সাধারণ আতঙ্কিত, তারা কিছুই বলবে না। সারারাত অনিদ্রায় কাটল এণ্ডরুজের। খুব ভোরে উঠে গুরুদয়ালকে নিয়ে চলে গেলেন গ্রামের গুরুদ্বারায়। সূর্যোদয়কালে সেখানে স্ত্রীপুরুষ সবাই প্রার্থনায় সমবেত হয়েছেন। গান ও শাস্ত্রগ্রন্থপাঠ শেষ হতেই এণ্ডরুজ হাতজোড় করে এগিয়ে এলেন। অনুনয় করে বললেন— তাঁরা যেন সত্যঘটনা বিবৃত করেন। আশ্চর্যের বিষয় যে-পুরোহিত এতদিন মুখ খুলতে চান নি, তিনি নিজেই সমস্ত ঘটনা বলে গেলেন সরল শিশুর মতো।

গুজরানওয়ালায় এসে তাঁরা শুনলেন লাহোর থেকে কুড়ি মাইল দূরে একটি লম্বরদার বাস করে। সাহস ও যোগ্যতার সঙ্গে সে বহুকাল সৈন্যদলে কাজ করেছে। টেলিগ্রাফের তার কাটার অপরাধে অপরাধী সন্দেহে গাছের সঙ্গে বেঁধে তাকে সর্বসমক্ষে বেত্রাঘাতে জর্জর করা হয়। সে অবস্থায় সে জ্ঞান হারিয়ে ফেলে। বেচারা একেবারে নির্দোষ। বন্ধুরা ভয় পাচ্ছিল পাছে তার মাথার গোলমাল হয়। এণ্ডরুজ তাকে খুঁজে বের করলেন। সাহেব দেখেই সে চিৎকার করে বলল, 'চলে যাও। আমি কাউকে কিছু বলব না, ইংরেজদের আমার ঢের জানা আছে।'

জলভরা চোখে হাতজোড় করে এণ্ডরুজ তাঁকে অনুনয় করতে লাগলেন কথা বলবার জন্যে। তার পর হঠাৎ সেই সৈনিককে তিনি বুকে জড়িয়ে ধরলেন। তাতে লোকটির মন নরম হল। গায়ের সার্ট খুলে ফেলল সে। তার দিকে তাকিয়ে এণ্ডরুজের মুখে আর কথা সরে না। অতিকষ্টে অশ্রুজল সম্বরণ করে বলেন, 'গ্রন্থসাহেবে গুরু নানক তো আমাদের ক্ষমার কথা বলেছেন। তুমি ভাই আমাকে ক্ষমা করো। আমার দেশের লোকের পাপ তো আমারই পাপ।' এ কথা বলেই তিনি মাথা নিচু করে তার পায়ে হাত দিলেন। 'না, না, পায়ে হাত দেবেন না'— বলেই সৈনিকটি লাফিয়ে উঠল। তার পরেই সে কান্নায় একেবারে ভেঙে পড়ল। কিছুক্ষণ পরে শান্ত হয়ে বলল, 'সাহেব, ছয় মাসে এই প্রথম আমি সান্ত্বনা পেলাম। আর কিছু চাই না আমার।' এণ্ডরুজ আবার তাকে জিজ্ঞাসা করলেন, 'সব ক্ষোভ মিটে গেল তো?' সে বললে, 'হ্যাঁ, সব মিটে গেছে, আমি শান্তি পেয়েছি।'

গুরুদয়াল মল্লিক পাশে দাঁড়িয়ে ঘটনাটি দেখলেন। তাঁর মনে হল এণ্ডরুজের নামের তিনটি আদ্যক্ষর C. F. A., Christ's Faithful Apostle অর্থাৎ খ্রীস্টের সত্যানুগ দূত— এরূপ ব্যবহারেই সার্থক।

এমনই এক ঝড়ের মুখে গান্ধীজি এসে পৌছলেন শানিত বিদ্যুতের মতো, অশুভকে খণ্ডবিখণ্ড করতে— ১৯১৯ সালের অক্টোবরের মাঝামাঝি সময়ে। পণ্ডিত মালবীয় ছিলেন কোমল স্বভাব— গান্ধীজির প্রচণ্ড ব্যক্তিত্ব-শক্তি ছিল তার সম্পূর্ণ বিপরীত। কোমলে-কঠোরে নিবিড় এণ্ডরুজ হয়েছিলেন এঁদের মাঝখানে যেন সংযোগ-সেতু।

দক্ষিণ ও পূর্ব -আফ্রিকায় সংগ্রামী খ্রীস্টসেবকের ভূমিকায়

এই-সব কাজের মধ্যে এণ্ডরুজ যখন মগ্ন তখনই দক্ষিণ-আফ্রিকায় যাবার জন্য আবার সনির্বন্ধ অনুরোধ এল। ১৯১৯ সালের ১৫ নবেম্বরে লাহোরে এক বিরাট জনসভায় বিদায়ভিক্ষা করলেন তিনি। ওই সভাতেই কঠিন ভাষায় ব্রিটিশ ও ভারতীয় রাজকর্মচারীদের কার্যের তীব্র নিন্দাও করেন। লাহোরের শ্রোতাদের মধ্যে বেশির ভাগই অখ্রীস্টান। ভারতের জাতীয় নেতা মালবীয়জি ও গান্ধীজি সেখানে তাদের মধ্যে উপস্থিত। এণ্ডরুজ যখন যীশুখ্রীস্টের বাণী উদ্ধৃত করে পাঞ্জাবের বর্তমান অবস্থায় তার প্রয়োজনীয়তার উল্লেখ করেন, সকলে সমান শ্রদ্ধায় তাঁর ভাষণ শ্রবণ করেন।

তিনি বলেন[১]—

লাহোরে প্রতিদিন প্রদোষান্ধকারে মণ্টগোমেরী উদ্যানে বেড়াতে গিয়ে আকাশের তারার মালার দিকে চেয়ে থাকি। বড়ো বড়ো ইউক্যালিপ্‌টাস গাছের মাথার উপর সূর্য উঠে যায়, আমি তাকিয়ে দেখি। সেই গভীর স্তব্ধতার মধ্যে আমার প্রভু খ্রীস্টের এই বাক্যগুলি স্মরণে আসে— 'শত্রুকে ভালোবাসো, যারা তোমাকে অভিশাপ দেয় তাদের তুমি আশীর্বাদ করো, তবেই তুমি তোমার দিব্যধামবাসী পিতার সুযোগ্য সন্তান হবে। কেননা, তাঁর সূর্য তো ভালোমন্দ নির্বিচারে সকলকে আলো দেয়। তোমার দিব্য-মহিমময় পিতা, তিনি 'পরমঞ্চ দৈবতম্'। তুমিও তাঁর মতো পূর্ণতা অর্জন করো।'

'প্রতিশোধ নয়, ক্ষমায় চিত্তকে বিধৃত করো। ঘৃণার নীরন্ধ্র অন্ধকার থেকে ভগবৎপ্রেমের জ্যোতির্ময় আলোকে বেরিয়ে এসো।'

এই ভাষণের অল্প কয়েকদিন আগেই সেখানকার এক গির্জায় এণ্ডরুজকে প্রবেশ করতে দেওয়া হয় নি। 'ঈশ্বরের এই গৃহ বিদ্রোহীর জন্য নয়'— এ কথা তাঁকে শুনতে হয়েছে গির্জারক্ষকের মুখে।

প্রতিটি অভিযানের শেষেই শান্তিনিকেতনের কথা মনে পড়ে এণ্ডরুজের। মাঝে মাঝেই ফিরে এসে বলেন, 'এবার আমি এখানকার কাজে মন দেব। কাল থেকে ইতিহাস ক্লাস শুরু হবে।' রবীন্দ্রনাথ কিন্তু তাঁর স্বভাবটি জানতেন তাঁর চেয়েও ভালো করে। তিনি ছদ্মগাম্ভীর্যে উত্তর দিতেন, 'আচ্ছা, স্যর চার্লস,[২] আমি বরং একটি নতুন রেলওয়ে গাইড এনে হাতের কাছে রাখি।'[৩]

১৯১৯ সালের ১৩ নবেম্বরে স্বামী শ্রদ্ধানন্দকে কবি লিখেছিলেন[৪]—

এণ্ডরুজ আমাকে ভালোবাসে বলেই মনে ভাবে যে শান্তিনিকেতনেই কেবল ওর কাজ। তাতে সে নিজের প্রতি অবিচার করে। ওর কাজের ক্ষেত্র যে জগৎ-জোড়া।

---

১ *The Tribune*, 16th Nov. 1919। দ্র. Chaturvedi & Sykes, *Charles Freer Andrews*, পৃ. ১৩৭।

২ ইংলণ্ডের রাজা আর্থারের রাউণ্ড টেবিলের বীর যাঁরা দীনদুর্বলের বন্ধু, নারীর সম্মান রক্ষায় অগ্রণী, তাঁদেরই নামের অনুকরণে রবীন্দ্রনাথ তাঁকে 'স্যর চার্লস' বলে সম্বোধন করতেন।

৩ Chaturvedi & Sykes, *Charles Freer Andrews*, পৃ. ১৩৮।

৪ তদেব।

এবারের মতো পাঞ্জাবের কাজ শেষ; দূরের আহ্বানে সাড়া দিয়ে বেরিয়ে পড়ার মুখে ১৯১৯ সালের ৩ নবেম্বর পাঞ্জাব থেকেই কবিকে লিখলেন[১]—

দক্ষিণ-আফ্রিকায় আমায় একবার যেতে হবে, কিন্তু আমার আসল কাজ শান্তিনিকেতন আশ্রমে ছাড়া আর কোথাও নয়। আরো ধীরে, আরো সংযত হয়ে সেখানে আমাকে ফিরতেই হবে।

আসলে শ্রমজীবী ভারতীয়ের অত্যাচার নিবারণের সংগ্রামে তাঁকে এবার যেতে হয়েছিল দক্ষিণ এবং পূর্ব -আফ্রিকার দুই অঞ্চলেই। পূর্ব-আফ্রিকায়—(প্রথমে উগাণ্ডায় গিয়েছিলেন এণ্ডরুজ)— ভারতবাসীদের দুঃখদুর্দশার অবধি ছিল না দীর্ঘদিন ধরে শ্বেতকায় ঔপনিবেশিকদের হাতে। যুদ্ধের পরে অবস্থা হয়েছিল আরো ভয়াবহ। বহু শতাব্দী ধরে সেই স্থানগুলি ভারতীয় বাণিজ্যকেন্দ্র। উনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে ব্রিটেন যখন সেখানে তার আধিপত্য দাবি করল তখন মনে হয়েছিল ভারতীয় প্রজাদের রক্ষণাবেক্ষণই তার উদ্দেশ্য।

উগাণ্ডায় রেলপথ তৈরি হবার পরই দলে দলে ইউরোপীয়রা এসে সেখানে বসবাস শুরু করে। বিশেষ করে মহাযুদ্ধের আগের ছ বছরেই তাদের সংখ্যা খুব বেড়ে যায়। দুর্ভাগ্যের বিষয় তাদের মধ্যে বেশির ভাগ প্রতিপত্তিশালী লোকই দক্ষিণ-আফ্রিকা থেকে আসে। দক্ষিণ-আফ্রিকার শ্বেতকায় জাতি বহু বছর ধরেই ভারতীয় এবং আফ্রিকাবাসীদের সঙ্গে চূড়ান্ত গর্বোদ্ধত ব্যবহার করে আসছে। সেই অভ্যাস তাদের রক্তের সঙ্গে মিশে গেছে।

তার পরে এল মহাযুদ্ধ। পাশেই টাঙ্গানাইকার জার্মান অধিকারভুক্ত অঞ্চল। সে দিক থেকে আক্রমণের ভয়ে পূর্ব-আফ্রিকায় সামরিক শাসন জারি হয়ে গেল। সন্দেহভাজন ভারতীয়দের অনেক সময় সামান্য কারণে কারারুদ্ধ করা হত বা দ্বীপান্তরে পাঠিয়ে দেওয়া হত। নির্বিচারে দ্বীপান্তর দণ্ড দেবার ফলে ভারতীয়দের চিত্তে অসহ্য তিক্ততার সৃষ্টি হয়।[২]

ভারতীয়দের প্রধান অভিযোগ ছিল কেনিয়ার উর্বর উচ্চতর মালভূমি অঞ্চলগুলির অধিকার তারা পেত না। তা ছাড়া মাঝে মাঝে তাদের ভয় দেখানো হত যে এই প্রদেশে বাণিজ্য এবং বসবাসের অধিকার তাদের বন্ধ

১ Chaturvedi & Sykes, *Charles Freer Andrews*, পৃ. ১৩৮।

২ তদেব, পৃ. ১৩৯।

করে দেওয়া হবে। কেনিয়ার আইন-সভায় তাদের প্রতিনিধিত্ব ইউরোপীয়দের সমকক্ষ হবে না। এখানেও শেষ নয়। যুদ্ধশেষে ইউরোপীয় রাজনৈতিকগণের পক্ষ থেকে স্বায়ত্ত শাসনের দাবি জানানো হল। কিন্তু তাতে তেইশ হাজার ভারতীয় ও লক্ষ লক্ষ আফ্রিকাবাসীকে বাদ দিয়ে কেবল দশহাজার শ্বেতকায় ইউরোপীয়দের শাসনক্ষমতা দাবি করা হয়।

সরকারি পরিচালন-পদ্ধতিতে আফ্রিকাবাসী ও ভারতবাসীদের কোনো হাতই থাকবে না। এণ্ডরুজ সেখানে গিয়ে উপস্থিত হবার অল্পদিন পূর্বেই নবনিযুক্ত সরকারি অর্থনৈতিক কমিশনের তদন্তের ফলাফল প্রকাশিত হয়েছে। কমিশনের বেশির ভাগ সদস্যই অবশ্য ছিলেন ইউরোপীয়। ভারতীয়দের কোনোরূপ সাক্ষ্যগ্রহণ না করেই কমিশন অভিমত দিলেন, কেনিয়ার অর্থনৈতিক দুরবস্থার প্রধান কারণ, ভারতীয়দের সংখ্যাবৃদ্ধি। তাঁরা আরো বললেন, ভারতীয়দের প্রতিদ্বন্দ্বিতাই আফ্রিকাবাসীকে উচ্চাকাঙ্ক্ষাহীন করে তুলেছে ও তাদের উন্নতির পথে প্রতিবন্ধক সৃষ্টি করেছে।

কমিশনের রিপোর্টে উল্লিখিত এই সিদ্ধান্ত লক্ষ করে এণ্ডরুজ আফ্রিকার জনসমাজের অবস্থা, এবং মূল আফ্রিকাবাসী ও ভারতীয়দের সম্পর্কের বিষয় গভীরভাবে পর্যবেক্ষণ করতে লাগলেন। এ দিকে ঔপনিবেশিক দলের লোকেরা দক্ষিণ-আফ্রিকায় এণ্ডরুজের পূর্ববর্তী কার্যকলাপের কথা জানতেন। তাই তাঁকে শত্রু মনে করে অকথ্য গালাগালি দিয়ে তাঁরা এমন ব্যবহার শুরু করলেন যেন তিনি তাঁদের অস্পৃশ্য। কিন্তু দক্ষিণ-আফ্রিকায় যেমন, এখানেও তেমনি তাঁর অনেক ইংরেজ বন্ধু জুটে গিয়েছিল। মিঃ ম্যাকগ্রেগর রস্ ছিলেন কেনিয়ার পৌর-অধিকর্তা। আফ্রিকাবাসীদের সম্বন্ধে অনেক তথ্য এণ্ডরুজ এঁর কাছ থেকেই সংগ্রহ করেন। তাঁর কাছে জানলেন, পূর্বপুরুষদের জমির ভোগদখলেও আফ্রিকাবাসীদের অধিকার অনিশ্চিত। তাদের খাটানো হত অনেকটা চুক্তিদাসের মতো।

সেই অর্থনৈতিক কমিশনের যত অভিযোগ ছিল, সব মিথ্যা প্রমাণিত করার মতো সাক্ষ্যপ্রমাণ এণ্ডরুজ সংগ্রহ করলেন। প্রয়োজনস্থলে স্পষ্ট জোরালো ভাষায় সত্য ঘোষণা করতে পারার তথ্য-সমর্থিত অধিকার তাঁর সম্পূর্ণ আয়ত্ত হল। মিশনরি ডাক্তার যাঁরা সকল সমাজের লোকের সেবা করেন তাঁদের বিবৃতি গ্রহণ করলেন এই হিসাবে যে ভারতীয়দের যৌননীতি-বোধ নিম্নস্তরের নয়। ভারতীয় কারিগরের সঙ্গে শিক্ষানবিশী করছে

আফ্রিকার অধিবাসী; আবার ভারতীয় জমিদারিতে আফ্রিকার শ্রমিক খুশি মনেই পরিশ্রম করছে; এ-সব এণ্ডরুজ লক্ষ করলেন। আফ্রিকাবাসীরা সরলভাবেই জানাল ভারতবাসীরা ও মিশনারিরা তাদের যথার্থ সুহৃদ্।

ক্রমে এণ্ডরুজ বুঝলেন, কেনিয়ায় ভারতীয়দের উপস্থিতি উভয়পক্ষেরই কল্যাণকর। তবু এণ্ড বুঝেছিলেন যে ভারতীয়রা যদি কেবল নিজেদের রাজনৈতিক অধিকার ও বৈষয়িক ধনসম্পদলাভে ব্যাপৃত থাকে তবে সে দেশে বাস করা তাদের পক্ষে একান্ত নিরর্থক। তিনি মনে করতেন ভারতীয়দের মনেপ্রাণেই আফ্রিকাবাসীদের সঙ্গে মিশে যেতে হবে। কেনিয়া উগাণ্ডায় এণ্ডরুজ শুধু রাজনীতির কথা বলতেন না, শিখদের গুরুদ্বার, মুসলমানদের অঞ্জুমান, আর্যসমাজের মন্দির, খ্রীস্টানদের গির্জা— এ-সব জায়গায় বক্তৃতা দিতে গিয়ে সর্বজাতির আর্তপীড়িতের সেবার আবেদনই জনসাধারণকে তিনি জানাতেন। আধ্যাত্মিক প্রেরণায় উদ্‌বুদ্ধ হয়ে সবাই যেন আফ্রিকাবাসীর নিঃস্বার্থ সেবা করে— এই ছিল তাঁর প্রধান আবেদন। বলতেন, আধুনিক যুগের ভারতীয় দুঃসাহসী অভিযানকারীরা আজ কোথায়, যাঁরা বাণিজ্যিক লোভের আশায় নয়, কেবলমাত্র নিঃস্বার্থ প্রেমে সঞ্জীবিত হয়েই দেশের মাটি ছেড়েছেন?

পূর্ব থেকে দক্ষিণ-আফ্রিকায় এলেন এণ্ডরুজ ১৯২০ সালে। সেখানে এশীয় তদন্ত কমিশনের কর্মধারা পর্যবেক্ষণের জন্য প্রেরিত ভারত-সরকারের প্রতিনিধিরাও প্রায় একই সময়ে গিয়ে উপস্থিত হয়েছিলেন। সেই প্রতিনিধিদলের অন্যতম সদস্য করবেট্-এর প্রতি এণ্ডরুজের গভীর শ্রদ্ধা ছিল; তাই স্থানীয় ভারতীয় নেতৃবর্গের সঙ্গে এঁদের ঘনিষ্ঠ যোগসূত্র গড়ে দিয়েছিলেন তিনি। পারস্পরিক অবিশ্বাসের বিরূপতা তাতে কেটে যেতে পেরেছিল অনায়াসে।

ভারতীয়দের সামাজিক ও অর্থ নৈতিক উন্নয়নে এণ্ডরুজের বিশেষ আগ্রহ। এবারে গিয়ে দেখলেন নাটালের গরিব ভারতীয়দের অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয়। সেখানকার শতকরা নব্বইভাগ ভারতীয় আখের খেতে শ্রমিকের কাজ করত। যদিও তারা চুক্তিদাসত্ব থেকে মুক্তি পেয়েছিল তবু কেউ কেউ দুঃসহ দারিদ্র্যের জ্বালায় পুনরায় চুক্তিতে আবদ্ধ হতে বাধ্য হত। যুদ্ধের পর ভারত-সরকার এ দিকে চাল রপ্তানি বন্ধ করে দেওয়ায় শ্রমিকরা তাদের প্রধান খাদ্য থেকে বঞ্চিত হচ্ছিল। তা ছাড়া ডারবানের ধনী ভারতীয় বণিকরা লাভের আশায় উঠ্‌তি বাজারে চাল মজুত রাখত। তাদের কুকর্মের কথা এণ্ডরুজ বাইরে

প্রচার হতে দিলেন না, কিন্তু আলাদা করে ডেকে তাদের বোঝালেন। পরদিন সকালে বণিকের মধ্যে একজন তাঁর কাছে যত চাল ছিল, নিয়ন্ত্রিত হারে বিক্রির জন্য সব বের করে দিলেন। এণ্ডরুজ ভারতীয় পত্রিকায় চাল রপ্তানি বন্ধ করার নীতির তীব্র প্রতিবাদ জানালেন।

দক্ষিণ-আফ্রিকায় ভারতীয় শ্রমিকদের ভয়াবহ দারিদ্র্যের নিপীড়ন দেখে তিনি স্থির থাকতে পারতেন না। তাঁর মনে হল ভারতে এদের পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করতে পারলেই কেবল এই কষ্টের হাত থেকে শ্রমিকদের নিষ্কৃতি দেওয়া যায়। ১৯১৪ সালে গান্ধী-স্মাট্‌স্ চুক্তির একটি শর্ত ছিল, যে-সব ভারতীয় শ্রমিক দেশে ফিরতে চায় ইউনিয়ন গভর্নমেণ্ট তাদের পাঠাবার খরচ দেবেন কিন্তু তারা দক্ষিণ-আফ্রিকায় স্বাধীনভাবে বসবাসের ক্ষমতা হারাবে। যুদ্ধের সময় এ শর্ত মুলতুবি রাখা হয়েছিল। এণ্ডরুজ শ্রমিকদের অভাবের কথা চিন্তা করে এবারে আবার সরকারকে রাজি করালেন তাদের অর্থ সাহায্য করতে।

মূল গান্ধী-স্মাট্‌স্ চুক্তি অনুসারে ভারতীয়দের আফ্রিকা ত্যাগ ছিল স্বেচ্ছাধীন। কিন্তু এশিয়া-বিরোধী চরমপন্থীরা এর কদর্থ করে ইউরোপীয় বণিকদের ভুল বোঝালেন। মনে হল, নিঃসহায় শ্রমিক এবং ধনবান ব্যবসায়ী নির্বিশেষে সকল ভারতীয়ই বুঝি আফ্রিকা ছেড়ে যাবেন। এ ব্যাপারে দক্ষিণ-আফ্রিকার ধনী ভারতীয় সমাজও এণ্ডরুজের উপর ক্রুদ্ধ হয়ে ওঠে। নাটালের আখের আবাদের কর্তৃপক্ষ আশঙ্কা করেছিলেন এর ফলে কুলির চালান বন্ধ হয়ে যাবে।

এণ্ডরুজের এই শুভপ্রয়াসের ফলে রাজনৈতিক দিক থেকে আফ্রিকার কোনো ক্ষতি হয় নি, কেননা অতি অল্পসংখ্যক শ্রমিকই দেশে ফিরে গিয়েছিলেন। কিন্তু ভারতে ফিরে এসে এই কুলিদের দুঃখদুর্দশা চরমে উঠেছিল। এদের কষ্টের প্রতিবিধানের যে উপায় এণ্ডরুজ নির্ধারণ করেন—তাঁর ভুল হয়েছিল সেখানে। একটা বিরাট জনগোষ্ঠীকে এক জায়গা থেকে উৎপাটিত করে অন্যত্র পুনর্বাসিত করা সহজ নয়। একবার যারা দেশ ছেড়ে নাটালে চলে গেছে তাদের সেখানেই শিকড় ছড়িয়ে বসার চেষ্টা করা স্বাভাবিক পন্থা হতে পারত। ভারতবর্ষের গ্রাম্যসমাজ সম্বন্ধেও এণ্ডরুজের ধারণা অসম্পূর্ণ ছিল। ভারতীয় সংস্কৃতির সাধারণ ঐতিহ্য সম্বন্ধেই তিনি সচেতন ছিলেন। শহরের বস্তিজীবনও তিনি দেখেছেন। কিন্তু তামিলনাদ ও যুক্তপ্রদেশের

গোঁড়া পল্লীসমাজের কোনো ধারণাই তাঁর ছিল না। পুনর্বাসনের জন্য এই বিদেশ-প্রত্যাগত শ্রমিকদের বাস্তবে যে কী দুর্দশা হতে পারে, তা ছিল তাঁর কল্পনার অতীত।

এণ্ডরুজ এতে মর্মাহত হয়েছিলেন খুব। নিজের ভুল স্বীকার করে নিদারুণ মনোবেদনায় পরের বছরে তিনি আফ্রিকা-ফেরত ভারতীয়দের সমস্ত দায় নিজে গ্রহণ করেন এবং এদের পুনঃপ্রতিষ্ঠার জন্য প্রাণান্ত চেষ্টা করেন।

৫

বিচিত্র কর্মযোগ

শান্তিনিকেতনে : স্বজনসঙ্গে বিচিত্রকর্মা

এণ্ডরুজ দক্ষিণ-আফ্রিকা থেকে ভারতে ফিরে এসেছেন। এ দিকে ১৯২০ সালের মে মাসে রবীন্দ্রনাথ গেলেন আমেরিকায়। ১৯২১ সালের জুলাই পর্যন্ত রবীন্দ্রনাথ আমেরিকা ও ইউরোপে ভ্রমণ করেন। তিনি যতদিন আশ্রমে অনুপস্থিত ছিলেন, এণ্ডরুজ তাঁর বেণুকুঞ্জের ছোট্ট ঘরটিতে বসে কিভাবে শান্তিনিকেতন বিদ্যালয়ের পুঙ্খানুপুঙ্খ তত্ত্বাবধান করেন তা জানলে আশ্চর্য বোধ হয়। কখনো ইংরেজি ভাষা ও সাহিত্যের ইতিহাস সম্বন্ধে ধারাবাহিক বক্তৃতা দিচ্ছেন, কখনো বা ইংরেজি সাহিত্যের সমালোচনা করছেন। কিছুদিন গ্রীকভাষাও শিক্ষা দেন।[১] তার উপর রয়েছে প্রতিদিনের অতিথিসেবার ধুম।

খুব ভোরে ঘুম থেকে উঠে তিনি যে লেখার কাজে লাগতেন অনেকসময় মধ্যরাত্রি পর্যন্ত তা চলত। পত্রের উত্তর দেওয়া, প্রবন্ধ লেখা, স্মারকলিপি প্রেরণ— সবরকম কাজই তার মধ্যে থাকত। এ কাজে তাঁর সাহায্যের কোনো ব্যবস্থাই ছিল না। এক-একটি প্রয়োজনীয় প্রবন্ধ আট-দশ বার স্বহস্তে অনুলিখনের পর ডাকবাক্সে ফেলার জন্য দ্বিপ্রহরের রোদে পোস্টাফিস অভিমুখে নিজেই হেঁটে চলে যেতেন। ইংরেজিতে একটি জনপ্রিয় গান আছে— 'পাগলা কুকুর আর ইংরেজ জাত, দুপুরের এই তপ্ত রোদে এরাই কেবল বাইরে বেরোয়।'[২] গানটি শুনতে তিনি ভারি মজা পেতেন। তা ছাড়া ভারতবর্ষের নানা স্থান থেকে তাঁর কাছে নানা কাজের আহ্বান আসে। ৭ অক্টোবর ডালটনগঞ্জে বিহার ছাত্রসমিতির সভাপতির কাজ করেন। সেখান থেকে দিল্লী সিন্ধু করাচী ও বোম্বাই অঞ্চলে যান।[৩] আলিগড় কলেজের পাঠ্যবিষয় নির্ধারণের জন্য সেখানে যেতে হয়। সেখান থেকে ফিরতে না-ফিরতেই পুনা নগরীর ছাত্রসম্মিলনের সভাপতি হবার আমন্ত্রণ পেয়ে সেখানে যান।[৪]

---

১ শান্তিনিকেতন পত্রিকা ১৩২৬।

২ Mad dogs and Englishmen go out in the midday sun.

৩ শান্তিনিকেতন পত্রিকা, আশ্বিন ১৩২৭।

৪ তদেব, অগ্রহায়ণ ১৩২৭।

গুরুদয়াল মল্লিক শান্তিনিকেতনেরই কর্মী। বনারসীদাস চতুর্বেদী পাঁচ বছর আগে থেকেই প্রবাসী ভারতীয়দের বিষয়ে এণ্ডরুজের সঙ্গে চিঠিপত্রে যোগাযোগ রক্ষা করে চলেছিলেন।[১] ১৯১৮ সালে একবার আর ১৯২০ সালের জুন মাসে আর-একবার এণ্ডরুজের সঙ্গে দেখা করতে তিনি শান্তিনিকেতনে আসেন। ১৯২০ সালের জুলাই মাসে তাই এণ্ডরুজের আহ্বান পেয়েই ইন্দোরের চীফ্‌স্ কলেজের ইংরেজির অধ্যাপকের পদ ত্যাগ করে বনারসীদাস চলে এলেন শান্তিনিকেতনে প্রবাসী ভারতীয়দের কাজে তাঁকে সাহায্য করতে।[২]

বনারসীদাসের লেখা প্রথম এণ্ডরুজ-স্মৃতি

১৯২১ সালের জুলাই মাসে এণ্ডরুজ গেলেন কলকাতা ডকের কাছে মেটিয়া-বুরুজে। ফিজি-ফেরত ভারতীয় শ্রমিকরা পুনর্বাসনের জন্য ভারতে এসে সেখানে তখন অতিকষ্টে বাস করছিল। তাদের সঙ্গে কিছুদিন থাকার পর অসুস্থ হয়ে আবার শান্তিনিকেতনে ফিরে এলেন। শয্যাশায়ী হয়েও তিনি কিন্তু তখন আরামে শুয়ে থাকতে পারেন নি। চিঠি, টেলিগ্রাম ও প্রয়োজনীয় প্রবন্ধাদি রচনায় তাঁর বিন্দুমাত্র অবসর ছিল না। তার মধ্যে কখনো তাঁকে একাকী পেলেই বনারসীদাস তাঁর জীবনকাহিনী লিপিবদ্ধ করে গেছেন। হিন্দীভাষায় 'ভারতভক্ত এণ্ডরুজ' স্মৃতিকথা প্রকাশ ও প্রচার করার অনুমতিও এণ্ডরুজ তখন তাঁকে দিয়েছিলেন। প্রথমেই অবশ্য তিনি এ প্রস্তাবে রাজি হন নি। কিন্তু পরে যখন শুনলেন, এ পুস্তকের সাহায্যে ইংরেজদের প্রতি ভারতীয়দের চিরাচরিত ঘৃণার ভাব অপসারিত হবার সম্ভাবনা রয়েছে, তখনই কেবল সম্মত হলেন।

---

১ বনারসীদাস চতুর্বেদী (১৮৯২)— হিন্দী সাহিত্যিক ও প্রথিতযশা সাংবাদিক। 'বিশাল ভারত' ও 'মধুকর' নামে দুটি হিন্দী পত্রিকার সম্পাদনা করেন। কয়েক বছর পূর্বে রাশিয়ার আমন্ত্রণে সে দেশ ঘুরে এসেছেন। রাজ্যসভার সদস্যরূপে দিল্লীতে থাকাকালীন সেখানে 'হিন্দী-ভবনে'র প্রতিষ্ঠা তাঁরই চেষ্টার ফল। দীনবন্ধু এণ্ডরুজের দুখানি জীবনী তিনি লেখেন। একখানি হিন্দীতে 'ভারতভক্ত এণ্ডরুজ' নামে, অন্যখানি ইংরেজিতে, শ্রীমতী মার্জোরি সাইক্‌সের সহযোগিতায়। 'চার্লস ফ্রিয়র এণ্ডরুজ' এই পুস্তকখানির হিন্দী অনুবাদ 'দীনবন্ধু এণ্ডরুজ' নামে সম্প্রতি প্রকাশিত হয়েছে।

২ ৩ অগস্ট ১৯২০, শান্তিনিকেতন থেকে কবিকে লেখা, রবীন্দ্রসদনে রক্ষিত এণ্ডরুজের অপ্রকাশিত পত্র।

সে যাই হোক, শান্তিনিকেতনে বাসকালে এণ্ডরুজের জীবনযাত্রা ও বিচিত্রমুখী কর্মের যথাযথ চিত্রটি পাওয়া যায় এ সময়কার কয়েকখানি চিঠিতে। শান্তি-নিকেতন বিদ্যালয়ের ছাত্রদের উৎসাহ-উদ্দীপনাপূর্ণ জীবনপ্রবাহের আভাসও এতে পাই। রবীন্দ্রনাথ তখন আমেরিকায়। আশ্রমের মুক্ত পরিবেশে ছাত্রদের আনন্দোচ্ছল জীবনের বর্ণনা দিয়ে এণ্ডরুজ তাঁকে লিখছেন[১]—

শান্তিনিকেতন
৩১ অগস্ট ১৯২০

কাল রাতে বাল্মীকিপ্রতিভার গান ও অভিনয়ে যদি আপনি উপস্থিত থাকতে পারতেন কত যে আনন্দ হত। আশ্রমে স্বামী শ্রদ্ধানন্দের আগমন উপলক্ষে আমরা এই নাটকটি করালাম। ছেলেমেয়েরা চমৎকার অভিনয় করেছে।... কলাবিভাগ ও সংগীতবিভাগ দেখে তিনি তো মুগ্ধ।... নাটক শেষ হতে সবাই মিলে শান্তিনিকেতন গান ধরল।... স্বামীজি আমাকে বললেন, এখানকার স্বাধীন আবহাওয়া ও আশ্রম-বালকদের আনন্দময় জীবন দেখে তাঁর সবচেয়ে ভালো লেগেছে।...

খানকয়েক চিঠিতে আছে আশ্রমের অর্থসমস্যা, রান্নাঘরের পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতার কথা— রান্নাঘরে বর্ণসমস্যা, খাদ্যবিষয়ে প্রাদেশিক গোঁড়ামি ইত্যাদি প্রতিদিনের কত পরিস্থিতির বাস্তব পরিচালনার বর্ণনা।

রবীন্দ্রনাথের চিঠিতে এণ্ডরুজ জানতে পারলেন আমেরিকায় তাঁর বিপুল সম্বর্ধনা হচ্ছে। সেখানে তিনি পাঁচ মিলিয়ন ডলার পাবার প্রত্যাশা করছেন। রবীন্দ্রনাথ এণ্ডরুজকে লিখলেন, 'এখন আমি 'পাঁচ মিলিয়ন ডলার' এই মন্ত্রটি জপ করছি।' এ দিকে শান্তিনিকেতনে তখন টাকার বড়ো টানাটানি। এণ্ডরুজ উত্তর দিলেন, 'পাঁচ মিলিয়ন ডলার খুঁজে বেড়ানোর চেয়ে ব্যাঙ্কে মজুত পাঁচ হাজার টাকার মূল্য এখন আমার কাছে বেশি।' কিছুদিন পরে এণ্ডরুজ লিখছেন[২]—

---

১ শান্তিনিকেতন রবীন্দ্রসদনে রক্ষিত এণ্ডরুজের অপ্রকাশিত পত্র।

২ তদেব।

৩ অক্টোবর ১৯২০

…পূজায় এবার আমরা পনেরো দিন ছুটি দিতে বাধ্য হলাম। সেই সুযোগে আমি টাকা জোগাড়ের চেষ্টায় বেরিয়ে পড়েছি— দিল্লী হায়দরাবাদ করাচি আহমেদাবাদে আর বম্বে যাব।…

এ-সব উদ্‌বেগের মধ্যেও ঘরোয়া নানাখবর এণ্ডরুজ গুরুদেবকে পাঠাচ্ছেন। কবির কনিষ্ঠা কন্যা মীরা দেবীর ঘরকন্নার নানা খুঁটিনাটি খবর, কবির দৌহিত্র নীতু ও দৌহিত্রী বুড়ির শৈশবের সারল্য ও মাধুর্যভরা দিনগুলির নানা কৌতুক-দীপ্ত ঘটনা এণ্ডরুজের পত্ররচনার মাধ্যমে উপভোগ্য হয়ে উঠেছে। এ দিকে নিচুবাংলায় দ্বিজেন্দ্রনাথের কাছে এসে কবির চিঠি তাঁকে পড়ে শোনানো এবং বড়দাদার আশীর্বাদেরও চিঠি কনিষ্ঠ ভ্রাতা রবির কাছে প্রেরণ করা— এও তাঁর দৈনিক কর্তব্যের অঙ্গ ছিল। 'কে কবে ভেবেছিল যে রবি এভাবে পশ্চিমদেশ জয় করে নেবে?'— বলতে বলতে বড়দাদার মুখ ভ্রাতৃগর্বে কেমন উজ্জ্বল হয়ে উঠত— সে ছবিও এণ্ডরুজের পত্রেই আমাদের চোখের সামনে স্পষ্ট হয়ে ওঠে।

এক দিকে শিক্ষকদের বেতনবৃদ্ধির জন্য গুরুদেবের কাছে আবেদন জানাচ্ছেন কেননা দ্রব্যমূল্য দিন দিন বেড়ে যাচ্ছে। আবার অন্য দিকে তাঁর বাবুর্চি জহুরি ও গুরুদেবের সেবক গুরুচরণের দৈনিক কাজকর্মের কৌতুককর বর্ণনা দিয়ে লিখছেন[১]—

২২ নবেম্বর ১৯২০

…সাধু খুব আনন্দে আছে। কোনো অতিথি এলে আর কথা নেই। তৎক্ষণাৎ তাঁকে তার একচেটিয়া দখলে নিয়ে এসে সেবায় মুগ্ধ করে দেবে। যখন কোনো অতিথি থাকে না তখন সে রোজ সকালসন্ধ্যা কেবল আপনার ঘর ঝাড়ামোছা নিয়েই ব্যস্ত থাকে। কখনো আমার ধারেও ঘেঁষে না। সেটা অবশ্য ভালোই। কারণ ও যদি না আসে তবে জহুরি একটু বক্ বক্ করার এই সুযোগটি পায় যে এত কাজ তাকে একাই টানতে হচ্ছে। তার ফলে ওর মেজাজও ভালো থাকে। তবে দেখতে পাচ্ছেন দুজনেই বেশ খুশি আছে। সাধু যে সকাল হলেই আমার ঘর ঝাঁট দিতে এসে হাজির হচ্ছে না তাতে আমি কত যে নিশ্চিন্ত আছি আপনাকে কী বলব? জহুরি

১ শান্তিনিকেতন রবীন্দ্রসদনে রক্ষিত এণ্ডরুজের অপ্রকাশিত পত্র।

পাঁচমিনিটে যে কাজ করে ফেলে সাধু তা করতে ঘণ্টার পর ঘণ্টা কাটিয়ে দেয়।... জহুরি আমাকে এত ভালোবাসে বলার নয়। আমি যেন ঠিক একটি আদুরে ছেলে। কখনো যদি ঠিকমত খাওয়া-দাওয়া না করি আমাকে এমন ধমক দেবে।...

রাজনীতি : শান্তিনিকেতন : ভারত-ভাবনা

১৯২০ সালে এণ্ডরুজ যত চিঠি লিখেছেন তার থেকে বুঝতে পারি, সেই সময়কার রাজনৈতিক উত্তেজনার চাপে তাঁর নিজের মন এবং শান্তিনিকেতনের আবহাওয়াও কতখানি প্রভাবিত হয়েছিল। পূর্ব-আফ্রিকার খবরের কাগজে তাঁর সম্বন্ধে যে কুশ্রী ইঙ্গিত করা হয় তাতে তাঁর চিত্ত কতখানি আহত হয়, তার প্রমাণ পাই বনারসীদাস চতুর্বেদীকে লেখা নিম্নোদ্ধৃত পত্রে[১]—

১ জুলাই ১৯২০

কাজের চাপে আর মাথা তুলতে পারি না। তোমার টেলিগ্রাম পেয়ে আনন্দিত হয়ে টেলিগ্রাম করার ইচ্ছাই আমার ছিল, কিন্তু টাকার অভাবে তা পারি নি। তুমি যাবার পর থেকে আবার অসুস্থ হয়ে পড়েছি। অসম্ভব কাজের চাপে আর সুস্থ হতে পারছি না। তুমি আসছ জানলে নিশ্চিন্ত হই।

পূর্ব-আফ্রিকার পত্রিকায় আমার সম্বন্ধে যে জঘন্য অপবাদ প্রচারিত হয়েছে তার কাটিং এই ডাকে তোমার কাছে পাঠাচ্ছি। সেটা পড়ে আমার মনে কত যে দুঃখ হয়েছে কী বলব![২]... আমি কখনো একটি পয়সাও কারোর কাছ থেকে নিই নি। শুধু তাই নয়। ফিজির স্কুল ও হাসপাতালের জন্য যতদিন কোনো সাহায্য পাই নি, ততদিন আমার সর্বস্ব সেখানে খরচ করেছি।... এ বড়ো মারাত্মক অপবাদ, একবার যদি এতে লোকে বিশ্বাস করে, তবে সমস্ত কাজ পণ্ড হবে। আমার মনে হয় এখনই সব হিন্দী কাগজে তোমার লেখা উচিত অপবাদটি কত যে নিষ্ঠুর। আর সত্যঘটনাও তোমার জানানো প্রয়োজন। ফিজিতেও ঠিক এরকমই ঘটেছিল, এখন পূর্ব-আফ্রিকায় শুরু হল।

---

১ Chaturvedi & Sykes, *Charles Freer Andrews*, পৃ. ১৫৪।

২ পূর্ব-আফ্রিকার পত্রিকায় লেখা হয়, এণ্ডরুজ ভারতবাসীদের বেতনভুক আন্দোলনকারী।

১৯২০ সাল। ভারতীয় রাজনীতিতে তখন নতুন অধ্যায়ের সূচনা হয়েছে। ১৯১৮ সালের জানুয়ারিতে লয়েড জর্জের সরকারি বিবৃতি অনুসারে ভারতীয় মুসলমানরা আশা করেছিল যে যুদ্ধান্তিক ব্যবস্থায় তুরস্কের সুলতান, যিনি মুসলমান জগতের খলিফার সম্মান পান, মুসলমানদের আধ্যাত্মিক ও জাগতিক ব্যাপারে তাঁর কর্তৃত্বই প্রধান বলে স্বীকৃত হবে। ১৯১৯ সালে তাঁদের মনে সন্দেহ জাগে যে এই অঙ্গীকার হয়তো রক্ষা হবে না। ১৯২০ সালের মে মাসে তুরস্কের সঙ্গে সন্ধির শর্তগুলি প্রকাশিত হতেই এ আশঙ্কা দৃঢ়বদ্ধ হল। মুসলমান নেতা মহম্মদ আলি ও শৌকৎ আলি ব্যাপক খিলাফৎ আন্দোলন শুরু করলে গান্ধীজিও তাতে তাঁর দৃঢ় সমর্থন জানান। ১৯২০ সালের সেপ্টেম্বরের প্রথম ভাগে ভারতের জাতীয় কংগ্রেসের বিশেষ অধিবেশনে সরকারের সঙ্গে অসহযোগের কর্মসূচীর সাতটি ধারা গ্রহণের সংকল্প নেওয়া হয়। প্রচণ্ড উদ্দীপনার মধ্যে গান্ধীজি ও আলি-ভ্রাতৃযুগল সমগ্র ভারত ভ্রমণ করেন। নানাস্থানে সভাসমিতি, ছাত্র-আন্দোলন, জাতীয় বিদ্যালয় স্থাপন ইত্যাদি কাজ দ্রুত পরম্পরায় চলতে থাকে।

গান্ধীজিকে খিলাফতের বিরুদ্ধে এণ্ডরুজ বহু পত্র দিয়েছেন। তার মধ্যে একটি পত্র[১]—

২৩ সেপ্টেম্বর ১৯২০

যে খিলাফৎনীতি তুরস্ক সাম্রাজ্যকে অতি পবিত্র মনে করে এবং অন্য সব পরাধীন মুসলমান জাতিকে স্বাধীনতা দিতে আপত্তি জানায়, তার প্রতি আমার মনে অসীম ঘৃণা। এই নীতির ব্যাপারে আমার আপত্তি এখনো বলবৎ রয়েছে। যতদিন মহম্মদ আলি ও শৌকত আলি দ্ব্যর্থপূর্ণ কথা বলবেন ততদিন এঁরা আমার পূর্ণ সমর্থন পাবেন না। তুমিও এখনো স্পষ্টভাবে আমার প্রশ্নের উত্তর দিতে পার নি। প্রশ্নটি তো অতি সহজ, এতে তো কোনো ফাঁক নেই। আরব, আর্মেনিয়া ও সিরিয়ার স্বাধীনতা কি তুমি অস্বীকার করবে? কারণ তাদের দেশ তো তাদের নিজেদের, তুরস্কের নয়।...

কেবল আলোচনা-সমালোচনাপূর্ণ মনোভাব নিয়েও এণ্ডরুজ বেশিদিন

১ শান্তিনিকেতন থেকে গান্ধীজিকে লেখা এণ্ডরুজের অপ্রকাশিত পত্র। গান্ধী-স্মারক সংগ্রহালয় সমিতির (নিউ দিল্লী) সৌজন্যে প্রাপ্ত।

থাকতে পারতেন না। সুনিশ্চিত কাজের প্রতিই ছিল তাঁর একমাত্র ঝোঁক। তাই বিচিত্র বিরোধী ভাবনা-কণ্টকিত মুহূর্তে অনেক চিন্তা করে এই ছোটো চিঠিখানি ছাপতে দেন প্রেসে।

১৯ সেপ্টেম্বর ১৯২০

ইণ্ডিয়ান ডেলি নিউজ পত্রিকার সম্পাদক মহাশয় সমীপেষু—

ভারতীয়দের অবমাননা আমি স্বচক্ষে দেখেছি। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের অধীনতা থেকে মুক্তি না পাওয়া পর্যন্ত ভারতীয়দের আত্মসম্মান ফিরে পাবার আর কোনো পথ দেখি না। মিশর যতখানি স্বাধীনতা পেয়েছে তার চেয়ে কম হলে চলবে না। স্বাধীনতা পেতে হলে চাই একটি ঐক্যবদ্ধ নীতিগত লক্ষ্যের রূপায়ণ। আপস বা দাক্ষিণ্যের কোনো স্থান এতে নেই।…

এণ্ডরুজ-কণ্ঠে স্বাধীন ভারতের দাবি

বস্তুত ভারতের স্বাধীনতার দাবি জনসমক্ষে এই প্রথম প্রচারিত হল। এই পত্র ও পুস্তকাকারে প্রকাশিত প্রবন্ধ Independence : The Immediate Need সে সময়কার তরুণদের মনে বিস্ময়কর উদ্দীপনার সঞ্চার করে। জওহরলালের জীবনস্মৃতিতে তার উল্লেখ দেখতে পাই।[১] এ বিষয়ে এণ্ডরুজ রবীন্দ্রনাথকে যে দুখানি পত্র দেন তাতে তাঁর বক্তব্য আরো বিশদভাবে বিশ্লেষিত হয়।[২]

২২ সেপ্টেম্বর ১৯২০

গান্ধীজির খিলাফৎ আন্দোলন আমি কিছুতেই সমর্থন করতে পারি না। …কোনোরকম সাম্রাজ্যবাদেরই একেবারে বিরোধী আমি। তাই যে-খিলাফৎ আন্দোলন অটোম্যান সাম্রাজ্যের দাবি করে তাকে কিছুতেই মানতে পারি না। কারণ সে আন্দোলন যে ভারতের স্বাধীনতার দাবির মূলেই কুঠারাঘাত করবে। কিন্তু জনগণের চেতনা যে সময়ে জাগ্রত হয়েছে সে সময়ে চুপ করে থাকাও যে আমার পক্ষে অসম্ভব। তাই আমাকে যদি কিছু বলতেই হয় তবে ভারতের পূর্ণ স্বাধীনতার যে দাবি আমি জানিয়েছি তার চেয়ে কম কিছু আমি চাইতেই পারি না।…

---

১ *Jawaharlal's Autobiography*, পৃ. ৬৬।

২ শান্তিনিকেতন রবীন্দ্রসদনে রক্ষিত এণ্ডরুজের অপ্রকাশিত পত্র।

২৮ সেপ্টেম্বর ১৯২০

...বর্তমানে সে দাবি গ্রাহ্য হবে না জানি। এক দিক থেকে বিচার করতে গেলে এর যথার্থ সময় আসার পূর্বেই আমি দাবিটি জানিয়েছি। কিন্তু প্রত্যেক ইংরেজেরই বোঝা উচিত ভারত আর বেশিদিন ইংরেজ সাম্রাজ্যের অধীনে থাকতে পারে না। আজ ইংরেজের প্রতি ভারতের প্রচণ্ড বিদ্বেষ। আমার মতে ভারতবর্ষকে পূর্ণ স্বাধীনতা দিলেই ইংরেজদের সঙ্গে তার যথার্থ বন্ধুত্ব অটুট থাকবে।

কলকাতার বিশেষ-কংগ্রেস উপলক্ষে এণ্ডরুজ কলকাতা গিয়ে শান্তিনিকেতন পরিদর্শনের জন্য বন্ধুবান্ধবদের নিমন্ত্রণ করে আসেন। তা ছাড়াও দেশবিদেশ থেকে বহুসংখ্যক অতিথি এসময় শান্তিনিকেতন দেখতে যান। গুরুদেবকে লেখা এইসময়কার চিঠিতে প্রায়ই তার সকৌতুক বর্ণনা মেলে।[১]

২৭ সেপ্টেম্বর ১৯২০

...'ছাগলের দুধ'[২] বা 'পাঁচ মিলিয়ন ডলারে'র চেয়েও অধিক শক্তিশালী একটি মন্ত্র এবার আমি গ্রহণ করেছি। সেটি হল 'অতিথি আর নয়'। তবে তাতে সার্থকতা লাভ আরো অসম্ভব। আপনি বলেছিলেন গত বছর খ্রীস্ট-জন্মোৎসবের ছুটিতে আমি আশ্রমে অনুপস্থিত ছিলাম বলে আপনি আমাকে দিনরাত অভিসম্পাত দিয়েছেন। এবার আমি তার তাৎপর্য ঠিক বুঝলাম। গত পনেরো দিন ধরে আমার দুঃখ ও সহিষ্ণুতার পাত্র পূর্ণ হয়ে উপচে পড়ছে। আর অভিশাপ-বাণী সজোরে উচ্চারিত না হলেও আমার মনের গভীরে প্রতিনিয়ত গুঞ্জিত হয়ে চলেছে।... কংগ্রেস শেষ হবার পর থেকে দৈনিক বারো থেকে ষোলো জন অতিথি এখানে আসছে।...

২৮ নবেম্বর ১৯২০

অতিথি, অতিথি, অতিথি— আরো অতিথি। স্টেশনে ঠিকমত গোরুর গাড়ি পাঠানো, সব সময়ে পাঁচ-ছজনের খাবার প্রস্তুত রাখার ব্যবস্থা করা, জহুরির মেজাজ ঠিক রাখা আর যথাসম্ভব তাড়াতাড়ি অতিথিদের ফিরতি ট্রেন ধরিয়া দেওয়া— এ-সবে আমার সমস্ত সময় চলে যাচ্ছে।...

---

১ শান্তিনিকেতন রবীন্দ্রসদনে রক্ষিত এণ্ডরুজের অপ্রকাশিত পত্র।

২ গান্ধীজি ছাগদুগ্ধ খেতেন, এখানে তারই উল্লেখ।

অধ্যাপক ও অভিভাবকদের অনুরোধে পনেরো দিন পূজার ছুটি দিতে হল। ৭ অক্টোবর বিহার ছাত্র কনফারেন্সের সভাপতি হয়ে ডালটনগঞ্জ গেলেন। পথের জনসমাবেশে তাঁদের অভ্যর্থনার বিষয় জানিয়ে শান্তিনিকেতনের অধ্যক্ষ জগদানন্দ রায় মহাশয়কে[১] লিখেছেন[২]—

১৬ অক্টোবর ১৯২০

ডালটনগঞ্জে বিহার ছাত্রসমিতিতে যা ঘটেছিল শুনলে আপনি কত যে আনন্দিত হবেন তা জানি।··· সেখানে যাবার আর ফেরার পথে, আর যে-কদিন সেখানে ছিলাম ততদিন, স্বদেশী ধুতি কুর্তা পরেই ছিলাম। তা দেখে ছাত্রদের খুব ভালো লেগেছে— এ কথা তারা আমাকে বলল। সেখানে আমাকে হিন্দুস্থানিতে তিনটে বক্তৃতা দিতে হয়েছে। তাও ছাত্রদের ভালো লেগেছে কিন্তু আমার লাগে নি। সমস্তক্ষণ আমি ভয়ে কাঁপছিলাম। কয়েকটি ছাত্রের বলা শুনে মনে হল যেন প্রতিযোগিতায় ইংরেজি বক্তৃতা দিতে উঠেছে। দু-একজন তো খানিক বলে হতবুদ্ধি হয়ে থেমেই গেল। হিন্দুস্থানিতে বলতে গিয়ে আমার অবস্থাও অনেকটা তাদেরই মতো হয়েছিল।

শোন নদীর পূর্বতীরে যত রেলস্টেশন আছে সর্বত্র আমরা আপ্যায়িত হয়েছি। চার দিককার গ্রাম থেকে স্টেশনে লোক এসে জড়ো হয়েছিল। সমস্ত দেশটা যে কিভাবে জেগে উঠছে দেখে অবাক লাগে। বেশির ভাগ স্টেশনই এত ছোটো যে সেখানে প্ল্যাটফর্ম নেই। তবু সব জায়গায় লোকের ভিড়। স্টেশনমাস্টার ও অন্যান্য রেলকর্মচারীরা সারি দিয়ে দাঁড়িয়ে আছেন আমাদের অভ্যর্থনার জন্য। আমি আপনাকে বলছি জগদানন্দবাবু, এ সম্পূর্ণ এক নতুন ভারতকে আমি দেখলাম। মনে রাখবেন, এরা শহরের লোক নয়, গ্রামের অভ্যন্তরে এদের বাস। চাষের খেত থেকে এই যে ওরা ছুটে এসেছে, সে তো কেবল মাতৃভূমির প্রতি ভালোবাসাতেই।

---

১ জগদানন্দ রায় (১৮৬৯-১৯৩৩)— জগদানন্দ রায় শিলাইদহ থেকে ব্রহ্মচর্যাশ্রমের গোড়ার দিকেই শিক্ষকতার কাজ নিয়ে আসেন। বিজ্ঞান বিষয়ে তাঁর লেখা পোকামাকড়, গ্রহনক্ষত্র, গাছপালা ও বিজ্ঞানাচার্য জগদীশচন্দ্রের আবিষ্কার গ্রন্থগুলি প্রসিদ্ধ।

২ Chaturvedi & Sykes, *Charles Freer Andrews*, পৃ. ১৫৮।

নরসিংভাই প্যাটেলকে[১] কয়েকদিন পরে লিখলেন[২]—

মাটিয়ানা, সিমলা পাহাড়
৩ নবেম্বর ১৯২০

কিকুভাইকে, তোমাকে আর অন্য সবাইকে আমার গুজরাট ভ্রমণের কথা জানাতে চাই।... চন্দ্রগ্রহণের মেলার সময় আমি ডাকুরে ছিলাম। অনুমান দেড় লাখেরও বেশি লোক সেদিন সেখানে জমায়েত হয়। সন্ধ্যা-বেলায় সভাটিকে দেখাচ্ছিল যেন এক বিরাট সমুদ্র। সভা যখন আরম্ভ হয় চাঁদে তখন গ্রহণ লেগেছে— চাঁদের চার দিকে একটি হলদে আভা। গ্যাসের উজ্জ্বল আলোয় দেখলাম প্রায় একশো গজ জায়গা জুড়ে নিস্তব্ধ শ্রোতার দল বসে আছে। তার মাঝখানে একটি ছোটো মঞ্চ। সেখানে পৌঁছবার জন্য প্রচণ্ড ভিড়ের মধ্যে সেই একশো গজ পথ আমাদের হেঁটে যেতে হল। চার দিকে অপূর্ব শৃঙ্খলা! মহাত্মাজি যখন হেঁটে গেলেন, একটি লোক নড়ল না। হাজার হাজার কণ্ঠে ধ্বনিত হল— জয় ভারতমাতাকী জয়! জয় হিন্দু-মুসলমানকী জয়! সে শব্দ শুনে মনে হয় বিপুল জলতরঙ্গ যেন কূল ভাসিয়ে নিয়ে গেল। মঞ্চের পশ্চাতে মেয়েদের বসার স্থান। ভারতবর্ষে অন্য কোনো সভায় এত মহিলা আমি একসঙ্গে দেখি নি।

ভিড়ের লোকের মুখ দেখে মনে হচ্ছিল চন্দ্রগ্রহণের দিকে আর কারোর নজর নেই, সভায় বক্তাদের দিকেই সকলের মনোযোগ নিবদ্ধ। মহাত্মা গান্ধী বলবেন বলে উঠে দাঁড়াতেই 'মহাত্মা গান্ধী কী জয়' শব্দ যেন আকাশ বিদীর্ণ করতে লাগল— এমন স্বতঃস্ফূর্ত, এমন আন্তরিক সে ধ্বনি।...

এবার চিঠি শেষ করি। ভোরের আলোর আভা আকাশে দেখা দিয়েছে। আমাদের খুব তাড়াতাড়ি যাত্রা করতে হবে কেননা কোটগড়ে পৌঁছতে ত্রিশ মাইল পথ অতিক্রম করতে হবে। সূর্যাস্তের আগেই সেখানে পৌঁছতে চাই।

---

১ নরসিংভাই প্যাটেল— পূর্ব-আফ্রিকা থেকে এলেন নরসিংভাই প্যাটেল সপরিবারে। নরসিংভাই জার্মান ভাষা ভালো জানতেন— বিশ্বভারতীতে ইনি জার্মান ভাষা শিক্ষা দিতেন। এ ছাড়া গুজরাটি ছাত্রদের গুজরাটিও শেখাতেন। এণ্ডরুজ সাহেবের ব্যবস্থায় ইনি আসেন। দ্র. রবীন্দ্র-জীবনী ৩য় খণ্ড, পৃ. ৯৪।

২ Chaturvedi & Sykes, *Charles Freer Andrews*, পৃ. ১৫৮।

শান্তিনিকেতনের অতিথিদের মধ্যে কয়েকজন এসেছিলেন রাজপুতনা থেকে। তাদের মুখেই এণ্ডরুজ প্রথম রাজপুতনারাজ্যের বেগারশ্রমের কথা শোনেন। কিছুদিন পরে স্টোক্‌সের চিঠি পেয়ে জানলেন সিমলা পাহাড়েও ভারত-সরকার অনুরূপ শ্রমের প্রচলন করেছেন। এরই তদন্তে এণ্ডরুজ ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে ঘুরে বেড়ালেন।

রবীন্দ্রনাথকে লিখছেন এক চিঠিতে[১]—

কোটগড়

নবেম্বর ১৯২০

...দুদিনের মধ্যেই কোটগড় ছেড়ে আমি শান্তিনিকেতনে যাব।... এখানে আসায় গ্রামের লোকের বেগারখাটা চোখে দেখলাম, সে অনেকটা দাসত্ব-প্রথারই মতো। স্টোক্‌স্ আমাকে সব পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে বুঝিয়ে বলেছেন। এ-সব গরিব লোকদের দাসত্বশৃঙ্খলমুক্ত করার সময় হয়েছে। তারা আমার চারি দিকে জড়ো হয়ে আমাকে জানাল তাদের দুঃখের কথা। এখন ওরা নতুন সাহসে একযোগে অগ্রসর হবে।...

উইলিয়াম উইনস্ট্যানলি পিয়রসনকে লিখেছেন[২]—

১২ নবেম্বর ১৯২০

স্টোক্‌স্ আর আমি— দুজনে একসঙ্গে গিয়ে দুদিনে কোটগড়ে পৌঁছলাম। জেলা-কমিশনার নিজেও তখন সেখানকার অবস্থা পরিদর্শনের জন্য উপস্থিত ছিলেন। তিনি সুবিবেচনার সঙ্গে সব অবস্থার পর্যালোচনা করলেন। আমি তখন তাঁকে দৃঢ়ভাবে জানালাম যে শীঘ্রই এ বিষয়ে কিছু করা দরকার। সব চাষীরা বলল যে ভবিষ্যতে বেগার খাটতে তারা একযোগে অস্বীকার করবে। এ কাজে আমি এত দূর থেকে এসেছি দেখে কমিশনারও তাড়াতাড়ি আপস মীমাংসায় উৎসুক হয়ে উঠলেন। ডাক-বিভাগের বেগার তিনি তৎক্ষণাৎ বন্ধ করে দিতে রাজি হলেন। গত কয়েক বছর ডাকের বেগার খাটতে গিয়ে তুষারের মধ্যে মারা পড়েছে

১ শান্তিনিকেতন রবীন্দ্রসদনে রক্ষিত এণ্ডরুজের অপ্রকাশিত পত্র।

২ Chaturvedi & Sykes, *Charles Freer Andrews*, পৃ. ১৫৯।

অনেক গ্রাম্য লোক। তাই তারা ডাক-বেগার খাটতে সবচেয়ে বেশি ভয় পায়। স্থির হল যে, ১ মার্চ পর্যন্ত বনবিভাগ ও পূর্তবিভাগের কর্মচারীরা কেবল নিজেদের কাজে বেগার খাটাতে পারবে, তার পরেই এ প্রথার সম্পূর্ণ পরিবর্তন আনতে হবে। কমিশনার এই শর্তে রাজি হলেন যে ১ মার্চ তারিখের মধ্যে বেগার প্রথার উচ্ছেদ না হলে নিষ্ক্রিয়-প্রতিরোধ শুরু করা চলতে পারে। বোঝা গেল সিমলার প্রমোদ-ভ্রমণকারীরা ভবিষ্যতে কখনো পয়সা ছাড়া লোক খাটাতে পারবে না। গ্রামের লোক নিজেদের কাজ করে সময় পেলে মাল বয়ে দিয়ে বাড়তি উপার্জন করবে। আমাকে অনেকে অনেকবার বলেছেন— চুক্তিদাসমুক্তির জন্য কেন বৃথা ফিজি যাও, আমাদের দেশের মধ্যেই যে এখনো তার চেয়ে বড়ো দাসত্বপ্রথা চলে আসছে। পাহাড়ে গিয়ে এই বেগারপ্রথা দেখার আগে পর্যন্ত আমি তার সত্যতা বুঝতে পারি নি।

আবার শান্তিনিকেতনে

১৩ নবেম্বর ১৯২০ শান্তিনিকেতনে ফিরে এসে এণ্ডরুজ রবীন্দ্রনাথের চিঠি পেলেন। রাজনৈতিক উত্তেজনার ঝড় এসে পাছে আশ্রমের গঠনমূলক কাজে বাধা ঘটায়— এ চিন্তায় কবি তখন উদ্‌বিগ্ন। তাই এণ্ডরুজ রবীন্দ্রনাথকে লিখলেন[১]—

বোলপুর
১৫ নবেম্বর ১৯২০

অন্যান্যবারের মতো এবারও আপনি ধরতে পেরেছেন কোথায় আমার ত্রুটি।[২] সত্যিই সাময়িক উত্তেজনায় ভেসে গিয়ে আমার আধ্যাত্মিক দৃষ্টি আবিল হয়ে উঠেছিল।...

তবে একটা কথা। এর মধ্যে যখন আমি আশ্রমের বাইরেও গেছি, তখনো কিন্তু রাজনীতির আবর্তে প্রবেশ করি নি। সর্বত্র আমি তার ভাবাবেগের দিকটির সমালোচনাই করেছি।... কিন্তু বর্তমান রাজনৈতিক

---

১ শান্তিনিকেতন রবীন্দ্রসদনে রক্ষিত এণ্ডরুজের অপ্রকাশিত পত্র।

২ নিউইয়র্ক থেকে ১৯২০ সালের ৪ নভেম্বরে কবি এণ্ডরুজকে যে পত্র লেখেন, এ পত্রে তারই উল্লেখ পাই। সে পত্রের বাংলা অনুবাদ, রবীন্দ্রনাথ-এণ্ডরুজ পত্রাবলী, পৃ. ৫৬, ৫৭।

অবস্থায় সম্পূর্ণ উদাসীন থাকাও আমার অসংগত বোধ হয়।... আমার কাজের কৈফিয়ত হিসাবে এ কথা বললাম বটে কিন্তু আমার প্রতি আপনার তীব্র তিরস্কারের প্রয়োজন ছিল তাও স্বীকার করি। ঈশ্বর করুন আমার আবেগপ্রবণতার ফলে আশ্রমের যেন কোনো ক্ষতি না হয়।...

সাময়িক রাজনীতিতে বিক্ষিপ্ত না হয়ে শান্তিনিকেতনের গঠনমূলক কাজ চলতে থাকুক— এ ইচ্ছা এণ্ডরুজের মনে ছিল। তবু ভারতের স্বাধীনতার যে আকৃতি জেগে উঠেছে, শিক্ষাক্ষেত্রে তার মূল্য যে রয়েছে, সে কথা তিনি বুঝেছিলেন। ১৯২০-২১ সালে রবীন্দ্রনাথকে যত চিঠি লিখেছেন তাতে দেখি শান্তিনিকেতন বিদ্যালয়ে এই ভাবগুলি কার্যকর করতে পারার কথাই বেশি। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় শান্তিনিকেতনের ছাত্রদের যোগ দেওয়া সম্বন্ধে এ সময়ে তিনি রবীন্দ্রনাথকে অনেক চিঠি লেখেন। তার মধ্যে একটি পত্রে লিখছেন[১]—

৮ ডিসেম্বর ১৯২০

আমাদের বিদ্যালয়ে ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষা ত্যাগের সংকল্প নেওয়া হয়েছে শুনে চারি দিকে সকলে আনন্দিত।... রান্নাঘরেও ব্রাহ্মণের আর আলাদা পঙ্‌ক্তি নেই। সে নিয়ে এখন আর কেউ মাথা ঘামায় না। বিদ্যালয়েও ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষা নেই, কারণ শিক্ষকরা আর সে পরীক্ষাকে কোনো আমলই দেয় না।...

সাহিত্য ও শিল্পকলায় বিশ্বভারতীর ছাত্রদের শক্তির বিকাশ দেখে এণ্ডরুজ উৎসাহে আনন্দে অভিভূত হতেন। তাই রবীন্দ্রনাথকে জানাচ্ছেন গোয়ালিয়রের গুহাচিত্রগুলি অঙ্কন করার জন্য যে-সব শিল্পী বিশ্বভারতী থেকে গেছেন, তাঁদের কথা[২]—

৩১ জানুয়ারি ১৯২১

...গোয়ালিয়রের ফ্রেস্কোগুলি জলরঙ ও তুলির সাহায্যে স্কেচ করে আমাদের শিল্পীরা শান্তিনিকেতনে পাঠাচ্ছেন দেখে এখানে সকলেরই খুব আনন্দ হচ্ছে।... এ কাজে তাঁদের উৎসাহ অদম্য।... এ-সব জিনিস বোঝার

---

১ শান্তিনিকেতন রবীন্দ্রসদনে রক্ষিত এণ্ডরুজের অপ্রকাশিত পত্র।

২ তদেব।

ক্ষমতা কিন্তু গান্ধীজির নেই। স্বরাজ পাবার পর তিনি নিশ্চয় এ-সব কাজ বন্ধ করে দেবেন। আমি কিন্তু সে দলে নই। আমি কখনো শিল্পকর্ম একেবারে ত্যাগ করতে বলব না।··· বাংলাদেশের ছাত্ররা ধর্মঘট করে স্কুলকলেজ থেকে বেরিয়ে আসছে। দেশের নেতাদের তারা বলছে, 'আমাদের কাজ দিন, গ্রামে গিয়ে আমরা দেশবাসীর সেবা করতে চাই।' গ্রামের কাজে উৎসুক এত যুবক আগে কখনো একসঙ্গে দেখি নি। জানি এ খবর আপনাকেও আনন্দ দেবে। আপনিও চান আমরা গ্রামের কাজ করি। সুরুলে গ্রামের কাজের শিক্ষাকেন্দ্র করব বলে আমরাও স্থির করেছি।

১৯২০ সালের ডিসেম্বর মাসে এণ্ডরুজ পুনা গিয়েছিলেন, খ্রীস্টান ছাত্রদের সর্বভারতীয় সম্মেলনে। ভারতীয় খ্রীস্টান সংঘে পুনরায় অভ্যর্থনা পাবার সম্মান তাঁর কাছে মূল্যবান ছিল। কিন্তু সেখানে কয়েকটি ছেলে সন্দেহভরে তাঁকে প্রশ্ন করে, 'আপনি কি খ্রীস্টান?' অত্যন্ত বেদনার্তস্বরে বিশপ জে. ওয়াই. মার্টিনকে এণ্ডরুজ তখন বলেছিলেন, 'আমি যে খ্রীস্টান তার ছাপ আমার চেহারায় যদি ধরা না পড়ে, তবে এ-সব ছেলেদের কাছে সে কথা বলায় কী লাভ?' অবশ্য খুব কমসংখ্যক ছেলেই এ দলে ছিল। অধিকাংশ ছাত্রই অতিশয় শ্রদ্ধার সঙ্গে তাঁর ভাষণ শুনল। তারা বলেছিল, 'এণ্ডরুজ যে আত্মত্যাগের কথা বলছেন, আগেই নিজের জীবনে তিনি তা পালন করেছেন—সে কথা যে আমরা জানি।'

পুনাবাসের আনন্দস্মৃতির মধ্যে একটি হল, দুটি খ্রীস্টাশ্রম স্থাপনের পরিকল্পনা এখানেই তিনি প্রথম শোনেন। তার মধ্যে একটি হল তিরুপত্তুরের 'খ্রীস্টকুল আশ্রম' অপরটি পুনার 'খ্রীস্টপ্রেম সেবা সংঘ'। এণ্ডরুজ বুঝতে পারলেন ভারতবর্ষের মধ্যেই খ্রীস্টপ্রেমিকের দরিদ্রসেবার বৃহৎ ক্ষেত্র রয়েছে। এ সময়ে এণ্ডরুজের আর-একটি বড়ো কাজ হল শান্তিনিকেতনের মহান জাতীয় সংস্কৃতির সঙ্গে ভারতীয় খ্রীস্টান সমাজের ঘনিষ্ঠ সংস্পর্শ স্থাপনের সম্পূর্ণ সুযোগ গ্রহণ। এ বিষয়ে রবীন্দ্রনাথকে এক পত্রে লিখছেন[১]—

১৩ মার্চ ১৯২১

···আমার মনের সাধ ভারতীয় খ্রীস্টানদের ভারতীয় জীবনের ঐশ্বর্য ও তার পূর্ণতার মধ্যে নিয়ে আসি।··· আজকাল আমার সঙ্গে ওদের ব্যবহারে

১ শান্তিনিকেতন রবীন্দ্রসদনে রক্ষিত এণ্ডরুজের অপ্রকাশিত পত্র।

পরিবর্তন দেখলে অবাক হতে হয়।... সবচেয়ে বড়ো কথা শান্তিনিকেতন দেখে যাবে বলে সবাই একবার এখানে আসে।...

আশ্রমের প্রতি পার্সী-সমাজের আগ্রহও তাঁরই চেষ্টায় জেগে ওঠে। তাঁদের মধ্যে কেউ কেউ চেয়েছিলেন, বিশ্বভারতীতে জরথুস্ত্র-ভবন স্থাপিত হোক। এ বিষয়ে এণ্ডরুজের মন্তব্য পড়ে বুঝি তিনি এ কাজের ভবিষ্যৎ ফলের সম্ভাবনায় কিরূপ চিন্তিত ছিলেন।

এ ব্যাপারে রবীন্দ্রনাথকে এক পত্রে জানালেন[১]—

...জরথুস্ত্র-ভবন বা ইসলাম-ভবন স্থাপন সম্পর্কে আমার আন্তরিক আগ্রহ ও উৎসাহ। তবে কেমন মনে হয় আমাদের যে মন্দির সেখানে তো কোনো পট বা প্রতিমা নেই। সেখানে শ্বেতপাথরের মেজে, ছেলেরা সাদা ফুল নিয়ে আসে। সেখানেই আমাদের ধর্মবিশ্বাসের ব্যক্তিগত স্বাধীনতা অক্ষুণ্ণ থাকে, সেখানেই আমরা এক ঈশ্বরের উপাসনায় মিলিত হতে পারি। সেই শ্বেতবর্ণে প্রত্যেকে আমরা নিজের মনের মতো রঙ মিলিয়ে নেব। কিন্তু যদি আলাদা আলাদা মসজিদ, গির্জা, অগ্নি-উপাসনার স্থান নির্মাণ করি তবে আমরা এখানেও ধর্মগত বিভেদের সৃষ্টি করব।...

উপরের চিঠিগুলি থেকে বোঝা যায় এণ্ডরুজ কী গভীর মমত্বের সঙ্গে শান্তিনিকেতন আশ্রম ও বিদ্যালয়ের সমস্যাগুলির সমাধানে আত্মনিয়োগ করতেন। আশ্রমের প্রাণধারায় নিজের প্রাণ মিশিয়ে তিনি তৃপ্তি পেতেন অপরিসীম।

এণ্ডরুজ তাঁর পঞ্চাশত্তম জন্মদিনে গুরুদেবকে যে পত্র দেন তার আংশিক উদ্‌ধৃতি এখানে অপ্রাসঙ্গিক হবে না।[২]

বোলপুর
১২ ফেব্রুয়ারি ১৯২১

আরাধ্যতম গুরুদেব,

আমাদের পাশ্চাত্য হিসাবে আজ আমার বয়স পঞ্চাশ বছর হল, আরো সঠিক প্রাচ্য গণনাতে হল একান্ন। আজ সারা সকাল বারে বারেই আপনাকে স্মরণ করেছি।

---

১ Chaturvedi & Sykes, *Charles Freer Andrews*, পৃ. ১৬৪।

২ রবীন্দ্রনাথ-এণ্ডরুজ পত্রাবলী, পৃ. ২৫১-২৫২।

…শান্তিনিকেতনে আমি আমার আশ্রয়স্থল খুঁজে পেয়েছি, আর পেয়েছি ঝড়ের পরের শান্তি। তাই আজ সকালে আমার প্রভুর দয়ার কথা ভাবতে গিয়ে আপনার কথাও আমার মনে পড়ছিল। আপনিই আমার সবচেয়ে অন্তরঙ্গ বন্ধু। গত কয়েকবছর ধরে কত আশ্চর্য আশীর্বাদই না আমায় করেছেন। তা ছাড়া যে ভারতবর্ষ নৈতিক ও আধ্যাত্মিক সম্পদে ও সৌন্দর্যে সমৃদ্ধ, পাশ্চাত্যের মতো উপকরণবাহুল্যের ঔদ্ধত্যে এখনো কলুষিত হয় নি, সেই ভারতের মতো দেশে এই যে আমার নূতন জন্ম, সেও কি কম সৌভাগ্যের কথা? সে কথা আজ আমি আবার একান্তভাবে অনুভব করলাম। শান্তম্ শিবমদ্বৈতমের আরাধনায় মাথা নত করে আজ সারা সকাল এ-সব কথাই ভেবেছি।…

বিচিত্র কর্মযোগ : ২

১৯২১-২২ সাল। গান্ধীজি তখন ভারতবর্ষের চতুর্দিকে জাতীয় জাগৃতির পাঁচদফা কর্মপন্থা ঘোষণা করছিলেন— অস্পৃশ্যতা উন্নয়ন, হিন্দু-মুসলিম-ভ্রাতৃত্ব, নারীর সম্মানরক্ষা, মাদকদ্রব্য বর্জন ও স্বদেশীগ্রহণ। এণ্ডরুজ এ কাজে আত্ম-সমর্পণ করলেন রাজনৈতিক কর্মী হিসাবে নয়, ধর্মপ্রাণ মানুষ হিসাবে। কেননা তিনি এগুলিকে ধর্মকার্য বলে মানতেন।

'ছাত্রদের প্রতি'[১] পুস্তিকায় দেখি কলকাতার ছাত্রদের কাছে ১৯২১ সালের ১৯ জানুয়ারি তারিখে এণ্ডরুজ ভাষণ দিচ্ছেন—

> ভারতের স্বাধীনতা আমার খ্রীস্টধর্মেরই এক নীতি।... ইংলণ্ড যদি আয়র্ল্যাণ্ড ও ভারতবর্ষকে সামরিক শক্তির সাহায্যে অধীন করে রাখে— তবে সে ইংলণ্ডের প্রতি আর আমার পূর্বের অনুরাগ অটুট থাকে না। ভারতবর্ষও যদি তার অনুন্নত সম্প্রদায়কে উন্নত না করে তবে সে আর আমাদের স্বপ্নের ভারত থাকে না।

ধর্মঘট ও দীনবন্ধু

১৯২১ সালের মার্চ মাসে ভারতের মাটিতে প্রথম ব্যাপক রেলধর্মঘট শুরু হল। কলকাতার চারপাশে হাওড়া, লিলুয়া, কাঁচড়াপাড়া— এ-সব জায়গার কারখানা তো আছেই, উত্তর প্রদেশের লখনউ প্রভৃতি অঞ্চলের বড়ো বড়ো কারখানা-গুলিতেও বহুসংখ্যক লোক ধর্মঘটের ফলে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। রেলওয়ে বা অন্য শ্রমশিল্পে তখন শ্রমিকদের অসন্তোষ প্রায় সর্বদাই উপেক্ষা করা হত এই ভেবে যে, আসলে তা রাজনৈতিক আন্দোলনকারীদেরই সৃষ্টি। অথচ জীবন-ধারণের ব্যয় অসম্ভব পরিমাণে বেড়ে যাওয়ায় শ্রমিকদের বেতনবৃদ্ধি ছিল অত্যাবশ্যক। তা ছাড়া যুদ্ধকালে অজস্র লাভ হওয়া সত্ত্বেও রেলকোম্পানি রেলশ্রমিকদের জীর্ণ অস্বাস্থ্যকর গৃহের পর্যন্ত সংস্কার করে নি। ১৯২০ সালের প্রথম দিকে রেল-কর্তৃপক্ষ কর্মীদের এই-সব অভিযোগ সম্বন্ধে বিচার-বিবেচনার জন্য তদন্ত কমিশন পাঠাবেন বলে অঙ্গীকারবদ্ধ ছিলেন। শ্রমিকগণ এক বছরেরও অধিক প্রতীক্ষা করে এবং পরে অনন্যোপায় হয়ে ১৯২১ সালের মার্চ মাসে ধর্মঘট শুরু করে।

---

১ *To the Students*, পৃ. ৪৬

এণ্ডরুজ স্বচক্ষে দুর্গতদের অবস্থা পরিদর্শনে গেলেন। ধৈর্যভরে দীর্ঘ আলোচনার পর শ্রমিকদের অভিযোগ ও দাবিগুলি অতি সূক্ষ্মভাবে পরীক্ষা এবং বিশ্লেষণ করলেন। এক দিকে যেমন তাদের সম্মত করলেন অযৌক্তিক দাবি প্রত্যাহারে, অপর দিকে কলকাতার রেল-কোম্পানির এজেণ্ট ও দিল্লীর রেলওয়ে বোর্ডের সদস্যদের সঙ্গে আলোচনা করে প্রয়োজনীয় বিষয়ে সংস্কার-সাধনের প্রস্তাব উপস্থাপিত করলেন।

এ কাজে নেমে তাঁকে অনেক জটিল অবস্থার সম্মুখীনও হতে হয়েছে অনেক সময়। নিম্নোদ্ধৃত ঘটনায় তার একটি উদাহরণ মেলে। এণ্ডরুজ বলছেন[১]—

হাওড়ায় এক রবিবারের সন্ধ্যা। অন্ধকার ঘনিয়ে এল। ধর্মঘট সম্পর্কে এক জরুরি মিটিঙের জন্য হেডমিস্ত্রিদের আমি জড়ো করছি। প্রায় আধ মাইল হেঁটে আমরা একটি ছোটো ময়দানে ঢুকলাম। গলির ভিতর দিয়ে যাবার সময় লক্ষ্য করলাম একটা জায়গায় বহু লোক জমায়েত হয়েছে। প্রত্যেকের হাতে বড়ো বড়ো লাঠি। প্রায় পাঁচশো লোক সেখানে জমেছে। একজন দৌড়ে এসে আমাকে খবর দিল যে সেদিন বিকেলে বাজারে গুর্খারা যে জুলুম করেছে তার জন্য তারা গুর্খাদের আক্রমণ করতে যাচ্ছে।

আমি যখন ভিড়ের মধ্যে ঢুকলাম তখন চারি দিকে প্রচণ্ড কোলাহল। কী যে হচ্ছে বুঝতেই পারছি না। ভিড়ের লোকেরা আগে কখনো আমাকে দেখে নি, আমি কে তাও জানে না। আমি একটা ছোটো চেয়ারে উঠে দাঁড়ালাম। কয়েক মিনিট লাগল তাদের শান্ত করতে। তারা তাদের লাঠি ঘোরায় আর বলে, গুর্খারা তাদের অপমান করেছে, প্রতিশোধ তাদের নেওয়াই চাই। কিছুক্ষণ পর্যন্ত মনে হচ্ছিল এদের হয়তো বাধা দেওয়াই সম্ভব হবে না। সঙ্গে যাঁরা ছিলেন তাঁরা ভয় পেলেন। প্রথমেই আমার পরিচয় দিতে জনতা কিছু শান্ত হল। তার পরে তাদের গান্ধীজির কথা বললাম। দক্ষিণ-আফ্রিকায় আমি যে তাঁর সঙ্গে কাজ করেছি সে কথাও বললাম। প্রত্যেকের হাতের লাঠি ফেলে আমার কথা শুনতে বলায় অনিচ্ছুকভাবে তারা তাই করল।

সেদিন সেই জনতাকে সম্পূর্ণ শান্ত করে তারা ভবিষ্যতে কোনো হিংসাত্মক

---

১ Chaturvedi & Sykes, *Charles Freer Andrews*, পৃ. ১৬৮।

কাজে প্রবৃত্ত হবে না— এ প্রতিজ্ঞাও এণ্ডরুজ তাদের দিয়ে করিয়ে নিলেন। সর্বশেষে 'মহাত্মা গান্ধী কী জয়'— সজোরে এই ধ্বনি তুলে তারা হাসিমুখে এণ্ডরুজের সঙ্গেই ফিরে গেল। দরিদ্র মজুররা যে কত সরল— এ ঘটনায় তার পরিচয় পেলেন এণ্ডরুজ। পরে তিনি কর্তৃপক্ষের কাছে জেনেছিলেন গুর্খারা সেই রাতে আক্রান্ত হলেই গুলি ছোঁড়ার আদেশ পেয়ে গিয়েছিল।

উপর্যুপরি রোগভোগের মধ্যেই এ-সব কাজ এণ্ডরুজকে করতে হত। ধর্মঘটকারীদের সভায় যাবার জন্য একবার তাঁকে হাসপাতাল থেকে লিলুয়া নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। কলকাতার কর্তৃপক্ষ যে-সব ক্ষেত্রে বিচার করতে অপারগ হলেন, সেগুলি আলোচনার জন্য তিনি রেলওয়ে বোর্ডের কাছে যান। সে আলোচনার শেষে লিলুয়ার শ্রমিকরা কাজে যোগ দিতে রাজি হল। দ্রুত সম্মানজনক আপস-মীমাংসায় উপনীত হতে পারাই সর্বদা এণ্ডরুজের আকাঙ্ক্ষিত ছিল। কারণ, ধর্মঘটকারীদের এমন কোনো সংস্থান ছিল না যাতে তারা কাজে যোগ না দিয়ে নিশ্চিন্ত থাকতে পারে। ধর্মঘট প্রত্যাহার সম্বন্ধে একমত হয়ে লিলুয়ার শ্রমিকসভায় সকলে জয়ধ্বনি করেছিল, 'এণ্ডরুজ সাহেবের জয়' বলে।

ধর্মঘটের কারণ ও তার প্রতিকার বিষয়ে রেলওয়ে বোর্ডের কাছে এণ্ডরুজ যে স্মারকলিপি পাঠিয়েছিলেন,[১] তাতে শ্রমিকদের ন্যায্য দাবির সমর্থনে তাঁর সুনির্দিষ্ট যুক্তিপরম্পরা অতুলনীয় বাস্তববুদ্ধির পরিচয় দেয়। সেখানেও তিনি সবচেয়ে বেশি জোর দিয়েছিলেন ম্যানেজার ও কর্মীদের মধ্যে মানবিক সম্পর্ক ও ব্যক্তিগত বন্ধুত্ব-স্থাপনের প্রয়োজনীয়তার উপরে। তাঁর মতে কর্মক্ষেত্রে এমন আবহাওয়ার সৃষ্টি হওয়া উচিত যাতে পরিচালক ও সহকর্মীবৃন্দ বোধ করতে পারেন যে প্রত্যেকেই তাঁরা একটিমাত্র সমবায় কর্মপ্রচেষ্টার অংশভাক্।

চাকরিক্ষেত্রে যতক্ষণ শ্রমিকদের নিশ্চিন্ত নির্ভরতা না আসে, যতক্ষণ তাদের প্রভিডেণ্ট ফাণ্ডের ব্যবস্থা ইত্যাদি না হয়, ততক্ষণ এদের অসন্তোষ থাকবেই। রেলপথ সুপ্রতিষ্ঠিত করা যতখানি প্রয়োজনীয় রেলকর্মীদের সন্তোষবিধান তার চেয়ে কম জরুরি নয়। সেজন্য কর্তৃপক্ষের দু দিকই বিচার করা কর্তব্য।

রেলধর্মঘটের নিরসন-চেষ্টায় এণ্ডরুজ যখন ব্যস্ত বিব্রত তখনই বিপন্নের

---

১ *Young Men of India*, August 1921 সংখ্যায় প্রকাশিত।

আর্তনাদ ভেসে এল আর-এক সীমান্ত থেকে। ছিলেন কাঁচড়াপাড়ায়, ছুটতে হল পদ্মাপারে চাঁদপুরে। সেও দীর্ঘকালের এক জটিল ইতিহাস।

১৯১৯ সালে যুক্তপ্রদেশে দুর্মূল্যের কষ্ট শুরু হলে সেখান থেকে দলে দলে লোক গিয়ে আসামের চা-বাগানের কাজে যোগ দিয়েছিল। সেখানে তখন শ্রমিকের চাহিদা খুব। ১৯২১ সালে আবার পৃথিবীব্যাপী বাজার মন্দার যুগ। আসামের চা-বাগিচায় চুক্তিবদ্ধ কুলির দল সেই অর্থনৈতিক কারণে অত্যন্ত অভাবের মধ্যে পড়ে। কেমন করে কুলিদের মাথায় প্রবেশ করল যে, তাদের দেশে 'গান্ধীরাজ্য' প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, সেখানে ফিরে গেলেই সকল দুঃখের অবসান সুনিশ্চিত।[১]

১৯২১ সালের গ্রীষ্মকাল। কেউ পায়ে হেঁটে; কেউ-বা রেলপথে— শ্রমিকরা সব এসে চাঁদপুরে পৌঁছল। সেখান থেকে স্টীমারে নদী পার হয়ে গোয়ালন্দ, তার পর ট্রেনে কলকাতা এসে যে যার দেশে ফিরবে।

চা-বাগিচার মালিকরা সকলেই প্রায় ব্রিটিশ; তারা প্রমাদ গণল। কুলি চলে গেলে কাজ অচল। ব্রিটিশ বাগিচাওয়ালাদের স্বার্থরক্ষার জন্য ব্রিটিশ-ভারতীয় সরকার অগ্রসর হলেন। সরকারি হুকুমে চাঁদপুরে কুলিদের স্টীমারে উঠতে বাধা দেওয়া হল।[২] কুলিদের মধ্যে যারা স্টীমার ধরতে পারল না তারা স্টীমারঘাটার কাছে রেলস্টেশনে আশ্রয় নিল।

সে রাতে গুর্খা সৈন্য পাঠিয়ে হতভাগ্য আশ্রয়প্রার্থীদের রেলস্টেশন থেকে দূরে এক ফুটবল খেলার খোলা মাঠে নিয়ে ফেলা হল। বাধা দেবার মতো শরীরের শক্তি বা মনের জোর— কিছুই তখন শরণার্থীদের মধ্যে অবশিষ্ট ছিল না। তাই গুর্খাদের এই নৃশংস আচরণ তাদের সহ্য করতে হল। এ ব্যাপারে বিক্ষুব্ধ ভারতীয় জনসমাজ পত্রপত্রিকায় প্রতিবাদ জানাল।

১৯২১ সালের ১৯ মে তারিখের রাতের ঘটনা এটি। এণ্ডরুজ চাঁদপুরে এসে পৌঁছলেন ২১ মে। রাতটা শ্রমিকদের সঙ্গে কাটালেন। পরদিন ভোরের আলো ফুটতেই বেরিয়ে পড়লেন শ্রমিকদের অবস্থা দেখে শহরবাসী ও সরকারি কর্মচারীদের সঙ্গে আলাপ-আলোচনার জন্য। সেইদিনের মধ্যেই তিনি তাঁদের রাজি করালেন যে তাঁরা বাংলা-সরকারের কাছে একযোগে পাঁচ

---

১ রবীন্দ্রজীবনী ৩য় খণ্ড, পৃ. ৯৬।

২ তদেব।

হাজার টাকা সাহায্যের দাবি করবেন। সে টাকায় এই অসহায় লোকদের জাহাজ-ভাড়ার ব্যবস্থা হবে। অন্যান্য খরচ তাঁরা চাঁদা সংগ্রহ করে মেটাবেন। এণ্ডরুজ চাঁদপুর এসে পৌঁছবার তৃতীয় দিনেই এত টাকা সংগৃহীত হল যে পাঁচশো লোককে পুরো ভাড়া দিয়ে তাঁরা জাহাজে করে গোয়ালন্দ পাঠালেন।[১] তখনো চার হাজার লোক অপেক্ষা করছে, সরকার-পক্ষের কাছ থেকে কোনো সংবাদ নেই। এতদিন কলেরা মহামারীর যে আশঙ্কা করা হচ্ছিল তাও শুরু হয়ে গেল। এ অবস্থায় কী করা যেতে পারে ভেবে এণ্ডরুজ চললেন দার্জিলিঙে। চাঁদপুরে রোগগ্রস্ত ও ক্ষুধার্তদের সেবার জন্য স্থানীয় লোকদের একটি কমিটি নিযুক্ত করে রেখে গেলেন।

কয়েকদিন পরে দার্জিলিঙ থেকে ফিরলেন ভাঙা মন নিয়ে। এ অবস্থায় শ্রমিকদের দায়িত্বগ্রহণ সরকারি স্বাস্থ্যবিভাগেরই বিহিত কাজ ছিল। কিন্তু স্বরাষ্ট্র-বিভাগ খেয়ালখুশি অনুযায়ী কর্তৃত্ব করে চলেছেন। এণ্ডরুজ কেবলমাত্র একটি সমস্যার সমাধান করে আসতে পেরেছেন; দার্জিলিঙ থেকে জেনে এসেছেন যে সস্তা ভাড়ায় শ্রমিকদের যাতায়াত করতে দিতে সরকারের কোনো আপত্তি নেই। নিশ্চিন্ত হলেন তখন এই ভেবে যে চাঁদার টাকায় যে ত্রাণ-তহবিল খোলা হয়েছে তা দিয়েই শ্রমিকদের সকলকে নিজ নিজ দেশে ফেরত পাঠানো সম্ভব হবে।

এণ্ডরুজ কলকাতায় ফিরে দেখলেন চাঁদপুরের গুর্খা-অত্যাচারের কথা শুনে হরতাল পালন শুরু হয়ে গেছে। ইতিমধ্যে চট্টগ্রামের তরুণ ব্যারিস্টার যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্ত, অধ্যাপক নৃপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও শেখ কাজেম আলি প্রভৃতি শক্তিশালী কংগ্রেস-নেতা পূর্ব রেল ও স্টীমার কোম্পানির শ্রমিক-কর্মচারীদের ধর্মঘটের আহ্বান জানিয়েছেন। অর্থনৈতিক বিবেচনার চেয়েও এই ধর্মঘটের উদ্দেশ্য ছিল স্পষ্টত রাজনৈতিক।

এই দুর্যোগেও এণ্ডরুজের মানবিক মূল্যচেতনা দ্বিধাহীন। কলকাতার একটি সভায় স্পষ্ট করে বললেন,[১] 'ধর্মঘট মাত্রই যে অনুচিত এ কথা আমি কখনো বলি নি, বলতেও পারি না। আমার মতে অসহযোগও তো একধরনের জাতীয় ধর্মঘট। কিন্তু আমি নিজের চোখে দেখেছি ক্ষুধার জ্বালায় শ্রমিকরা কত যে হিংসাত্মক কাজ করে।··· আমরা শিক্ষিত লোকেরাই বরং ক্লেশ বরণ করে নেব; হতভাগ্য দরিদ্রদের কেন কষ্টভোগ করতে দেওয়া?'

১ Chaturvedi & Sykes, *Charles Freer Andrews*, পৃ. ১৭১।

কিন্তু বৃথাই এ-সব আবেদন জানালেন। কলকাতা থেকে চাঁদপুরে ফিরে দেখলেন ধর্মঘট শুরু হয়ে গেছে। রোগসংক্রমণমুক্ত কত শত শ্রমিক বাড়ি ফিরে যাবার জন্য অধীর প্রতীক্ষা করছে। অথচ স্টীমার কোম্পানির কর্মচারীরা তখনো ধর্মঘট পালন করছে।[১]

স্বেচ্ছাসেবকদের নিয়ে এণ্ড্রুজ কাজে নামলেন। শ্রমিকদের আবার ক্যাম্পে ফিরে পাঠাতে দুঃখে তাঁদের বুক ভেঙে যায়। তারা নিরাশ হয়ে কাঁদতে কাঁদতে ক্যাম্পে ফেরে। অবশ্য কিছুদিন পরে তাদের নিজ দেশে প্রত্যাবর্তনের ব্যবস্থা হয়েছিল।

চাঁদপুরে স্বেচ্ছাসেবকদের সঙ্গে এণ্ড্রুজ যখন কাজ করতেন তাঁর সহকর্মীরা অনুভব করতেন দারুণ সমস্যার ঝড়ের মুখে তাঁর অম্লান প্রশান্তি। বিশপ প্যাকেনহাম[২] বলেন, 'তিনি যেন শান্তির প্রতিমূর্তি হয়ে সেখানে বিচরণ করছিলেন। সেই উত্তেজনা ও ঔদ্ধত্যের আবহাওয়ায় তাঁর উপস্থিতির শান্ত প্রভাব যেন চারি দিকে ব্যাপ্ত হত। তাঁর মধুর ব্যক্তিত্ব সকলকে বিক্ষোভ-আলোড়নের ঊর্ধ্বে উঠতে সাহায্য করত।'

এণ্ড্রুজের সামনে তখন দুটি কর্তব্য বাকি। প্রথমত আসাম-প্রত্যাবৃত্ত গোরখপুর জেলার শ্রমিকরা নিজ গ্রামে পুনর্বাসনের জন্য এসে যেন একঘরে হয়ে না পড়ে। বস্তুত ফিজি-ফেরত ভারতীয়রা তার আগের বছর দেশে ফিরে এসে এই ব্যবস্থাই পেয়েছিল। তিনি গ্রামে গ্রামে ঘুরে ঘুরে জনসাধারণের কাছে এই আবেদন জানালেন, যেন তাঁরা এদের স্নেহভরে গ্রহণ করেন।[৩]

এণ্ড্রুজের দ্বিতীয় কর্তব্য হল পূর্ববঙ্গের অবস্থা জানিয়ে ব্রিটিশ ও ভারতীয় রাজনৈতিকদের নিজ নিজ দায়িত্ব সম্পর্কে সজাগ করে দেওয়া।

---

১ এই ধর্মঘট পরে মহাত্মা গান্ধীর পরামর্শে প্রত্যাহৃত হয়। নেতারা তার পর একে একে গ্রেপ্তার হন। দীনবন্ধু ধর্মঘট সমর্থন করেন নি। কিন্তু চাটগাঁয় এসে তিনি সাশ্রুনয়নে জনসভায় ধর্মঘটকারীদের সাহায্যের জন্য আবেদন জানান। তাঁর পরিধেয় বস্ত্র, পাঞ্জাবী ও উত্তরীয় কয়েক শো টাকায় নীলাম হয়। এই ধর্মঘটের কষ্টের বিষয়ে তিনি তাঁর সুহৃদ অধ্যাপক নৃপেন্দ্রচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের পুস্তক *Ideal of Swaraj*-এর ভূমিকায় উল্লেখও করেছেন।

২ Rev. Pakenham Walsh— আসামের বিশপ। তাঁর স্ত্রী ও তিনি চাঁদপুরের ক্যাম্পে শিশুদের ও কলেরা রোগীদের অম্লানবদনে শুশ্রূষা করেন।

৩ গান্ধী-স্মারক সংগ্রহালয়, নিউ দিল্লী। দ্র. গান্ধীজিকে লিখিত ২১ জুন ১৯২১ তারিখের অপ্রকাশিত পত্র।

গান্ধীজিকে তিনি আহ্বান করেছিলেন পূর্ববঙ্গের উত্তেজিত পরিবেশে স্বয়ং উপস্থিত হবার জন্য। ১৯২১ সালের ২১ জুন তারিখের চিঠিতে তাই তাঁকে লিখেছিলেন—

> …পূর্ববঙ্গের লোকদের যেমন প্রচণ্ড ভাবাবেগ তেমনই অধীরতা এবং ক্রোধ… এমন সহজদাহ্যতা যাদের, তাদের কাছে এ-সব ধর্মঘট তো আগুনে খড়কুটোর মতো। কখন বিস্ফোরণ শুরু হয় ভেবে আমি আতঙ্কিত হয়ে আছি। মনে হচ্ছে এখানে একমাত্র তুমিই অহিংসা প্রচারে সক্ষম হবে। আমি আমার সাধ্যমত চেষ্টা করে চলেছি। এদের প্রাণঢালা অনুরাগও আমি পেয়েছি। যখনই তোমার কথা এদের শোনাই হিংসাত্মক আবেগের প্রচণ্ডতা কমে যায়। তারা জানে হিংসা উদ্রেক করে এমন কোনো শব্দই আমার সামনে উচ্চারণ করা চলে না। কিন্তু কোনো সভায় যদি আমি উপস্থিত না থাকি বা ভাষণ-শেষে ফিরে যাই তখন তাদের ব্যবহারে পূর্বের উদ্দামতা ফিরে আসে বলে শুনতে পাই।

চাঁদপুরের ঘটনায় এক দিকে এণ্ডরুজ সরকারি রাজকর্মচারীদের, অন্য দিকে অসহযোগ আন্দোলনকারীদের বাড়াবাড়িকে রূঢ় সমালোচনায় ও কঠোর প্রতিবাদে জর্জরিত করেছিলেন। তখনকার এক প্রামাণ্য বার্ষিক গ্রন্থে (*Annual Register, India 1921*) তাঁর যে ভাষণ লিপিবদ্ধ আছে তাতে পাই—

> গভর্নমেণ্টের কাজে প্রমাণ হয় যে দরিদ্র ও দুর্দশাগ্রস্তের বিরুদ্ধে তাঁরা ধনী পুঁজিবাদী ও ক্ষমতাবানের পক্ষ সমর্থন করেন। সে কারণেই নির্ধনরা গান্ধীজির কাছে গিয়ে ভিড় করে; কেননা তিনি তাদের বোঝেন। …১৯২১ সালও ১৯১৯-এর চেয়ে কোনো অংশেই পৃথক নয়। তথাকথিত দ্বৈতশাসননীতি আগাগোড়া আদিম স্বৈরতন্ত্রের রূপান্তর বলেই আর-একবার প্রমাণিত হয়েছে।… সংস্কার-আইনের পাতায় যে দায়িত্বশীল সরকারের প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছে, যার মূল কথা ভারতীয় উদ্‌যোগ ও অভিমতের স্বীকৃতি— আজও তা সর্বত্রই একান্ত অনুপস্থিত।

১৯২১ সালের ১৫ জুন তারিখে হাউস অব কমন্‌সে এণ্ডরুজের এই ভাষণ সম্পর্কে আলোচনাকালে একজন সদস্য বলেন— 'রাজদ্রোহের অপরাধে এণ্ডরুজকে ইংলণ্ডে ফিরিয়ে আনা কর্তব্য।' বাংলাদেশের সরকারি কর্মচারীরা জানতেন সে কাজ কতখানি বিপজ্জনক হতে পারে। তাই তাঁদের একজন

বলেছিলেন, 'এণ্ডরুজকে নিয়ে কী যে করি! এঁকে জেলে দিলে ইনি কিছু মনে করবেন না, অথচ সারা দেশের লোক ক্ষেপে যাবে। ভারতবর্ষের শতকরা নিরানব্বই জন লোকই ভাইসরয়ের চেয়ে এণ্ডরুজের কথা বেশি মানে।'[১]

ভারতবর্ষে এণ্ডরুজের প্রভাব সম্বন্ধে মণ্টেগুও যথেষ্ট সজাগ ছিলেন। তাই তিনি এণ্ডরুজকে 'ঈশ্বরের খেয়ালখুশির এক খাপছাড়া সৃষ্টি' (God's own fool)— এই বিশেষণে ভূষিত করেছিলেন।

এণ্ডরুজ কিন্তু মোটেই কাণ্ডজ্ঞানহীন ছিলেন না। শেক্‌স্‌পীয়রের নাটকের তথাকথিত বিদূষকদের মতো স্পষ্টবক্তা ও তীক্ষ্ণবুদ্ধিসম্পন্ন ছিলেন তিনি। ভারতীয় শ্রমিকদের সম্বন্ধে বিবেচনা করার জন্য যে রয়্যাল কমিশন বসে সেখানে ১৯২১ সালের শ্রমিক-চাঞ্চল্যের মূল কারণ নির্দেশ করা হয় মালিকদের সঙ্গে কর্মচারীদের দূরত্ব। আসামের চা-বাগান থেকে শ্রমিকদের দলবদ্ধ প্রত্যাবর্তনের কারণ নির্ধারণ করতে গিয়েও তাঁরা বলেছেন, এর পশ্চাতে রাজনৈতিক প্রেরণা উপস্থিত নেই। জীবন-ধারণের প্রয়োজন মেটাবার পক্ষে যে অর্থের দরকার শ্রমিকদের বেতনের হার তার চেয়ে ঢের কম ছিল বলেই তারা দেশে ফিরতে বাধ্য হয়। এ-সব সিদ্ধান্ত এণ্ডরুজেরই বিচার-বিশ্লেষণের ফল। রয়্যাল-কমিশন তার অনুমোদন করে নিজেদের রায় প্রকাশ করেন।

অসহযোগ : কবি ও গান্ধী

কিন্তু ১৯২১ সাল ভারতবর্ষের মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস অন্যতর কারণেও অবিস্মরণীয়। পূর্বাঞ্চলের বিচিত্র শ্রমিক-বিক্ষোভের প্রসঙ্গ ছাড়া সারা ভারত তখন মহাত্মাজির অসহযোগ-আন্দোলনের আহ্বানে প্রকম্পিত। নাগপুর কংগ্রেসের পরেই বস্তুত ১৯২১ সালের শুরু থেকেই অসহযোগের প্রস্তুতি ও প্রয়াস নানা দিকে মুখরিত হয়ে ওঠে। রবীন্দ্রনাথ তখন ছিলেন ইউরোপ-আমেরিকায়। জুলাই মাসে (১৬ জুলাই ১৯২১) ইউরোপ থেকে দেশে ফিরলেন তিনি।[২] বিদেশে থাকার সময়ে এণ্ডরুজের চিঠির মাধ্যমেই অসহযোগের বিস্তারিত খবর তাঁর জানা হয়েছিল। বস্তুত পত্রের মধ্য দিয়ে

---

১ রেভারেণ্ড ডিউইক্ (Dewick) মন্তব্যটি শুনে এণ্ডরুজের ইংরেজি-জীবনীগ্রন্থের লেখক শ্রীবনারসীদাস চতুর্বেদী ও লেখিকা শ্রীমতী মার্জোরি সাইক্‌স্ -কে জানান।

২ রবীন্দ্রজীবনী ৩য় খণ্ড, পৃ. ১০০।

এ সম্পর্কে তাঁদের দুজনের আলোচনাও হয় বিস্তর।[1] কবির শিল্পীমন সারা পৃথিবীর সঙ্গেই তাঁর স্বদেশের সহযোগিতা করে। 'অসহযোগ' শব্দটিই তাঁর কানে বেসুরো। রবীন্দ্রনাথের এই সংশয় এণ্ডরুজের শিল্পীসত্তাকেও প্রভাবিত করেছিল। অথচ অভীষ্ট লক্ষ্যের সম্পর্কে গান্ধীজির অনন্যচিত্ততায় ধর্মযোদ্ধা এণ্ডরুজ মুগ্ধ না হয়েও পারেন না।

১৯২১ সালের ২৬ জানুয়ারি তারিখে তিনি রবীন্দ্রনাথকে লিখেছিলেন[2]—

> ...কলকাতায় গান্ধীজির ভাষণের একটি কপি আপনাকে পাঠালাম। ভাষণটি চমৎকার।... সরল ত্যাগব্রতী জীবনাদর্শের আহ্বানই তাঁর আবেদনটিকে এত শক্তিশালী করে তোলে। তবু এ যেন অতীতে ফিরে যাওয়া, ঐশ্বর্যময় ভবিষ্যতের সাগ্রহ অভ্যর্থনা এ তো নয়। শিল্প সংগীত সাহিত্য বা গানের যেন কোনো মূল্যই নেই। জানি মহাত্মাজি বলবেন, 'ঠিক তাই, এখন তো আমরা সংগ্রামে লিপ্ত রয়েছি।' এ কথায় সত্য কিছু আছে মানতেই হবে। এমন সময় আসে যখন জীবনের সব আভরণ খসিয়ে ফেলতে হয়। কিন্তু সম্পূর্ণ খসিয়ে ফেলা কি চলে? কখনোই না।...

এবারে রবীন্দ্রনাথ দেশে ফিরে আসার পরে কয়েকমাস ধরেই এণ্ডরুজের প্রধান প্রচেষ্টা হল তাঁর ঘনিষ্ঠ এই দুই অসাধারণ বন্ধুর স্বভাব ও মতের সমতাসাধন। রবীন্দ্রনাথের প্রতি অসীম শ্রদ্ধায় তিনি তাঁকে গুরু বলে মানতেন। তাই গান্ধীজির মতামত নিয়ে যত স্বাধীনভাবে সমালোচনা করতেন রবীন্দ্রনাথের সম্পর্কে ঠিক তেমনটি করতে পারতেন না। অথচ গান্ধী-রবীন্দ্রনাথের মতের ঐক্যবিধানের জন্য এণ্ডরুজ যে ঐকান্তিক পরিশ্রম করতেন, যে উদ্‌বেগ বহন করতেন তা দেখে গান্ধীভক্ত বড়দাদা দ্বিজেন্দ্রনাথ এণ্ডরুজের ডাক-নাম রেখেছিলেন 'হাইফেন'। এণ্ডরুজ রবীন্দ্রনাথ এবং গান্ধীজির মধ্যস্থলে থেকে উভয়কে যুক্ত করতে চেষ্টা করতেন।

এণ্ডরুজের পরামর্শক্রমে গান্ধীজি এই সময় পূর্ববঙ্গ ও আসাম পরিভ্রমণে যান। কলকাতা হয়ে যাবার পথে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে তাঁর দীর্ঘ আলোচনা হয়। এণ্ডরুজ তখন তাঁদের সঙ্গে জোড়াসাঁকোর বাড়িতে উপস্থিত ছিলেন। অবনীন্দ্রনাথের আঁকা ত্রিমূর্তির সেই বিখ্যাত ছবি এই অবসরেই অঙ্কিত হয়।

---

১ রবীন্দ্রনাথ-এণ্ডরুজ পত্রাবলী, পৃ. ৮৪-৮৯। দ্র. শান্তিনিকেতন রবীন্দ্রসদনে রক্ষিত এণ্ডরুজের ১৯২১ সালের অপ্রকাশিত পত্র।

২ শান্তিনিকেতন রবীন্দ্রসদনে রক্ষিত এণ্ডরুজের অপ্রকাশিত পত্র।

সে সময়কার সংকীর্ণ জাতীয়তাবোধ রবীন্দ্রনাথকে পীড়িত করেছিল। তা ছাড়া এণ্ডরুজ গ্রামের কাজে শিক্ষা দেবার জন্য যে ক'টি তরুণকে সংগ্রহ করেছিলেন, উদ্দাম রাজনৈতিক আন্দোলনেই তাদের চিত্ত বিধৃত থাকে; জাতীয় বিদ্যালয়ে প্রাত্যহিক শিক্ষাদানের কঠোর পরিশ্রম তাদের মনঃপূত নয়।

Mahatma Gandhi's Ideas পুস্তকে[১] এণ্ডরুজ বলেছেন—

রবীন্দ্রনাথ লক্ষ্য করে দেখলেন জনসাধারণের মনোভাব নৈতিক চেতনার গভীরে প্রবেশ না করে উগ্র উত্তেজনার ফলে ব্যর্থতায় পর্যবসিত হল। তাঁর নিজস্ব অতুলনীয় ভাষায় রবীন্দ্রনাথ বলেন, 'অসহযোগের আহ্বানধ্বনি কানে যেন তীব্রস্বরে গর্জে ওঠে, গানের ঐকতান তো বাজে না।' দীর্ঘকালের নিরুদ্ধ অনুভূতিগুলি হিংস্র আক্রোশে যেন অসহযোগীদের বাক্যে কর্মে ফেটে পড়ছে, কই আত্মার পুঞ্জীভূত শক্তি ধৈর্যে ক্ষমায় সাহসে দাক্ষিণ্যে তো প্রকাশ পায় না। তা ছাড়াও আর-একটি ব্যাপারে রবীন্দ্রনাথ গান্ধীজির সঙ্গে একমত হতে পারেন নি। ভারতবর্ষের দারিদ্র্য ঘোচাবার জন্য চরকা-কাটার আন্দোলনটি গান্ধীজির চোখে সর্বরোগহর মহৌষধ। রবীন্দ্রনাথ তাকে সে ভাবে গ্রহণ করতে পারেন নি। তাঁর মতে এ আন্দোলনে দরিদ্র জনগণের কিছু উপকার নিশ্চয় হবে— তার বেশি ব্যাপক কিছু নয়।

…সংকীর্ণ জাতীয়তাবিরোধী রবীন্দ্রনাথের সাবধান-বাণী গ্রহণ করে গান্ধীজি তাঁর নামকরণ করলেন 'The Great Sentinel'। তবু তিনি তাঁর দৃঢ়মতে স্থির রইলেন যে, ভারতের দৈন্যমোচনের জন্য স্বদেশে খদ্দর প্রস্তুত ও তার বহুল প্রচার জাতীয় কর্মসূচীর প্রথমেই থাকা উচিত।

…গান্ধীজি বললেন, 'আমাদের অসহযোগ ইংরেজের সঙ্গেও নয়, পশ্চিমের সঙ্গেও নয়। পাশ্চাত্য বস্তুতান্ত্রিক সভ্যতা এবং তার লোভ ও দরিদ্রশোষণ-নীতির বিরুদ্ধে।… ক্ষুধার্ত জনসাধারণ জীবনে একটি কাব্যই কেবল কামনা করে, তা হল তাদের ক্ষুধার অন্ন।'

রবীন্দ্রনাথ ও এণ্ডরুজ উভয়ের পূর্ণ সমর্থন ছিল আর্তের ক্রন্দন-মোচনে। তবু গান্ধীজি যখন স্বদেশী প্রবর্তন করতে গিয়ে বিদেশীবস্ত্রে নাটকীয়ভাবে অগ্নি

---

১ সি. এফ. এণ্ডরুজ -সম্পাদিত, পৃ. ২৫৫-২৬৫।

সংযোগের ব্যবস্থা দিলেন এণ্ডরুজ তখন দুঃখে ক্ষোভে জর্জর হয়ে বার বার গান্ধীজিকে চিঠি দিয়ে বোঝাতে চাইলেন।

১৯২১ সালের অগস্ট মাসে লিখলেন[১]—

আমি জানি কেবলমাত্র দুঃখীর দুঃখমোচনের আকাঙ্ক্ষাতেই তুমি বিদেশীবস্ত্রে অগ্নিসংযোগ করার কথা বলেছ। তবু আমার মনে হয় তোমার ভুল হচ্ছে। 'বিদেশী' শব্দটিতেই যে সংকীর্ণ জাতীয়তাবোধ প্রকাশ পায় তাকে উত্তেজিত করার চেয়ে বাধা দেওয়াই বেশি প্রয়োজন বলে আমার বিশ্বাস। সুন্দর সূক্ষ্ম বস্ত্রগুলিতে তুমি আগুন ধরাতে যাচ্ছ— এ দৃশ্য কল্পনায়ও আমার পক্ষে বেদনাদায়ক। এই যে বিপুল পৃথিবীতে আমরা জন্মেছি তার কথা ভুলে গিয়ে কেবল ভারতবর্ষের উপরই যেন দৃষ্টি নিবদ্ধ করা হচ্ছে। এর ফলে সেই প্রাচীন সংকীর্ণ স্বার্থপরায়ণ জাতীয়তাবোধেই আমরা ফিরে যাব বলে আমার ভয় হয়। মাদকদ্রব্য পান, অস্পৃশ্যতা, জাতিগত ঔদ্ধত্য —এ-সবের উপর যখন তুমি কঠিন আঘাত হানো, তাতে আনন্দ পাই। বেশ্যাবৃত্তির মতো জঘন্য পাপাচরণের উচ্ছেদসাধনে তোমার শান্ত নির্মল কারুণ্য দেখে আমি মুগ্ধ হয়েছি। কিন্তু আমাদেরই অন্যদেশবাসী ভাইবোনদের হাতের তৈরি সুন্দর সুন্দর কাপড় সম্বন্ধে তুমি যদি বল যে, সেগুলি ব্যবহার করা পাপ, সেগুলো পুড়িয়ে দেওয়াই উচিত, তবে আমার মনের মধ্যে যে কেমন করে, সে আমি তোমাকে বোঝাতে পারব না। তুমি যে খদ্দর আমাকে পরতে দিয়েছ, আজকাল আমি কিছুতেই তা পরতে পারি না, পাছে ফ্যারিসিদের[২] মতো আমার মধ্যেও এই ভাব প্রকাশ পায় যে আমি অন্যদের চেয়ে পবিত্রতর।

তোমার ব্যবহারে আঘাত পেলে তোমার কাছে গিয়েই যে আমি কাঁদি তা তো তুমি জানো, তাই জানাই, এই ব্যাপারে সত্যিই আমি মর্মান্তিক আঘাত পেয়েছি।

ঠিক সেই সময়েই খুলনা জেলায় দুর্ভিক্ষ চলছিল। বস্ত্রাভাবে কত লোককে শীতে কাঁপতে দেখেছেন এণ্ডরুজ। তাতে গান্ধীজির কাপড় পোড়ানোর

---

১ *Mahatma Gandhi's Ideas*, পৃ. ২৭০-২৭১।

২ ফ্যারিসি— প্রাচীন ইহুদীদের এক শাখা যাঁরা মনে করতেন ইহুদিধর্মশাস্ত্র অক্ষরে অক্ষরে পালন করা কর্তব্য। এঁরা কেবল নিজেদের পবিত্রতম জ্ঞান করতেন।

আন্দোলন তাঁর পক্ষে আরো অসহ্য মনে হয়েছিল। অবশ্য তাঁর এ-সব কথার জবাবে গান্ধীজিও গভীর স্নেহভরে এণ্ডরুজকে লেখেন[১]—

…আমাদের প্রয়োজন নেই বলে সেই বিদেশী কাপড় যে গরিবের হাতে অশ্রদ্ধায় ছুঁড়ে ফেলে দেব— এ কথা ভাবতে আমার নিজেকে ভারি ছোটো মনে হয়।… সব রকম বিদেশী জিনিসের ব্যবহার সম্বন্ধে যদি আমি এ কথা বলতাম তবে তাতে জাতিবিদ্বেষ প্রকাশ পেত সন্দেহ নেই। কিন্তু আমি তো কেবল বিদেশী বস্ত্রের উপরই জোর দিচ্ছি। ভারতবর্ষে এখন জাতি-বিদ্বেষ তীব্র হয়ে উঠেছে। মানুষের দিক থেকে জিনিস-ধ্বংসের পথে আমি সেই বিদ্বেষের দিক-পরিবর্তন করে দিয়েছি।

…অবশ্য আমার এ আন্দোলনে বিদেশী কাপড় পোড়ানো অত্যাবশ্যক নয়। কাপড় পোড়ানো যে পছন্দ না করে সেও এ আন্দোলনে যুক্ত থাকতে পারে। মহাদেবের[২] কথায় বুঝলাম অসহযোগ-আন্দোলনটি সম্বন্ধেই তোমার মনে সন্দেহ জেগেছে। তাই আমি তোমাকে লিখেছিলাম— তা যদি সত্যও হয় তবু তোমার প্রতি আমার স্নেহ অপরিবর্তিত থাকবে। তবে এ আন্দোলনে তোমার বিশ্বাস স্থির আছে জানলে স্বভাবতই আমার মন সান্ত্বনা পায়।

হিংসার বাতাস

এই বেদনাদায়ক আত্মসমীক্ষার মধ্যে এণ্ডরুজকে আর-একবার কেনিয়া যেতে হয়েছিল। ১৯২১ সালের ডিসেম্বরে যখন সেখান থেকে ভারতে ফিরলেন, কংগ্রেসের অহিংস আন্দোলনে তখন হিংস্রতা প্রবেশ করে গেছে। নবেম্বর মাসে প্রিন্স অব ওয়েলসের ভারতে আগমন উপলক্ষে বোম্বাইতে যে হিংসাত্মক কাজ শুরু হয় গান্ধীজি তাঁর সহকর্মীদের নিয়ে পাঁচদিনেও তা থামাতে পারলেন না। তখন তিনি অসহযোগ-আন্দোলন বন্ধ না করে প্রায়শ্চিত্ত-স্বরূপ পাঁচদিন প্রায়োপবেশন করেন। ডিসেম্বরে কংগ্রেসের আহমেদাবাদ অধিবেশনে আত্মিক আদর্শমূলক একটি বক্তৃতা ('religious message')

---

১ ১৩ অগস্ট ১৪ সেপ্টেম্বর এবং ২৫ সেপ্টেম্বর ১৯২১ তারিখে এণ্ডরুজকে লেখা গান্ধীজির চিঠি। দ্র. Chaturvedi & Sykes, *Charles Freer Andrews*, পৃ. ১৭৮।

২ মহাদেব দেশাই, গান্ধীজির সেক্রেটারি।

দেবার জন্য গান্ধীজি এণ্ডরুজকে অনুরোধ জানালেন।[১] সংশয়-ভরা মন নিয়ে রাজি হলেন এণ্ডরুজ।

সে সময় রবীন্দ্রনাথকে লিখছেন (২৫ ডিসেম্বর ১৯২১)—

আজ খ্রীস্টোৎসবের দিন। আমি কংগ্রেসের অধিবেশনে যোগ দিতে যাচ্ছি। সারা পথে শুনেছি সংগ্রামের কোলাহল। আইন-অমান্য আন্দোলন সর্বক্ষণই হিংসাত্মকতার ধার ঘেঁষে চলেছে। তবু বলব, সত্যিকার সাহসের নিদর্শনও অনেক পেয়েছি। পুরানো দাস-মনোভাবের বহু ঊর্ধ্বে একটি নতুন শক্তি জাগ্রত হয়েছে।…

কংগ্রেসের প্রথম অধিবেশনের দিনেই আহমেদাবাদের বিরাট জনসমাবেশে এণ্ডরুজ বিদেশী কাপড়ের তৈরি ইউরোপীয় স্যুট পরে উঠে দাঁড়িয়ে সরলভাবে ব্যক্ত করলেন তিনি তাঁর খদ্দরের পোশাক কেন ছেড়ে এসেছেন। শ্রোতারা সকলে শ্রদ্ধাপূর্ণ মনে সে ভাষণ শুনল। জাতীয়তাবাদী পত্রিকা 'জন্মভূমি' কংগ্রেসের সভাপতি হিসাবে এণ্ডরুজের নির্বাচন সমর্থন করল। পত্রিকা-সম্পাদকের মতে বিদেশী কাপড় পোড়ানোয় এণ্ডরুজের আপত্তি ঘোষণা সত্ত্বেও এ পদে তিনিই মনোনীত হবার যোগ্য। কেননা, অসহযোগ-আন্দোলনের একজন প্রধান উদ্যোক্তা তিনি, এ আন্দোলনে আত্মশুদ্ধির প্রয়োজনীয়তা সর্বাগ্রে তিনিই অনুভব করেছেন।

এণ্ডরুজকে সভাপতি নির্বাচিত করার প্রস্তাবটি অবশ্য গৃহীত হয় নি। তবু এই অধিবেশনেই যখন ভারতের পূর্ণ স্বাধীনতার দাবির প্রস্তাব প্রথম এল, ভারতীয় কংগ্রেসে এণ্ডরুজের রাজনৈতিক চিন্তাধারার প্রভাব সম্পর্কে তখন সন্দেহের আর অবকাশ রইল না। কংগ্রেসের অধিবেশনে এণ্ডরুজের ভাষণ-শেষে তাঁর ইউরোপীয় স্যুটের দিকে তাকিয়ে গান্ধীজি একটু হেসে চোখ টিপে বললেন— এ কিন্তু তোমার 'শরারৎ' (দুষ্টুমি) চার্লি।

এ সময়কার শান্তিনিকেতন পত্রিকায় লেখা হয়[২]—

শ্রীযুক্ত এণ্ডরুজ সাহেব দেশের কাজের সহিত এমন নিবিড়ভাবে যুক্ত হইয়া পড়িয়াছেন যে, সম্প্রতি তাঁহার পক্ষে আশ্রমে একসঙ্গে অধিকদিন বাস করা হইয়া উঠিতেছে না। গত এক বৎসরের উপর ভারতবর্ষের

১ B. Pattabhi Sitaramayya, *The History of the Indian National Congress*, পৃ. ২২১-২২৩।

২ আশ্রমসংবাদ, শান্তিনিকেতন পত্রিকা, মাঘ ১৩২৮।

পীড়িত আর্তদের জন্য নানা স্থানে তাঁহাকে যাতায়াত করিতে হইয়াছে।...

দেখা যাচ্ছে ১৯২১ সালের সেপ্টেম্বরের মাঝামাঝি তিনি পূর্ব-আফ্রিকায় যান আর ডিসেম্বরের মাঝামাঝি সময়ে সেখান থেকে ফেরেন।[১] এই দ্বিতীয় বার এণ্ডরুজ পূর্ব-আফ্রিকায় যান সেখানকার ভারতীয়দের অনুরোধে। এবার তাঁকে পূর্ব-আফ্রিকার ভারতীয় কংগ্রেসের সভাপতি করতে চাওয়া হলে তিনি বলেন, সেবা করাই তাঁর প্রাণের আকাঙ্ক্ষা, নেতৃত্ব করা নয়।

এবারকার যাত্রায় পূর্ব-আফ্রিকার শ্বেতাঙ্গ ঔপনিবেশিকরা তাঁকে বিশ্বাস-ঘাতক আখ্যা দিয়ে তাঁর বিরুদ্ধে এমন প্রচণ্ড আলোড়নের সৃষ্টি করল যে একবার তাঁকে তাঁরা দল বেঁধে হত্যা করার চেষ্টাও করে।

একদিন এণ্ডরুজ নাইরোবি থেকে উগাণ্ডা যাচ্ছেন। ট্রেন মধ্যরাত্রে নাকোরো স্টেশনে এসে পৌঁছলে একদল শ্বেতাঙ্গ ঔপনিবেশিক এসে ট্রেনে এণ্ডরুজের কামরায় ঢুকল। দাড়ি ধরে টেনে তাঁকে তারা প্ল্যাটফর্মে নামাবার চেষ্টা করল। দলের যে সর্দার সে বারবার তাঁর সামনে এসে ঘৃণাভরে উচ্চারণ করতে লাগল, তোমার মতো বিশ্বাসঘাতককে দেখে যীশুখ্রীস্ট অশ্রুপাত করেছিলেন। এণ্ডরুজ তখন অসুস্থ। এ ঘটনায় তিনি এমন বিক্ষুব্ধ হয়েছিলেন যে সুস্থ করার জন্য উগাণ্ডার মিশন হাসপাতালে তাঁকে নিয়ে গেলেন তাঁর বন্ধু ডক্টর কুক। ডক্টর কুক এ ঘটনাটি জানালেন গভর্নর লর্ড নর্থিকে। তিনি লণ্ডনে এ খবর পাঠালে মিঃ উইনস্টন চার্চিল দুঃখ করে বলেছিলেন— এণ্ডরুজ দুর্বৃত্তদের নাম জানালে পারতেন; উপনিবেশের সব বিবেচক ব্যক্তিরা এঁদের শাস্তিতে খুশি হতেন বলেই আমার বিশ্বাস।

চার্চিলের ধারণা সত্য। কেনিয়ার ইউরোপীয়রা ঘটনাটি শুনে দুঃখপ্রকাশ করেন। অথচ তা সত্ত্বেও এণ্ডরুজের প্রতি তাঁদের অনেকের ঘৃণা যে কতদূর পৌঁচেছিল এণ্ডরুজেরই এক চিঠিতে তার প্রমাণ মেলে। উগাণ্ডা থেকে স্টীমারে ফিরছিলেন তিনি। সেখানে এক শিখদম্পতির সঙ্গে বসে গল্প করতে করতে তাঁদের শিশু-সন্তানটিকে কোলে নিয়ে কিছুক্ষণ আদর করলেন। একটু পরেই স্টীমারের এক ঔপনিবেশিক আরোহী রাগে কাঁপতে কাঁপতে তাঁর সামনে এসে বলল, 'জানো, এই কালো ছেলেটিকে নিয়ে যখন বসেছিলে তখন পারলে তোমাকে আমি খুন করতাম। তোমার মতো লোককে ঘাড় ধরে ঠেলে সমুদ্রে ফেলে দিতে হয়।'

১ আশ্রমসংবাদ, শান্তিনিকেতন পত্রিকা, মাঘ ১৩২৮।

আগেই বলা হয়েছে, ১৯২১ সালে ভারতের রাজনৈতিক রঙ্গমঞ্চ নানাবিধ মতের আবর্তে ধুলিমিলন হয়েছিল, তারই মাঝে নিজের কর্তব্যবোধ অনুসারে কাজ করে চলেছেন এণ্ডরুজ। কিন্তু বছরের শেষভাগে এই-সব মতদ্বন্দ্বে ও তর্কজালে জড়িয়ে পড়ে তিনি অসহ্য ক্লান্তিবোধ করেন।

মোপলাদের সেবায়

অবশেষে ১৯২২ সালের প্রথম দিকে তাঁর চিত্তে প্রশান্তি এসেছিল আর্তজনের সেবার মাধ্যমে। সেবাকার্যে মতের দ্বন্দ্ব শান্ত হয়, প্রেমের ভাষাই সেখানে একমাত্র ভাষা। দক্ষিণ-ভারতে মালাবার কোচিন ও ত্রিবাঙ্কুরের মোপলাদের মধ্যে সেবারে ছয় সপ্তাহ কাটালেন এণ্ডরুজ। আগের বছরের শেষভাগে, এণ্ডরুজের কেনিয়া যাবার মুখে মালাবারে প্রচণ্ড মোপলা-বিদ্রোহ[১] ঘটে গেছে। এবারে গিয়ে দেখলেন হিন্দু-মুসলমানের ঐক্য নষ্ট হয়েছে, অস্পৃশ্যতায় ছেয়ে গেছে সারাদেশ। আগের বছর ওইসব অঞ্চলে অনুষ্ঠিত দুর্ঘটনার কারণ হিসাবে এণ্ডরুজ তাঁর প্রবন্ধে সকল অপরাধই সমাজের ঘৃণিত শোষিত মুসলমান মোপলাদের উপর আরোপ করেন নি বলে সেখানকার হিন্দু অধিবাসীরা অনেকে তাঁর প্রতি ক্রুদ্ধ হয়। কিন্তু তাঁর মতে গণ্ডগোলের মূল কারণ ছিল অস্পৃশ্যতা। নিম্নবর্ণের হিন্দু ও মোপলারা অস্পৃশ্যতার কারণেই ছিল সমাজে অপাঙ্‌ক্তেয়। এ সম্পর্কে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার একটি মর্মান্তিক দৃশ্য চিরকাল এণ্ডরুজের স্মৃতিতে মুদ্রিত ছিল। বহুস্থানে তিনি এ ঘটনার বর্ণনা করেন। মালাবারে চেরুমাদের এক অতি অপরিচ্ছন্ন বাস-গৃহে প্রবেশ করে দেখলেন, একটি দরিদ্র রমণী তার ছোট্ট শিশুটিকে কোলে নিয়ে আরো দুটি বালক সন্তানের সঙ্গে বসে আছে। বালক দুটিকে আদর করবেন বলে এণ্ডরুজ যেই একটু ঘরের মধ্যে এগিয়ে গেছেন রমণীটি আর্ত চীৎকারে পিছিয়ে গেল, বালক দুটিও মাকে জড়িয়ে ধরে কাঁদতে লাগল।

এণ্ডরুজ পরে বুঝেছিলেন তাঁকে দেখে ওরা ভেবেছে যে উচ্চজাতের

---

১ মোপলা-বিদ্রোহ— মালাবারের মোপলারা মুসলমান। খিলাফৎ আন্দোলনের খবরে তারা মনে করল উত্তর-ভারতে মুসলিমরাজ্য স্থাপিত হয়ে গেছে। এখন তাদের দেশেও কাফের-নিধন বা কাফেরদের মুসলমান ধর্মে দীক্ষিত করে ইসলামস্থান স্থাপন করতে হবে। দ্র. রবীন্দ্রজীবনী ৩য় খণ্ড, পৃ. ৯৭।

কোনো লোক তাদের আঘাত করবে বলে ঘরে ঢুকেছে। এই ভয়ের পিছনে কত যুগের নিপীড়িত মানবাত্মার ক্রন্দন মিশে আছে ভেবে তাঁর অপরিসীম দুঃখ হল। আর্তের বেদনায় এই সন্তাপ কোনোদিন এণ্ডরুজের মন থেকে ঘোচে নি।

চেরুমা পুলয়া নায়াদী— এরা সেখানকার অস্পৃশ্যদের মধ্যেও নিম্নতম শ্রেণীর। গান্ধীজির ভাই এসেছেন— এ কথা তাদের মধ্যে ছড়িয়ে পড়তেই বড়ো বড়ো সভায় এসে এরা জমায়েত হতে লাগল। এণ্ডরুজ হিন্দু ও খ্রীস্টান দোভাষীদের সঙ্গে নিয়ে তাদের কাছে গিয়ে স্নিগ্ধমধুর স্বরে আলাপ-আলোচনা করতে লাগলেন। তারা চুপ করে থাকতে এতই অভ্যস্ত যে ভয় কাটিয়ে তাদের বিশ্বাসভাজন হতে এণ্ডরুজের অনেক সময় লেগেছিল। তিনি দেখে স্তম্ভিত হয়েছিলেন যে ত্রিবাঙ্কুরের সিরিয়ান চার্চের খ্রীস্টানেরা সবাই ছিলেন উচ্চবর্ণের লোক, আর অস্পৃশ্যতা তাঁদের মধ্যেও প্রচলিত। কয়েকটি খ্রীস্টান তরুণ অবশ্য তখন থেকেই এর বিরুদ্ধে সংগ্রাম শুরু করেছিল। কোট্টায়ামে এণ্ডরুজ বাস করতেন মিঃ কে. কে. কুরুবিলার গৃহে। তাঁরা দুজনে মিলে অস্পৃশ্যদের পাড়ায় সকল খ্রীস্টবিশ্বাসীর সামাজিক ভোজের আয়োজন করলেন। খুব সামান্য সংখ্যক খ্রীস্টানই তাতে যোগ দিয়েছিলেন। কিন্তু দীনতম জনের সঙ্গে একাত্ম হবার আগ্রহে এণ্ডরুজ নিজে একটানা খালি পায়ে হেঁটে পায়ের অনেক জায়গাতেই কেটে-ছড়ে ফেলেছিলেন। সেদিনের স্বল্পসংখ্যক প্রত্যক্ষ-দর্শীর পক্ষে সেও ছিল এক অবিস্মরণীয় স্মৃতি।

একক সংগ্রাম এ ভাবে এগিয়ে চলল। মাদ্রাজের শেরিফ একটি সভা আহ্বান করলেন কেনিয়ার এশিয়া-বিরোধী নীতির বিরুদ্ধে ভারতীয় আইন-সভার প্রতিবাদ প্রস্তাব সমর্থন করে। এই একটি মাত্র ব্যাপারে সমস্ত ভারতবর্ষ সেদিন ঐক্যবদ্ধ হতে পারত। কিন্তু তার পরিবর্তে উগ্রপন্থী অসহযোগকারীরা সভাক্ষেত্রে মধ্যপন্থীদের বক্তব্য উচ্চ চীৎকারে দমিয়ে দিয়ে সভা ভেঙে দিল। এণ্ডরুজ ছিলেন প্রধান বক্তা। তিনি উঠে দাঁড়িয়েই শ্রোতাদের সম্বোধন করে বললেন, আজ কেবল পাঁচটি শব্দই আমি প্রথম উচ্চারণ করব— আমি তোমাদের ব্যবহারে অত্যন্ত লজ্জিত।

এই ঘটনার পরে এণ্ডরুজকে দেখি উত্তর-ভারতে টুণ্ডলায়, ভারতীয় রেল-কর্মচারীদের লাইনে একটি ছোটো সংকীর্ণ ঘরে। তখন প্রচণ্ড ঝড়ের গতিতে চলছিল তাঁর কর্মধারা। এদিকে টুণ্ডলায় রেলকর্মীদের ধর্মঘট চলেছে। তাঁর মনের সবটুকু মমতা ঢেলে তিনি ধর্মঘটকারীদের সেবা করছেন। ইউরোপীয় কর্মচারীরা নিম্নতন ভারতীয় কর্মচারীদের অসহ্য নিপীড়ন করত। অপমানিত কর্মচারীরা আগে কিছু না জানিয়ে হঠাৎ ধর্মঘট শুরু করে। কিন্তু এমনই দুর্ভাগ্য, ধর্মঘটের যে অব্যবহিত কারণ দেখানো হল তা অত্যন্ত ঠুনকো। শুধু তাই নয়, নিপীড়িতদের কষ্টের কথাও অতিরঞ্জিত করে বলা হয়েছিল। ফলে সত্যসন্ধ এণ্ডরুজ সে ধর্মঘট সমর্থন করতে পারলেন না। 'ঘুষখোর' এই অপবাদ মাথা পেতে নিয়েও ধর্মঘটকারীদের কাজে যোগ দেবার জন্য তিনি সনির্বন্ধ অনুরোধ করলেন।

এ বিষয়ে শান্তিনিকেতন পত্রিকার ১৩২৯ সালের বৈশাখ সংখ্যায় লেখা হয়েছে—

এণ্ডরুজ সাহেব প্রায় একমাস কাল রেলওয়ে ধর্মঘটের মীমাংসার জন্য ধর্মঘটকারীদের মধ্যে গিয়া অনেক চেষ্টা করিয়া ব্যর্থমনোরথ হইয়াছেন।

গত ৭ই ও ৮ই চৈত্র ধর্মঘট সম্বন্ধে তাঁহার অভিজ্ঞতা আশ্রমবাসী সকলের নিকট জ্ঞাপন করেন।

তিনি বলেন, ই. আই. আর.-এর এজেন্ট ধর্মঘটকারীদের যাহা দিতে চাহিয়াছিলেন তাহা আশাতিরিক্ত এবং তাহা গ্রহণ করিলে সব দিক দিয়া কল্যাণকর হইত। এখন ব্যাপার যেরূপ দাঁড়াইতেছে তাহাতে হিংসা বিদ্বেষ জ্বলিয়া উঠিবে, দাঙ্গাহাঙ্গামা রক্তপাত নিবারণের সাধ্য কাহারো থাকিবে না। রাষ্ট্রনীতি নির্মম, সহস্র সহস্র নিরপরাধ নরনারীর সমস্ত সুখদুঃখ-কল্পিত তুচ্ছ লাভের আশায় বলিদান দিতে সে কুণ্ঠিত নহে, এইটিই আমাদের উৎকণ্ঠার বিষয়। আমাদের আশ্রমের তপস্যা সত্য হোক, সমস্ত বিরোধ বিক্ষোভের উপরেও আজিকার দুর্দিনে এখানকার ক্ষমা কল্যাণ এবং শান্তির ধারা ভারতবর্ষের সর্বত্র অব্যাহত হোক, তাঁহার চরণে এই আজ আমাদের একান্ত কামনা যেন হয়।

এণ্ডরুজ আবার এক পুরোনো সমস্যার সমাধানে নিজেকে ব্যাপৃত করলেন। সমস্যাটি হল, ফিজি ও ব্রিটিশ গিয়ানা -ফেরত ভারতীয় শ্রমিকদলের পুনর্বাসনের। ১৯২০ সালে এক দিকে যুদ্ধোত্তর দ্রব্যমূল্যবৃদ্ধি এবং অপর দিকে শর্তবদ্ধ শ্রমের পরিবর্তে স্বেচ্ছাধীন শ্রমনিযুক্তির রীতি প্রবর্তনের ফলে ফিজি দ্বীপের শ্রমিকদের মধ্যে নতুন চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছিল। কিছু সংখ্যক চুক্তিবদ্ধ শ্রমিক এবং ফিজিতেই যাদের জন্ম (Fiji-born) এমন কয়েকটি শ্রমিক তখন ভারতে প্রত্যাবর্তন করেছিল। কিন্তু ফিরে আসার পরে বেশির ভাগ লোকই কোনো কাজের সংস্থান পেল না, উপরন্তু গ্রামের লোকেরা তাদের একঘরে করে রাখল। কলকাতায় আবার অনেকের জিনিসপত্র চুরি যাওয়ায় সর্বস্ব হারিয়ে ভারতে তাদের একমাত্র বন্ধু এণ্ডরুজের শরণাপন্ন হল তারা। হতভাগ্যের দল আবার ফিজিতে ফিরে যাবার জন্যই প্রস্তুত হয়ে কলকাতার ডক ছাড়িয়ে মেটিয়াবুরুজের ম্যালেরিয়া-অধ্যুষিত অঞ্চলে মাটির ঘরে ভিড় করে এসে বাস করছিল।

সমস্যার শুরুতে ১৯২১ সালের জানুয়ারিতে এদের দেখতে এণ্ডরুজ প্রথম মেটিয়াবুরুজে আসেন। প্রথম থেকেই তিনি বুঝেছিলেন যারা ফিজি থেকে ফিরে এসেছে তাদের মধ্যে বেশির ভাগই অসৎ চরিত্রের লোক, কয়েকটি মাত্র ভালো লোক সে দলে ছিল। সবচেয়ে কঠিন সমস্যা দেখা দিয়েছিল যারা ফিজিতেই জন্মেছে তাদের নিয়ে। ভারত-সরকারের যে কর্মচারীটির উপর তাদের ব্যবস্থার ভার ছিল তাঁকে তিনি লিখলেন, 'আমার মনে হয় ফিজি-সরকার যদি এদের বিনামূল্যে নিয়ে যাবার ব্যবস্থা করতে চান তবে সে সুযোগ দেওয়া দরকার।' একদল ফিরে যাবার পর আর যারা বাকি থাকল সেই বিপর্যস্ত মানুষগুলির ভারতে পুনর্বাসনের জন্য যতরকম চেষ্টা দরকার এণ্ডরুজ তার কিছুই বাকি রাখলেন না। কিন্তু ১৯২২ সালে সমস্যাটি পুনরায় চূড়ান্ত আকার ধারণ করল। সে বছরের ফেব্রুয়ারি মাসে ফিজির ঔপনিবেশিক চিনি-শোধক কোম্পানি ভারতীয় শ্রমিকদের বেতন এক-তৃতীয়াংশেরও অধিক কমিয়ে দেয়। অথচ তার আগের বছর 'সিডনি বুলেটিন' পত্রিকার মতে তাদের ব্যবসায়ে লাভ দাঁড়িয়েছে প্রচুর। তাই প্রাণের দায়ে কুলি-জাহাজ ভরে আবার শ্রমিকরা কলকাতায় এল।

এণ্ডরুজ ধীরে ধীরে একটি ছোটো কমিটি গড়ে তুললেন। তার নাম

Indian Emigrants' Friendly Service Committee। বাংলা সরকারের প্রতিনিধি, বন্দর স্বাস্থ্য কর্তৃপক্ষ এবং জনসাধারণের মধ্য থেকে সেই সমিতির সদস্যরা নির্বাচিত হলেন। ফ্রেডরিক জেম্‌স্‌ ও হরেন্দ্র মুখোপাধ্যায়— এই দুজন হলেন সমিতির সম্পাদক। জাহাজঘাটায় জাহাজ এসে দাঁড়ালে তাঁরা আগে এগিয়ে যেতেন। চোর ও বাটপাড়ের হাত থেকে শ্রমিকদের রক্ষা করতেন, গৃহহীনকে গৃহ দিতেন। এণ্ডরুজ বহু চেষ্টায় তাঁদের জন্য সরকারি সাহায্যের ব্যবস্থা করেছিলেন। দুর্গতদের জন্য সাহায্য সংগ্রহের চেষ্টায় পরিশ্রমে ক্লান্তিতে তাঁর শরীর মন প্রায়ই ভেঙে পড়ত। ফিজি থেকে ফিরে যারা এসেছে, সপরিবারে তাদের পুনর্বাসনের জন্য সহায়তা প্রার্থনা করে যত চিঠি তিনি এ দিকে ও দিকে লিখতেন, তার মধ্যে খুব কম চিঠিরই উত্তর আসত। আবার অত করে যেটুকু সুযোগ তিনি শ্রমিকদের জন্য সংগ্রহ করতে পারতেন, তারও খুব কম অংশই তারা কাজে লাগাত। মূল থেকে উচ্ছিন্ন হবার পর এতবার তাদের বিভিন্ন জায়গায় বসানো হয়েছিল যে তারা কোথাও আর নূতন করে শিকড় গাড়তেই পারছিল না। এণ্ডরুজের কাছে গিয়ে কেঁদে পড়ে তারা বলত, হয় আমাদের গুলি করে মেরে ফেলো, নয় তো ফিরে যাবার ব্যবস্থা করে দাও। মাসের পর মাস ধরে এই বিক্ষুব্ধদের মধ্যে হিংসাত্মক কর্মের সম্ভাবনা বেড়েই চলল। দলে দলে তারা বিনা টিকিটে শান্তিনিকেতনে চলে আসত। তিনি তাদের দুঃখের কথা বারবার শুনতেন, চোখ তাঁর জলে ভরে আসত। তার পর নিজের হাতে যা টাকা-পয়সা থাকত, মুঠো ভরে তাদের হাতে তুলে দিতেন ফিরতি পথের ট্রেন-ভাড়ার জন্য। তারা আবার মেটিয়াবুরুজের স্যাঁৎসেঁতে ঘরে ফিরে আসত। মনে তাদের এ সান্ত্বনা থাকত যে তাদের ভাইয়ের মতো ভালোবেসে বুকে জড়িয়ে ধরার লোক অন্তত একজন আছেন। এণ্ডরুজ দীর্ঘশ্বাস ফেলে নিজের ডেস্কে গিয়ে লিখতে বসতেন। যদি তাদের সাহায্যের জন্য কোনো চিঠি তখনো অলিখিত থাকে বা কোনো পরিকল্পনা করার থাকে— তারই চেষ্টায় মন নিবদ্ধ করতেন।

সে-কয়টি বছর এণ্ডরুজ ভারতবর্ষে কী মানসিক কষ্টে, কী নিদারুণ গ্লানিতে দিন কাটিয়েছেন, খুব কম লোকই সে কথা জানেন। মারোয়াড়ী অ্যাসোসিয়েশন ও ইম্পিরিয়াল ইণ্ডিয়ান সিটিজেনশিপ অ্যাসোসিয়েশন আর্তত্রাণে সাহায্য হিসাবে তাঁকে বহু অর্থ দিতেন। প্রবাসী ভারতীয়দের সেবার

কাজের জন্যও তাঁরা অর্থ সাহায্য করতেন। মাঝে মাঝে ধনী-বন্ধুদের সাহায্যও তিনি পেতেন। অতিথিপরায়ণ গৃহস্বামীদের দ্বার এণ্ডরুজের জন্য সর্বদা উন্মুক্ত থাকত। গৃহিণীরা কখনো কেউ তাঁর মোজা রিফু করে রাখতেন, জামার বোতাম লাগিয়ে দিতেন, সার্ট কমে গেছে দেখলে নতুন সার্ট কয়েকটি বাক্সে ভরে দিতেন। কেউ রেলের টিকিট, কেউ-বা ডাকটিকিট কিনে দিতেন। আবার কেউ হয়তো ট্যাক্সিভাড়া মিটিয়ে দিতেন। তাঁকে অতিথি করে রাখা বড়ো সহজ কাজ ছিল না। সম্পূর্ণ নিঃস্বার্থ ব্যক্তিও কেমন করে না বুঝেই অনেক সময় অত্যধিক দাবি করতে পারেন, তার আশ্চর্য উদাহরণ ছিলেন এণ্ডরুজ। একজন বলেছেন, 'এণ্ডরুজ ছিলেন স্বভাবশিল্পী। তাই প্রত্যেক কাজেই তিনি এমন তন্ময় হয়ে যেতেন যে সময়ের কোনো জ্ঞানই তাঁর থাকত না।' সুশীল রুদ্রের কন্যা ইলা তাঁর পিতৃতুল্য এই পিতৃবন্ধুর কথা বলতে গিয়ে বলেছেন, 'সকাল পাঁচটায় অনেক সময় চা চাইতেন। চা খেয়ে বেরোতেন যখন বলে যেতেন, দুপুর একটায় ফিরবেন। অথচ কখনো হয়তো বিকেল চারটেতেও একদল লোক নিয়ে বাড়ি ফিরতেন। তখন বিব্রত গৃহকর্ত্রীকে হয়তো বলে ফেললেন, কিছু ভেবো না মা, ঘরে যা আছে তাতেই হয়ে যাবে।'

অপরিগ্রহের মূর্ত প্রতীক

কোনো কোনো সময় আবার তিনি কপর্দকহীন অবস্থায়ও পড়তেন। 'তোমাকে 'তার' করার ইচ্ছা ছিল, হাতে টাকা না থাকায় ডাকেই চিঠি পাঠাতে হল'— এ কথা তাঁর অনেক চিঠির আরম্ভেই পাওয়া গেছে। হাতে যখন তাঁর টাকা থাকত তখন 'দরিদ্রকে দয়াদানে বঞ্চিত করার চেয়ে অযোগ্য লোককে টাকা দিয়ে প্রবঞ্চিত হওয়াও ভালো'— এ ছিল তাঁর মূলনীতি। ওয়ালওয়ার্থ-বাসের সময় থেকে এ রীতি তিনি মেনে এসেছেন। তাঁকে অবশ্য ঠকিয়েছে অনেকে। একটি লোক মাদ্রাজে ফিরবার ভাড়া তাঁর কাছ থেকে চেয়ে নেবার পরেও কলকাতার রাস্তায় তাকে ভিক্ষা করতে দেখা গিয়েছিল। একটি ছাত্র একবার পাণ্ডুলিপি টাইপ করাবার জন্য তাঁর কাছ থেকে টাকা নিয়ে গেল। তার পর থেকে সেই ছাত্রকেও আর দেখা গেল না, পাণ্ডুলিপি তো নয়ই। তার বিরুদ্ধে কোনো কথা এণ্ডরুজ কানেই নিতেন না। বলতেন, 'বিচার করবার আমি কে?' একটি মারোয়াড়ী বন্ধু একবার তাঁকে

সোনার বোতাম উপহার দিয়েছিলেন। পরের বার বন্ধুটির সঙ্গে দেখা হবার আগেই সেগুলো হারিয়ে ফেলেছেন। সিমলার রাস্তায় পাহাড়ীদের শীতে কাঁপতে দেখে কতবার যে নিজের ওভারকোট খুলে তাদের দিয়ে দিয়েছেন তার হিসেব নেই। তার পর বর্ষার জলে সর্বাঙ্গ ভিজিয়ে যখন ঘরে ফিরতেন গৃহকর্তার সস্নেহ তিরস্কার তঁাকে হাসিমুখে শুনতে হত।

তাঁর হাতে অন্য লোকের জিনিস এলেও একই অবস্থা হত। তখনকার মতো খুব বিরক্ত হলেও কেউ তাঁর উপর রাগ করে বেশিদিন থাকতে পারতেন না। এণ্ডরুজ একবার দিল্লীতে সুশীল রুদ্রের বাড়িতে রয়েছেন। সেখান থেকে একদিন তাঁকে দূরে অন্য কোথাও যেতে হবে। চার্লির ভোরের চা যাতে গরম থাকে সে ভাবনায় সুশীল রুদ্র তাঁর ছেলেকে ডেকে বললেন, 'ওঁকে থার্মস ফ্লাস্কটি দাও-না সুধীর!' এ ফ্লাস্কটি ছেলে ইংলণ্ড থেকে যত্ন করে বাপের জন্য এনেছে। খুব ভালো জিনিসটি। ছেলে বাধা দিয়ে বলে, 'না বাবা, ওটা যে আমি তোমার জন্য এনেছি। মিঃ এণ্ডরুজকে কোনো জিনিস দিয়ে লাভ নেই, উনি তো কখনো তা ফিরিয়ে আনবেন না।'— বলতে বলতেই এণ্ডরুজ ঢুকেছেন ঘরে। সুশীল বললেন, 'তুমি যদি ফ্লাস্কটি আবার ফিরিয়ে আনো চার্লি, সুধীর বলছে, তবেই ওটা তোমাকে সঙ্গে নিতে দেবে।' (সুধীর চাপা গলায় বলল, 'তেমন কোনো কথাই আমি বলি নি।')

এণ্ডরুজ যখন ফিরলেন, মালপত্রের মধ্যে তখন থার্মসের কোনো চিহ্নই নেই। খেতে বসে সুধীর বলে, 'মিঃ এণ্ডরুজ, থার্মসটি কোথায় গেল?'— 'থার্মস? আমার সঙ্গে কি থার্মস ছিল? ও হ্যাঁ, থার্মস। মনে পড়েছে। আমার সঙ্গে একই কম্পার্টমেণ্টে একজন অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান মহিলা যাচ্ছিলেন। তাঁর ছেলেটি যে কী চেঁচাচ্ছিল তোমাকে কী বলব! তার জন্য একটু গরম পানীয় দরকার ছিল তো? তাই...'

এই আত্মভোলা সাধকের কী রাজনীতি, কী সমাজসেবা সবেতেই জড়িয়ে আছে স্বত-উচ্ছলিত মানবিক প্রেম।

৬

প্রাণঝর্নার শতধারা

এণ্ডরুজের আজীবন কর্মকাণ্ডের কাহিনী শেষ হবার নয়। দেশ থেকে মহাদেশান্তরে তাঁর সংগ্রামী কর্মধারা ছড়িয়ে পড়েছিল; রোগশয্যায় থেকেও কাজের হাত থেকে নিজেকে তিনি মুক্তি দেন নি কোনোদিন।

তবু যত বড়ো 'কর্মী' ছিলেন এণ্ডরুজ, 'প্রেমিক' ছিলেন তার চেয়ে অনেক বেশি। সে প্রেম নিঃশেষে সমর্পিত হয়েছিল 'মানবপুত্র' যীশুর চরণে; সেইখানেই তাঁর দীনদরদী তন্দ্রাহীন মানবপ্রেমেরও উৎস। অসহায় মানুষ যেখানেই অবিচারে পীড়িত হয়েছে, প্রেমিক-কবি এণ্ডরুজের মনের চোখে তখনই ভেসে উঠেছে ক্রুশবিদ্ধ যীশুর যন্ত্রণাহত প্রেমে-করুণ মূর্তিটি। আর ধৈর্য রাখতে পারেন নি— পাগলের মতো ছুটেছেন পৃথিবীর এক সীমা থেকে আর-এক সীমায়। একমাত্র আকাঙ্ক্ষা উৎপীড়িতের দুঃখমোচন। এণ্ডরুজের সকল কাজই মূলত দীন-সেবা— একান্ত, গভীর, আন্তরিক খ্রীস্ট-সাধনা! কাজের হিসাবের নিরেট তালিকার মাঝখান থেকে বিদ্যুৎচমকের মতো এ অনুভব বারবার উজ্জ্বল হয়ে ওঠে।

গান্ধীপ্রেমী অহিংস সৈনিক

১৯২২ সালের সেপ্টেম্বর মাসে এণ্ডরুজ ছিলেন অমৃতসরে। ধর্মপ্রাণ অকালি শিখেরা তখন মন্দির-মোহন্তের গোঁড়ামির বিরুদ্ধে মুখর হয়ে উঠেছে সেখানে। 'গুরু কা বাগ' নামে শহরের বাইরে একটি স্থানে জ্বালানি কাঠ কাটতে বাধা দিচ্ছিলেন সেখানকার মোহন্ত। স্বপক্ষে তিনি পুলিসের সমর্থন জোগাড় করেছিলেন। কিন্তু শত শত লোক যখন বিরুদ্ধপক্ষে যোগ দিল পুলিসকে তখন নির্দেশ দেওয়া হল গ্রেপ্তারের পরিবর্তে প্রতিপক্ষকে গায়ের জোরে বাধা দেবার। অকালিরা তার উত্তরে অহিংস সত্যাগ্রহ পালন করে চলল। তাদের ধর্মবিশ্বাস, গুরুর বাগানে কাঠ-কাটার অধিকার তাদের আছে। পুলিস-পাহারাদারের সামনে তাই ঘণ্টার পর ঘণ্টা কিল ঘুঁষি সহ্য করেও দাঁড়িয়ে রইল সকলে। তাদের সমর্থনকারীরাও চুপ করে দূর থেকে সব পর্যবেক্ষণ করতে লাগল। এণ্ডরুজ নিজের চোখে দৃশ্যটি দেখে মুগ্ধ হলেন। এই

যোদ্ধজাতের সাহস, শৃঙ্খলাবোধ, ধর্মের ব্যাপারে তাদের উদ্দীপনা ও দুঃখ-সহনের বীর্য তাঁর চোখে মহান হয়ে উঠল। এই সত্যাগ্রহ সংগ্রামের কাহিনী অনেক পত্রপত্রিকায় বর্ণনা করে পরে তিনি গান্ধীজির আদর্শ প্রচার করেন।

এ বিষয়ে সে সময়কার শান্তিনিকেতন পত্রিকায়ও পাই[১]—

…বিশ্বভারতীর উপাচার্য মিঃ এণ্ডরুজ প্রতি রবি এবং বুধবার মহাত্মা গান্ধীর জীবনী সম্বন্ধে বক্তৃতা করিয়াছিলেন। দক্ষিণ-আফ্রিকায় ভারতবর্ষের যে-সব কর্মানুষ্ঠানে মহাত্মাজির সঙ্গে মিঃ এণ্ডরুজ ঘনিষ্ঠভাবে লিপ্ত ছিলেন এবং মহাত্মাজির জীবনের মূলমন্ত্র অহিংসা পরিচায়ক কয়েকটি প্রকৃত ঘটনা সম্বন্ধে, কথাপ্রসঙ্গে বিশেষভাবে আলোচনা হয়। ইহার পর উপর্যুপরি কয়েকটি সান্ধ্যসভায় তিনি মহাত্মাজি এবং আধুনিক সভ্যতা' সম্বন্ধে যে আলোচনা উত্থাপন করেন তাহা খুব হৃদয়গ্রাহী হইয়াছিল—বিশ্বভারতীর অধ্যাপক ও ছাত্র অনেকেই এই আলোচনাতে যোগদান করিয়াছিলেন।

আবার উক্ত পত্রিকার কার্তিক ১৩২৯ সালের আশ্রম-সংবাদে দেখি—

ছুটির পূর্বে শ্রীযুক্ত এণ্ডরুজ সান্ধ্যসভায় কয়েকদিন 'ভারতবর্ষের কাছে বর্তমান জগতের দাবি' সম্বন্ধে আলোচনা করেন। যন্ত্রভারপীড়িত কর্মক্লান্ত সভ্যজগতের মুক্তির যে বাণী ভারতবর্ষের সাধনার মধ্যে নিহিত আছে তপস্যা এবং সাধনার দ্বারা আমাদের প্রত্যেকের জীবনে তাহাকে জীবন্ত জাগ্রত করিয়া সেই দেবাদিদেবকে— যাহার জাতি নাই এবং যিনি অবর্ণ—আমাদের অর্ঘ্যনিবেদন করিব—বিশ্বমানব তাহারই প্রতীক্ষা করিয়া আছে, পরম দুঃখের মধ্যেও এই কথাটিকে আমাদের মনে উজ্জ্বল করিয়া রাখিতে হইবে।

খ্রীস্টধর্ম ও বৌদ্ধধর্ম সম্বন্ধে বলতে গিয়ে একদিন তিনি বলেন—

সম্প্রতি যে-সকল আলোচনা হইতেছে তাহা হইতে মনে হয় খ্রীস্টীয় প্রথম শতাব্দীতে বৌদ্ধধর্ম চীনে প্রবেশ করে। বৌদ্ধ ও খ্রীস্ট -ধর্মের মধ্যে আশ্চর্য মিল আছে। পূর্বেকার সকল ধর্মের মধ্যেই একটা প্রতিশোধের প্রবৃত্তি দেখা যায়। চক্ষুর বদলে চক্ষু, দন্তের বদলে দন্ত— এই ছিল তাহাদের বাণী। কিন্তু বৌদ্ধধর্ম এক নূতন সত্য প্রচার করিল, বুদ্ধ বলিলেন— প্রেমের দ্বারা

---

১ আশ্রম-সংবাদ, শান্তিনিকেতন পত্রিকা, ভাদ্র-আশ্বিন ১৩২৯।

ক্রোধকে জয় করিতে হইবে। এ কত বড়ো বাণী। এই পরম সত্য জগতের নানা জাতিকে আকর্ষণ করিয়া লইল। খ্রীস্টধর্মেরও বাণী ইহাই। বৌদ্ধধর্ম যে বাণী সারা এশিয়াতে প্রচার করিয়া ইউরোপের দ্বারে আনিয়া দিয়াছিল, খ্রীস্টধর্ম সেই বাণী এশিয়ার প্রান্ত হইতে সারা ইউরোপে প্রচার করিয়াছে।

কবির সঙ্গী : দীনসেবক

অমৃতসর থেকে ফিরে এণ্ডরুজ বোম্বাই এলেন। সেখান থেকে কবির সঙ্গে তিনি পুনা যাত্রা করলেন ১৯২২ সালের ২৩ সেপ্টেম্বর তারিখে।[১] এইবার তাঁরা পশ্চিম ও দক্ষিণ -ভারত এবং সিংহল পরিভ্রমণ করেন। কবির স্বাস্থ্যের প্রতি উদ্‌বেগবশে তাঁর সেক্রেটারির গুরুভার দায়িত্বও তিনি নিজে থেকে গ্রহণ করেছিলেন। কবির আদর্শের প্রচারের দিকেও তাঁর লক্ষ ছিল জাগ্রত। শান্তিনিকেতন পত্রিকার আশ্রম-সংবাদে পাই এইবার কৈম্বাটুরে এণ্ডরুজ গুরুদেবের আদর্শ সম্বন্ধে একটি বক্তৃতা দেন। বক্তৃতায় বিশেষভাবে তিনি শান্তিনিকেতন ও বিশ্বভারতীর ক্রমোন্নতি সম্বন্ধে বলেন।[২] এই সব-কিছুর সঙ্গে তাঁর নিজস্ব কাজ ছিল অস্পৃশ্যদের মধ্যে। ১৯২২ সালের ৮ অক্টোবরে মাদ্রাজ শহরে যে ভাষণ দিলেন সেটিই ক্রমশ দক্ষিণ-ভারতের নানা জায়গায় প্রচার করেন[৩]—

মাত্র তিনদিন আগে মাদ্রাজ প্রেসিডেন্সির এক গ্রামে বিশ্বকবির অভ্যর্থনায় গিয়েছিলাম। আমি একটু আগে সভায় উপস্থিত। পাশাপাশি গ্রামেরও বহুলোক জমায়েত হয়েছে। একটু দূরে দেখি কয়েকটি অর্ধ-উলঙ্গ দরিদ্র স্ত্রী পুরুষ ও শিশু। এরা কারা জানতে চাইলে উত্তর পেলাম এরা পঞ্চম। শিশুদের আদর করব বলে এগিয়ে যেতেই তারা ছুটে পালাতে শুরু করল। আমাকে তাদের এত ভয় দেখে দুঃখে বুক ফেটে যাচ্ছিল। একজনকে বললাম, ওদের বলো, না পালিয়ে ওরা যেন আমার কাছে আসে। কাছে গিয়ে তাদের বুকে জড়িয়ে ধরলাম। তাদের ভাষা আমি জানি না, তবু

---

১ রবীন্দ্রজীবনী, ৩য় খণ্ড, পৃ. ১২৯।

২ শান্তিনিকেতন পত্রিকা, ভাদ্র-আশ্বিন ১৩২৯।

৩ Chaturvedi & Sykes, *Charles Freer Andrews*, পৃ. ১৮৭, ১৮৮।

অন্তরের ভাষা বুঝেছি। তারা পিছনেই দাঁড়িয়ে রইল। অভ্যর্থনা-সভায় তাদের কোনো অংশ ছিল না। একজন ইশারা করতে তারা মাটিতে শুয়ে পড়ে কপাল ঘষতে লাগল। এ দৃশ্যে আমার মন বেদনায় ভরে গিয়েছিল।

'দীনজনের প্রতি করুণায় আমার মন ভরে আছে'— এ কথা যীশুখ্রীস্ট বলেছিলেন। আরো আগে বুদ্ধ এই একই কথা বলেছেন। এর জন্য চাই হৃদয়ের দরদ। এখানে খ্রীস্টসংঘে এমন একজনও কি নেই যিনি সারাজীবন এদের সঙ্গে আত্মিক যোগ রেখে বাস করতে পারেন? পঞ্চম হয়ে এদের দুঃখকষ্টের অংশ নিন, এদের স্পর্শ করুন। অন্য দায়িত্ব ছাড়তে পারলে আমি নিজেই এ কাজ করি। হিন্দু মুসলমান বা খ্রীস্টান হিসাবেই শুধু কাউকে আমি এ কাজে আহ্বান করছি না। মানবের বংশে মানব হয়ে জন্মেছেন বলে এ কাজে আপনাদের অধিকার।

মাদ্রাজ থেকে আবার তিনি উত্তরে গেলেন তাঁর পুরোনো বন্ধু রেল-কর্মচারীদের মধ্যে। লাহোর ও বোম্বাইতে এণ্ড্রুজের সভাপতিত্বে দুটি সভা হয়। তাঁর চেষ্টায় সর্বভারতীয় রেলকর্মী সংঘ স্থাপিত হল। রেলওয়ে বোর্ডের কাছে তাদের প্রতিনিধিত্ব করার জন্য সংঘের একটি কমিটি রাখাও স্থির হল।

১৯২২ সালের ডিসেম্বরে তাঁর দীর্ঘ ভ্রমণকালের একটি ঘটনা প্রত্যক্ষদর্শীর বিবরণে পাই[১]—

শীতের সকালে ট্রেন এসে পৌঁছল উত্তর-ভারতের একটি বড়ো স্টেশনে। সঙ্গীকে নিয়ে এণ্ড্রুজ স্টেশন থেকে বেরচ্ছেন, গায়ে গরম শাল। স্টেশন-মাস্টারের ঘরের সামনে ভিড় লক্ষ্য করে এগিয়ে দেখেন, ক্রুদ্ধ স্টেশন-মাস্টার এক বেচারী শীর্ণ কম্পমান মেয়েকে ধমকাচ্ছেন। ভিড়ের লোকদের কাছে জানলেন মেয়েটি স্টেশনমাস্টারের ঘরে ঢুকে আগুন পোয়াচ্ছিল। তিনি দেখতে পেয়ে তাকে ঘর থেকে বের করে দিয়ে বকছেন। এণ্ড্রুজ তাঁর সামনে গিয়ে বললেন, 'আপনি না খ্রীস্টান? আপনার আচরণে আমি যে লজ্জায় মরে যাচ্ছি, একটু ভদ্রতা অন্তত করতে পারতেন।' বলেই নিজের গায়ের শালখানি খুলে মেয়েটির গায়ে পরিয়ে দিয়ে গেলেন।

---

১ ঘটনাটি সাহারানপুরের রেভারেণ্ড এস. এন. তালিবুদ্দিনের কাছে চতুর্বেদীজি ও শ্রীমতী সাইক্‌স্‌ শুনেছেন। দ্র. Chaturvedi & Sykes, *Charles Freer Andrews*, পৃ. ১৮৮, ১৮৯।

বন্যাবিধ্বস্ত বাংলাদেশের গ্রামগুলিতে দুর্ভিক্ষের করাল ছায়া পড়েছে। রবীন্দ্রনাথের জমিদারির কিয়দংশ তারই মধ্যে; তাই প্রজাদের জন্য তিনি চিন্তিত। গভর্নর লর্ড লিটনের কাছ থেকে সেখানকার কালেক্টরের কাছে চিঠি নিয়ে কবির প্রতিনিধি হয়ে এণ্ড্রুজ পতিসরে গেলেন। ১৯২৩ সালের ৮ জানুয়ারি তারিখে রবীন্দ্রনাথকে সে বিষয়ে লিখছেন[১]—

> নদীতীরের গ্রামগুলি দেখব বলে নাগর নদীর উপর দিয়ে ছোটো একটি নৌকোয় করে চলেছি। সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত দরখাস্ত নিয়ে দরিদ্র লোকেরা হাউসবোটের কাছাকাছি নদীর ধারেই বসে থাকে। আমি বলে দিয়েছি আমার কাছে আসতে কাউকে যেন বাধা না দেওয়া হয়। আমি যখন নদীর ধারে হাঁটি, তারা দলে দলে এসে আমার পিছন পিছন চলতে থাকে।
>
> সবচেয়ে জরুরি প্রশ্ন হল বীজ আর চাষের গোরু জোগাড় করা যায় কেমন করে? একমাসের মধ্যে বীজ বোনার সময় এসে যাবে। জমিতে লাঙলই বা এখন দেওয়া যায় কেমন করে আর বীজই বা কোথায় পাই?

রাত্রে বিছানায় শুয়ে ঘুমোতে পারেন না। উপায় খুঁজে বের করলেন। সকাল সাতটায় গিয়ে সাত মাইল দূরে আত্রাই নদীর ধারে বন্যাত্রাণ কর্মীদের শিবিরে পৌঁছোন। সেখানে তাঁদের প্রশ্ন করেন ট্র্যাক্টর ও বীজ কেনার জন্য তাঁরা কি সরকারি সাহায্য নিতে রাজি আছেন? তাঁদের সম্মতি পেয়ে আর এক মুহূর্ত চা-পানের জন্যও অপেক্ষা করলেন না। কেননা তখনই ট্রেন ধরে কলকাতা গিয়ে লর্ড লিটনকে সব খবর যে জানাতে হবে।

সরকারি ঋণও পাওয়া গেল। ট্র্যাক্টর পাবার আশ্বাসও পেলেন। আবার পাঁচসপ্তাহ পরে ১৫ ফেব্রুয়ারি তারিখে পতিসর থেকে কবিকে লিখলেন[২]—

> আমি আবার এখানে ফিরে এসে ভালোই করেছিলাম। চার দিকে কাজকর্ম অনেক এগিয়ে যাচ্ছে। শুধু কালীগ্রামেই বীজ আর চাষের গোরু কেনার জন্য সরকার পঞ্চাশ হাজার টাকা বিতরণ করছেন। আমিও তাই চেয়েছিলাম। নগেনবাবু[৩] বলছেন আমি সামনে থেকে চাপ না দিলে

---

১ Chaturvedi & Sykes, *Charles Freer Andrews*, পৃ. ১৮৯।

২ তদেব, পৃ. ১৮৯।

৩ কবির শ্যালক নগেন্দ্রনাথ রায়চৌধুরী।

সে টাকা কিছুতেই দরিদ্রলোকের হাতে পৌঁছত না।··· ট্র্যাক্টরের কাজ শুরু হয়েছে। জেলেদের সঙ্গে যে দাঙ্গা লাগার কথা আপনাকে জানিয়েছিলাম আমি আসায় সেটাও মিটে গেছে।

শান্তিনিকেতন-কথা

এণ্ডরুজের জীবনে দেখি জনগণের সেবা বিশেষ ব্যক্তির সেবাকে বাধাগ্রস্ত করে নি। এই দুবার পতিসর বাসের মাঝখানের সময়টুকু শান্তিনিকেতনেই তিনি কাটিয়েছিলেন। দক্ষিণদেশ থেকে একটি তামিল ছেলে কেবল এণ্ডরুজের সেখানে উপস্থিতির কথা ভেবেই কলাবিভাগে ভর্তি হতে এসেছিল। আসার পর কয়েকদিনের মধ্যে সেখানে সে অসুস্থ হয় ও তার মৃত্যু ঘটে। শোকার্ত পিতার একমাত্র সান্ত্বনা ছিল যে এণ্ডরুজ তাঁর ছেলের রোগশয্যায় সর্বদা উপস্থিত থাকতেন। তিনি (মিঃ পি. আর. পিল্লাই) সেই সময় (১২ ফেব্রুয়ারি ১৯২৩) তাঁর বন্ধুকে লিখেছিলেন— 'এণ্ডরুজ আমার ছেলের সেবা করেছিলেন দেবদূতের মতো। বিশ্বাস করুন, ঈশ্বরপ্রেরিত দেবদূত ছাড়া কেউ এমন পারে না। সেই খ্রীস্টপ্রীতির স্নিগ্ধ আবহাওয়ায় শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করে পুত্র আমার ধন্য হয়েছে।'

প্রায় প্রতিবারেই এণ্ডরুজ কলকাতা থেকে ফেরার পথে রাতের তারার আলোয় হেঁটে বোলপুর স্টেশন থেকে ফিরতেন আর খুব ভোরের গাড়িতে কলকাতা যেতেন। সেখানে স্টেশন থেকে পায়ে হেঁটে ভিড়ের মধ্যে পথ করে কখনো 'মডার্ন রিভিউ' বা 'বিশাল ভারত' পত্রিকা অফিসে, কখনো-বা সায়েন্স কলেজে আচার্য প্রফুল্লচন্দ্রের কাছে যেতেন। আচার্যদেব তখন তাঁর ছাত্রদের নিয়ে বন্যাত্রাণকার্য সংগঠন করেছিলেন। বন্ধুরা রাগ করে এণ্ডরুজকে বলতেন, 'তুমি কেন এত হেঁটে চলাফেরা কর, বলো তো? একটা বাসে উঠে গেলেই তো হয়।' হঠাৎ একদিন ভোরের খবরের কাগজ খুলে তাঁরা দেখলেন এণ্ডরুজের লেখা আবেগপূর্ণ এক চিঠি— 'দশবছর বয়সের ছেলেরা শীতে কাঁপতে কাঁপতে ম্যানহোলে ঢুকে নর্দমা পরিষ্কার করছে, এ দৃশ্য কলকাতার অধিবাসীরা কিভাবে সহ্য করছেন?' শান্তস্বরে বন্ধুদের বললেন, 'আমি যদি হেঁটে পথ না চলতাম তবে কেমন করে এ-সব দেখতাম?' পত্রিকার সে চিঠি দেখে তাঁদের খেয়াল হল হ্যারিসন রোডের উপর দিয়ে যাবার সময় তাঁরাও তো কতবার এ দৃশ্য দেখেছেন— অথবা বলা যেতে পারে

তাঁদের চোখ থাকতেও তাঁরা চেয়ে দেখেন নি, অথচ এণ্ডরুজ ঠিকই লক্ষ করেছেন।

সে-রকমই এক শীতের সকালে খবরের কাগজওয়ালা ছোটো ছেলেটিকে ডেকে একখানি অমৃতবাজার পত্রিকা হাতে নিলেন। পকেটে হাত দিয়ে দেখেন খুচরো পয়সা সব শেষ হয়ে গেছে। কারণ পথে সব ভিক্ষুকদের হাতে কিছু কিছু দিতে হয়েছে তো। মাত্র এক আনা পয়সার অভাবে কাগজখানি আবার ছেলেটির হাতে ফিরিয়ে দিতে হচ্ছে। ছেলেটি এ দিকে একদৃষ্টে সাহেবের মুখের দিকে তাকিয়ে আছে। হঠাৎ সে বলে ওঠে— 'ও, আপনি তো এণ্ডরুজ সাহেব। আপনার কাছ থেকে আমি পয়সা নেব না।' বলেই কাগজখানি তাঁর হাতে গুঁজে দিয়ে ছেলেটি ছুটে ভিড়ের মধ্যে মিশে যায়।

পরের বার কলকাতায় এসে ভিড়ের মধ্যে থেকে ছেলেটিকে বের করে তার বিশ্বস্ততার পুরস্কারস্বরূপ তাকে তিনি একটি টাকা দেন।

আবার আফ্রিকায়

১৯২৩ সালের মার্চ মাস থেকে কেনিয়ার ভারতীয়দের ব্যাপার নিয়ে এণ্ডরুজ আবার নিবিষ্ট হয়ে পড়লেন। পূর্বেই বলা হয়েছে ১৯২১ সালে একবার সেখানে গিয়েছিলেন স্থানীয় ভারতীয়দের আগ্রহে। তখনই ভারতীয়দের বিরুদ্ধে জাতিগতভাবে অমর্যাদাকর ভেদনীতি গ্রহণের আশঙ্কা প্রথম দেখা দিয়েছিল প্রশাসনিক পর্যায়ে। কেনিয়াবাসী ভারতীয়দের লক্ষ্য ছিল জাতিগত বৈষম্য দূরীকরণ।

এণ্ডরুজের পকেট ডায়ারি থেকে জানা যায় ১৯২৩ সালের মে-জুন মাসে তিনি খুবই কর্মব্যস্ত। একদিন লণ্ডনের ভারতীয় ছাত্রাবাসের বিরাট সভায় শ্রীনিবাস শাস্ত্রী ও এণ্ডরুজ উপস্থিত ছিলেন।[১] শাস্ত্রীজি সংযত ভাষায় ভারতীয়দের সমস্যার কথা বললেন। কিন্তু তাঁর পরে যে ভারতীয় বক্তাটি

---

১ শ্রীনিবাস শাস্ত্রী প্রথম ভারতীয় এজেণ্ট হিসাবে দক্ষিণ-আফ্রিকায় যান। যেমন তাঁর বিদ্যাবত্তা তেমনই ছিল বাক্‌পটুতা। আফ্রিকার ইউনিয়ন সরকার এবং ইউরোপীয় অধিবাসী সকলেই তাঁর ব্যবহারে মুগ্ধ ছিলেন। ইংরেজি ও সংস্কৃত ভাষায় অসাধারণ পাণ্ডিত্য ছিল। ১৯৪৬ সালে তাঁর মৃত্যু হয়। দ্র. গান্ধী-সাহিত্য ৭, মেরে সমকালীন, পৃ. ৫৪৮-৫৫৪।

উঠে দাঁড়ালেন, তিনি ব্রিটিশ জাতির বিরুদ্ধে একটি উত্তেজনাপূর্ণ ভাষণ দিয়ে সর্বশেষে বললেন, 'ব্রিটিশরা যদি হিংসাত্মক কার্য পছন্দ করে তবে সে পথের চূড়ান্ত পরিণতিও ভারত তাদের দেখাতে পারে।'

সে সভায় সেদিন উপস্থিত ছিলেন ধর্মযাজক উইনস্লো। তিনি সেদিনকার ঘটনার বর্ণনা প্রসঙ্গে লেখেন[১]—

শত শত ভারতীয় ছাত্র সেখানে সমবেত হয়েছে। তাদের আনন্দোচ্ছ্বাসে ঘর পরিপূর্ণ। সি. এফ. এ. বলতে শুরু করলেন। বললেন, 'যে বক্তৃতা শুনলাম, তার পরে আমি যা বলব ভেবে আজ এসেছিলাম তা আর বলা চলে না। ঘৃণাকে ঘৃণা দিয়ে যারা ব্যাহত করতে চায় তাদের তিনি স্মরণ করিয়ে দিলেন যীশুখ্রীস্টেরও পাঁচশো বছর আগে বুদ্ধ বলেছিলেন—ক্রোধকে জয় করবে অক্রোধের দ্বারা— নিজের ক্রোধকে এবং অপরের ক্রোধকে।'

তিনি বললেন, 'কর্মই সত্য। মানুষ যেরূপ ফসল বোনে, সেরূপ ফলই লাভ করে। সর্বমানবকে এক পিতার সন্তান বলে স্বীকার করেও আমরা ভারতবর্ষে যাদের অস্পৃশ্য বলি, তাদের রেখেছি অসহ্য দুর্গতির মধ্যে। ঠিক সেই আচরণ যখন অন্যের কাছে পাই তখন কেন আমরা অভিযোগ করব? মানুষের শক্তি অক্রোধে, ক্ষমাতে, এই কথা বুঝতে দেয় না সেই পশুই যে আজও মানুষের মধ্যে মরে নি।'

সেই প্রচণ্ড আবেগের মুহূর্তে আমি লোকটির সাহসের প্রতি শ্রদ্ধা দেখাব, কি ভারতীয় ছাত্ররা যেরূপ শান্তভাবে তাঁর তিরস্কারটি গ্রহণ করল, তার জন্য তাঁদের প্রশংসা করব, ভেবে পাচ্ছিলাম না। এ ঘটনায় প্রকাশ পেল এণ্ডরুজের প্রতি শ্রদ্ধায় প্রতিটি ভারতীয়ের মন কিরূপ পূর্ণ। বক্তৃতাশেষে সমস্ত ঘর উৎসাহিত কলধ্বনিতে মুখর হল।

কেনিয়া সম্পর্কে ঔপনিবেশিক অফিসের স্মারকলিপি জুলাই মাসে (১৯২৩) প্রকাশিত হয়। এণ্ডরুজ তখন ভারতবর্ষে এসে গেছেন। সমপর্যায়ে ভোট গ্রহণের (common electoral roll) প্রস্তাব নাকচ করে সাম্প্রদায়িক ভোটগ্রহণ (communal franchise) প্রস্তাব গৃহীত হয়। স্থির হয় যে ভারতীয়দের অধিবাসন (immigration) প্রশ্নের মীমাংসা কেনিয়াতেই

---

১ Chaturvedi & Sykes, *Charles Freer Andrews*, পৃ. ১৯৪।

হবে। প্রায় ঠিক সেই সময়েই ১৯২৩ সালের ২৪ জুলাই তারিখে জেনারেল স্মাট্‌স্ নাটালে দক্ষিণ-আফ্রিকার জন্য জাতিগত পৃথকীকরণের (racial segregation) একটি প্রস্তাব তৈরি করলেন। ১৯২৪ সালের জানুয়ারি মাসে সেটি একটি বিলে পরিণত হবার কথা। এ প্রস্তাবটির কথা শুনে ভারতবর্ষে ভারতীয়দের মধ্যে যে ক্ষোভের সৃষ্টি হয় এণ্ডরুজও তার সমভাগী ছিলেন।

সাম্প্রদায়িক ভোটাধিকার এবং ভোটাধিকারহীনতা— এ দুয়ের মধ্যে একটি বেছে নিতে হবে, এই প্রস্তাবে ভোটাধিকারহীন ইংরেজ ঔপনিবেশিক সরকারের প্রাধান্য স্বীকারই বাঞ্ছনীয়— এণ্ডরুজ সেই মত প্রকাশ করেন। কারণ সাম্প্রদায়িক ভোটাধিকারের অর্থ আফ্রিকার আদিম অধিবাসীদের এবং ভারতীয়দের নিশ্চিত বিনাশ— এই তাঁর দৃঢ়প্রত্যয় ছিল। কিন্তু এণ্ডরুজের ভারতীয় সহযোগীরা জাতিগত অবমাননায় ক্ষুব্ধ হয়ে ভোটাধিকারহীনতার বিরুদ্ধে অভিমত প্রকাশ করলেন।

আফ্রিকাবাসীদের স্বার্থের প্রতি এণ্ডরুজের সজাগ দৃষ্টি লক্ষ করে কেনিয়ার ভারতীয়রা ধরে নিল যে তিনি এখন তাঁদের বিরোধী পক্ষ। এই সময় তাঁর বিরুদ্ধে তীব্র গালাগালি বর্ষণ শুরু হল এই অভিযোগে যে, এণ্ডরুজ আফ্রিকা-বাসীদের দাবির প্রশ্ন নতুন করে তুলেছেন কেবল ভারতীয়দের দাবি নাকচ করার উদ্দেশ্যে।

এ ধরনের আঘাত এণ্ডরুজ ক্বচিৎ-কদাচিৎ পেয়েছেন। শরীর ছিল তখন রুগ্‌ণ। পরের তিন সপ্তাহ ধরেই তিনি জ্বরে ভুগলেন। তা ছাড়া ও-সমস্ত ব্যাপারে এমনভাবে পরাজিত হবার দুঃখে বিমর্ষ হয়ে রইলেন। *The Democrat* নামক নাইরোবি-স্থিত ভারতীয়দের এক পত্রিকা ব্যঙ্গ করে লিখেছিল, 'আর-এক ধরনের শত্রু আমাদের আছে, বিশ্বাসঘাতক, খদ্দরধারী, খালি পা, শ্বেতাঙ্গ সাধুর দল। এঁরা আমাদের সাহায্য করতে আসেন, কেবল আমাদের সংগ্রামকে পরাভূত করবার জন্য।' এই তীব্র আঘাতের প্রতিলিপিসহ 'ইয়ং ইণ্ডিয়া' পত্রিকার তৎকালীন সম্পাদক চক্রবর্তী রাজাগোপালাচারীর কাছে এণ্ডরুজ এক চিঠিতে লিখেছিলেন, 'ইচ্ছা করে এবার আমার প্রভুর সঙ্গে আমি চিরনির্বাসনে যাই। তিনিই জানেন, এ-সব কত যে মিথ্যা।'

তার পরে আন্তরিক সাধনায় নিজেকে তিনি এর ঊর্ধ্বে তুলতে চেষ্টা করলেন। তাঁর প্রতি মিথ্যা দোষারোপকে তিনি দুরারোগ্য রোগের চিহ্ন

হিসাবে গ্রহণ করে স্থির করলেন, ভারতবাসীকে এ বিষয়ে আসল সত্য ব্যাপারটি জানাতে হবে।

এ দিকে রাজাগোপালাচারী ও সমগ্র ভারতীয় প্রেসগুলি যেমন শ্রদ্ধাভরে এণ্ড্রুজের সমর্থনে এগিয়ে এলেন, 'ডেমোক্রাট' পত্রিকার মন্তব্যের বিরুদ্ধে তাঁরা যে তীব্র প্রতিবাদ করলেন তাতেই প্রকাশ পায় ভারতের যথার্থ সহানুভূতি কোন্ দিকে। কেনিয়া ও লণ্ডনে যে এণ্ড্রুজের কাজ সম্পূর্ণ ব্যর্থ হয়েছিল, তাও নয়। ইংলণ্ডের ধর্মীয় ও রাজনৈতিক মহল থেকে পূর্ব-আফ্রিকা সম্বন্ধে পক্ষপাতহীন তদন্তের যে দাবি এল তার ফলে ১৯২৪ সালে একটি তদন্ত কমিটি গঠিত হয়। এর মূলেও রয়েছে ইংলণ্ডের শিক্ষিত সমাজে জনমত গঠনে এণ্ড্রুজের আপ্রাণ প্রচেষ্টা।

১৯২৩ সালের মাঝামাঝি এণ্ড্রুজ তাঁর পরবর্তী কর্তব্য সম্বন্ধে অনেক চিন্তা করলেন। শরীর অত্যন্ত খারাপ, কিন্তু সে দিকে তাঁর দৃষ্টি নেই। ভাবলেন দক্ষিণ-আফ্রিকায় পৃথকীকরণ আইন প্রবর্তিত হবার উপক্রম হয়েছে, এখন সে বিষয়ে সংগ্রামের জন্য তাঁর সেখানে যাওয়া প্রয়োজন হতে পারে। এ দিকে আসাম থেকে আহ্বান এল, ছাত্রসম্মেলনে যোগদানের। সেখানে পিয়রসনের মৃত্যু-সংবাদ পেয়ে শান্তিনিকেতনে ফিরে এলেন।[১]

পিয়রসন-কথা

উইলিয়ম উইনস্ট্যানলি পিয়রসনের কথা পূর্বেও বলা হয়েছে। ১৯১৪ সালের এপ্রিল মাসে কয়েকদিনের ব্যবধানে পিয়রসন ও এণ্ড্রুজ শান্তিনিকেতনের কাজে যোগ দেন। শান্তিনিকেতনে এসে অল্প কদিনের মধ্যে তিনি যেমন বাংলাভাষা আয়ত্ত করেছিলেন, তেমনি সকলের মনও জয় করেছিলেন। শান্তিনিকেতনের আশপাশের সাঁওতাল গ্রামগুলিতেও তাঁর কর্মক্ষেত্র বিস্তৃত হয়েছিল। পিয়রসন-পল্লী নামে একটি সাঁওতাল গ্রাম আজ পর্যন্ত তাঁর স্মৃতি বহন করছে।[২]

শিশুদের তিনি অত্যন্ত ভালোবাসতেন। শান্তিনিকেতন স্কুলের ছেলেরা

১ রবীন্দ্রজীবনী, ৩য় খণ্ড, পৃ. ১৫৪।

২ শ্রীঅমিয়কুমার সেন, শান্তিনিকেতন-স্মৃতি (উইলিয়ম পিয়রসন -লিখিত Santiniketan, 1916, গ্রন্থাংশের অনুবাদ), পৃ. ৪০।

তাঁর নাম বদলে বাংলা নাম দিয়েছিল প্রিয় সেন, জাপানীদের মুখে সেই নাম হয়েছিল প্রিয় সান।[১]

১৯১৬ সালের মে মাসে রবীন্দ্রনাথ জাপান যাত্রা করেন। সঙ্গে ছিলেন এণ্ডরুজ, পিয়রসন ও শ্রীমুকুল দে। এণ্ডরুজ আগেই ভারতে ফিরে আসেন। রবীন্দ্রনাথ সেখানে কয়েকমাস কাটিয়ে সেপ্টেম্বর মাসে আমেরিকা যান। পিয়রসন এই সময় সঙ্গে থেকে ভাষণ তৈরি এবং ভ্রমণসূচী রচনায় তাঁকে সাহায্য করেন। ১৯১৭ সালের জানুয়ারি মাসের শেষে আবার রবীন্দ্রনাথ জাপানে পৌছোন এবং মুকুল দেকে নিয়ে দেশে ফিরে আসেন। পিয়রসন চীন এবং জাপান পরিভ্রমণের উদ্দেশ্যে জাপানেই থেকে যান। জাপানে অবস্থানকালে তিনি ভারতবর্ষের রাজনৈতিক আশা-আকাঙ্ক্ষাকে সমর্থন করে একখানি পুস্তিকা লেখেন। সেটি বিদেশী ভারত সরকার-কর্তৃক নিষিদ্ধ হয় এবং পিয়রসনকে পিকিং থেকে বন্দী করে ইংলণ্ডে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানে তিনি ইউরোপের মহাযুদ্ধের সমাপ্তি পর্যন্ত স্বগৃহে অন্তরীণ অবস্থায় থাকেন। ১৯২০ খ্রীস্টাব্দের জুন মাসে রবীন্দ্রনাথ যখন ইউরোপ যান পিয়রসন ইংলণ্ড থেকে তাঁর সঙ্গী হন— সেপ্টেম্বর মাসে কবির সঙ্গে আমেরিকায় যান। ১৯২১ খ্রীস্টাব্দের জুলাই মাসে কবি যখন দেশে ফিরলেন পিয়রসনও বহুদিন পরে শান্তিনিকেতনে তাঁর নিজস্ব স্থানটিতে পুনরায় অধিষ্ঠিত হন।[২]

১৯২২ সালে স্বাস্থ্যপরিবর্তনের উদ্দেশ্যে পিয়রসন দেশে যান। সুস্থ হয়ে ভারতে ফেরার সময় ১৯২৩ সালের ইউরোপের কতকগুলি স্কুল ভালো করে দেখতে গিয়ে ইতালি ভ্রমণকালে অসাবধানতাবশত ট্রেনের কামরার দরজা হঠাৎ খুলে যাওয়ায় তিনি নীচে পড়ে যান। ২৪ সেপ্টেম্বরে তাঁর মৃত্যু হয়।

মৃত্যুর পূর্বে পিয়রসনের শেষ সজ্ঞান উক্তি— 'ভারত, আমার একমাত্র প্রাণের ধন ভারত।' (My one and only love, India)[৩]

৩০ সেপ্টেম্বর সকালে বিলাত থেকে তারযোগে এণ্ডরুজের কাছে খবর

---

১ C. F. Andrews, "W. W. Pearson", *Visva-Bharati Quarterly*, May 1939, পৃ ৩৭।

২ শ্রীঅমিয়কুমার সেন, শান্তিনিকেতন-স্মৃতি (উইলিয়ম পিয়রসন -লিখিত, Santiniketan, 1916, গ্রন্থাংশের অনুবাদ), পৃ. ৪১।

৩ C. F. Andrews, "W. W. Pearson", *Visva-Bharati Quarterly*, May 1939, পৃ. ৩২।

আসে যে পিয়রসন ২৪ সেপ্টেম্বর ইতালিতে দুর্ঘটনায় ইহলোক থেকে বিদায় নিয়েছেন। শান্তিনিকেতন পত্রিকার আশ্বিন মাসের আশ্রম-সংবাদে দেখি পিয়রসনের স্মৃতিরক্ষার জন্য কী করা যায় সে বিষয় নির্ধারণের জন্য কলাভবনে একটি সভা হয়। সভায় এণ্ডরুজ বলেন যে হাসপাতালের উন্নতিসাধন পিয়রসনের প্রিয়চিন্তা ছিল। 'শান্তিনিকেতন' নামে তাঁর লেখা বইয়ের লভ্যাংশ হাসপাতালের জন্য তিনি দান করেছিলেন। বিদেশ থেকেও মাঝে মাঝে হাসপাতাল ফাণ্ডে টাকা পাঠিয়েছেন। তাই স্থির হয় পিয়রসনের নামে শান্তিনিকেতনে একটি চিকিৎসালয় খোলা হবে। তার এক অংশে গরিব গ্রামবাসীদের ওষুধ দান ও বিনা পয়সায় চিকিৎসা করা হবে। নতুন হাসপাতালের জন্য ত্রিপুরার পরলোকগত মহারাজা যে দান অঙ্গীকার করেছিলেন, তার কিছু পাওয়া গেছে। বাকি টাকার জন্য এণ্ডরুজ পূজার ছুটিতে ত্রিপুরায় যাবেন।

কিন্তু বন্ধু পিয়রসনের এই আকস্মিক মৃত্যুতে শোকের নির্মম আঘাতে এণ্ডরুজের শরীর ভেঙে পড়ল। নবেম্বরের শেষে চিকিৎসার জন্য তিনি আবার ইংলণ্ডে প্রত্যাবর্তন করলেন।[১]

সেখানে এণ্ডরুজের বন্ধু 'কনটেমপোরারি রিভিউ' পত্রিকার সম্পাদক জি. পি. গুচ্ (G. P. Gooch) আর 'ম্যাঞ্চেস্টার গার্ডিয়ান' পত্রিকার সম্পাদক সি. পি. স্কট (C. P. Scott)— এঁরা দুজন এণ্ডরুজকে পরিচিত করালেন ইংলণ্ডের তদানীন্তন বিদ্বৎসমাজে। সেখানে সকলেই কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের বিশ্বভারতীর আদর্শের প্রতি সজাগ সহানুভূতি প্রকাশ করলেন। ভারতীয় দৃষ্টিভঙ্গি থেকে রাজনৈতিক প্রশ্নগুলির কী মীমাংসা করা যায়, এ বিষয়ে জানার জন্য তাঁরা উৎসুক হলেন।

এই যাত্রায় এণ্ডরুজের সবচেয়ে আনন্দের অভিজ্ঞতা ছিল *The Quest of the Historical Jesus* পুস্তকের লেখক অ্যালবার্ট সোয়াইটজারের সঙ্গে পরিচয়। মিঃ ও মিসেস জে. এইচ. ওল্ডহ্যাম উভয়ের বন্ধু— তাঁদের গৃহেই এই সাক্ষাৎকার ঘটে। বিদায় নেবার কালে স্টেশনে যাবার পথে যে ঘটনাটি এণ্ডরুজ চাক্ষুষ প্রত্যক্ষ করেন ইউরোপীয় খ্রীস্টবিশ্বাসে অহিংসভাবের উদাহরণ দিতে গিয়ে তিনি বহুবার তার উল্লেখ করেছেন। তাঁর নিজের ভাষায় ঘটনাটি এরূপ[২]—

১ Chaturvedi & Sykes, *Charles Freer Andrews*, পৃ. ১৯৭।

২ *Current Thoughts*, Madras, April 1925। দ্র. Chaturvedi & Sykes, *Charles Freer Andrews*, পৃ. ১৯৮।

একটা মোটা লাঠিতে অ্যালবার্ট সোয়াইটজারের জিনিসপত্রের ভারী থলেটি ঝুলিয়ে দুজনে সেটি বয়ে নিয়ে চলেছি। সেই ভোরে পথঘাটে বরফজমা-পিছল। হঠাৎ 'আহা, আহা' বলে চীৎকার করে সোয়াইটজার রাস্তায় একেবারে দাঁড়িয়ে পড়লেন। তাতে আমার প্রায় হুমড়ি খেয়ে পড়ার অবস্থা। নিচু হয়ে ধীরে ধীরে হাতে তুলে নিলেন একটি ছোট্ট কীট। সেটি রাস্তার ধারে বেড়াঝোপের সারিতে তুলে দিলেন। সেটি পড়েছিল গাড়ির চাকা চলে যাবার পর রাস্তায় যে গর্ত হয় তারই মধ্যে। সেটিকে গাছের পাতার উপর রেখে সোয়াইটজার বললেন, 'ওখানেই ওটা ঠিক থাকবে। রাস্তায় পড়ে থাকলে মরে যাবে।'

ইংলণ্ডে এবার উপযুক্ত চিকিৎসায় এণ্ডরুজের স্বাস্থ্যেরও দ্রুত উন্নতি হতে লাগল। কিন্তু যারবেদা জেলে হঠাৎ গান্ধীজির অসুস্থতার খবর পেয়ে তাঁকে ভারতে ফিরতে হল ১৯২৪ সালের প্রথম ভাগে। সেবার মধ্যরাত্রে (১৩ জানুয়ারি) অ্যাপেণ্ডিসাইটিস অপারেশন করে গান্ধীজিকে বাঁচানো হয়। ৫ ফেব্রুয়ারি এণ্ডরুজ ও গান্ধীজি পুনার সাসুন হাসপাতালে বসে আছেন এমন সময় গান্ধীজির কারামুক্তির খবর আসে।[১]

গান্ধী-রবীন্দ্র-সাহচর্যে

এবার গান্ধীজির কারামুক্তির পর তাঁর সঙ্গে এণ্ডরুজের জীবনের ঘনিষ্ঠতম অধ্যায়ের শুরু। দীনদরিদ্র পদদলিতের প্রতি উভয়ের মনে একই উদ্‌বেগ, প্রেমের শক্তিতে উভয়ের বিশ্বাস সমান। তাই যদিও নীতিগত ব্যাপারে উভয়ের মতানৈক্য হয়েছে বহুবার, তবু তাঁদের পরস্পরের প্রতি নির্ভর ও বিশ্বাসের বন্ধনকে দৃঢ়তর করেছে দীর্ঘদিনের এই বিচ্ছেদ।

১৯২৪ সালের জানুয়ারি মাসে এণ্ডরুজ যখন শান্তিনিকেতনে ফিরে এলেন তখন গুরুদেব রবীন্দ্রনাথ তাঁকে বললেন, 'তুমি মহাত্মাজির কাছে যাও, সেখানেই রয়েছে তোমার যথার্থ কাজ।' এণ্ডরুজকে এ বিষয়ে বেশি বলার প্রয়োজন ছিল না। ইংলণ্ড থেকে ভারতে ফিরেই প্রথম পুনা গিয়ে এণ্ডরুজ নিজেই বুঝেছেন গান্ধীজির তাঁকে কতখানি প্রয়োজন। পরের দুই মাস তিনি গান্ধীজির সঙ্গে বাস করেন। সেখানে তখন ভারতের বিভিন্ন স্থান থেকে

---

১ Tendulkar, *Mahatma*, vol. II, পৃ. ১২২।

নেতৃবৃন্দ এসে গান্ধীজির সঙ্গে যে-সব আলোচনা করতেন সে-সব পরামর্শে এণ্ডরুজেরও বিশিষ্ট অংশ ছিল। গান্ধীজির অসুস্থ অবস্থায় তাঁর রাজনৈতিক, সামাজিক ও ধর্মসম্বন্ধীয় আলোচনার মুখপত্র 'ইয়ং ইণ্ডিয়া' পত্রিকার সম্পাদনা-ভারও এণ্ডরুজ গ্রহণ করেন।

এই দু-মাসে দুটি ব্যাপারে যে বিচার মীমাংসা হয় এণ্ডরুজের জীবনে তার বিশেষ মূল্য আছে। ভারতীয় খ্রীস্টান নেতা জর্জ জোসেফ ও গান্ধীজি যখন উত্তর ত্রিবাঙ্কুরের ওয়াইকোম্ নামক স্থানে গ্রামের মন্দিরের পাশে সাধারণের রাস্তা দিয়ে অস্পৃশ্যদের চলার অধিকার দাবি করে জোসেফের নেতৃত্বে সত্যাগ্রহ সংগ্রাম অভিযানের পরিকল্পনা করেন তখন এণ্ডরুজও সেখানে উপস্থিত ছিলেন। দ্বিতীয়ত আসামের ছাত্র-সম্মেলনে (সেপ্টেম্বর ১৯২৩) যোগদান করতে গিয়ে এণ্ডরুজ যা শুনেছেন আর দেখেছেন তা স্মরণ করে তিনি নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটির কাছে দাবি করলেন যে সেখানে আফিম ব্যবহার সম্বন্ধে ভালোরকম তদন্ত হওয়া চাই। সেই তদন্ত-কমিটির গঠনেও তিনি নেতৃপদ গ্রহণ করেন।[১]

রবীন্দ্রনাথ তখন চীন পরিভ্রমণে গেছেন। তাঁর ফেরার পথে এণ্ডরুজ হংকঙে তাঁর সঙ্গে যুক্ত হলেন। জুন জুলাই ও অগস্ট মাস তাঁর সঙ্গে মালয় ও বর্মায় কাটালেন। দূরপ্রাচ্যে আফিমের ব্যবহার বিষয়ে তদন্ত ও বিশ্ব-ভারতীর জন্য অর্থ-সংগ্রহ— এই দুই কাজই তাঁর একসঙ্গে চলল।

এ দিকে ভারতবর্ষে তখন রাজনৈতিক পরিস্থিতি সংকটজনক। ১৯১৯ সালের অ্যাক্ট-অনুযায়ী ভারতীয় আইনসভার সদস্যদের মনোনীত করা হত সাম্প্রদায়িক ভোটাধিকারে। কেনিয়ায় এণ্ডরুজ যে প্রথার বিরুদ্ধে সংগ্রাম করেছেন তারই সমগোত্রীয় এই প্রথার মধ্যে যে ভেদভাব নিহিত আছে, রাজনৈতিক অধিকারের দাবিতে অনুন্নত সমাজ সংগঠন এবং স্বরাজ্যদলের আইনসভা-প্রবেশের স্বীকৃতির ফলে তখন তা ক্রমেই বেড়ে চলেছিল। ১৯২৪ সালের অগস্ট মাসে ভয়াবহ সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা হল, বিশেষভাবে সীমান্তপ্রদেশে কোহাটে। গান্ধীজি তখন দিল্লীতে ছিলেন। দুঃখে লজ্জায় ম্রিয়মাণ হয়ে তিনি প্রায়শ্চিত্ত হিসাবে একুশ দিনের (১৮ সেপ্টেম্বর থেকে ৮ অক্টোবর

১ B. Pattabhi Sitaramayya, *The History of the Indian National Congress*, পৃ. ৪৩৬।

১৯২৪) উপবাস-ব্রত গ্রহণ করলেন।[১] এই প্রায়োপবেশনের সময় ভারতের সব ধর্মমতের ও সব প্রদেশের চারশো বিশিষ্ট নেতা দিল্লীতে ঐক্য সম্মেলনে মিলিত হয়ে সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে সংগ্রামের শপথ গ্রহণ করেন। এণ্ডরুজ আবার গান্ধীজির সঙ্গে মিলিত হলেন। আবার তিনি 'ইয়ং ইণ্ডিয়া'র সম্পাদনাভার গ্রহণ করে গান্ধীজির প্রায়োপবেশনে ও রোগমুক্তিকালে বন্ধুর কর্তব্য পালন করেন।

ট্রেড-ইউনিয়ন কংগ্রেস

এণ্ডরুজের অব্যবহিত পরবর্তী কর্তব্য হল নিখিলভারত ট্রেড-ইউনিয়ন কংগ্রেসের আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়া। ১৯২০ সালে প্রতিষ্ঠানটির জন্ম; সমসাময়িক কাল থেকে পুরো চার বছর ধরেই ভারতের শ্রমিক সমস্যার সঙ্গে নানাভাবে তাঁর ঘনিষ্ঠ যোগ গড়ে উঠেছিল। তা ছাড়া ১৯২৩ সালে জেনিভায় আন্তর্জাতিক শ্রমিক কার্যালয়ে পরিভ্রমণ করে তিনি বুঝেছিলেন যে ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনের উপরে সুদৃঢ় কেন্দ্রীয় কর্তৃত্বের প্রয়োজন রয়েছে। ১৯২৫ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে তাই তিনি নাগপুর ট্রেড-ইউনিয়ন কংগ্রেসের বার্ষিক সম্মেলনে যোগ দেন। সেই সম্মেলনেই ১৯২৫-২৬ সালের জন্য তাঁকে সভাপতি নির্বাচিত করা হয়। এই বছরে শিল্পব্যাপারে পরামর্শদান ও বিরোধনিষ্পত্তির জন্য তাঁকে বহুক্ষেত্রে আহ্বান করা হয়। আফিম-তদন্ত শেষ করার জন্য একবার আসামে গেলেন, আবার গেলেন উড়িষ্যায় বন্যা-বিধ্বস্ত অঞ্চলে। অবশ্য তখনো এণ্ডরুজ মনে ভাবছেন শান্তিনিকেতনের অধ্যাপনার কথা। ১৯২৫ সালের জুলাই মাসে বিদ্যালয়ের ক্লাস শুরু হতেই তিনি কয়েকটি ক্লাসের ভার নিতে উৎসাহভরে এগিয়ে গেলেন। কিন্তু নিবিড়ভাবে অধ্যাপনা তিনি কখনো করতে পারেন নি। সে বছর নবেম্বর মাসে তাঁকে আবার দক্ষিণ-আফ্রিকা যেতে হয়েছিল।

আফিম-বিরোধী সংগ্রামে

আফিম-বিরোধী সংগ্রামে এণ্ডরুজের দূরদৃষ্টির প্রসার ও নিঃস্বার্থ অধ্যবসায়ের যে উদাহরণ মেলে তা সত্যি বিস্ময়কর। ভারতবর্ষে ও বিদেশে আফিম

---

১ Tendulkar, *Mahatma*, Vol. II, পৃ. ১৪৮।

বিক্রয়ের একচেটিয়া অধিকার ভারতে ব্রিটিশ-সরকারের হাতেই ছিল। শ্রীমতী লা মট[১]-এর লেখা 'একচেটিয়া আফিম ব্যবসায়' (*The Opium Monopoly*) পুস্তক পাঠ করে সে বিষয়ে এণ্ডরুজের আগ্রহ প্রথম জাগ্রত হয়ে উঠেছিল। তিনি ১৯২০ সালের 'মডার্ন রিভিয়ু' পত্রিকায় সরকারের বিরুদ্ধে তীব্রভাষায় এক প্রবন্ধ লেখেন।[২] চীনে আফিম রপ্তানি অবৈধ ছিল, অথচ ভারতবর্ষ থেকে জাহাজে হংকং, সিঙাপুর, ব্যাঙ্কক ইত্যাদি চীনের আশপাশের স্থানে অপর্যাপ্ত আফিম চালান যেত। সে-সব বন্দরের কর্তৃপক্ষরা আফিম-চালান থেকে প্রচুর রাজস্ব আদায় করতেন। শ্রীমতী লা মটের সঙ্গে এণ্ডরুজ যোগাযোগ স্থাপন করলেন। আফিম-রপ্তানি ও ভারতবর্ষে তার প্রয়োজনীয়তা কতখানি— সে বিষয়ে যত বই যত প্রবন্ধ লেখা হয়েছে সবই এণ্ডরুজ পড়ে ফেললেন।

১৯২১ সালের শেষভাগে গান্ধীজি আসামে গিয়ে আফিম-ব্যবসায়ের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করেন। সরকার-পক্ষ থেকে এ সংগ্রামের অপপ্রচার হয়। সরকারি শুল্ক-বিভাগের রিপোর্টে লেখা হয় অসহযোগীদের এই চেষ্টা আফিম-বর্জনের জন্য ততটা নয়, যতটা সরকারি কর্মচারীদের বিব্রত করার জন্য। এণ্ডরুজের অভিজ্ঞতা আরো বেড়েছিল ১৯২৪ সালে হংকং ও মালয় পরিভ্রমণে। ভারতে ফিরে এসে আসামের স্থানীয় নেতাদের রিপোর্ট তিনি হাতে পেলেন— তদন্তের সাক্ষ্য বিশ্লেষণ করে সুস্পষ্টভাষায় যুক্তিগুলিকে সাজালেন।

জেনিভা সম্মেলনের পূর্বেই এণ্ডরুজ একখানা দরখাস্ত সই করিয়ে নিলেন রবীন্দ্রনাথ, গান্ধীজি, রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় প্রমুখ দেশনেতাদের দিয়ে। নিজেও তাতে সই করলেন। তাতে লেখা হল কেবলমাত্র ঔষধ ও বিজ্ঞানের প্রয়োজন ভিন্ন আফিম ফুলের চাষই যেন বন্ধ করে দেওয়া হয়। জেনিভা থেকে হোরেস আলেকজাণ্ডার এণ্ডরুজকে 'তার' করে জানালেন গান্ধীজির কাছ থেকে যেন বিশেষ একটি বাণী পাঠানো হয়। এণ্ডরুজ তাড়াতাড়ি সেটি সংগ্রহ করে পাঠালেন যাতে সভার চরম সংকট-মুহূর্তে গিয়ে

১ Miss N. La. Motte, আমেরিকান মহিলা, ব্রিটিশ-সরকারের একচেটিয়া আফিম ব্যবসায়ের নিন্দা করে বই লেখেন।

২ C. F. Andrews, "The Opium Monopoly in India", *The Modern Review*, December 1920, পৃ. ৫৯৪-৫৯৬।

সেটি পৌঁছয়। সে সময়কার বর্ণনা দিয়ে পরে শ্রীমতী লা মট এণ্ড্রুজকে লেখেন[১]—

দরখাস্তখানি পেশ করা হলে সভায় বেশ একটু সাড়া পড়ে গেল। সেখানি আর মহাত্মা গান্ধীর টেলিগ্রামটি আজ বিকেলের বিস্ময়কর সাফল্যের মূলে। ভারতীয়দের দরখাস্ত পাঠ শেষ হলে মিঃ ক্যামবেল যখন প্রতিবাদ করতে উঠে দাঁড়ালেন তখনই এক রোমাঞ্চকর অবস্থার সৃষ্টি হল।

ভারতে ব্রিটিশ-সরকারের প্রতিনিধি মিঃ ক্যামবেল সবেমাত্র সম্মেলনে এই উক্তিটি করেছেন যে, ভারতের জননেতা মহাত্মা গান্ধী পর্যন্ত কথনো আফিম-নীতি সম্বন্ধে কোনো প্রতিবাদ করেন নি। এ কথা বলার সঙ্গে সঙ্গে গান্ধীজির 'তার' গিয়ে সভায় পৌঁছনোতে তাঁর একটু অপ্রস্তুত হবারই তো কথা।

মিঃ ক্যামবেলের এরূপ মিথ্যা কথার প্রতিবাদে দাদাভাই নওরোজী ও গোপালকৃষ্ণ গোখলের প্রকাশিত ভাষণ থেকে উদ্ধৃতি তুলে এণ্ড্রুজ পত্র-পত্রিকায় প্রবন্ধ লিখতে লাগলেন। বহু আয়াসে তিনি ভারতীয় প্রেসগুলিতে পৃথিবীর সব দেশ থেকে এমন সব তথ্য এনে সরবরাহ করতে লাগলেন যাতে জনমত গঠিত হয়। ১৮৮১ খ্রীস্টাব্দে আফিমের কারবার সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ কী বলেছেন তা খুঁজে বের করলেন। ১৭৪৩ খ্রীস্টাব্দে লর্ড চেস্টারফিল্ড ব্রিটিশ শুল্ক-প্রথার বিরুদ্ধে কী বলেছেন তাও উদ্ধৃত করে দিয়েছিলেন। তার পরে এই-সব তথ্য মিলিয়ে একটি সংক্ষিপ্তসার চুম্বক এণ্ড্রুজ নিজে তৈরি করলেন। জেনিভা সম্মেলনের কার্যবিবরণীও তার মধ্যে স্থান পেল।

তার ফলে বাংলাদেশ ও অন্যান্য প্রদেশে ক্রমশ আফিম-বিরোধী আইন শাসনযন্ত্রের স্বীকৃতি লাভ করে। এণ্ড্রুজ তখনো কিন্তু সতর্ক পর্যবেক্ষণরত রইলেন।

আফিম-সংগ্রামের মধ্য দিয়েই এণ্ড্রুজের সুপ্তশক্তি আর-একবার পূর্ণ প্রকাশ পেল। বাইরে থেকে দেখতে তিনি যতখানি নমনীয় ছিলেন, ভিতরে ছিলেন ততখানিই ইস্পাত-দৃঢ়। সে শক্তির সঙ্গে জড়িত হয়েছিল তাঁর বহুবন্ধুত্বের যোগ, স্বভাবের প্রগাঢ় আবেগ-প্রবণতা ও বিভিন্ন ব্যক্তিত্বের সংস্পর্শ।

---

১ ২৩ নবেম্বর ১৯২৪ সালে এণ্ড্রুজকে লেখা শ্রীমতী লা মটের পত্র। দ্র. Chaturvedi & Sykes, *Charles Freer Andrews*, পৃ. ২০৩।

এই বন্ধুবৎসল, স্বভাবপ্রেমী, আবেগময় সত্তাই বারবার ধরা পড়েছে কর্মী এণ্ডরুজের আরো অজস্র কর্মধারার মধ্যে। রবীন্দ্রনাথের প্রতি তাঁর অনুরাগ ছিল গভীর শ্রদ্ধায় জড়িত— অনেকটা শিষ্য যেমন ভালোবাসে তার গুরুকে, তেমনি। তাই পরমশ্রদ্ধেয় 'গুরুদেবে'র ভার লাঘবের জন্য তিনি একবার নয়, বহুবার বিশ্বভারতীর জন্য চাঁদাসংগ্রহের ন্যায় বিরক্তিকর কাজ সাগ্রহে মাথায় তুলে নিয়েছেন। ১৯২৩ সালের নবেম্বর মাসেও ইংলণ্ডে যাবার জন্য ভাঙা শরীরে যখন বোম্বাইতে প্রতীক্ষা করছেন, সে সময়েও ঘণ্টার পর ঘণ্টা শান্তিনিকেতনের সহকর্মী গৌরগোপাল ঘোষের আর্থিক সহায়তার জন্য সেখানকার বণিক বন্ধুদের কাছে ঘুরে ঘুরে বেড়িয়েছেন।

১৯২৪ সালে রবীন্দ্রনাথ চীন পরিভ্রমণ-শেষে হংকং এসে পৌঁছলেন। তাঁর পৌঁছনোর কিছু আগে এণ্ডরুজ হংকঙে এসে ভারতীয় বণিকদের কাছে বিশ্বভারতী প্রতিষ্ঠানের আদর্শের কথা বললেন। খবরের কাগজে সে বিষয়ে প্রবন্ধাদি লিখলেন, সভাসমিতিতে বিশ্বভারতীর বিষয় সেখানকার অধিবাসীদের জানালেন। কবির সংবর্ধনা-সভায় তাঁকে যাতে একটি টাকার থলি উপহার দেওয়া হয়, তার খুঁটিনাটি ব্যবস্থা করে ফেললেন। কয়েকদিন পরে কবি যখন সিঙাপুর থেকে দেশে ফিরে এলেন, এণ্ডরুজ তখনো বিশ্ব-ভারতীর কাজ করবেন বলেই রয়ে গেলেন সেখানে। মালয় স্টেটের প্রত্যেক শহরে তিনি বিশ্বভারতীর জন্য প্রচারকার্য চালিয়ে গেলেন। কবির কল্পনা ও কর্মের আন্তর্জাতিক রূপটি তিনি স্পষ্ট করে বিবৃত করতে লাগলেন। যেমন ভারতীয়দের সঙ্গে তেমনি মালয়ের চীনাদের সঙ্গে তিনি বন্ধুত্বসূত্রে আবদ্ধ হতে পেরেছিলেন। যাঁদের মধ্যে বিভিন্ন ধর্ম ও প্রাদেশিক সংস্কৃতির মিশ্রণ দেখতে পেয়েছেন তাঁদেরই তিনি সাদরে শান্তিনিকেতন আশ্রমে আহ্বান করেছেন।

দেশে-বিদেশে প্রেমের প্রবাহ

দেশে-বিদেশে সর্বত্রই এণ্ডরুজের ভূমিকা ছিল আর্তসেবায় উদ্‌বুদ্ধ প্রেমিকের আর অক্লান্ত সৈনিকের। আর ভারতে তাঁর মানবতাসেবী মনের তার বাঁধা হয়েছিল দুই কোটিতে— তার এক প্রান্তে গুরুদেব রবীন্দ্রনাথ— আর-এক-প্রান্তে পরমবন্ধু মোহন, মহাত্মা মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধী।

১৯২৪ সালের সেপ্টেম্বর মাসে দিল্লীতে গান্ধীজির পূর্বোক্ত প্রায়োপবেশন-কালে এণ্ডরুজ উপস্থিত ছিলেন। এই সময় বহু পরিশ্রম ও ক্লান্তি থেকে গান্ধীজিকে তিনি রক্ষা করেন। প্রতিদিন অজস্র আগন্তুক, ঐক্য সম্মেলনের সদস্যবৃন্দ— তা ছাড়া আরো অনেকে গান্ধীজির সঙ্গে দেখা করতে আসতেন। সে ক্ষেত্রে দ্বারের প্রহরীর কাজ অতি আয়াসসাধ্য ছিল এণ্ডরুজের পক্ষে।

এই সময় এণ্ডরুজ সম্বন্ধে আমরা যা কিছু জানতে পারি সবই তাঁর ব্যক্তিগত যোগের আকর্ষণে মধুর ও হৃদয়গ্রাহী। ১৯২৪ সালে বিশ্বভারতীর সেবায় কবির সাহায্যের জন্য যখন সিঙাপুরে গিয়েছিলেন— দিল্লীর এক প্রাক্তন সহকর্মী বিশপ ডেভি তাঁকে স্টেশন থেকে অভ্যর্থনা করে নিয়ে যেতে এসে দেখেন দীনদুঃখী ভারতীয়দের একটি জনতা তাঁকে স্বাগত জানাবার জন্য বহু পূর্ব থেকেই অপেক্ষা করে আছে। তাদের দৃষ্টিতে সেদিন দীনবন্ধুর প্রতি যে শ্রদ্ধা ফুটে উঠেছিল সে কথা তিনি কখনো ভোলেন নি। আসামে ডিব্রু-গড়ে কুলি ও ঝাড়ুদারদের সভাস্থলে আহ্বান করে তাদের শিশুদের জন্য নিজের গায়ের শালখানি পেতে দিয়েছিলেন।[১] ১৯২৫ সালে উড়িষ্যার বন্যাবিধ্বস্ত অঞ্চল পরিদর্শন করতে যাওয়ার মধ্যে যতখানি ছিল ব্যক্তিগত বন্ধুত্বের দাবি ততখানিই ছিল মানবের দুঃখে অপার সহানুভূতি। ১৯২০ সালে ডালটনগঞ্জের সম্মেলনে উড়িষ্যার পণ্ডিত গোপবন্ধু দাশের সঙ্গে এণ্ডরুজের পরিচয় হয়েছিল।[২] তিনিই ১৯২৫ সালে বন্যাবিধ্বস্ত উড়িষ্যায় দীনবন্ধুকে সঙ্গে নিয়ে যাবেন বলে শান্তিনিকেতন পর্যন্ত এসেছিলেন। পণ্ডিত গোপবন্ধু সম্পর্কে এণ্ডরুজ বলেন, 'প্রার্থনা-উপাসনায় দৃঢ়বিশ্বাসী, নিষ্ঠাবান হিন্দু অথচ অস্পৃশ্যদের বন্ধু— তাঁর সঙ্গ পেলে মনে হয় ভগবৎসঙ্গ লাভ করছি। বন্যাপ্লাবিত মহানদীতে এণ্ডরুজকে সঙ্গে নিয়ে তিনি চলেছেন বর্ষার ঝড়-জলে একটি নৌকায় খাদ্যসম্ভার নিয়ে;

---

১ *The Times of Assam*, 4th May 1925। পদ্মধর চালিহার লিখিত প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য। বন্ধুরা অনেকসময় এণ্ডরুজকে তিরস্কার করতেন অপরিচ্ছন্ন দীনতম লোককে বুকে জড়িয়ে ধরার জন্য। বিশেষ করে তিনি যখন তাঁর মনের ভাব ভাষায় প্রকাশ করতে পারতেন না, তখন তাঁর শুভেচ্ছা জানাবার এই ছিল উপায়ান্তর।

২ পণ্ডিত গোপবন্ধু দাশ— উড়িষ্যার ত্যাগব্রতী নেতা। পুরীর কাছে সাক্ষীগোপালে তিনি একটি আশ্রমবিদ্যালয় স্থাপন করেন। অসহযোগের সময়ে ওকালতি ত্যাগ করেন। উৎকল দেশকে ঐক্যসূত্রে বন্ধন তাঁর জীবনের একমাত্র আকাঙ্ক্ষা ছিল। ১৯২৮ সালে তাঁর মৃত্যু হয়। দ্র. গান্ধী-সাহিত্য ৩, मेरे समकालीन, পৃ. ২৫৫, ২৫৬।

নদীর বাঁধভাঙার ফলে আর্তব্যাকুল শরণার্থীদের মধ্যে সেগুলি বণ্টন করতে হবে।

পুরী জেলা চার মাস জলমগ্ন ছিল। চাষ করবার জমি নেই, সময়ের সদ্ব্যবহার করার মতো কোনো কাজ হাতে নেই। দিনের পর দিন দুর্ভিক্ষের আগমনপ্রতীক্ষা ছাড়া কৃষকের আর কোনো গত্যন্তর রইল না। জনসাধারণের দুর্গতি চোখে দেখার জন্য একটি রাজকর্মচারীও এগিয়ে এল না অথচ এণ্ডরুজ যেই কাজে নামলেন সি. আই. ডি. পুলিসযোগে ইংরেজ শাসকগোষ্ঠী সর্বত্র সন্দেহের দৃষ্টিতে তাঁকে অনুসরণ করতে লাগলেন।

এণ্ডরুজ ও বড়দাদা

শান্তিনিকেতনে বড়দাদা দ্বিজেন্দ্রনাথের সঙ্গে এণ্ডরুজের ছিল প্রীতিপূর্ণ সখ্য। এণ্ডরুজের অন্তর নারীসুলভ কোমলতায় পূর্ণ, জরাজীর্ণ এই বৃদ্ধ মানুষটির একাকিত্ব তিনি অনুভব করতেন। যখন এণ্ডরুজ শান্তিনিকেতনে অনুপস্থিত থাকতেন তখন প্রায় রোজই বড়দাদাকে একখানি করে চিঠি পাঠিয়ে তাঁর ভালোবাসা নিবেদন করতেন যাতে অন্তত কিছুক্ষণের জন্য তিনি আনন্দ পান। বড়দাদা কখনো কখনো বলতেন— 'এই হাইফেনকে নিয়ে তো মহা মুশকিল। শুধু গান্ধীজি আর গুরুদেবকে যুক্ত করেই তো সে ক্ষান্ত হয় না দেখছি। এখন তার চেষ্টা হয়েছে এই বৃদ্ধ নিঃসঙ্গ বড়দাদাকে কুমারিকা অন্তরীপ থেকে হিমালয় পর্যন্ত যত জ্ঞানীগুণী অধ্যাপক ও ছাত্র আছে সকলের সঙ্গে ভ্রাতৃভাবে সমন্বিত করা। গণিতবিজ্ঞানে এই আমার নতুন আবিষ্কার :

Hymen : Conjugal love : Hyphen : brotherly love

যখনই এণ্ডরুজ আশ্রমে ফিরতেন, বহুক্ষণ ধরে দুজনের ঘনিষ্ঠ সান্ধ্য-আলোচনা চলত। কখনো আবার দিনের বেলায়ও শিশুর অধৈর্য নিয়ে বৃদ্ধ তাঁকে ডেকে পাঠাতেন কোনো রসিকতা বা নতুন কোনো চিন্তায় ভাগ নেবার জন্য। যে ইংরেজি লিখছেন, তা শুদ্ধ এবং বাগ্‌বৈশিষ্ট্যসম্মত হয়েছে কি না জানবার জন্যও বড়দাদা মাঝে মাঝে চার্লিকে ডেকে পাঠাতেন। খবর পেলেই এণ্ডরুজ ছুটে চলে আসতেন। প্রিয় পুত্রের সঙ্গ পেলে স্নেহময় পিতার যেমন মনের ভাব হয় বড়দাদাও চার্লিকে পেলে ঠিক সেরকম খুশি হয়ে উঠতেন। এণ্ডরুজ যখন সামনে না থাকতেন ছোটো

ছোটো কাগজের টুকরোয় মাঝে মাঝে ছড়ার ছন্দেও তাঁর কাছে চিঠি যেত।[১]

গান্ধীজির অ্যাপেনডিক্স অপারেশনের পর এণ্ডরুজ যে সময়ে তাঁর সঙ্গে ছিলেন, সেই সময়েই ১৯২৪ সালের মার্চ মাসে বড়দাদা এণ্ডরুজকে লেখেন—

> মহাত্মাজিকে আমার অন্তরের কৃতজ্ঞতা, অনুরাগ ও শ্রদ্ধা জানাই, আর এ পৃথিবীতে আমার যত বন্ধু আছেন, যত বন্ধু ভবিষ্যতে হবেন, তাঁদের সবাইকার বন্ধুত্ব মিলিয়েও যাঁর বন্ধুত্বের সমান হয় না, যাঁকে আদরের চার্লি বলার দাবি আমার আছে— তাঁকেও সমান স্নেহ ও শ্রদ্ধা জানাই।

১৯২৫ সালের নবেম্বর মাসে দক্ষিণ-আফ্রিকা যাবার প্রাক্‌কালে এণ্ডরুজ ও বড়দাদা দ্বিজেন্দ্রনাথ বসে একসঙ্গে গল্প করলেন। তাঁরা দুজনেই জানতেন এই হয়তো তাঁদের শেষ কথাবার্তা। পরদিন সকালে স্টেশনে যাবার পথে এণ্ডরুজ নিচু বাংলার বারান্দায় নেমে নিঃশব্দে বড়দাদার নীরব আশীর্বাদ গ্রহণ করলেন। এই তাঁদের শেষ দেখা[২]—

সুশীল রুদ্রের জীবনাবসান

১৯২৫ সালের ২৯ জুন সিমলা পাহাড়ে সোলোনে সুশীল রুদ্রের মৃত্যু হয়। তিনি ক্রমশ যখন অচেতন হয়ে পড়ছেন, এণ্ডরুজ ছিলেন তাঁর সঙ্গে— অস্ফুট স্বরে বলতে শুনলেন, 'আমার দেশ, আহা আমার প্রাণের স্বদেশ।' পরের মুহূর্তেই ঈশ্বরোপলব্ধির আনন্দে স্পষ্টস্বরে বলে উঠলেন, 'কী আশ্চর্য, কী অপূর্ব তাঁর প্রকাশ।' পরের দিন এণ্ডরুজ বনারসীদাস চতুর্বেদীকে লেখেন, 'সুশীলের মৃত্যু যে আমার পক্ষে কতখানি মর্মান্তিক তা এখনো আমি অনুভব

---

১ Dearest Charlie—

As I have no other,
O Charlie brother—
Friend in need
In will and deed—
Send I to thee
Sweet Amritee,
A Timely token
Of friendship unbroken,
Do not refuse
To make good use
Of this eleventh Magh-cake
For Borodada's sake.

Your own
Borodada.

২ ১৯২৭ সালের জানুয়ারি-মার্চ সংখ্যায় 'ইয়ং ইণ্ডিয়া' এবং ১৯২৮ সালের 'বিশ্বভারতী কোয়ার্টারলি' পত্রিকাতে এণ্ডরুজের লেখা বড়দাদার স্মৃতিকথাগুলি দ্রষ্টব্য।

করতে পারছি না। দেহে-মনে আমি ক্লান্ত পীড়িত।' এণ্ডরুজের ভারতীয় বন্ধুদের মধ্যে এই ধীর, বিজ্ঞ, নম্র লোকটির দান তাঁর জীবনধারা গঠনে কত যে সহায়তা করেছে, তার কোনো পরিমাপ নেই।

মানবতার বিজয়সংগ্রামে দক্ষিণ-আফ্রিকায়

১৯২৫-১৯২৭ সাল। এণ্ডরুজের কর্মজীবনের বহুবিচিত্র ধারা তাঁকে আবার টেনে নিয়ে যায় দক্ষিণ-আফ্রিকায়।

দক্ষিণ-আফ্রিকার ইউনিয়ন সরকার ১৯২০-২১ সালে এশীয় তদন্ত কমিশন বসিয়েছিলেন। কমিশন জানাল যে এশিয়াবাসীদিগকে একই জায়গায় ইউরোপীয়দের থেকে পৃথক পৃথক এলাকায় পৃথকভাবে রাখা অন্যায় তো বটেই তা ছাড়া ইউরোপীয় এবং এশীয় উভয়ের পক্ষেই তা অসম্মানজনক। তার চেয়ে এশীয়রা যদি ইচ্ছাপূর্বক কোনো পৃথক স্থান পছন্দ করে নেয় তবে তার ব্যবস্থা করা সম্ভব। এশিয়া-বিরোধী-সংগ্রাম এভাবে আবার নতুন করে শুরু হল। প্রায় একই সময়ে কেনিয়ায়ও আবার বিক্ষোভ দেখা দেয়। ১৯২৩ সালের জুলাই মাসে জেনারেল স্মাট্স্ দক্ষিণ-আফ্রিকায় 'শ্রেণীগত ভূমিরক্ষণ বিল' (Class Areas Bill) প্রবর্তন করতে চান। এই বিলটি শেষ পর্যন্ত ইউনিয়ন পার্লামেণ্টে পাস করা সম্ভব হয় নি। স্মাট্সের পরে হার্টজগ্-এর জাতীয়তাবাদী দল ক্ষমতায় এল। এরা একটা বিল আনল যার নাম 'বর্ণ-বিভেদক বিল' (Colour Bar Bill)। কিন্তু এটাও পাস করা যায় নি। ১৯২৫ সালের জুলাই মাসে স্মাট্সের 'শ্রেণীগত ভূমিরক্ষণ বিল'টি 'ভূমিসংরক্ষণ বিল' (Areas Reservation Bill) নামে পুনরায় প্রবর্তিত করা হয়। এই বিল অনুসারে এশীয়রা নাটালে কেবল একটি নির্দিষ্ট জায়গায় ভূ-সম্পত্তি ক্রয় করতে পারবেন। তা ছাড়া দক্ষিণ-আফ্রিকা ইউনিয়নের অন্য সমস্ত প্রদেশে এশীয়দের অবাধ গতায়াত নিষিদ্ধ হয়ে গেল। তৃতীয়ত এঁদের স্ত্রীপুত্রকন্যাগণকে দেশ থেকে আনার ব্যাপারেও কিছু বিধিনিষেধ আরোপ করা হল।

এ ছাড়াও নাটাল ও ট্রান্সভালে ভারতীয়দের স্বার্থবিরোধী দুটি অর্ডিন্যান্স চালু করা হয় যার ফলে জমির অধিকার ও বাণিজ্য-সংক্রান্ত লাইসেন্সও নিয়ন্ত্রিত হয়ে যায়।

ভূমিসংরক্ষণ বিলটি একটি বিশেষ নির্বাচিত কমিটির হাতে দেওয়া হয় সম্যক বিবেচনার জন্য। এর মধ্যে ১৯২৫ সালের ২৫ নবেম্বর তারিখে জি.

এফ. প্যাডিসনের নেতৃত্বে একটি তদন্ত কমিশন ভারতের ব্রিটিশ-সরকারের তরফ থেকে দক্ষিণ-আফ্রিকায় যায়। গান্ধীজির অনুরোধে এণ্ড্রুজ কমিশনের কয়েকদিন পূর্বেই আফ্রিকা পৌঁছলেন। সেখানে তিনি ভারতের সরকারি প্রতিনিধিদের সর্বতোভাবে সাহায্য করেন।

দক্ষিণ-আফ্রিকায় ব্রিটিশদের ন্যায়বোধের কাছে তিনি সর্বক্ষণ আবেদন করে চললেন। বললেন, ১৯১৪ সালের গান্ধী-স্মাট্‌স্‌ চুক্তির সম্পূর্ণ বিরোধী এই ভূমিসংরক্ষণ বিলটি। অতএব এ ক্ষেত্রে শাসকগোষ্ঠী চুক্তিভঙ্গ ও বিশ্বাস-ভঙ্গের দোষে অপরাধী হতে চলেছেন।

১৯২৬ সালের ফেব্রুয়ারি মাসেও রাজনৈতিক অবস্থা নৈরাশ্যব্যঞ্জক। এণ্ড্রুজ নিজেকে বোঝালেন যে বিরোধিতার মধ্যেও প্রচারকার্য চলে। বহু সংবাদ-পত্রে তাঁর লেখা ছাপা হতে লাগল। রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে তাঁর ভাষণ শুনবার জন্য বহুলোক সমবেত হত, তার মধ্যে ইংরেজ থাকত, 'আফ্রিকানদের'ও[১] (Afrikander) থাকত। সরকারি কর্মচারী, সমাজসেবক, লোকহিতৈষী ও রক্ষণশীল— সর্বশ্রেণীর লোকের সঙ্গেই তাঁর বন্ধুত্ব। এরই মধ্যে সময় করে কয়েকদিনই গেছেন একটি অন্ধ বাতগ্রস্ত অশীতিপর বৃদ্ধাকে কবির লেখা থেকে তাঁর প্রিয় অংশগুলি পড়ে শোনাবার জন্য।

ভূমিসংরক্ষণ বিলটি যে বিশেষ কমিটিতে গেল এণ্ড্রুজ তাঁদের কাছে স্মারকলিপির আকারে তাঁর বক্তব্য সাক্ষ্যপ্রমাণসহ পেশ করেন। এণ্ড্রুজের কয়েকটি পরামর্শ ছিল এরূপ— প্রথমত বিলটির বিচারবিবেচনা আপাতত স্থগিত রাখার জন্য কমিটি যেন ইউনিয়ন-সরকারকে অনুরোধ করেন। দ্বিতীয়ত উভয়পক্ষের মনোভাব শান্ত হলে দক্ষিণ-আফ্রিকার একটি প্রতিনিধিদল যেন ভারতে যায়। তৃতীয়ত, অবস্থা আরো ভালো হলে একটি গোলটেবিল বৈঠক আহ্বান করা উচিত হবে। এতে ভারত ও দক্ষিণ-আফ্রিকার মধ্যে সর্বতো-ভাবে হৃদ্যতার ভাব গড়ে উঠবে।

দক্ষিণ-আফ্রিকায় এ সময়ে এণ্ড্রুজের মর্যাদা কত ব্যাপক ছিল সে কথা বুঝি তখনই যখন দেখি যে এই-সব প্রস্তাবই সেবারে সম্পূর্ণভাবে গৃহীত হয়েছিল এবং গোলটেবিল বৈঠকের সময়ও ঠিক হয় ১৯২৬ সালের ডিসেম্বর মাসে।

১৯২৬ সালের এপ্রিল মাসে এণ্ড্রুজ ভারতবর্ষে ফিরে এলেন। তাঁর

---

১ আফ্রিকাবাসী, যাদের পূর্বপুরুষ ইউরোপীয়।

অনুপস্থিতিকালে লর্ড আরউইন ভাইসরয় হয়েছেন। দক্ষিণ-আফ্রিকা সম্বন্ধে এণ্ডরুজ তাঁর সঙ্গে দীর্ঘ আলোচনা করেন। আরউইনও গভীর খ্রীস্টবিশ্বাসী ছিলেন। এণ্ডরুজের নিঃস্বার্থ সেবাপ্রবণতা ও ন্যায়পরতা তিনি সহজেই উপলব্ধি করেছিলেন।

অন্যপক্ষে ১৯২৬ সালের গ্রীষ্মকালেই রবীন্দ্রনাথ আবার ইউরোপ চলে যান। ফলে এণ্ডরুজ যতদিন সম্ভব শান্তিনিকেতনেই আবার বসবাস করতে লাগলেন। কিন্তু অবসন্ন শরীরে যখন তাঁর বিশ্রামের প্রয়োজন ছিল তখনো তিনি ক্লান্তমস্তিষ্কে ভারতীয় পত্রিকাদির জন্য প্রবন্ধের পর প্রবন্ধ লিখতে লাগলেন দক্ষিণ-আফ্রিকার অবস্থা বিবৃত করে। একদিন একটি ছোটো পোকার কামড়ে জ্বর এল আর রক্তও দূষিত হল। এবারেও আর-একবার গান্ধীজির তিরস্কার-মিশ্রিত পত্র পেয়ে তবেই তিনি কিছুকালের জন্য কাজে নিরস্ত হলেন।

শান্তিনিকেতনে রবীন্দ্র-সুহৃদ

রবীন্দ্রনাথের ইতালি ভ্রমণের পরবর্তী বিতর্ক-উত্তাল দিনগুলিতে 'গুরুদেব' সম্পর্কে এণ্ডরুজ নানাভাবে সন্তর্পিত সাবধানী মনের পরিচয় দিয়েছেন বারবার। ইতালি থেকে সুইজারল্যাণ্ড পৌঁছেই রবীন্দ্রনাথ লক্ষ্য করলেন বিশেষ সাবধানে উচ্চারিত তাঁর বক্তৃতাগুলিকে কয়েকটি ফ্যাসিস্ত পত্রিকা এমন বিকৃত করেছে যাতে মনে হয় তিনি ফ্যাসিস্ত সরকারের একজন বিশেষ সমর্থক। কবি এতে ক্ষুব্ধ হয়ে 'ম্যাঞ্চেস্টার গার্ডিয়ান' পত্রিকায় এর প্রতিবাদ জানালেন। এই ঘটনায় ইতালিতে বিক্ষোভের ঝড় ওঠে, ইতালির পণ্ডিত বিশ্বভারতীর অধ্যাপক তুচ্চি (Tucci) বিষম সংকটে পড়েন।

১৯২৬ সালের ১৭ অগস্ট তারিখে এণ্ডরুজ গুরুদেবকে লেখেন—

ইতালি ভ্রমণ সম্বন্ধে আপনার চিঠিপত্র যখন আসছিল ভাগ্যে সে সময় আমি তুচ্চির কাছে ছিলাম। সে আমাকে বিশ্বাস করে, আমার বন্ধুত্বে তার আস্থা আছে। হয়তো সে বিশ্বভারতী ছেড়ে যাবে, কিন্তু তিক্ত অপ্রসন্ন মন নিয়ে নয়।

এ পত্রের তিন সপ্তাহ পরে রবীন্দ্রনাথকে আবার জানালেন—

ইতালি সম্বন্ধে আপনার চিঠিখানি 'মডার্ন রিভিয়ু'তে ছাপতে না দিয়ে

বিচ্ছেদ সৃষ্টির হাত থেকে আমি আপনাকে রক্ষা করতে পেরেছি।[১] তুচ্চি প্রথম আঘাত সামলে উঠেছে। ইতালীয় সরকারের সমর্থন পেলে সে হয়তো শান্তিনিকেতনে থেকে যাবে। এর মধ্যে সে মূল্যবান গবেষণার কাজ করছে।

এণ্ড্রুজের আরো একটি অনবদ্য কাজ, বন্ধুত্বের আর-এক প্রকৃষ্ট অবদান রয়েছে তাঁর বিশ্বভারতীর সেবার ক্ষেত্রে। বিশ্বভারতীর সাহায্যে ভিক্ষুরূপে চাঁদা সংগ্রহ তাঁর কর্তব্যের অঙ্গ ছিল। তা ছাড়া এই সময়ে তিনি আরো একটি কাজ করেন। সুশীল রুদ্র মৃত্যুকালে তাঁর কাছে বেশ কিছু টাকা রেখে গিয়েছিলেন, সেইসঙ্গে নিজের যথাসর্বস্ব যোগ করে এণ্ড্রুজ বিশ্বভারতীর খরচের ওভারড্রাফটের জন্য জামিন হিসাবে ব্যাঙ্কে গচ্ছিত রেখে দিয়েছিলেন। অথচ এ দান তাঁর নিজের চোখে ছিল নিতান্তই অকিঞ্চিৎকর। তাঁর জীবদ্দশায় এ ঘটনার উল্লেখ পর্যন্ত তিনি কাউকে করতে দিতেন না।

আবার আফ্রিকায়

১৯২৬ সালের ২৯ সেপ্টেম্বর তারিখে অসংখ্য লোকের শুভেচ্ছা ও আশীর্বাদ সঙ্গে নিয়ে এণ্ড্রুজ দক্ষিণ-আফ্রিকায় গোলটেবিল বৈঠকে উপস্থিত হবার জন্য যাত্রা করেন। ১৯২৬ সালের ১ অক্টোবর তারিখে এণ্ড্রুজ-ভগ্নীদ্বয়কে গান্ধীজি লিখলেন[২]—

চার্লির যাত্রার পূর্বের কটি দিন আমি ওর সঙ্গে আনন্দে কাটিয়েছি। দক্ষিণ-আফ্রিকার জনমত যদি ভারতীয়দের বিরোধী হয় তবে এই বৈঠক কিছু করতে পারবে না। সেই জনমত গঠনের কাজ চার্লিই ভালো পারবে। কারণ তার উপস্থিতিতেই সমালোচনা বন্ধ হয়ে যায়, বিরোধভাব শান্ত হয়। শ্বেতকায় ও ভারতীয় সমাজে সংযোগের একমাত্র সূত্রই হল চার্লি।

'ম্যাঞ্চেস্টার গার্ডিয়ান' পত্রিকার সম্পাদক স্কট ইংলণ্ডের হয়ে এণ্ড্রুজকে লিখলেন[৩]—

আপনার বন্ধুত্বের মূল্য যে আমার কাছে কতখানি, সে কথা কী করে

---

১ ১৯২৬ সালে 'বিশ্বভারতী কোয়ার্টারলি'তে পত্রখানি ছাপা হয়।

২ Chaturvedi & Sykes, *Charles Freer Andrews*, পৃ. ২১৯।

৩ তদেব, পৃ. ২১৯, ২২০।

বুঝিয়ে বলি? আপনার মতো লোকের সাহায্যেই কেবল আমরা ভারতের প্রতি আমাদের কর্তব্য সাধন করতে পারব।

২০ অক্টোবর তারিখে এণ্ডরুজ ডারবানে পৌঁছলেন। সেখানে গিয়ে এক অচিন্ত্যপূর্ব সংকটে পড়লেন। দেখলেন ভারতীয় পাড়ায় বসন্ত মহামারী শুরু হয়ে গেছে। মৃত্যুর হার সেখানে শতকরা পঁচিশজন। শহরে ব্যাপক ত্রাসের সঞ্চার হয়েছে। এণ্ডরুজ তৎক্ষণাৎ বস্তিবাসীদের সেবায় লেগে গেলেন। একমাস এভাবে কাটল। প্রতিদিন কখনো দিনে তিন-চারবার করেও, তিনি রোগসংক্রমণ প্রতিরোধের জন্য পৃথক এলাকাগুলিতে গিয়ে সকলের দেখাশোনা করে আসতেন। সেখানকার পাওয়ার হাউস-স্টেশনের ব্যারাকে দরিদ্র ভারতীয় কর্মচারীই বেশির ভাগ বাস করত। সেখানকার ফুটো ছাদ দিয়ে জল পড়ত, পোকায়-খাওয়া দরজা-জানলা, স্যাঁৎসেতে মেজে। সেখানে একা-হাতে এণ্ডরুজ সেবাকার্য চালিয়ে গেলেন। কারোর ভাষা তিনি বুঝতে পারেন না, রোগাক্রান্ত অঞ্চলে একটি তামিল দোভাষী সংগ্রহ করে আনার অনুমতিও সরকারের কাছে পেলেন না। রোগগ্রস্ত ব্যক্তিরা রোগ গোপন করছে— এ বিষয়ে পত্রিকায় লেখালেখি চলল। ভীত সন্ত্রস্ত ভারতীয় জনসাধারণ সতর্কতামূলক উপদেশের ভাষা বুঝতে পারত না, এখানেই ছিল প্রধান সমস্যা।

সেই একটি মাস এণ্ডরুজের মনে হয়েছিল তিনি যেন একটি বারুদের স্তূপে বসে আছেন। তাঁর নম্র সহানুভূতিপূর্ণ সেবায় যেরূপ বিশ্বাসের সঞ্চার হল আর কোনো উপায়ে তা আনা সম্ভব ছিল না। শান্তিনিকেতনে ফরাসী ভাষার অধ্যাপক বেনোয়াকে এণ্ডরুজ ৪ নবেম্বর ১৯২৬ তারিখে লিখলেন, 'আমি এখানে না থাকলে ব্যারাকে দাঙ্গা লেগে যেত।'

এই সংকটকালে এণ্ডরুজ ডারবানের মেয়র ও সিটি কাউন্সিলারদের, এবং স্বাস্থ্য ও গৃহনির্মাণ কমিটির সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা করে চলেছিলেন। খবরের কাগজে স্থান করে নিয়ে বিশেষভাবে জনসাধারণের স্বাস্থ্য সম্বন্ধেই তিনি আলোচনা করতে লাগলেন। কর্মীদের জন্য নতুন পরিকল্পনায় গৃহ-নির্মাণের প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে সিটি কাউন্সিলারদের অবহিত করলেন। ধনী ভারতীয়দের মধ্যে ত্রাণসমিতি স্থাপন করে অন্যত্র থেকে আর্তপীড়িতদের জন্য যথাসম্ভব সাহায্য সংগ্রহ করতে লাগলেন।

দক্ষিণ-আফ্রিকার লোকেরা সেখানকার ধনী ভারতীয়দের 'আরব' আখ্যা

দিয়েছিলেন। সেই 'আরব'দের মধ্যে স্বদেশপ্রীতির চিহ্নমাত্রও ছিল না। সরকারি কর্মচারীরা ভারতীয়দের মধ্যে এই বিচ্ছিন্নতাকে ঘৃণাও করে, আবার তার সুযোগও নেয়।

১৯২৭ সালের জানুয়ারি মাস। হঠাৎ সমস্ত অবস্থার পরিবর্তন হয়ে গেল। ভূমি-সংরক্ষণ বিলটি প্রত্যাহৃত হয়। দক্ষিণ-আফ্রিকার স্থায়ী অধিবাসী ভারতীয়দের স্ত্রী ও অপ্রাপ্তবয়স্ক সন্তানদের ভারত থেকে আনবার অনুমতি পাওয়া গেল। দক্ষিণ-আফ্রিকার ভারতীয়রাও পাশ্চাত্য মান-অনুযায়ী জীবন-ধারণ করবে— এরূপ প্রত্যাশাও মিলল। তা ছাড়া দক্ষিণ-আফ্রিকায় একজন ভারতীয় এজেন্ট নিয়োগ করাও স্থির হল। উভয় সরকারের মতানুসারে যে সাময়িক চুক্তি প্রস্তুত হয় ডক্টর মালান ১৯২৭ সালের ২১ ফেব্রুয়ারি তারিখে আইন-পরিষদে সেটি পাঠ করেন।

আফ্রিকার ভারতীয়দের এণ্ডরুজ বলেন—

প্রথমত আমি মনে করি আফ্রিকায় আপনাদের গৃহস্থ জীবন যাপন করা কর্তব্য। ব্যাবসার জন্য আফ্রিকায় বাস করবেন আর বোম্বাইতে ঘরবাড়ি থাকবে— এটা ঠিক নয়। দ্বিতীয়ত ভারতীয়রা যে অর্থ আফ্রিকায় উপার্জন করবেন, সেখানেই সে অর্থ তাঁদের ব্যয় করা চাই। তৃতীয়ত আফ্রিকার ভারতীয় সমাজ তাঁদের এবং তাঁদের সন্তানদের মধ্যে আফ্রিকার প্রতি দেশ-প্রেমের সঞ্চার করবেন। যথার্থ পূর্ব ও দক্ষিণ -আফ্রিকাবাসী হয়ে উঠতে পারলে তবেই তাঁরা সেখানকার ইউরোপীয় বাসিন্দা ও আফ্রিকাবাসীদের অনুরাগ ও সৌহার্দ লাভ করবেন।

১৯২৭ সালের ২৩ অগস্ট তারিখে এণ্ডরুজ আফ্রিকা থেকে বোম্বাই এসে পৌঁছলেন। এর মধ্যে শ্রীনিবাস শাস্ত্রী দক্ষিণ-আফ্রিকার ভারতীয় এজেন্টের কর্মভার গ্রহণ করেছেন। এণ্ডরুজ ভারতে প্রত্যাবর্তন করলে গান্ধীজি তাঁর অপূর্ব কীর্তির জন্য তাঁকে অভিনন্দন জানান। লর্ড আরউইনও তাঁকে শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতা জানিয়েছিলেন।

এণ্ডরুজের অবিচলিত কর্মনিষ্ঠা ও অনাবিল প্রেমের নিঝর দেশে দেশে মানুষের হৃদয়ে পথ করে নিয়েছে— বিপদ বাধা মানে নি।

৭

প্রাচ্য-প্রতীচ্যের সেতুবন্ধন

১৯২৭ সালের ২৩ অগস্ট তারিখে এণ্ডরুজ আফ্রিকা থেকে ভারতে ফিরে এলেন। তেইশ বছর আগে ভারতের মাটিতে যেদিন প্রথম পদার্পণ করলেন (২০ মার্চ ১৯০৪), তার পর থেকে একসঙ্গে কয়েকমাসের বেশি কখনো ভারতের বাইরে বাস করেন নি। তার মধ্যেও ১৯১৭-১৮ সালে ফিজিতে আর ১৯২৬-২৭ সালে দক্ষিণ-আফ্রিকাতেই অপেক্ষাকৃত অধিককাল বাস করেন। সে-সব জায়গাতেও ভারতীয় অধিবাসীদের সঙ্গেই বেশির ভাগ সময় কেটেছে তাঁর। কিন্তু এবারে আবার প্রায় একটানা নয় বছর (১৯২৮-১৯৩৭) তিনি পাশ্চাত্য দেশেই বাস করেন। তার মাঝে মধ্যে খুবই সংক্ষিপ্ত-কাল কেটেছে এই সময়ে ভারতে।

উড়িষ্যায় ত্রাণকার্যে

দরিদ্রদেশ উড়িষ্যা তখন প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের বিরুদ্ধে সংগ্রামে বিধ্বস্ত। ১৯২৭ সালে ভারতবর্ষে ফিরে তাঁর দৃষ্টি সে দিকেই আকৃষ্ট হল। সে বছর সেপ্টেম্বর মাসে মহানদীর বন্যায় প্রায় আশিহাজার বাড়ি ভেসে গিয়েছিল। এণ্ডরুজ তৎক্ষণাৎ সেখানে উপস্থিত হলেন শুধু ত্রাণকার্যের জন্য নয়, এই প্রায়-নিয়মিত বার্ষিক বিপর্যয়ের হাত থেকে বন্যাপীড়িতদের রক্ষার কোনো স্থায়ী ব্যবস্থা করা যায় কি না, বিশেষ করে তারই উপায় নির্ধারণের জন্য।

যুক্তরাষ্ট্রে মিসিসিপি নদী সম্বন্ধে যে-ব্যবস্থা অবলম্বন করা হয়েছে, তারই অভিজ্ঞতা থেকে মহানদীর গতি নিয়ন্ত্রণের কোনো গ্রহণযোগ্য উপায় আছে কি না বিচার করে দেখার দাবিতে জনমত গঠনে এণ্ডরুজ প্রবৃত্ত হলেন। উড়িষ্যার তরুণ কংগ্রেস নেতাদের সঙ্গে এই উপলক্ষে তাঁর স্নেহের সম্পর্ক স্থাপিত হয়ে গেল। তাঁরা তাঁকে জ্যেষ্ঠভ্রাতার ন্যায় মান্য করতেন।

ট্রেড-ইউনিয়ন

১৯২৭ সালের শেষ দিকে দ্রব্যমূল্য কমে যাওয়াতে নিয়োগ-কর্তারা কর্মী ছাঁটাই করতে শুরু করলেন। এর ফলে চারি দিকে নূতন বিক্ষোভের সৃষ্টি হল। নবেম্বর মাসে কানপুরে সর্বভারতীয় ট্রেড-ইউনিয়ন কংগ্রেসে এণ্ডরুজ যোগ

দিলেন। সেখানে তাঁকে সভাপতি নির্বাচিত করা হয়। এবার লিলুয়ার পূর্ব-ভারতীয় রেলকর্মচারী আর জামসেদপুরের টাটা আয়রন অ্যাণ্ড স্টীল কোম্পানির কর্মচারীদের ছাঁটাই প্রস্তাবের বিরুদ্ধে তিনি সংগ্রামে প্রবৃত্ত হলেন। ভারতীয় ট্রেড-ইউনিয়ন কংগ্রেস কোনো বিদেশী ট্রেড-ইউনিয়নের সঙ্গে যুক্ত না থেকে যেন নিজের কাজ নিজেই করে যায়— এই ছিল তাঁর নির্দেশ।

ইউরোপে: ভারতভাবনা ও খ্রীস্টসেবা

১৯২৮ সালের ৫ জুন তারিখে এণ্ডরুজ ইউরোপ যাত্রা করেন। প্রথম তাঁর ইচ্ছা ছিল রবীন্দ্রনাথ হিবার্ট লেকচার দিতে অক্সফোর্ড যাবার সময় উভয়ে একসঙ্গে যাত্রা করবেন। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ অসুস্থ হয়ে পড়ায় এণ্ডরুজ একাই যান।

পশ্চিমের সামনে ভারতকে যথার্থভাবে উপস্থাপিত করার উপযুক্ত ব্যক্তির প্রয়োজন ছিল। ১৯২৭ সালে ক্যাথেরিন মেয়োর কুখ্যাত পুস্তক 'মাদার ইণ্ডিয়া' প্রকাশিত হয়। কেবলমাত্র আমেরিকায় নয়, ভারত সম্পর্কে সমগ্র পৃথিবীর লোকের মতামত গঠনে এই পুস্তকের প্রভাব ক্ষতিকর হবার আশঙ্কা দেখা দিয়েছিল। সেই একই সময়ে ভারতীয় শাসনতন্ত্র সংস্কারের জন্য যে 'সাইমন কমিশন' নিযুক্ত হয়, তাতে একটিও ভারতীয় সদস্য না থাকায় ভারতবাসীদের নৈরাশ্য ও ক্ষোভ চূড়ান্ত আকার ধারণ করে।[১] মহাত্মা গান্ধী ও এণ্ডরুজ— দুই বন্ধুতে আলোচনা করে স্থির করেন অদূর ভবিষ্যতে গান্ধীজিকে ইংলণ্ডে যেতে হবে। এণ্ডরুজ বুঝতে পারলেন গান্ধীজির পথ প্রস্তুত করার জন্য এখনই ইংলণ্ডে তাঁর অনেক কাজ করার আছে।

এণ্ডরুজ ইংলণ্ডে পৌছলে সেখানকার এক প্রকাশন সংস্থা তাঁর একটি আত্মজীবনী প্রকাশ করতে চান।[২] তাঁর ধর্মজীবনের ক্রমোন্নতির বিবরণ লিপিবদ্ধ করতে তাঁকে অনুরোধ জানালেন, এণ্ডরুজ এতই অভিভূত হয়ে পড়েন

১ সাইমন কমিশন— মণ্টেগু-চেম্‌সফোর্ড সংবিধান প্রবর্তিত হবার পর থেকে ভারতীয় কংগ্রেস দ্বৈরাজিক (Dyarchy) শাসনব্যবস্থার অবসান ঘটানোর প্রস্তাব করেছিল। সেই সূত্রে ব্রিটিশ পার্লামেন্টে স্যার জন সাইমনের নেতৃত্বে এক কমিশন বসাবার কথা ঘোষণা করা হয় (নবেম্বর ১৯২৭)। দ্র. প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়, ভারতে জাতীয় আন্দোলন, পৃ. ১৮৮।

২ Hodder & Stoughton.

যে প্রথমটা এই গুরু দায়িত্ব নিতে তিনি অস্বীকৃত হন। পরে অনেকের কাছে অনুরুদ্ধ হয়ে এ কাজে তিনি হাত দেন। সে গ্রন্থই হল *What I Owe to Christ*। এটি শেষ করতে তাঁর তিন বছর লেগেছিল।

এণ্ডরুজ এবার একই সময়ে তিনটি কাজে হাত দিলেন। প্রথম চেষ্টা হল মিস্ মেয়োর রিপোর্টের বিরুদ্ধে যথার্থ ভারতের চিত্র বিশ্বের সমক্ষে তুলে ধরা। তাঁর *True India* পুস্তকে লেখকের প্রধান স্বপ্ন ছিল ভারতের আধ্যাত্মিক ও সংস্কৃতিগত ঐতিহ্য এবং পূর্ণ সৌন্দর্যের প্রতিভূ মূর্তিতে রবীন্দ্র-চরিত্রকে ভাস্বর করে তোলা। দ্বিতীয়ত এণ্ডরুজ এ কথাও বুঝেছিলেন যে, পশ্চিমের কাছে ভারতের রাজনৈতিক আশা-আকাঙ্ক্ষার ব্যাখ্যাও তাঁকেই করতে হবে। গান্ধীজির জীবনী ও চিন্তাধারার সঙ্গে পরিচিত করতে হবে তাঁদের। তাঁর তৃতীয় আকাঙ্ক্ষা ছিল প্রাচ্যভূমির বিচিত্র অভিজ্ঞতার মাধ্যমে খ্রীস্টদর্শন এবং খ্রীস্টসেবার যে আদর্শ তাঁর চেতনায় বিকশিত হয়েছে, পাশ্চাত্য অধ্যাত্ম-বাদীদের কাছে তা প্রকাশ করা।

এণ্ডরুজ ইংলণ্ডে যাবার ছয় মাসের মধ্যেই পূর্ব-পশ্চিমে মিলনসেতু নির্মাণের জন্য তাঁর যে অদম্য প্রয়াস তার ফল ফলতে শুরু করে। ব্রিটিশ প্রেসগুলির সঙ্গে সংযোগ তিনি ক্রমশ বিস্তৃত করলেন। ইংলণ্ড ও জেনিভায় যত শান্তিসংস্থাপক সংগঠন আছে সবগুলির ঘনিষ্ঠ সংস্পর্শে এলেন। তাঁর আমেরিকা যাবারও একটি পরিকল্পনা তৈরি হল। এই সময়ে রোম্যাঁ রোলাঁর সান্নিধ্যে যাপিত একটি দিনের স্মৃতি তাঁর চেতনায় অবিস্মরণীয় হয়ে ছিল। তা ছাড়া এণ্ডরুজ ব্রিটিশ বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রত্যেকটিতে এবং বহু খ্রীস্টজনসংঘে ভাষণ দেন। লণ্ডনের রাজনৈতিক নেতা ও ভারতীয় ছাত্রদের সঙ্গেও ঘনিষ্ঠ বন্ধুত্ব গড়ে তোলেন।

এণ্ডরুজ এই একই সময়ে রবীন্দ্রনাথের চারটি পুস্তকের সম্পাদনা করেন। পুস্তকগুলি হল *Letters to a Friend, Fireflies, The Tagore Birthday Book* আর *Thoughts from Tagore*। কেবলমাত্র অন্তরের অনুরাগেই তিনি এ কাজে হাত দেন।

রাজনৈতিক সাক্ষাৎকার, লেখা বা বক্তৃতা দেওয়া— এ-সবের ফাঁকে ফাঁকে রবীন্দ্রসাহিত্যের রসধারায় অবগাহন করে তিনি তার নতুন স্বাদ, নতুন প্রেরণা পেতেন। রবীন্দ্রনাথের বাণী প্রচারে সহায়তা করছেন ভেবে তিনি উদ্‌বুদ্ধ হতেন।

প্রায় একই সময়ে ইউরোপ ও আমেরিকার সাধারণ লোকের বোধগম্য করে *Mahatma Gandhi's Ideas* বইটি লেখেন। *A Quest for Truth* নামে সংকলিত কয়েকটি প্রবন্ধ এণ্ডরুজ লেখেন ১৯২৮ সালে *Youngmen of India* পত্রিকার জন্য। তাঁর আধ্যাত্মিক চিন্তাধারার স্তর-নির্ণয়ে সেই প্রবন্ধগুলি খুবই মূল্যবান।

এণ্ডরুজের ভাষণে তাঁর নিজ জীবনের সত্য কিভাবে উদ্ভাসিত হয়ে উঠত রেজিনাল্ড রেনল্ডস্-এর অভিজ্ঞতায় তার প্রকাশ সুস্পষ্ট। বার্মিংহামের একটি সম্মেলনে এই সময়ে এণ্ডরুজের বক্তৃতা শুনেছিলেন তিনি। সে বিষয়ে পরে লেখেন[১]—

'আমার প্রভু যেখানে ক্রুশবিদ্ধ হন তুমিও কি সেদিন সেখানে ছিলে না?'[২] এণ্ডরুজের মুখে এই সংগীতের তীব্র তীক্ষ্ণ আবেদনে যেন সমগ্র মানবের দুঃখবেদনা আমার হৃদয়দ্বারে সুতীব্র আঘাত করল।

নিগ্রোদাসত্বের করুণকাহিনী ও ভারতের দুঃখযন্ত্রণার প্রতীক হিসাবেই গানের এই পঙ্‌ক্তিটি এণ্ডরুজ উদ্‌ধৃত করেন।··· আত্মশুদ্ধির যে-আগুন এ বাক্যের মধ্যে নিহিত রয়েছে তারই স্মৃতিতে আমি বারবার ফিরে যাই। সেদিনকার আরো একটি স্মৃতি প্রতীক হিসাবেই আমার মনে আসে। চার্লি এণ্ডরুজ যখন কথা বলছিলেন, অজ্ঞাতেই যেন তিনি আমাদের কাছে সরে আসতে লাগলেন। বক্তৃতাকালে স্থির গতিহীন, যেন নিস্পন্দ, অথচ শ্রোতাদের বোঝাবার তীব্র আকাঙ্ক্ষায় যেন ক্রমশ আমাদের দিকে সত্যই এগিয়ে আসছিলেন।

আসলে ঈশ্বরপ্রেমের এই মগ্ন তন্মনস্কতা আর দীনদরিদ্র মানুষের মধ্যে ঈশ্বরমহিমা সন্ধানের অধীর আগ্রহই ছিল এণ্ডরুজের বিচিত্র কর্মময় জীবনের প্রেরণা-উৎস। এই প্রসঙ্গে সহজেই মনে পড়ে—১৯২৭ সালে জাপানি পত্রিকার জন্য প্রবন্ধ লেখেন "Why I am a Christian"। পরে সেটি পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয়। তাতে এণ্ডরুজ লিখেছিলেন[৩]—

নৈতিক ও আধ্যাত্মিক জীবনের অভিজ্ঞতায় যীশুখ্রীস্ট আমার কাছে

---

১ Chaturvedi & Sykes, *Charles Freer Andrews*, পৃ. ২৩৫।

২ 'Were you there when they crucified my Lord ?'

৩ Chaturvedi & Sykes, *Charles Freer Andrews*, পৃ. ২৩৫-২৩৬।

ঈশ্বরের জীবন্ত বিগ্রহ। আমার এই অস্তিত্বের অন্য পারে ঈশ্বরের যে অসীম সত্তা আছে তার সম্বন্ধে আমি কিছুই জানি না। কিন্তু আমার যীশুখ্রীস্টের মধ্যে মানুষ যিনি, তাঁরও একটি দিব্যসত্তা আছে। সেই দিব্য বিভা, দিব্য সত্য ও দিব্য অনুরাগ অন্য মানুষের মধ্যে যখনই দেখি, স্বাভাবিকভাবে তাঁর সঙ্গেই আমার খ্রীস্টের সম্পর্ক স্থাপিত হয়।

ইউরোপের অবিশ্রাম কর্মধারা ও অধ্যাত্মসংযোগ-প্রয়াস যখন এইভাবে নিরবধি চলেছে তখন ১৯২৮ সালের শেষভাগে আমেরিকার পথে পাড়ি দিলেন এণ্ডরুজ। যাত্রার পূর্বের অভিজ্ঞতাটিও এণ্ডরুজ-জীবন-সন্ধানীর পক্ষে লোভনীয়।

স্যার গর্ডন গাগিসবার্গ ব্রিটিশ-গিয়ানার ভাবী গভর্নর। লণ্ডনের 'আর্মি অ্যাণ্ড নেভি ক্লাব'-এ তিনি এণ্ডরুজের আসার অপেক্ষায় বসে আছেন। তাঁর সঙ্গে আছেন রেভারেণ্ড ফ্রেজার।[১]

একটু পরে ঝলমলে পোশাক-পরা হলের একটি পোর্টার এসে স্যার গর্ডনকে নিবেদন করল, 'দরজায় দাঁড়িয়ে একজন বলছেন আপনার সঙ্গে এখন তাঁর দেখা করার কথা, কিন্তু আপনি নিজে এসে দেখে না গেলে তাঁকে আমি ভিতরে ঢুকতে দিতে পারি না।' ফ্রেজার হেসে বললেন, 'এ নিশ্চয় এণ্ডরুজ।' দুজনে তাঁরা এগিয়ে গিয়ে দেখেন, নোংরা ক্যানভাসের জুতো, ফ্লানেলের পুরনো ঢিলে ট্রাউজার, অপরিচ্ছন্ন কলারওয়ালা ক্রিকেটসার্ট পরে এণ্ডরুজ দাঁড়িয়ে আছেন। গাগিসবার্গ খুশি হয়ে তাঁকে অভ্যর্থনা করে ভিতরে নিয়ে সবাই মিলে খেতে বসলেন। সৈন্যাধ্যক্ষ, সৈনিক, গভর্নর— স্যার গর্ডনের সঙ্গে যাঁরাই কথা বলতে এলেন, প্রত্যেককে তিনি তাঁর মান্য অতিথি এণ্ডরুজের সঙ্গে পরিচিত করিয়ে দিলেন। কিছুক্ষণ আলাপ-আলোচনার পর এণ্ডরুজের ব্রিটিশ-গিয়ানায় যাওয়া স্থির হয়। এবার এণ্ডরুজ বিদায় নেবেন, স্যার গর্ডন তাই তাঁকে সঙ্গে করে নীচে নেমে এসে ট্যাক্সিতে তুলে দিলেন। মাথা নিচু করে অতিথিকে সম্মান জানালেন। যতক্ষণ পর্যন্ত ট্যাক্সিখানি দেখা যায় একদৃষ্টে চেয়ে থেকে সঙ্গীর দিকে ফিরে বললেন, 'আজ আমার মনে হচ্ছে আমার প্রভুকে ভোজে আমন্ত্রণ করার সৌভাগ্য জীবনে এসেছিল।'

---

১ রেভারেণ্ড এ. জে. ফ্রেজার— ঘানার Achimota-স্থিত কলেজের তদানীন্তন অধ্যক্ষ। পূর্বে ইনি সিংহলে ছিলেন।

১৯২৯ সালের জানুয়ারি মাসে এণ্ডরুজ যুক্তরাষ্ট্রে পৌঁছলেন। অন্য কোনো কাজে হাত দেবার আগে মিস মেয়োর সঙ্গে দেখা করলেন। আলাপ-আলোচনায় বুঝলেন যে তাঁর মধ্যে কোনো কপটতা নেই। তাই রাজনৈতিক উদ্দেশ্যমূলক বই লিখেছেন ভেবে পূর্বে তাঁর উপর যে দোষারোপ করেছিলেন, এণ্ডরুজ সঙ্গে সঙ্গে তা প্রত্যাহার করে নিলেন। অবশ্য এই কারণে ভারতীয় সমাজে পরে তাঁকে নিন্দিত হতে হয়।

আমেরিকার পত্রিকা-সম্পাদকদের অনেকের সঙ্গে এণ্ডরুজ দেখা করলেন। কোয়েকারদের সঙ্গে আলোচনার ফলে তাঁদেরই মধ্য থেকে ডক্টর টিম্বর্স নামে একজনকে গ্রামে গ্রামে ম্যালেরিয়া-বিরোধী কাজের জন্য বিশ্বভারতীর কর্মী হিসাবে পাঠানো হল। এ দিকে ১৯২৯ সালের ২৬ ফেব্রুয়ারি তারিখে কবি রবীন্দ্রনাথ ভারতবর্ষ থেকে কানাডায় যাত্রা করবেন, সেখানে তাঁর কার্যক্ষেত্র প্রস্তুত করার জন্য এণ্ডরুজ আগেই যুক্তরাষ্ট্র থেকে কানাডা রওনা হলেন। পথে পথে কত যে শারীরিক কষ্ট সহ্য করতে হয়েছে তাঁকে, সে বিষয়ে দৈবাৎ কোনো চিঠিতে আভাসমাত্র পাওয়া যায়। আটলান্টিকের উপর দিয়ে ঠাণ্ডায় ঝড়ে যাত্রা করতে গিয়ে ইনফ্লুয়েঞ্জায় পড়লেন। কয়েক মাস তার কষ্ট থেকে মুক্তি পান নি। তা ছাড়া লোকের ভিড় ও জনতার কোলাহল তাঁকে বড়োই ক্লান্ত করত। ১৯৩৯ সালের ১৬ ফেব্রুয়ারি তারিখে কবিকে লিখলেন, 'তীব্র ইচ্ছাশক্তির জোরেই কেবল আমি চলে ফিরে বেড়াচ্ছি।'

ফেব্রুয়ারি মাসের শেষভাগে উৎসুক হৃদয়ে চললেন টাস্কেজীতে। সেখানে নিগ্রোশিক্ষার প্রতিষ্ঠান গড়েছেন বুকার টি. ওয়াশিংটন।[১] দশটি দিন পরম শান্তিতে কাটল। স্কুলের কর্মসূচী হিসাবে শৃঙ্খলাবদ্ধ জীবন কাটালেন সেখানে ছোটো বড়ো সকলের বন্ধুত্বে এক হয়ে। তাঁর স্কুল-পরিদর্শনের খবর টাস্কেজীর 'মেসেঞ্জার' পত্রিকায় (৯ মার্চ ১৯২৯) নিম্নলিখিতভাবে লিপিবদ্ধ রয়েছে—

> পূর্বদেশ থেকে সংস্কৃতির দূত একজন এসেছেন টাস্কেজীতে। সরলতা, প্রশান্তি ও স্থৈর্য তাঁর আত্মায় প্রতিফলিত। যে বাণী তিনি সঙ্গে এনেছেন

---

১ বুকার টি. ওয়াশিংটন, 'নিগ্রোজাতির কর্মবীর' নামে এঁর *Up from Slavery* বইয়ের অনুবাদ দ্রষ্টব্য। শিক্ষাবিদ্ সেবাধর্মী এই নিগ্রো-নেতা আমেরিকার নমস্য ব্যক্তি : দাস-বংশোদ্ভব হয়েও চরিত্রবলে তিনি সর্বজনমান্য রূপে নিগ্রোদের দৃষ্টান্তস্থল হয়ে আছেন।

তাতে রয়েছে মহাত্মা গান্ধী ও কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ— পৃথিবীর এ দুই মহামানবের অনলংকৃত কাহিনী। ভারতের উচ্চভাবনা, সেখানকার নেতাদের আত্মত্যাগ, অনুন্নত দলের সঙ্গে ঐক্যবদ্ধ হয়ে তাঁদের কর্মপ্রচেষ্টা— এ-সব বিষয়ে তিনি সর্বদাই বলেন। ভারতের শান্তিনিকেতন ও আমেরিকার টাস্কেজী উভয়েরই উদ্দেশ্য এক— কী করে মানবাত্মার মুক্তিসাধন করা যায়।

তিনি কিন্তু সন্ন্যাসী নন, তাঁকে দেখলে সংসারবর্জিত ভিন্ন জগতের লোকও মনে হয় না। আশ্চর্য বাস্তববোধ রয়েছে তাঁর। কিন্তু যখন তিনি আমাদের সঙ্গে ছিলেন অন্তরাত্মার অপূর্ব আনন্দের আভাস তাঁর মুখেচোখে সর্বদা ফুটে উঠতে দেখা যেত। আমাদের একটি ছাত্র বলেছিল, তাঁর কথা শুনলে মনে হয় স্বয়ং যীশুখ্রীস্টই আমাদের সঙ্গে কথা বলছেন।

রবীন্দ্রনাথ কানাডায় এসে পৌঁছবেন, তাই এপ্রিল মাসে এণ্ডরুজ চলে গেলেন ভ্যানকুভারে, আসামাত্রই যাতে তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ হয়। সেখানে শিখ-সমাজের অল্পই লোক। নাগরিকতার অধিকার দাবি করে তাদের যে সংগ্রাম তার সঙ্গে এণ্ডরুজ বহু পূর্ব থেকেই পরিচিত। ১৯১৭-১৮ সালের ইম্পিরিয়াল কন্‌ফারেন্সে লর্ড হার্ডিঞ্জ তাদের পক্ষ সমর্থন করেছিলেন। এণ্ডরুজ এবারে যখন এসে পৌঁছলেন ততদিনে শিখদের স্ত্রীপুত্ররা তাদের সঙ্গে মিলিত হবার অনুমতি পেয়েছে, চার দিককার অবস্থা আনন্দজনক। এণ্ডরুজকে তারা স্বাগত জানাল অভ্যর্থনা করে। তাঁকে মোটরে করে গুরুদ্বারের উপাসনায় নিয়ে এল, ভোজসভায় নিমন্ত্রণ করল। তিনি যে শিখ নন, তাতে কিছুই এসে গেল না। তিনি ঈশ্বরপ্রেরিত মানব, তাদেরই একজন তিনি। তাদের পূর্ণ নাগরিকতার অধিকার লাভের জন্য এবারেও নিজ সামর্থ্যমত সবই করলেন এণ্ডরুজ। ভ্যানকুভারের 'দ্য মর্নিং স্টার' পত্রিকার নোয়েল রবিন্‌সন্‌ ১৯২৯ সালের ১৬ এপ্রিল তারিখে এণ্ডরুজকে লিখেছেন, 'শান্ত অনুত্তেজিত ভাবে একটি লোক কত যে কাজ করতে পারে আপনার মধ্যে তা দেখে আমি অবাক হয়েছি।'

কানাডা থেকে রবীন্দ্রনাথ সানফ্রান্সিস্কো যাত্রা করেন। এবার এণ্ডরুজ ব্রিটিশ-গিয়ানার পথে তাঁর দীর্ঘ যাত্রায় পাড়ি দিলেন। জাহাজ বহু জায়গায় থামল, সে-সব স্থানে নেমে এণ্ডরুজ সেখানকার ভারতীয়দের সম্বন্ধে সব খবর সংগ্রহ করলেন। দেখলেন ব্রিটিশ-গিয়ানার মতো এ-সব জায়গায়ও ভারতীয় অধিবাসীরা একেবারেই ভারত থেকে বিচ্ছিন্ন।

১৯২৯ সালের ১৮ মে তারিখে শনিবার এণ্ডরুজ জর্জটাউনে পৌছলেন। পরদিন প্রথমেই চলে গেলেন ডোমরেরায় আখ-আবাদের স্থানে। ভারতীয়রা সেখানে তখনো বাস করত চুক্তিদাসদের পুরানো ভাঙা অস্বাস্থ্যকর কোয়ার্টারে। সকাল-সন্ধ্যা গির্জার উপাসনায় তিনি হিন্দীতে ভাষণ দিতেন। তখন হিন্দুরাও এসে যোগ দিত। ভারতের খবর পাবার জন্য, ভারতীয় ভাষায় কথা শোনার জন্য তাদের অন্তর ছিল তৃষ্ণার্ত।

এই সময়ে এক কানাডিয়ান ধর্মযাজক এবং আর-একজন ভারতীয় সমাজ-নেতার সঙ্গে পৃথক পৃথক আলোচনার মাধ্যমে এণ্ডরুজ আঞ্চলিক জাতিসংঘাত প্রভৃতি বিষয়ে তাঁর ধারণা স্পষ্ট করে নিলেন। উভয় তরফ থেকে স্পষ্টই বোঝা গেল যে, ভারতীয়দের মধ্যে জাতিগত কুসংস্কার প্রায় ছিলই না। কেবল দেশ থেকে সম্পূর্ণ উন্মূলিত হয়ে পড়ায় এবং ধীরে ধীরে ধর্ম ও ভাষাগত ঐতিহ্য শিথিল হয়ে গিয়ে এদের মধ্যে নৈতিক দুর্বলতা কেবলই বেড়ে যাচ্ছিল।

২৬ মে গেলেন ওয়েস্ট কোস্টে। পরের কয়েকদিন জর্জটাউনের বেকার যুবকেরা তাঁকে ঘিরে রইল। তারা ভারতে ফিরে যেতে চায়। কাছাকাছি জমিদারিতে তাদের কাজের ব্যবস্থা হতে পারে কিন্তু তারা তা করতে চায় না। তখন তিনি মেটিয়াবুরুজের দুর্দশাগ্রস্ত ফিজিপ্রত্যাগতদের বিষয় ওদের কাছে খুলে বললেন।

৩ জুন সন্ধ্যায় নিগ্রোদের একটি সাধারণ সভায় যোগদান করে বুঝতে পারলেন যে আফ্রিকার বান্টুদের চেয়ে এদের জাতীয় চেতনা অনেক বেশি প্রখর। এক সাংবাদিক বন্ধু বললেন, পশ্চিম-ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জের নিগ্রোরা সাধারণত সৈনিক, তারা কৃষক নয়। তাই ভারতীয়দের সঙ্গে কর্মক্ষেত্রে তাদের বিরোধ থাকা সম্ভব নয়। তবে খুব বেশি সংখ্যক ভারতীয় এসে সে দেশের স্থায়ী বাসিন্দা হয়ে কৃষিকর্ম গ্রহণ করলে, তারা সেটা পছন্দ করবে না।

তার পরের একটি সপ্তাহ কাটল ভ্রমণে। বিদ্যালয়-পরিদর্শন, ভারতীয়দের বিবাহ, মদ্যপান ও শিক্ষা— এ-সব বিষয়ে সর্বত্র পর্যালোচনা করলেন। এণ্ডরুজ ব্রিটিশ-গিয়ানায় কিছুদিন বাস করে সেখানে কলোনি সৃষ্টির নতুন পরিকল্পনা বিষয়ে চিন্তা করলেন। যেখানে যান সর্বত্রই সমবায় কৃষিশিল্প সম্বন্ধে আলোচনা করেন; আর শিক্ষাব্যবস্থার তথ্য-সন্ধান চলে বিদ্যালয়ের পর বিদ্যালয় পরিদর্শনে। শিক্ষা— বিশেষ করে মেয়েদের শিক্ষা যে কলোনির মঙ্গলবিধানে কত প্রয়োজনীয়— সে কথা এণ্ডরুজ বারবার বলতেন। আখ-আবাদী সংঘের

সদস্যদের সঙ্গে দেখা করে তাঁদের জানালেন যে ধানচাষ শুরু হলে তাতে আখ-আবাদের ক্ষতি হবে বা ম্যালেরিয়ার প্রাদুর্ভাব হবে— এ-সব আশঙ্কা ভিত্তিহীন। বরং শহরের দিকেই যে সকলে ছুটে চলছে, তা বন্ধ হবে।

১৯২৯ খ্রীস্টাব্দের ১৩ জুন তারিখে তিনি ব্রিটিশ-গিয়ানা ত্যাগ করেন। অক্টোবর মাসে কানাডা ফিরে গিয়ে কানাডা সরকারকে জানালেন, ত্রিনিদাদ ও ব্রিটিশ-গিয়ানা হয়ে কেপটাউন ওঁ ভারতবর্ষ পর্যন্ত সোজা জাহাজ-রাস্তা খোলায় তাঁদের লাভের আশা আছে। ১৯২৯-৩০ সালের শীতকাল কাটল কানাডা ও আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রে। যে-সব ভারতবাসীদের মধ্যে আর্যরক্ত প্রবহমান যুক্তরাষ্ট্রে তাদের ও ইউরোপীয়দের সমান অধিকার প্রাপ্য— এরূপ ঘোষণা করা হয় কোপল্যাণ্ড বিলে। এণ্ডরুজ প্রাণপণে সে বিলের বিরোধিতা করেন। কেননা, এই নীতি সংকীর্ণ জাতীয়তাপ্রসূত। অনার্য দক্ষিণ-ভারতীয়রা বঞ্চিত হবে এ নীতিগ্রহণের ফলে।

আমেরিকায় চলেছিল একটানা বক্তৃতা-সফর, আর অবিশ্রাম রচনার ধারা। সর্বত্র ভাষণ দিয়েছেন, আর পত্রিকার জন্য লিখেছেন প্রবন্ধের পর প্রবন্ধ। অতিরিক্ত পরিশ্রমে শরীর কাতর তবু এই দৃঢ়প্রতিজ্ঞা নিয়ে এগিয়ে গেছেন যে 'মাদার ইণ্ডিয়া' পুস্তক পাঠে ভারতবর্ষ সম্বন্ধে মানুষের যে ভ্রমাত্মক ধারণা হতে পারে তাকে সংশোধন করা চাই-ই। *Mahatma Gandhi's Ideas* নামে যে পুস্তক লিখছিলেন তাতে তাঁর অবসরের প্রতিটি মুহূর্ত নিয়োজিত হল। এই বছরেই পুস্তকটি লিখে শেষ করেন এবং সঙ্গে সঙ্গে সেটি প্রকাশিতও হয়ে যায়। গান্ধীজির প্রেরণায় ভারতের জাতীয় উজ্জীবনের কাহিনী তাঁর প্রত্যেকটি বক্তৃতায় থাকত।

জে. টি. সাণ্ডারল্যাণ্ড ছিলেন ভারতের আমেরিকান বন্ধু। ১৯৩০ সালের জুন মাসে 'দি মডার্ন রিভিউ' পত্রিকায় তিনি লেখেন, 'ভারতের মহান গণনেতা গান্ধীজি ভারতের কোন্ কর্মসাধনে প্রবৃত্ত তা এণ্ডরুজ যে ভাবে আমেরিকার কাছে প্রকাশ করতে পেরেছেন, এমন আর কেউ পারেন নি।'

অন্য পক্ষে ইউনাইটেড স্টেট্সের ভারতীয়দের একটি দল গান্ধীজির কাছে প্রকাশ্যভাবে দীর্ঘ পত্র লিখে এণ্ডরুজের বিরুদ্ধে অভিযোগ করেন। মিস মেয়োর সম্পর্কে পূর্বে এণ্ডরুজ যে রাজনৈতিক কুমতলবের অপবাদ দেন তা প্রত্যাহার করাতেই যে ভারতীয়রা বিশেষ ক্ষুব্ধ হন, এ কথা পূর্বেই বলা হয়েছে। তা ছাড়া ওয়াইকোম সত্যাগ্রহে প্রত্যক্ষদর্শীর যে বিবরণ তিনি

আমেরিকায় দেন তাতেও ভারতীয়দের ধারণা হয় এণ্ডরুজ ভারতের কুসংস্কার-গুলি সম্পর্কে ইউনাইটেড স্টেট্সের লোকদের সজাগ করতেই চেয়েছিলেন। এণ্ডরুজ কিন্তু তাঁর কর্তব্যে অটল রইলেন।

লবণকর নিবারণে ডাণ্ডি-অভিযান

১৯৩০ খ্রীস্টাব্দে এণ্ডরুজ আমেরিকা থেকে ফিরে এলেন ইংলণ্ডে। ততদিনে ভারত-ব্রিটিশ সম্পর্কে ঘন দুর্যোগ দেখা দিয়েছে, ভারতে রাজনৈতিক জীবনে জেগেছে অসংখ্য জটিল সমস্যা আর প্রবল উত্তেজনা।

১৯২৯ সালের অক্টোবর মাসে লর্ড আরউইন ইংলণ্ড থেকে দিল্লী এসে যখন জানালেন গোলটেবিল বৈঠকে ভারতীয়দের আমন্ত্রণ করার ভার তাঁকে দেওয়া হয়েছে, তখন ভারত ও ব্রিটেনের রাজনৈতিক সম্পর্কের একটি নতুন অধ্যায় রচিত হল। মিঃ র‍্যামজে ম্যাকডোনাল্ডের মতো দায়িত্বশীল নেতারা ভারতীয়দের এই আশা দিলেন যে এবারকার গোলটেবিল সম্মেলনে ভারতবর্ষের জন্য ডোমিনিয়ান স্ট্যাটাসের খসড়া তৈরি হবে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত ব্রিটিশ রাজনীতিকরা তা দিতে অস্বীকৃত হওয়ায় নৈরাশ্যের আঘাতে ভারতীয়দের মধ্যে প্রচণ্ড বিদ্রোহভাব দেখা দিল। ১৯২৯ সালের ডিসেম্বর মাসে লাহোর কংগ্রেসে ভারতের সম্পূর্ণ স্বাধীনতার প্রশ্ন উঠল। ১৯৩০ সালের ২৬ জানুয়ারি প্রথম গণতন্ত্রদিবস বলে ঘোষণা করা হল।

সরকারের লবণ-আইন অমান্য করে এপ্রিল মাসে গান্ধীজি তাঁর তিন সপ্তাহের ঐতিহাসিক ডাণ্ডি অভিযান চালালেন। চারি দিকে বয়কট, গণ-আন্দোলন ইত্যাদি শুরু হল। গান্ধীজি এবং আরো অনেকে কারারুদ্ধ হলেন।

১৯৩০ সালের এপ্রিল মাসে এণ্ডরুজ যখন ইউনাইটেড স্টেট্স থেকে ইংলণ্ডে ফিরলেন তখন তাঁর মনে হল এবার তাঁর প্রধান কর্তব্য দ্বিতীয় গোলটেবিল বৈঠকে যে-সব বিষয় আলোচনা হবে তাতে ভারতীয় পরিপ্রেক্ষিতটি ইংরেজ জনসাধারণকে বুঝিয়ে দেওয়া। *India & the Simon Report* নামক পুস্তিকাটি তখন লিখে ফেললেন।

১৯৩০ সালের শেষের দিকে কবির সঙ্গে এণ্ডরুজ আবার গেছেন ইউনাইটেড স্টেট্সে। হঠাৎ দক্ষিণ-আফ্রিকা থেকে সংবাদ এল, ট্রান্সভালে জাতিগত সমস্যা কঠিন হয়ে দাঁড়িয়েছে। তাড়াতাড়ি লণ্ডনে ফিরে এণ্ডরুজ কেপটাউনের দিকে যাত্রা করলেন। ১৯৩১ সালের এপ্রিলে যখন ইংলণ্ডে ফিরলেন তখন

ভারতের অবস্থার পরিবর্তন হয়েছে। ভারতে গান্ধী-আরউইন চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে, কংগ্রেস তাতে সম্মতি দান করেছে। ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস ১৯৩১ সালের দ্বিতীয় গোলটেবিল সম্মেলনের জন্য গান্ধীজিকে একমাত্র প্রতিনিধি নির্বাচন করেছে।

গোলটেবিল কনফারেন্সে মধ্যস্থতা

গান্ধীজি লণ্ডনে আসার আগে ইংরেজচিত্তে তাঁর সম্বন্ধে শ্রদ্ধা জাগানো এবং ইংরেজদের মতামত সম্বন্ধে তাঁকে সচেতন করার চেষ্টায় এণ্ডরুজ নিজেকে ব্যাপৃত রাখলেন।

ইংলণ্ডের ল্যাঙ্কাশায়ারের লোকের দুঃখ দেখে গান্ধীজিকে তিনি অনুরোধ করলেন যেন বিদেশী বস্ত্র বয়কটের আহ্বান তিনি তুলে নেন। বললেন, ১৯১৪ সালেও তো তিনি দক্ষিণ-আফ্রিকায় সত্যাগ্রহ আন্দোলন একবার তুলে নিয়েছিলেন। বন্ধুর অন্তরের কোমলতা গান্ধীজি ঠিকই ধরতে পেরেছেন। তাই এ পত্রের উত্তরে এণ্ডরুজকে তিনি লিখলেন[১]—

> ...যেমন তোমার চিরকালের স্বভাব, তোমার চোখ যা দেখে আর কান যা শোনে তাতেই তুমি দুঃখ পাও। এবার ল্যাঙ্কাশায়ারের লোকদের বেকার জীবন তোমাকে বিচলিত করেছে। আমরা যা চোখে দেখি ও কানে শুনি অনেকসময় তা পূর্ণ সত্যকে আমাদের কাছ থেকে আড়াল করে রাখে। আমি সব সময়েই দেখেছি বিশেষ জরুরি অবস্থাকে সাধারণ আইনের পর্যায়ে ফেলা যায় না।

আমেরিকায় থাকাকালীন এণ্ডরুজ *Mahatma Gandhi at Work* পুস্তক প্রণয়ন শুরু করেছিলেন। এসময়ে সেটি সম্পূর্ণ হয়ে প্রকাশিত হয়। ব্রিটেনে ও আমেরিকায় বহু খ্রীস্টান পত্রপত্রিকার সম্পাদকদের কাছে গান্ধীজির জীবন ও বাণী সম্বন্ধে এণ্ডরুজ নানা তথ্য পরিবেশন করেন ও বহু সভাসমিতিতে তাঁর সম্বন্ধে বক্তৃতাও করেন।

মহাত্মা গান্ধী শেষপর্যন্ত লণ্ডনে এসে পৌছলেন। মার্সাই বন্দরে এণ্ডরুজ তাঁকে আনতে গেলেন। কনফারেন্সের বাইরে তাঁর সর্বত্র পরিভ্রমণের দায়িত্ব এণ্ডরুজ নিজে নিলেন। লণ্ডনের পূর্বপ্রান্তে 'মুরিয়েল লেস্টার'-এর অনাথাশ্রমে

---

১ এণ্ডরুজকে লেখা গান্ধীজির পত্র, ২৪ জুন ১৯৩১ ; রবীন্দ্রসদনে রক্ষিত ফোটোকপি।

গরিবদের মধ্যে বাস করার জন্য গান্ধীজি জোর করতে লাগলেন কারণ তিনি তাদেরই ভালো করে বোঝেন।[১]

অথচ এই আশ্রমগৃহটি ওয়েস্টমিনিস্টারের রাজনৈতিক কেন্দ্র থেকে বহু দূরে অবস্থিত। এণ্ডরুজ ভেবে দেখলেন গান্ধীজির কর্মশক্তি অব্যাহত রাখতে হবে তাঁর সর্বাপেক্ষা গুরুতর কর্মের জন্য; তাই তাঁর অফিসের ব্যবস্থাও করতে হবে কনফারেন্স হেড কোয়ার্টারের কাছাকাছি। অনিচ্ছাসত্ত্বেও গান্ধীজি রাজী হলেন ৮৮ নং নাইট্‌স্‌ব্রিজে ঘর ভাড়া করতে। তবে চার্লির অমিত-ব্যয়িতার জন্য এই প্রথম দুজনের মধ্যে ঝগড়া হল। শেষপর্যন্ত ব্যবস্থা হল চার্লির এক পুরনো ভারতীয় বন্ধু বাড়িটির তত্ত্বাবধানের ভার নেবেন। চার্লি দখল করে বসলেন বাড়ির চিলেকোঠাটি। সেই কর্মব্যস্ত দিনগুলি থেকে যেটুকু সময় উদ্বৃত্ত পেতেন সেইখানে বসে এণ্ডরুজ *What I Owe to Christ* বইখানি লিখতেন।

সে সময় সে রকম শান্ত মুহূর্ত পাওয়াও দুষ্কর ছিল। কেননা সমস্ত দিন লোক-জনের যাতায়াত চলত। এণ্ডরুজ নিজেকে গান্ধীজির গৃহদ্বারের প্রহরী নিযুক্ত করেছিলেন। অনাকাঙ্ক্ষিত বহু ব্যক্তি বারবার এসে দেখা করতে চাইলেও এণ্ডরুজ তাঁর কর্তব্যে ও সংকল্পে স্থির থাকতেন।

ইংলণ্ডে গান্ধীজির ভ্রমণযাত্রার সবচেয়ে বড়ো বৈশিষ্ট্য হল সে দেশের শ্রেষ্ঠ মনীষিদের সঙ্গে তাঁর নির্জন-সাক্ষাৎকার। এ ব্যবস্থায় এণ্ডরুজের দূরদৃষ্টি ও সুপরিকল্পনার পরিচয় যথার্থই ছিল বিস্ময়কর। বন্ধু হেনরি পোলক ও অন্যান্যদের সাহায্যে তিনি এই ব্যবস্থা করেছিলেন যে, প্রতি রবিবারে গান্ধীজি যেন ইংলণ্ডের বিভিন্ন অঞ্চলগুলি পরিদর্শনের সুযোগ পান।

একবার গান্ধীজি গেলেন ল্যাঙ্কাশায়ারে। সেখানে যাবার জন্য তিনি আগে থেকেই চার্লির কাছে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ। এই সাক্ষাৎকারে সাধারণ শ্রমিকরা বুঝতে পারল ইংলণ্ডের বস্ত্রশিল্প ভারতবাসীরা যে বয়কট করেছে তার মধ্যে ন্যায় অন্যায় যাই থাক, গান্ধীজি কিন্তু দারিদ্র্যের বিরুদ্ধে সংগ্রামে তাদের সহকারী-বন্ধু। তারাও তাই তাঁকে শ্রদ্ধা জানাতে দ্বিধামাত্র করল না।

'ম্যাঞ্চেস্টার গার্ডিয়ানে'র সম্পাদক সি. পি. স্কট, কেম্‌ব্রিজে পেমব্রোক

---

১ মুরিয়েল লেস্টার (Muriel Lester) ব্রিটিশ সমাজসেবিকা খ্রীস্টভক্ত ও ভারতবন্ধু। মহাত্মার সঙ্গে তাঁর বহুকালের আত্মিক যোগ।

কলেজের অধ্যাপকগণ, বার্মিংহামে ভারতের কোয়েকার বন্ধুবর্গ, অক্সফোর্ড ব্যালিয়েল কলেজের ডঃ লিণ্ডসে— এঁদের সঙ্গেও গান্ধীজি পরিচিত হলেন এণ্ড্রুজের মধ্যস্থতায়।

এ-সব দেখাসাক্ষাতের ফল কী হয়েছিল এণ্ড্রুজ নিজে তার বর্ণনা করে বলেছেন—

গান্ধীজির অসাধারণ ব্যক্তিত্বের প্রভাব পড়ল ইংলণ্ডের মনীষিদের উপর। তাঁর চিন্তাধারার স্বাতন্ত্র্য দেখে তাঁরাও সে-ভাবে চিন্তা করতে শুরু করলেন। সব সময় তাঁরা যে একমত হতেন তা নয়। তবু তাঁর ব্যক্তিত্বের মাহাত্ম্য তাঁদের মনে অসীম শ্রদ্ধা জাগাত। ইংলণ্ড ছোট্ট দেশ— এ ধরনের প্রভাব সেখানে খুব দ্রুতই ছড়িয়ে পড়ে। মহাত্মা গান্ধীকে কেবলমাত্র একটি অবাস্তব ধর্মোন্মাদ ব্যক্তি বলেই এতকাল ইংলণ্ডের লোকে জানত। প্রত্যক্ষদর্শনে সে মনোভাব তাঁদের সম্পূর্ণ দূর হয়েছিল।

গোলটেবিল বৈঠকের দিক থেকে গান্ধীজির ইংলণ্ডে আগমন যে বিরাট ব্যর্থতায় পর্যবসিত হল এণ্ড্রুজ নিজেই সেটি অনুভব করেছিলেন। সত্যিই এ সময়ে মন তাঁদের নৈরাশ্যে ভরে যায়। দ্বিতীয় গোলটেবিল বৈঠক যখন বসল ততদিনে ইংলণ্ডের যে শ্রমিক সরকার বৈঠক ডাকার প্রস্তাব করেছিলেন তাঁদের হার হয়েছে সেবারের সাধারণ নির্বাচনে। যদিও র‍্যামজে ম্যাকডোনাল্ড তখনো প্রধানমন্ত্রীর পদে অভিষিক্ত, তাঁর ক্যাবিনেট সহকর্মীদের মনোভাব ভারতবর্ষের বিরুদ্ধে অনমনীয় হয়ে উঠেছে। বৈঠকের কয়েকটি প্রস্তাব ভারতীয় প্রতিনিধিদের অনেকেই গ্রহণের জন্য স্বীকৃত হলেন। কিন্তু গান্ধীজি একাই সেগুলির প্রতিবাদ জানাতে বাধ্য হন।

ভারতবর্ষের জন্য দায়িত্বশীল সরকার গঠনের চেষ্টা বিফল হল ঠিকই, তবু এণ্ড্রুজ তাঁর অপ্রতিরোধ্য কর্মশক্তি নিয়োগ করলেন প্রচলিত সংবিধানের গণ্ডির মধ্যেই প্রকৃতপক্ষে ভারতীয় সরকার গঠন করবার পরিকল্পনায়। কিন্তু ঘটনা সম্পূর্ণ বিপরীত পথ ধরল। ১৯৩২ সালের জানুয়ারি মাসে ভারতে পদার্পণের প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই গান্ধীজি কারারুদ্ধ হলেন আর কংগ্রেস বেআইনি ঘোষিত হল।

এ সময়ে এণ্ড্রুজ ছিলেন দক্ষিণ-আফ্রিকায়। ১৯৩২ সালে সম্ভাব্য ভারতবর্ষ ও দক্ষিণ-আফ্রিকার গোলটেবিল সম্মেলনের ব্যবস্থার জন্য তখনই সেখানে তাঁর উপস্থিতির প্রয়োজন ছিল।

গান্ধীজি কারারুদ্ধ হলে এণ্ডরুজ সমস্ত কর্মসূচী পরিত্যাগ করে সঙ্গে সঙ্গে দক্ষিণ-আফ্রিকা থেকে ভারতে ফিরে এলেন। ১৯৩২ সালের মার্চের মাঝামাঝি যখন তিনি এসে পৌছলেন ততদিনে ত্রিশ হাজারের বেশি লোককে ভারতে আইন-অমান্য আন্দোলনের জন্য অন্তরীণ করা হয়েছে। লর্ড আরউইনের জায়গায় লর্ড উইলিংডন ১৯৩১ সালে ভাইসরয় পদে নিযুক্ত হয়ে প্রকাশ করলেন তাঁর পূর্ববর্তী শাসনকর্তার নীতির ভুলে শাসনকার্য ব্যাহত হয়েছে। বিশেষ করে সীমান্তে আবদুল গফ্‌ফর খানের লালকুর্তাবাহিনীর বিরুদ্ধে কঠিন শাসনব্যবস্থা অবলম্বন করা হল। কংগ্রেসের বিরুদ্ধেও দমননীতি গ্রহণ করা হল।

ব্রিটিশরাজের কঠোরনীতিতে শান্তিনিকেতনে রবীন্দ্রনাথের মন বিষণ্ণ। এণ্ডরুজ এবং তাঁর কোয়েকার বন্ধুদের সঙ্গে আলোচনার পর কবি 'মানব-শুভকামীদের উদ্দেশ্যে' এক আবেদন লিখলেন। সেটি গান্ধীজির হাতে পৌছবার অনুমতি মিলল না। পরে অবশ্য সেটি ইংলণ্ডে প্রকাশিত হয়ে বহুল-প্রচার লাভ করে।

ভারতবর্ষে এণ্ডরুজের উপর পুলিস-নির্দেশ জারি হল যে তিনি দিল্লী ত্যাগ করে ভারতের অন্যত্র যেতে পারবেন না। চিত্ত তাঁর বিষাদাচ্ছন্ন, শরীরে মনে কাতর অবসন্নতা। দিল্লীতে একটি খ্রীস্টসংঘে ঈস্টারের ভাষণ দিতে সম্মত হয়েছেন। নৈরাশ্যের অন্ধকারে মন ছেয়ে আছে। নিজেকে প্রশ্ন করছেন, কী বাণী তাঁর দেবার আছে? প্রভুর পুনরুত্থানের পর মেরীর সঙ্গে বাগানে তাঁর সাক্ষাৎকার হয়— সে কাহিনীর বর্ণনা এ সময়ে একদিন পাঠ করতে গিয়ে এণ্ডরুজের চোখের সম্মুখে যেন আশা ও বিশ্বাসের আলোর বন্যা নেমে এল। তিনি নবতর উদ্দীপনায় আবার কর্তব্যপথে অগ্রসর হলেন।

ইংলণ্ডে

১৯৩২ সালের মে মাসের প্রথম সপ্তাহে আবার তিনি ইংলণ্ডে পদার্পণ করলেন। পরের দুটি মাসে তাঁর কর্মশক্তির পূর্ণ প্রয়োগ হল ব্যক্তিগত সাক্ষাৎকারে। লর্ড আরউইন, লর্ড স্যাঙ্কি, স্যার স্যামুয়েল হোর— এঁরা তখন বিলাতে। এঁদের তিনজনের সঙ্গেই সাক্ষাৎ করলেন। প্রধানমন্ত্রী র‍্যামজে ম্যাকডোনাল্ড গিয়েছিলেন ছুটি নিয়ে গল্‌ফ খেলতে। সেখানে গিয়ে তাঁকে

খুঁজে বের করে গল্‌ফের মাঠের চার দিকে হাঁটতে হাঁটতে এণ্ডরুজ তাঁর বক্তব্যটি পেশ করলেন।

প্রধানমন্ত্রীর কাছে এণ্ডরুজের বক্তব্য ছিল, জুনের শেষে বিশেষ অর্ডিন্যান্সের কাল অতিক্রান্ত হলে ভারতবর্ষে শান্তিসংস্থাপনের নবতর প্রচেষ্টা কি শুরু করা চলে না? কিন্তু প্রধানমন্ত্রীর আচরণে বুঝলেন ভারতের জটিল সমস্যা সম্পর্কে কোনো আলোচনার ইচ্ছা পর্যন্ত তাঁর নেই। এবার এণ্ডরুজ মনে দৃঢ় সংকল্প করলেন গান্ধীজির বিরুদ্ধে ইংলণ্ডে যে অপপ্রচার চলেছে তার বিরুদ্ধে তিনি আবার সংগ্রাম করবেন।

১৯৩২ সালের জুনের শেষ হল অথচ ভারত সম্পর্কে নীতি রইল অপরিবর্তিত। বাইরে থেকে দেখলে মনে হতে পারে এণ্ডরুজ বুঝি সংগ্রামে পরাস্ত হলেন। কিন্তু তিনি মনে জেনেছেন অবস্থার উন্নতি হয়েছে। ভারতের অবস্থা বর্ণনা করে ইংলণ্ডের খ্রীস্টসংঘের ন্যায়বোধের প্রতি তাঁর আবেদন শুরু হল জুলাই মাসে। তাঁর রচিত *What I Owe to Christ* গ্রন্থ সেই বছরই ইংলণ্ডে প্রকাশিত হয়েছে। অল্প সময়েই পুস্তকটির অধ্যাত্মনিবেদন ও সাহিত্যকৃতি জনমনকে এমন সচকিত করে যে নানাস্থানে ভাষণদানের জন্য তাঁর কাছে আমন্ত্রণ আসতে লাগল। শান্তিসংস্থাপকের ভূমিকায় কাজের জন্য এণ্ডরুজ এবার এক সুবৃহৎ ক্ষেত্র পেলেন। তখনই আর-একটি নূতন পুস্তক প্রণয়নের আগ্রহ তাঁর মনে এল। ভাবলেন *Christ in the Silence* পুস্তকে বিবৃত করবেন তাঁর অন্তরের নিত্য-উৎসারিত শান্তির গোপন উৎসটি কোথায়!

জর্মনিতে

১৯৩২ সালের অগস্ট মাসে রবীন্দ্রনাথের দৌহিত্র নীতীন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় জর্মনিতে যক্ষ্মারোগে আক্রান্ত হয়ে মারা যায়। নীতুর রোগের খবর পেয়ে এণ্ডরুজ জর্মনি যান। নীতুকে তিনি শৈশব থেকে জানতেন। জর্মনিতে গিয়ে চিকিৎসা ও শুশ্রূষার ভালোরূপ ব্যবস্থা করলেন; মৃত্যু আসন্ন জেনে মাতাপিতাকে কলকাতা থেকে আনিয়ে নিলেন। মৃত্যুর পরে অন্তিম উপাসনাবাণীও তিনিই পাঠ করেন। অপরিসীম ক্লান্তির মধ্যেও ভারতবর্ষে নীতুর আত্মীয়স্বজন সবাইকে দীর্ঘ পত্র দিয়ে জানিয়েছেন হাসপাতালে কত সেবাযত্ন সে পেয়েছে। আরো জানিয়েছেন পর্বতবনস্পতি ঘেরা সমাধিস্থানের শান্তগম্ভীর পরিবেশের কথা।

সে সময় তাঁর ইংলণ্ডের বন্ধুদের কাছে যে-সব পত্র লেখেন সেগুলি পড়ে বুঝতে পারি, এ শোকের আঘাত তাঁকে কী মর্মান্তিক বেজেছিল। নীতুর মৃত্যুর পরে তাঁর আধ্যাত্মিক অনুভূতিগুলি যখন জীবন্ত সত্যরূপে তাঁর মধ্যে জাগ্রত হয় তখন সেই প্রেরণাই *Christ in the Silence* পুস্তকের রচনায় তাঁকে উদ্‌বুদ্ধ করে।

সুইজারল্যাণ্ডে

এণ্ডরুজ একবার অক্সফোর্ড গ্রুপের সদস্যদের সঙ্গে সুইজারল্যাণ্ডে কিছুদিন বাস করবেন বলে কথা দিয়েছিলেন। নীতুর শেষকৃত্যের পর তাই সেখানে গেলেন। তখন ক্লান্ত শরীরে মনে হয়েছিল ইংলণ্ডের মাটিতে চিরবিশ্রাম লাভ করতে পারলে শান্তি হত। কিন্তু অঙ্গীকার রক্ষার জন্য তাঁকে সুইজারল্যাণ্ডেই যেতে হল।

শরীর-মনের তৃপ্তি ও আরাম অবশ্য তাঁর এই সুইজারল্যাণ্ডেই মিলল, লেমান হ্রদের উপরে সূর্যালোকিত পর্বতের শোভা, সেখানকার তরুণপ্রাণের সাহচর্য তাঁর বিশুষ্ক প্রাণে শান্তিবারি সিঞ্চন করত। এখানে কিছুদিন বিশ্রামের পর হ্রদের ধারে তুষারশ্রেণীর দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে মনে পড়ল— কোটগড় থেকে তিব্বতে যাবার পথটির কথা। ১৯২৬ সালে সাধু সুন্দর সিং সে পথে যাত্রা করে আর তো ফেরেন নি। *Sadhu Sundar Singh : A Personal Memoir* পুস্তক রচনার পরিকল্পনা তখনই মাথায় এল।

সাম্প্রদায়িক পৃথক নির্বাচন রোধ

১৯৩২ সালে ভারতে কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা ঘটে। ডঃ আম্বেদকর ছিলেন অস্পৃশ্যদের নেতা।[1] তাঁর সঙ্গে মিলে গোলটেবিল বৈঠকের আরো কয়েকটি দল দাবি করেছিলেন সদ্যগঠিত ভারতীয় শাসনতন্ত্রে তাঁদের নিজ নিজ সম্প্রদায়ের জন্য সাম্প্রদায়িক ভোটাধিকার চাই। গান্ধীজি প্রতিবাদে কংগ্রেসকে তখন স্পষ্ট করেই জানিয়েছিলেন যে, প্রয়োজন হলে প্রাণ দিয়েও তিনি এ নীতির বিরোধিতা করবেন। কিন্তু ১৯৩২ সালের ৪ জানুয়ারি কারারুদ্ধ

---

১ ডঃ বি. আর. আম্বেদকর অর্থনীতিক ও অধ্যাপক হিসাবে জীবন শুরু করেন। অনুন্নত সম্প্রদায়ের নেতা হিসাবে খ্যাত। ভারতের সংবিধান রচনায় তাঁর দান অতুলনীয়। স্বাধীন ভারতেও আইন-মন্ত্রিত্ব করেন। শেষজীবনে বৌদ্ধধর্মে দীক্ষা নেন।

হয়ে পড়ায় এই প্রস্তাবের বিরুদ্ধে তাঁর ব্যক্তিগত সংগ্রামের পরিকল্পনা কার্যকর হয় নি।[1] কিন্তু অগস্ট মাসে ইংলণ্ডের তদানীন্তন প্রধানমন্ত্রীর 'সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারা'র সিদ্ধান্ত প্রকাশিত হতে দেখা গেল যে এই রোয়েদাদের যে-যে শর্তে গান্ধীজির আপত্তি ছিল সেগুলি ঠিকমত স্বীকৃতি পায় নি। অবশ্য সে বাঁটোয়ারার মধ্যে একটি ধারা এরূপ ছিল যে, সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন দল একমত হলে এর পরিবর্তন করাও সম্ভব। গান্ধীজি অগত্যা যারবেদা জেলে থেকেই এবার উপবাস শুরু করলেন (১৭ অগস্ট ১৯৩২) এই উদ্দেশ্যে যে বর্ণহিন্দু ও অস্পৃশ্য দলের নেতারা এবার সম্মিলিতভাবে এই বাঁটোয়ারার পরিবর্তন দাবি করবেন তাঁর নির্দেশিত পথে। এই ঘটনার পরিণতিতে যে আপস-মীমাংসা হয় তাই পুনাচুক্তি নামে খ্যাত।[2]

গান্ধীজির এই উপবাসের উদ্দেশ্য ও উপায় সম্পর্কে পাশ্চাত্যে নানারূপ সংশয়ের সৃষ্টি হয়েছিল। চিন্তাশীল ও বিবেচক বহু ইউরোপীয়ের মনে এই দ্বিধা এল যে, এ ভাবে নৈতিক চাপ দেবার উপায়টি সত্যিই কি অহিংস? উপবাস সম্বন্ধে এ ধরনের প্রশ্ন ও সন্দেহ এণ্ডরুজের মনেও জেগেছিল। তিনি গান্ধীজির কাছে চিঠি লেখার সময়ে খোলাখুলিভাবে এ-সব প্রশ্ন করতেন। কিন্তু প্রকাশ্যভাবে যখনই কিছু লিখতেন তখন বন্ধুর এ কাজের পশ্চাতে তাঁর পবিত্র হৃদয়ের শুভ উদ্দেশ্যের ছবিটিই তুলে ধরতেন। বলতেন, এ হচ্ছে প্রেমিকহৃদয়ের আত্মনিপীড়ণ।

১৯৩২ সালের অক্টোবরের *The Christian Century* পত্রিকায় লিখলেন—

> গান্ধীজি লক্ষ্য করেছেন, দরিদ্রতম ব্যক্তি, যাদের তিনি প্রাণের চেয়েও

১ দ্র. Tendulkar, *Mahatma*, vol. III, পৃ. ১৫৬।

২ পুনাচুক্তি— হিন্দুসমাজকে বর্ণহিন্দু ও তপশীলভুক্ত হিন্দু— এই দুই ভাগে বিভক্ত করার জন্য পৃথক নির্বাচনের ব্যবস্থায় মহাত্মা গান্ধী প্রতিবাদ করেন ও পরে অনশন করেন। হিন্দু-সমাজের নেতৃবৃন্দ মহাত্মা গান্ধীর অনশনভঙ্গের উদ্দেশে পুনাতে এক চুক্তি করেন। এই চুক্তিতে স্থির হয় নির্যাতিত সম্প্রদায়ের প্রতিটি সভ্যপদের জন্য ওই সম্প্রদায়ের ভোটারগণ প্রথমে চারজন সভ্য নির্বাচন করবেন, পরে সমস্ত হিন্দু ভোটারগণ একত্রে ভোট দিয়ে সেই চারজনের মধ্য থেকে একজনকে নির্বাচন করবেন। এই চুক্তির ফলে তপশীলভুক্ত সম্প্রদায়ের মোট সভ্য-সংখ্যা প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক নির্দিষ্ট সংখ্যা থেকে বৃদ্ধি পায়। দ্র. বিনয়েন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, 'স্বাধীন ভারতের শাসনব্যবস্থা'।

ভালোবাসেন, তারা ভুলপথে এগিয়ে চলেছে। তারা জানে না কী ভয়ংকর সর্বনাশের দিকে তাদের গতি। তাঁর অতিপ্রিয়জনদের প্রতি গভীর অনুরাগে তিনি আপন প্রাণের ভয় অতিক্রম করে তাদের গতিপথের সম্মুখে নিজেকে নিক্ষেপ করেছেন। এ ধরনের আত্মদানে অবশ্যই একটি সৌকুমার্য আছে যা বিরল, যা দুর্লভ। এমন করুণ আকৃতি আমাদের হৃদয়ের তন্ত্রীতে অনুরণন তোলে। প্রিয় বন্ধুর জন্য নিজের প্রাণ যিনি বলি দিতে পারেন, তাঁর এই গভীর অনুরাগের চেয়ে উচ্চতর আর কী হতে পারে?

গান্ধীজির উপবাসের খবর যখন ইংলণ্ডে এল, এণ্ডরুজ তখন ম্যাঞ্চেস্টারে। তৎক্ষণাৎ লণ্ডনে ফিরে এসে তিনি প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করলেন, ইণ্ডিয়া অফিসে গেলেন। তা ছাড়া লর্ড আরউইন, লর্ড স্যাঙ্কি এবং লর্ড লোথিয়ানের সঙ্গেও দেখা করলেন। কেননা এঁরা সকলেই ব্যাপারটা জানেন ও এর গুরুত্ব বোঝেন। গান্ধীজিকে তার করে এণ্ডরুজ জানতে চাইলেন, তাঁর কি এখন ভারতে আসা প্রয়োজন? গান্ধীজি উত্তর পাঠালেন— তাঁর এই উপবাসব্রত যে ঈশ্বরের ইচ্ছাক্রমে গৃহীত হয়েছে, সে বিষয়ে তিনি নিশ্চিত, চার্লি এখন ইংলণ্ডেই থাকুন। তার পরের কয়েকটি দিনব্যাপী বিলাতে এণ্ডরুজের অতন্দ্র প্রয়াস গান্ধীজির উপবাসভঙ্গে বিশেষ সাহায্য করেছিল।

পোলক ও হোরেস আলেকজাণ্ডারের সাহায্যে এণ্ডরুজ গান্ধীজির অনশন সম্পর্কে একটি বিবৃতি প্রস্তুত করলেন। তাতে সুস্পষ্টভাবে অবস্থাটি বর্ণিত হল। ইংলণ্ডের প্রতিটি দৈনিক পত্রিকায় আর প্রায় আড়াইশোটি সাপ্তাহিক পত্রিকায় বিবৃতিটি প্রেরণ করা হল।

২৪ সেপ্টেম্বর বিকেলে পুনাচুক্তির খবর বিলাতে এণ্ডরুজের কাছে এল। বেশির ভাগ মন্ত্রীরা তখন সপ্তাহান্তে অবসরযাপন করতে গেছেন শহরের বাইরে। র‍্যামজে ম্যাকডোনাল্ড চেকার্সে তাঁর গ্রামের বাড়িতে ছিলেন। রবিবার সকাল সাতটায় এণ্ডরুজ তাঁর সঙ্গে সাক্ষাতের উদ্দেশ্যে সেখানেই চলে গেলেন। সেদিন সারাদিনটাই সাক্ষাৎকারে কাটল। এ দিকে আগাথা হ্যারিসন বসে আছেন লণ্ডন অফিসে ফোনের সামনে। তারযোগে ভারতবর্ষ থেকে সুদীর্ঘ সংবাদ আসছে আর তৎক্ষণাৎ তিনি সে-সব এণ্ডরুজের কাছে প্রেরণ করছেন। জীবনের প্রতিটি সংকট মুহূর্তের ন্যায় এবারও এণ্ডরুজ এক ঐশ্বরিক শক্তির সান্নিধ্য অনুভব করেন। তাতে তাঁর মস্তিষ্ক সজাগ, বুদ্ধিবৃত্তি তীক্ষ্ণ হয়ে ওঠে। পুনাচুক্তির ফলে গান্ধীজি তাঁর উপবাসভঙ্গ করলেন।

দক্ষিণ-ভারতের গুরুবায়ুরে একটি মন্দিরে অস্পৃশ্যদের প্রবেশের অধিকার দাবি করে ১৯৩২ সালের নবেম্বরের প্রথমভাগে এম. কেলাপ্পান নামে একজন সত্যাগ্রহী অনশন শুরু করলেন। গান্ধীজি ঘোষণা করলেন সে দাবি স্বীকৃত না হলে ১৯৩৩ সালের জানুয়ারির প্রথম থেকে তিনিও তাই করবেন। তাঁর এই সংকল্পের খবর পেয়ে এণ্ডরুজ তাঁকে এক দীর্ঘ পত্র লেখেন। সেখানে তিনি গান্ধীজিকে এই প্রশ্ন করেন যে আত্মহত্যা পর্যন্ত যদি টেনে নেওয়া যায় তবে উপবাসের নৈতিকতা থাকে কোথায়? আরো লিখলেন[১]—

> খ্রীস্ট যখন জেরুজালেমে যাবার জন্য দৃঢ় সংকল্প গ্রহণ করলেন তখন তিনিও এ রকম চাপ দিয়েছিলেন বলে আমার ধারণা।··· হয়তো তাঁর মনে হয়েছিল তাঁর মৃত্যুতে ইহুদী নেতারা অসৎকর্ম থেকে নিবৃত্ত হবেন।··· তা ছাড়া তিনি যে ধর্মমন্দির থেকে পাপাসক্তদের বহিষ্কার করেছিলেন— সেখানেও ছিল অন্যায় দমনে নৈতিক শক্তির প্রয়োগ। তবে অনশন, আত্মহত্যা— এ-সব এখনো আমার অত্যন্ত অরুচিকর ঠেকে।···

ভারতবর্ষে তখন যেন মহৎ সংস্কারসাধনের যুগ শুরু হল। কাশীর মতো তীর্থক্ষেত্রেও বর্ণহিন্দু ও হরিজনদের মধ্যে শুভবুদ্ধিপ্রসূত মিলনদৃশ্য অলৌকিক ঘটনার মতো প্রতিভাত হত। গান্ধীজির নতুন সাপ্তাহিক 'হরিজন' পত্রিকায় যুগ যুগ সঞ্চিত সামাজিক বাধা অপসারণের যে-সব বিবৃতি প্রকাশিত হত এণ্ডরুজ তা সুকৌশলে বিলাতে ব্রিটিশ সরকারের ঊর্ধ্বতন কর্মচারীদের গোচরীভূত করতেন আর সেখানকার ধর্মসংক্রান্ত পত্রপত্রিকায় প্রকাশ করতেন।

এ-সব উৎসাহের দিনেও মহাত্মা গান্ধীর মনে হল ঈশ্বরের নির্দেশে তাঁকে আরো তিন সপ্তাহের অনশনব্রত গ্রহণ করতে হবে সেবাকর্মে শুচিশুদ্ধতার প্রয়োজনে। খবরটি শুনে ইংলণ্ডের লোকের মনে এবার আর গান্ধীজির সত্যপরতায় সন্দেহ বা অবিশ্বাস এল না, এল বিস্ময়বিমূঢ়তা। এণ্ডরুজ ইংলণ্ড থেকে বন্ধুকে 'তার' প্রেরণ করলেন— 'সংকল্প গ্রহণ করো, প্রয়োজন বুঝেছি। অন্তরের ভালোবাসা জানাই।' গান্ধীজি তার উত্তরে লিখলেন,

---

১ গান্ধীজিকে লেখা এণ্ডরুজের চিঠি, ১০ নবেম্বর ১৯৩২। নিউ দিল্লী গান্ধী-স্মারক সংগ্রহালয় সমিতির সংগ্রহভুক্ত।

'তোমার 'তার'বার্তাটি আমি সযত্নে সংরক্ষণ করছি। তুমি যে আমার সংকল্পের মনোভাব সংগত বলে বুঝেছ তার জন্য ঈশ্বরের কাছে আমি কৃতজ্ঞ।'

এণ্ডরুজ অনুভব করলেন, এর ফল শুভ হবে। আগের সেপ্টেম্বরের মতো মানসিক সংঘাত তাঁকে অস্থির করল না। এবার যে একটি সীমাবদ্ধ কালের জন্য গান্ধীজির অনশন ঘোষণা, তাতেই এণ্ডরুজ অনেকটা নিশ্চিন্ত। তা সত্ত্বেও খবরটি আসার পর চার দিন লণ্ডনে কাটালেন। গান্ধীজির শর্তহীন কারামুক্তির প্রয়োজনীয়তার কথা সেখানে সকলকে জানালেন। ১৯৩৩ সালের ১৯ মে আইনত তাঁর ছাড়া পাবার কথা ছিল। ৮ মে তারিখে তিনি দ্বিপ্রহর বারোটায় অনশন শুরু করলেন, সেদিনই সন্ধ্যায় তাঁর কারামুক্তি হয়।[১] সেই অনশনের একুশ দিনের মধ্যে প্রতিদিনই এণ্ডরুজ তাঁকে একখানি করে 'তার' পাঠাতেন।

উডব্রুকের কোয়েকার আশ্রমে

১৯৩৩ সালে বার্মিংহামের প্রান্তে উডব্রুকের কোয়েকার আশ্রমের সদস্য হয়ে এণ্ডরুজ সেখানে বাস করছিলেন।

১৯২৮ সাল থেকে উডব্রুকের কোয়েকারদের সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক ঘনিষ্ঠ হয়েছিল। শান্তিনিকেতনের সঙ্গে এ আশ্রমের যোগাযোগ দৃঢ় হল দুই কারণে— প্রথমত ডঃ অমিয় চক্রবর্তীকে ফেলোশিপ প্রদান ও দ্বিতীয়ত ১৯৩০ সালে দু বার কবি-কর্তৃক এই আশ্রম পরিদর্শন। উডব্রুকের ঘরোয়া আবহাওয়া ও উদার আধ্যাত্মিকতা এণ্ডরুজের স্মরণে আনত অতিপ্রিয় ভারতীয় গৃহপরিবেশ। তাই লেখার জন্য বিশ্রামের প্রয়োজন হলে তিনি এখানেই চলে আসতেন।

Christ in the Silence পুস্তকটি এবার শেষ করে প্রকাশ করা চাই— এ-কথা এণ্ডরুজের মনে এল। এ পুস্তকে পাই সন্ত জন্-এর বাণী সম্বন্ধে তাঁর গভীর ধ্যানলব্ধ বিচার। এ সময়ে লেখা একখানি পত্রেই কেবল সেই অভিজ্ঞতার উল্লেখ পাই—

> চেতন ও অধ্যাত্মজগতের সীমারেখা আমি যেন উত্তীর্ণ হয়ে গেছি। তবে কি ভগবান কেবল ধর্মচেতনার মধ্য দিয়েই আমার জীবনে আসবেন অনির্দেশ্য রূপ ধরে?

---

১ Tendulk , *Mahatma*, vol. III, পৃ. ২০৩।

এণ্ডরুজের কাছে প্রশান্তির অর্থ কিন্তু বিরলে চোখ বন্ধ করে কেবলমাত্র ধ্যানধারণায় মগ্ন থাকা নয়। এই প্রশান্তির মধ্যে রয়েছে তাঁর কর্মরত জীবনের ভিত্তি। ভারতের অবস্থা শান্ত থাকলে তাঁকে যখন লণ্ডনে যাতায়াত করতে হত না, তখন প্রায় ভোর চারটা থেকেই তিনি চিন্তায় ও লেখায় ব্যস্ত থাকতেন। বিকেল হলেই বার্মিংহামের অলিতে গলিতে ঘুরে খুঁজতেন কোথায় দীনদরিদ্র, কোথায় রোগক্লিষ্ট, কোথায় কে একাকী অসহায় রয়েছে। চার্লি সম্বন্ধে গান্ধীজি এক বন্ধুর কাছে সুন্দর এক মন্তব্য করেন।[১]

যে-সব লোক ক্ষমতায় প্রতিষ্ঠিত তাদের সঙ্গে দেখা করা চার্লির কাছে গুরুভার কর্তব্যকর্ম, আর তোমার-আমার মতো লোকের কাছে আসায় ওর অপরিসীম আনন্দ। সংসার যাদের অসহায় দুর্বল বলে জানে— সে-সব লোকের সংযোগই হল চার্লির শক্তির ভিত্তি।

এই সময়ে নিজের পরিবারের সাহায্যে এণ্ডরুজকে নানাভাবে ব্যস্ত থাকতে হয়েছে। তাঁর ছোটো একটি ভাই মোটর-দুর্ঘটনার ফলে মস্তিষ্কে রক্তক্ষরণ-জনিত অসুস্থতায় ভোগেন। কিছুকাল তাঁকে হাসপাতালে থাকতে হয়। নিউজিল্যাণ্ডে যে-দুটি বোন ছিলেন তাঁদের একজনের স্বামী মারা যাবার পর বোনটি অত্যন্ত অসুস্থ হয়ে পড়েন। *What I Owe to Christ* বইটি বিক্রয়ের অর্থে ভাইবোন-দুটিকে সাহায্য করতে পেরে তিনি আশ্বস্ত হলেন।

কিন্তু ছোটোখাটো অন্যমনস্কতার অভ্যাস চার্লির সারাজীবনেও সংশোধন হল না। পাশ্চাত্যদেশে কোনো বাড়িতে তিনি অতিথি থাকলে গৃহকর্ত্রীকে ব্যতিব্যস্ত হয়ে উঠতে হত। সকাল সাড়ে-পাঁচটায় হয়তো দেখা গেল গ্রীষ্মকালের ভোরের রোদে বাড়ির সামনের দরজার বাইরে বসে তিনি পত্রিকার জন্য প্রবন্ধ লিখছেন। তার পরেই হয়তো শোবার ঘরের চটিজোড়া পায়ে দিয়ে প্রাতর্ভ্রমণে বেরলেন। উপাসনা করতে গিয়ে কোনো দিকে জ্ঞান থাকত না। দুপুরে খেতে আসতেন হয়তো এক ঘণ্টা দেরি করে।

এণ্ডরুজ সম্বন্ধে লোকে বলত, যে-টুপি পরে তিনি রেস্টুরেণ্টে ঢুকতেন, কখনো সেটি পরে তিনি বেরতেন না। আর পাজামা, মোজা আর রুমাল— এগুলো ব্যবহারের অযোগ্য না হওয়া পর্যন্ত তাঁর সে দিকে খেয়ালই যেত না।

---

১ দ্র. Chaturvedi & Sykes, *Charles Freer Andrews*, পৃ. ২৬৯।

বস্তুত অন্যমনস্ক অধ্যাপকের যে-কাহিনী প্রচলিত আছে, তিনি ছিলেন তার মূর্ত প্রতীক।

সাংসারিক বিষয়ে অনাসক্ত সাধুটি এক দিকে ক্যাবিনেট মন্ত্রীদের পরামর্শ-দাতা বা আর্তের বন্ধু, অন্য দিকে আবার তখনো মনেপ্রাণে প্রকৃতিপ্রেমিক বার্মিংহামের সেই স্কুলবালকটি রয়েছেন। এবার ইংলণ্ডের বসন্তকালে পুষ্পভারে সজ্জিত প্রকৃতির শোভা দেখলেন বহুকাল পরে। ঈস্টারের রবিবারে মা-বাবার সমাধিতে ড্যাফোডিল ফুল দিতে পেরে নিজেকে কৃতকৃতার্থ মনে করলেন।

গান্ধীজির ব্যক্তিগত সত্যাগ্রহ আন্দোলন

এ দিকে ভারতবর্ষে গান্ধীজি কয়েকজন সহচর নিয়ে (১ অগস্ট ১৯৩৩) সবরমতী থেকে পদযাত্রা শুরু করলেন ব্যক্তিগত সত্যাগ্রহ আন্দোলনের নেতা হিসাবে। তাঁকে একবছরের কারাদণ্ড দিয়ে পুনার যারবেদা জেলে আটক করা হল। আগের বছর মে মাসে জেলে থাকবার সময় 'হরিজন' পত্রিকার জন্য কাজ করার যে সুযোগ তাঁকে দেওয়া হয়েছিল, তা তিনি পুনরায় প্রার্থনা করলেন। কিন্তু এবার তাঁকে নিরাশ হতে হল। ১৬ অগস্ট থেকে আবার তাঁর প্রায়োপবেশন শুরু হয়।[১] এবারও আত্মশোধনের জন্য তিনি এ অনশনব্রত গ্রহণ করলেন।

পরদিন এণ্ডরুজ ইংলণ্ড থেকে ফিরে বোম্বাই নামলেন। লর্ড আরউইন, লর্ড স্যাঙ্কি, জেনারেল স্মাট্স্— সবাই তাঁকে বলে দিয়েছেন— তাঁদের বিশ্বাস ঈশ্বরই তাঁকে এবারকার কাজে ভারতে পাঠাচ্ছেন। যাবার সময় লর্ড আরউইন বিশেষ করে বললেন, 'ভারতের সেই অসাধারণ শুদ্ধসত্ত্ব মানুষটিকে আমার শ্রদ্ধা জানাবেন।' গান্ধীজি কিন্তু তারযোগে এণ্ডরুজকে পরামর্শ দিয়েছিলেন, তিনি যেন ইংলণ্ডেই থাকেন। গান্ধীজিকে তাঁর ভারতে প্রত্যাগমন-সংবাদ দিতে গিয়ে এণ্ডরুজ তাই লিখলেন, 'আশা করি, অনমনীয় কোনো প্রতিজ্ঞা-গ্রহণের পূর্বে তোমার সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ হবে।'

এবারকার প্রয়োপবেশনে গান্ধীজির শারীরিক অবস্থার দ্রুত অবনতি ঘটতে থাকে। তাই ২০ অগস্ট ১৯৩৩ তারিখে তাঁকে পুনার সাসুন হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হয়।

---

১ Tendulkar, *Mahatma*, vol. III, পৃ. ২১৪।

২৩ অগস্ট তারিখে গান্ধীজি বিনাশর্তে কারামুক্ত হন। বন্ধুর জীবনরক্ষায় এণ্ডরুজের অংশ কতখানি, হোরেস আলেকজাণ্ডারকে লেখা ২৮ অগস্ট তারিখের চিঠি পড়লে তা বুঝতে পারি। তিনি লিখছেন—

বুধবার অবস্থা সংকটজনক হয়েছিল। সকাল সাড়ে এগারোটার সময় তাঁকে দেখলাম অতি কষ্টে কথা বলছেন। শেষ সময় আসন্ন বুঝে ছোটো-খাটো জিনিসপত্র সবাইকে দিয়ে দিচ্ছেন। আমাকে পেয়ে তাঁর হাস্যকৌতুক শুরু হল। তখন প্রতিজ্ঞা করিয়ে নিলাম যতক্ষণ আমি চেষ্টা করব ততক্ষণ তাঁকে জীবনরক্ষার জন্য সংগ্রাম করে যেতে হবে। যদি বুঝতে পারি গভর্নমেণ্টের শেষ কথা বলা হয়ে গেছে, আমিই তাঁকে শান্তিতে মরতে দেব। প্রতিজ্ঞা করালাম, প্রাণধারণের জন্য তাঁকে জল খেতে হবে। তৎক্ষণাৎ চলে গেলাম স্বরাষ্ট্রসচিবের কাছে। বুঝলাম, ডাক্তার তাঁকে আশঙ্কার কথা আগেই জানিয়েছেন। আমি ফিরে আসতে আবার ডাক্তার এলেন, কিছুক্ষণের মধ্যে কারামুক্তির আদেশ স্বাক্ষরিত হয়ে এল।

গান্ধীজিকে তাঁর কারামুক্তির খবর দিতে গেলাম ডাক্তার কামাকে সঙ্গে নিয়ে। অ্যাম্বুলেন্স আসার আগে কমলালেবুর রস খাবার জন্য আমরা তাঁকে জোর করতে লাগলাম। সংস্কৃত মন্ত্রের আবৃত্তি করে আর তাঁর প্রিয় দুটি ইংরেজি গান গেয়ে আমি শোনালাম। ডাক্তার কামা বিদায় চাইতে এলে গান্ধীজি অনেক কষ্টে মাথা তুলে বললেন, 'ডাক্তার, তোমার অপরিসীম সহৃদয়তার জন্য আমি কৃতজ্ঞ।'

আমার অন্য নানা অসুবিধার মধ্যে প্রধান হল, যে পাড়ায় আমি ছিলাম সেটি তখন প্লেগ-অধ্যুষিত। যেদিন গান্ধীজির অবস্থা সংকটজনক সেদিনই আমাকে ইন্‌জেকশন নিতে হল অথচ এক মুহূর্তও বিশ্রামের অবসর নেই। তার ফলে সে রাতেই আমার খুব জ্বর এল। পাঁচদিন পরে কোনোমতে সুস্থ হয়ে উঠেছি। গান্ধীজির কারামুক্তির তিনদিন পরে তোমার চিঠিতে জানলাম আমার বন্ধু জন হোয়াইটের মৃত্যু হয়েছে।[১] রবিবারটি তাঁর সান্নিধ্যের অনুভূতি নিয়ে আমি শান্তিতে কাটিয়েছি।

১৯৩৩ সালের ৪ সেপ্টেম্বর তারিখে স্যামুয়েল হোরকে কিন্তু এণ্ডরুজ অন্য ধরনের এক পত্র লেখেন। তাঁকে লিখেছেন—

---

১ John White of Mashonaland— এণ্ডরুজ-রচিত এঁর একটি জীবনীগ্রন্থ আছে।

এক আসন্ন বিপদ থেকে আমরা দৈবযোগে উত্তীর্ণ হয়েছি। সামান্য সামান্য কারণে মহাত্মা গান্ধীর প্রাণ নিয়ে আমরা খেলা করতে পারি না। বর্তমানে ভারতবর্ষ যে প্রত্যক্ষ বিপদের সম্মুখীন হয়েছে তা হল ব্যক্তিগত সন্ত্রাসবাদ যা পরে জনসাধারণের মধ্যে হিংসাত্মক কাজে পরিণত হবে। তার বিরুদ্ধে গান্ধীজির এই অহিংসক নীতিই আমাদের পক্ষে পরম মূল্যবান প্রতিরোধক।

দায়িত্বশীল ভারতীয় নেতৃবৃন্দের সঙ্গে এণ্ডরুজও সন্ত্রাসবাদের নিন্দা করেন। তবে ইংরেজ হিসাবে সিমলার ইংরেজ কর্মচারীদের বলেন যে শুধু শাস্তিমূলক ব্যবস্থা অবলম্বন করলে এই রোগের বৃদ্ধিই হবে। বিচক্ষণ রাজনৈতিক মূল কারণ নির্ণয় করে গঠনমূলক কাজে নামতে হবে। যে বাঙালি ছাত্ররা এতকাল সরকারের দমননীতি ও গুপ্তচরবৃত্তির ফলে নির্যাতিত হয়েছে, যারা অর্থনৈতিক সংকটে বিপর্যস্ত— তারাই যে সন্ত্রাসবাদের কবলে পড়বে, এতে আশ্চর্যের কিছু নেই। ভারতীয় ছাত্রদের দিক থেকে বিষয়টি বিবেচনা করে সহানুভূতিসম্পন্ন হবার জন্য এণ্ডরুজ কর্তৃপক্ষের কাছে পুনরায় আবেদন জানালেন। ভারতীয় চরিত্রের বদান্যতা আকর্ষণের জন্য তাঁরা যেন সচেতনভাবে উদারনীতি অবলম্বন করেন— এ পরামর্শও এণ্ডরুজ ভারতের ব্রিটিশ শাসকবর্গকে দেন।

কোথাও কোনো সাড়া জাগল না। জওহরলাল বহু দায়িত্বশীল নরমপন্থীদের সঙ্গে মিলে একখানি দরখাস্তে স্বাক্ষর করেন। তাতে এই আবেদন ছিল যে, অপরাধীদের যেন আন্দামানে নির্বাসিত না করা হয়। সরকারপক্ষের সমর্থকরা মনে করলেন, এঁরাই বুঝি সন্ত্রাসবাদের উৎসাহদাতা। পাঞ্জাবের ভগৎসিংহের কার্যকে প্রকাশ্যভাবে নিন্দা করা সত্ত্বেও কর্তৃপক্ষ গান্ধীজিকে সন্ত্রাসবাদী দলভুক্ত বলে সন্দেহ করলেন। এরূপ নিষ্ঠুর অন্যায় অভিযোগের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে সংযতভাবে কথা বলা এণ্ডরুজের পক্ষে দুরূহ। তাই কখনো কখনো প্রবল আবেগভরে তিনি সাক্ষ্যপ্রমাণহীন মন্তব্য প্রয়োগ করে নিজের বক্তব্যকে দুর্বল করে ফেলতেন। হত্যাপ্রয়াসের অপরাধে অভিযুক্ত বীণা দাস ও অন্য বহু সন্ত্রাসবাদী তরুণতরুণীকে যাতে আন্দামানে না পাঠানো হয় এণ্ডরুজ তার জন্যও চেষ্টা করেন।[১]

---

১ বীণা দাসের ভগ্নী কল্যাণী ও শ্রীবিনয়েন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ৩০ আশ্বিন ১৩৩৯ সন্ধ্যায় শান্তিনিকেতনে এসে অনুরোধ জানানোর পর রবীন্দ্রনাথ এণ্ডরুজ-মারফৎ তার-বার্তায় লেডি জ্যাকসনকে অনুরূপ আবেদন পাঠান।

ভারতের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে উন্নতি সাধনের চেষ্টা করতে ১৯৩৩ সালে নবেম্বরের শেষে এণ্ডরুজ আবার ইংলণ্ডে ফিরলেন। সেখানে মাদ্রাজের 'হিন্দু' পত্রিকার প্রতিনিধির সঙ্গে এক সাক্ষাৎকারে তিনি বলেন, 'ভারতবর্ষ সম্বন্ধে ইংরেজের নৈতিকবোধ উন্নত করার দায়িত্ব নিয়ে আমি প্রচারকার্য চালিয়ে যাচ্ছি।' তাই কেবল লণ্ডনে বাস না করে ইংলণ্ডে যত বিশ্ববিদ্যালয়, যত ধর্মপ্রতিষ্ঠান আছে সবগুলির সঙ্গে যোগসূত্র রক্ষা করে এণ্ডরুজ অগ্রসর হলেন, কেননা এই-সব স্থানেই ইংরেজ জনসাধারণের মতামত গড়ে ওঠে ও তাদের নৈতিক বোধ জাগ্রত হয়।

১৯৩৪ সালের ১৫ জানুয়ারি তারিখে বিহারে প্রচণ্ড ভূমিকম্পের ধ্বংসলীলা দেখা যায়। রবীন্দ্রনাথ এণ্ডরুজকে বিস্তৃত এক তারবার্তায় ক্ষতির পরিমাণ জানিয়ে খবরটি পাঠালেন। তৎক্ষণাৎ অর্থসংগ্রহে সচেষ্ট হলেন এণ্ডরুজ। পরের চারটি মাস কাটল ব্রিটিশ দ্বীপপুঞ্জ ও পশ্চিম-ইউরোপের বড়ো বড়ো শহরগুলি ভ্রমণে। যেখানেই গেছেন বক্তৃতায় রেডিওর মাধ্যমে এবং পত্র-পত্রিকায় বিহারের সহায়তার জন্য আবেদন জানিয়েছেন। *The Indian Earthquake* নামে একটি ক্ষুদ্র পুস্তিকাও দ্রুত প্রকাশ করে ফেললেন।

চাঁদা-সংগ্রহের চেষ্টায় এণ্ডরুজ যখন সুইডেনে যান তখনকার একটি ঘটনা প্রত্যক্ষদর্শীর বিবরণ থেকে এখানে লিপিবদ্ধ হল[১]—

> যেদিন তিনি স্টকহল্‌মের প্রকাণ্ড হলে দাঁড়িয়ে বিহারের প্রাকৃতিক দুর্যোগের বর্ণনা দিচ্ছেন, সেদিন এই আত্মভোলা সাধকের তালি-দেওয়া ক্যান্‌ভাসের জুতোর দিকে সভার শ্রোতাদের অনেকের নজর পড়েছিল।
>
> সে দেশ থেকে যেদিন তিনি বিদায় নিয়ে যান, দেখা গেল তাঁকে বিশেষ সম্মান দেখাবার জন্য ট্রেনের কামরাটি মহার্ঘ ফুলে সজ্জিত করা হয়েছে। আর স্টেশনে যাঁরা তাঁকে বিদায়-সম্বর্ধনা জানাতে এসেছেন অনেকের হাতে একটি করে জুতোর বাক্স। এণ্ডরুজ তাকিয়ে তাকিয়ে তাঁদের দেখলেন আর মৃদু মৃদু হাসলেন। ট্রেনের সীটের নীচে এরূপ অনেক জোড়া জুতো সেবার জড়ো হয়েছিল। সর্বত্র জনসাধারণের ভক্তিশ্রদ্ধা এভাবে তিনি আকর্ষণ করেছেন দিনের পর দিন।

---

১ লক্ষ্মীশ্বর সিংহ— বিশ্বভারতীর প্রাক্তন ছাত্র ও অধ্যাপক।

১৯৩৪ সালের মে মাসের মাঝামাঝি আবার তিনি দক্ষিণ-আফ্রিকার দিকে যাত্রা করলেন।

সেই বছরেরই অগস্ট মাসে ভারতবর্ষে ফিরে এলেন তাঁর 'সব হতে আপন' শান্তিনিকেতনে। অমিয় চক্রবর্তী লিখছেন[১]—'সি. এফ. এ. আজ এলেন। সমস্ত আশ্রম একেবারে চঞ্চল হয়ে উঠেছে। কবি তো তাঁকে দেখে শিশুর মতো খুশিতে আত্মহারা।' তাঁর ভালোবাসায় শান্তিনিকেতনের দাবি এবং তাঁর জীবনের বৃহৎ কর্মক্ষেত্র সম্পর্কে এণ্ডরুজের মনে এখন আর কোনো দ্বিধা বা সমস্যা নেই। ১৯৩২ সালে কবিকে তিনি লিখেছিলেন, 'শান্তিনিকেতনের পরিধি এখন সমগ্র জগতে বিস্তৃত। তাই কেন্দ্রের প্রতি ধ্রুব থাকতে হলে সমগ্র পরিধি এখন আমাকে ভ্রমণ করতেই হবে।'

১৯৩৪-৩৫ সালের লিপিবদ্ধ কার্যবিবরণী দেখে বুঝতে পারি এণ্ডরুজের শান্তিসংস্থাপকের ভূমিকা ছিল ব্রিটিশ ও ভারতীয়— এই দুই পক্ষের মধ্য-ভূমিতে। ১৯৩৫ সালে এণ্ডরুজ ইংলণ্ডে। এক বেতার ভাষণে তিনি ব্রিটিশ জনসাধারণের নিকট আবেদন জানান। সেখানে তাদের সুপ্ত মানবিকতাকে স্পর্শ করে বলেন[২]—

> ভারতের মনোভাবই আমাদের প্রধান বিচার্য বিষয়।… পূর্ণ স্বাধীনতা, পূর্ণ জাতীয়তা ও জাতিগত সমতা— যদি আমাদের মূলনীতি হয়, তবে শর্ত নিয়ে কোনো বিবাদ-বিসম্বাদ আসতেই পারে না। এখনো ভারতবর্ষের মনস্তত্ত্ব বুঝে হৃদয় স্পর্শ করতে পারি নি আমরা, তাই সমস্ত শুভেচ্ছা সত্ত্বেও আমরা এতকাল ভুলপথে এগিয়েছি।… ভারতের নতুন শাসন-ব্যবস্থায় গোলটেবিল আলোচনায় প্রতিশ্রুত ডোমিনিয়ান স্ট্যাটাসের উল্লেখমাত্র নেই। কেন্দ্রীয় আইনসভা গঠন করে সেখানে প্রগতিবিরোধী সব সামাজিক ও অর্থনৈতিক স্বার্থ সুরক্ষিত করার ব্যবস্থা পূর্বেই হয়ে গেছে,। ভারতীয়রা তাই স্বভাবতই একে বিশ্বাসভঙ্গ হিসাবে ধরেছে।

India & Britain— A Moral Challenge পুস্তকটি এ সময়ে লেখেন। আরো দুটি বিষয়ে এণ্ডরুজ ইণ্ডিয়া অফিসের দৃষ্টি আকর্ষণ করলেন।

---

১ Chaturvedi & Sykes, *Charles Freer Andrews*, পৃ. ২৭৭।

২ *The Listener*, 25 January 1935; অপিচ দ্র. Chaturvedi & Sykes, *Charles Freer Andrews*, পৃ. ২৭৯।

প্রথমত ভারতীয় খ্রীস্টান সম্প্রদায়ের গুরুত্বপূর্ণ অধিকার সম্বন্ধে। ভারতীয় খ্রীস্টানদের একটি দল সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারার অন্তর্বর্তী হতে অস্বীকৃত হন। ধর্মযাজক সংস্থাকে কেন্দ্রের 'নিজস্ব বিষয়' বলে আলাদা করে রাখার প্রস্তাবও অনেকের মনঃপূত নয়। এণ্ডরুজের সর্বদা চেষ্টা ছিল ভারতীয় খ্রীস্টান ধর্মযাজক সংস্থাকে কেন্দ্রের আওতা থেকে মুক্ত রাখার।

দ্বিতীয় প্রস্তাবে অনুরোধ করলেন ১৯৩৫ সালে ইংলণ্ডের রাজার জুবিলী উৎসব উপলক্ষে জওহরলাল নেহরু ও আবদুল গফ্‌ফর খাঁকে যেন মুক্তি দেওয়া হয়। এটি বিবেচনা করতে সরকার অস্বীকৃত হলে এণ্ডরুজ সংযত ভদ্র ভাষাতে তাঁদের অবিমৃষ্যকারিতার নিন্দা করলেন।

এণ্ডরুজ স্থির করলেন ১৯৩৫ সালের গ্রীষ্মকালে আবার ভারতবর্ষে যাবেন। পরীক্ষা করবেন সরকারের নতুন আইনগুলির প্রবর্তনের ফলে ভারতের জাতীয় জীবনে কিছু উন্নতি দেখা দিয়েছে কি না।

তিনি ভারতে পৌঁছবার কিছুদিন পরেই কোয়েটায় ভূমিকম্প হয়। প্রেসের সরকারি বিজ্ঞপ্তিতে এ দুর্ঘটনায় হতাহত সম্পর্কে বর্ণবৈষম্যমূলক আচরণে ভারতবাসীর মনে গভীর তিক্ততার সৃষ্টি হয়। ৭ জুন ১৯৩৫ তারিখে আগাথা হ্যারিসনকে এণ্ডরুজ লিখলেন—

> কোয়েটায় কত শত মিলিটারি অফিসার ছিল। তারা ইচ্ছা করলেই জীবিত ভারতীয়দের নাম প্রকাশ করে পাঠাতে পারত। তাতেই লোকে সান্ত্বনা পেত। কিন্তু চারদিন ধরে পত্রিকায় কেবল পাওয়া গেল প্রত্যেকটি মৃত আহত ও জীবিত ইউরোপীয়ের নামের তালিকা।

অবস্থা আরো সঙ্গিন হল যখন গান্ধীজি কোয়েটায় যেতে বাধা পেলেন। সেই বাধা অপসারণের জন্য এণ্ডরুজ ঘণ্টার পর ঘণ্টা সেক্রেটারিয়েটে কাটালেন; কিন্তু সব চেষ্টাই ব্যর্থ হল। রাগে অধীর হয়ে তিনি বললেন, 'এক ফোঁটা সাধারণ বুদ্ধি এদের মগজে ঢোকানো একেবারেই অসম্ভব। এদের ধারণা প্রত্যেকটি ভারতীয় খুব নিশ্চিন্তে সুখে আছে, যে লোকটি কেবল অসন্তোষের সৃষ্টি করছে সে হল, সি. এফ. এণ্ডরুজ।'

দক্ষিণ ও পূর্ব-আফ্রিকায় নৈতিক জয়

১৯৩১ সালের জানুয়ারি, ১৯৩২ সালের জানুয়ারি ও ১৯৩৪ সালের জুন মাসে এণ্ডরুজ তিনবার অল্প কিছুদিনের জন্য দক্ষিণ-আফ্রিকায় যান। এই

তিনবারের ভ্রমণে সেখানকার ভারতীয় সমস্যা সম্বন্ধে তাঁর মনোভাবে ক্রমশ কিছু কিছু পরিবর্তন আসে। এই সময় থেকেই তিনি এই মত প্রকাশ করেন যে যে-সব ভারতীয় দক্ষিণ-আফ্রিকায় জন্মগ্রহণ করেছে তাদের নিজেদের রক্ষণা-বেক্ষণের জন্য আর ভারতের উপর নির্ভর করা ঠিক নয়, নিজেদের দক্ষিণ-আফ্রিকাবাসী মনে করে তারা নিজেদের সংগ্রাম নিজেরাই করবে। সে সংগ্রামে যীশুখ্রীস্টের ভক্ত হিসেবে এণ্ডরুজ চিরকালই বন্ধুভাবে তাদের পাশে থাকবেন। আফ্রিকায় বর্ণবিদ্বেষের বিরুদ্ধে যে সংগ্রাম তাঁকে করতে হবে তাতে ভারতে ব্রিটিশ সরকারের সাহায্যের চেয়ে খ্রীস্টজনসংঘের নৈতিক প্রভাবের উপর তাঁর নির্ভর ছিল বেশি।

এই সময়ে দক্ষিণ-আফ্রিকায় বিভিন্ন জাতিকে পৃথক করার উদ্দেশ্যে একটি বিলের প্রস্তাব করা হয়। এণ্ডরুজ তৎক্ষণাৎ বিলটি কী উপায়ে বন্ধ করা যায়, তার চেষ্টা নানাভাবে করতে লাগলেন। উদারমতাবলম্বী ইউরোপীয় পত্র-পত্রিকাগুলি তাঁকে এই বিষয়ে সমর্থন করল। কিছুকাল পরে দেখা গেল দক্ষিণ-আফ্রিকা সরকার বিলটি সাময়িকভাবে রদ করেছেন। এণ্ডরুজের জয় হল এবং এটিকে তাঁর আশ্চর্য বিজয় বলে তিনি বর্ণনা করেছেন।

এ বিজয়ের একটি প্রধান কারণ হল, দক্ষিণ-আফ্রিকার লোকের কাছে তিনিও ছিলেন দক্ষিণ-আফ্রিকাবাসী। তারা তাঁকে আপন বলে মানত। সেখানকার বিশিষ্ট ব্যক্তিদের নামের তালিকায় এণ্ডরুজের নামও ছিল। ঘরদোরের অপরিচ্ছন্নতা বা দলাদলির জন্য ডারবানের ভারতীয় শ্রমিকদের তিনি যে ভাবে তিরস্কার করতেন কোনো বাইরের লোক তা করতে সাহস পাবে না। তারা কিন্তু বিনীতভাবে তাঁর শাসন মেনে নিত। কেপটাউনে ডারবানে বহু গৃহে শিশুরা চাচা চার্লিকে দেখে উৎসাহে ঝাঁপিয়ে পড়ত আর তাঁর জন্মদিনে ফুল ও নানা উপহার নিয়ে তাঁকে শুভেচ্ছা জানাত।

পূর্ব-আফ্রিকাতে তাঁর কাজের প্রণালীও ছিল ঠিক একই রকম। সাম্প্রদায়িক ভোটাধিকার ও পৃথকীকরণ নীতির বিরুদ্ধে কেনিয়ার ভারতীয়দের দীর্ঘ সংগ্রামে তিনি ক্রমান্বয়ে তাঁদের সহায়তা করে যান। ভারতবর্ষের জনসাধারণের কাছে সাহায্য কেবল একবারের সংগ্রামেই তিনি চেয়েছিলেন— সেটি হল জাঞ্জিবারে ১৯৩৪ সালে।

কেনিয়া বা দক্ষিণ-আফ্রিকায় যাবার পথে বা সেখান থেকে ফেরার সময় অনেকবারই তিনি জাঞ্জিবারের ভারতীয়দের কাছে দু-একদিন থেকে গেছেন। অনেক সময় সকৌতুকে বলতেন— জাঞ্জিবার অঞ্চলটি একটি ক্ষুদ্র ভূস্বর্গবিশেষ। সেখানে যে লবঙ্গের কারবার গড়ে উঠেছিল তার উপরই সে দেশের সমৃদ্ধি নির্ভর করত। ভারতীয়দের উৎসাহেই এর শুরু। সেখানকার অন্যান্য সম্প্রদায় ও ইংরেজ সরকারি কর্মচারীদের সঙ্গে ভারতীয়দের সম্পর্ক ছিল সম্প্রীতি ও সৌজন্য -সম্মত।

১৯৩৪ সালে যখন দক্ষিণ-আফ্রিকা থেকে এণ্ডরুজ জাঞ্জিবারে গেলেন তখন সমস্ত দ্বীপটিতে বিক্ষোভ চলেছে। ব্যাপারটি লবঙ্গ-ব্যবসায় সংক্রান্ত। যুদ্ধোত্তরকালে হঠাৎ লবঙ্গের দাম কমে যাওয়াতে বিশেষ করে ভারতীয় ব্যবসায়ীরা অত্যন্ত ক্ষতিগ্রস্ত হন। তখন জাঞ্জিবার সরকারের স্বার্থরক্ষার্থে দুটি অর্ডিন্যান্স প্রণয়ন করা হয়। কিন্তু এ অর্ডিন্যান্স চালু হলে দেখা গেল এতে ভারতীয়, যারা জাঞ্জিবারে জন্মেছে, তাদের স্বার্থ অত্যধিক পরিমাণে ক্ষুণ্ণ হচ্ছে।

ভারতবর্ষে এসে এণ্ডরুজ ভারতীয় পত্রিকায় দীর্ঘ প্রবন্ধাদি লেখেন ও *Zanzibar Crisis* নামক পুস্তিকায় স্পষ্ট ভাষায় জাঞ্জিবারের সমস্যাটি তুলে ধরেন। তার ফলে ভারতবর্ষ জাঞ্জিবারের লবঙ্গ বয়কট করে (১৯৩৭)। এতে জাঞ্জিবারের লবঙ্গ-ব্যবসায়ে চরম অবনতি দেখা দেয়। জাঞ্জিবার সরকার বাধ্য হয়ে অর্ডিন্যান্সগুলি প্রত্যাহার করেন।

মানুষে মানুষে বর্ণবৈষম্য আর জাতি ও সম্প্রদায় -গত ভেদভাবের অমর্যাদা ও অবিচারের বিরুদ্ধে এণ্ডরুজ সারাজীবন সংগ্রাম করে চলেছেন— প্রবলপ্রতাপ শক্তিমানদের সঙ্গে দীনদরিদ্রদের পক্ষ নিয়ে।

৮

জীবন-সায়াহ্ন

১৯৩৫ সাল। এণ্ডরুজের বয়স ৬৪ বৎসর। তাঁর জীবনের উষালগ্নে জ্ঞান ও ধর্মানুভবের নিবিড় যোগে প্রেমের যে আলো জ্বলেছিল অন্তরে, আজও তা স্তিমিত হয় নি। তারই ঘর-ছাড়ানো ডাকে বেরিয়ে পড়েছিলেন দেশবিদেশে নিগৃহীত বঞ্চিত মূক জনগণের মানব-অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য সংগ্রামের উদ্দেশে। এখনো তার বিরাম নেই।

ছাত্রসমাজের সংস্পর্শে

এই সময়ে এণ্ডরুজ বিশেষভাবে ছাত্রসমাজের ঘনিষ্ঠ সংস্পর্শে আসেন। কী ব্রিটেনে, কী ভারতবর্ষে— সর্বত্রই ছাত্রসমাজ তাঁর চিরপ্রিয় ছিল। এখানে একটু আগের কথা বলি। ১৯২৮ সালে এণ্ডরুজ ইংলণ্ডের বহু বিশ্ববিদ্যালয়ে ভারতীয় জীবনাদর্শের পরিচয় গভীর মমত্বের সঙ্গে বিবৃত করেন। ১৯২৯ সালের জানুয়ারি মাসের প্রথম ভাগে লিভারপুলে Student Christian Movement-এর চতুর্বার্ষিক সম্মেলনে যোগ দেবার আগ্রহে তাঁর যুক্তরাষ্ট্রে যাবার তারিখ পিছিয়ে দেন। সেই সম্মেলনে যে বাণী তিনি ভাষণের মাধ্যমে প্রচার করেন, ছাত্রজগতের সঙ্গে তাঁর বন্ধুত্বের মূলে রয়েছে তারই অনুপ্রেরণা।

সেখানে তিনি বলেন[১]—

> আমার বয়স হল প্রায় ষাট।··· এখন প্রাণের একমাত্র কামনা যে খ্রীস্টের মহান নাম নিয়ে দেশে দেশে জাতিগত সংকীর্ণতা ঘুচিয়ে দেব ও খ্রীস্টসংঘের মধ্যে সেই ক্ষুদ্রতার উচ্ছেদসাধন করব। এ-সব কাজ এখনকার তরুণসমাজের হাতে ছেড়ে যেতে পারলে আমরা, বৃদ্ধরা আনন্দিত হব। কেননা আদর্শের প্রতি অনুরাগই তরুণের মনে রয়েছে। বৃদ্ধবয়সের স্বার্থবুদ্ধি এখনো তাকে স্পর্শ করে নি। তাই এখনো সে দৃপ্ত সাহসে এগিয়ে চলতে পারে।

১৯৩৫ সালের জানুয়ারি মাসেই শেষ সপ্তাহে উইনস্টন চার্চিল বি. বি. সি.র বেতারে ভারতবর্ষ সম্বন্ধে এক ভাষণ দেন। তার ফলে অক্সফোর্ডের একটি সভায় ভারতীয় ও ব্রিটিশ ছাত্রদের মধ্যে তীব্র বিতর্ক শুরু হয়। সে সভায়

---

১ Chaturvedi & Sykes, *Charles Freer Andrews*, পৃ. ২৮৮।

এণ্ডরুজ উপস্থিত ছিলেন। তাঁর *India & Britain* পুস্তকের আলোচনার সূত্র ছিল সেই প্রসঙ্গেই। কিছুদিন পরে এণ্ডরুজ কেম্‌ব্রিজে বক্তৃতা দিচ্ছিলেন। ভারতবর্ষ ব্রিটিশ-স্বার্থেই ব্রিটিশের অধিগত বলে চার্চিলের সে উদ্ধত দাবি এণ্ডরুজ তখনো ভুলতে পারেন নি।

১৯৩৫ সালের ফেব্রুয়ারি-মার্চ মাসে এণ্ডরুজ পশ্চিম-আফ্রিকাতে ছিলেন। সেখানে ঘানার আচিমোতা-স্থিত কলেজের অধ্যক্ষ তখন রেভারেণ্ড এ. জি. ফ্রেজার। ইনিই ১৯২৮ সালে এণ্ডরুজের সঙ্গে স্যার গর্ডন গাগিসবার্গ-এর পরিচয় করিয়ে দিয়েছিলেন। এণ্ডরুজ আফ্রিকাবাসীদের মঙ্গলকামী ছিলেন বলে তাদের শিক্ষাসংস্থা, ব্যাবসা-বাণিজ্যের ব্যবস্থা— সবই দেখতে চাইলেন। ছয়সপ্তাহ এখানে কাটল। আচিমোতাতে একদিন 'যীশুখ্রীস্ট ও উপাসনা' বিষয়ে বললেন। এখানকার লোকসংস্কৃতি, অধিবাসীদের রীতিনীতি, পর্ব-উৎসবাদি এবং তাদের জাতীয় জীবনে খ্রীস্টধর্মের প্রভাব— ইত্যাদি বিষয় আগ্রহভরে লক্ষ্য করতে লাগলেন।

সমুদ্র থেকে দূরে 'আশাণ্টি' রাজাদের অঞ্চলে গিয়ে সেখানকার নতুন স্বর্ণখনিগুলিতে কী কাজ হচ্ছে তা নিজের চোখে দেখলেন। সোনার বাজার তখন খুব চড়া, কিন্তু ওই দেশের পক্ষেও তা মঙ্গলকর কি না সে বিষয়ে তাঁর মনে সন্দেহ জাগে। সাধারণ লোকের স্বাস্থ্য ও শান্তি ব্যাহত হবার দুটি কারণ তিনি দেখতে পেয়েছিলেন। প্রথমত বনজঙ্গল কেটে পরিষ্কার করার ফলে জমির ক্ষতি, এবং দ্বিতীয়ত দূর দূর থেকে চাকুরি করার জন্য লোক এসে পড়ায় স্থানীয় লোকদের গৃহস্থজীবন অশান্তিগ্রস্ত হবার সম্ভাবনা।

আফ্রিকার কর্তব্য শেষ হলে এণ্ডরুজ ভারতে ফেরেন এবং এখানেই ১৯৩৫ সালের মাঝামাঝি সময়ে *India & Britain* নামক গ্রন্থরচনা শেষ হল। এবারে এণ্ডরুজ খুঁজে পেলেন তাঁর প্রবীণ বয়সের উপযোগী নবীন কর্মক্ষেত্রের সন্ধান। গান্ধীজি এবং অন্যান্য বন্ধুরা বলেছিলেন, এবার সক্রিয় রাজনৈতিক ক্ষেত্র থেকে তাঁর অবসর নেওয়া উচিত। এখন লেখার দিকে তাঁর মন সন্নিবিষ্ট করতে পারলে ভালো হয়। প্রথম জীবনে শান্তিনিকেতনে গিয়ে তিনি পূর্ব-পশ্চিমে ধর্মব্যাখ্যাতার ভূমিকা নেবার যে স্বপ্ন দেখেছিলেন, এতদিনে তাঁরও মনে হতে লাগল যেন সেই সময় এসেছে। চিন্তাজগতেও প্রেরণা এল— মধ্যযুগের ভক্তিসাধক ভারতীয় কবিদের রচনার সঙ্গে St. Bernard of Clairvaux নামক সাধকের খ্রীস্টস্তুতিবিষয়ক গানগুলির

তুলনামূলক মূল্যায়ন গড়ে তোলার। সাধারণ মানুষের উপর উভয় ধারার রচনার প্রভাবই সমান এবং দুই দেশের বিশেষ রাজনৈতিক অবস্থার সন্ধিক্ষণেই সেগুলি লেখা হয়। এই আলোচনাসূত্রেই ধীরে ধীরে কেম্‌ব্রিজের কথা তাঁর মনে পড়ল। সেখানে প্রকাণ্ড লাইব্রেরি আছে, অনুসন্ধিৎসু ব্যক্তিদের শান্তিতে বিদ্যানুশীলনের জন্য সুব্যবস্থা রয়েছে। সেখান থেকে তিনি এমন একটি বই লিখবেন যাতে ভারতবাসীদের কাছে সেন্ট বার্নার্ডের অতীন্দ্রিয় চিন্তাধারা সুস্পষ্ট হয়। তা ছাড়া অক্টোবর মাসে *India & Britain* পুস্তকটিও প্রকাশিত হবার কথা। সেটিকেও এর মধ্যে ছাপার উপযুক্ত করে নিতে হবে।

এরই মধ্যে ব্যবস্থা একটি হয়ে গেল। পেম্‌ব্রোক কলেজে পর পর দুই বছর (১৯৩৫, ১৯৩৬) শীতকালীন পর্বে তাঁকে অনারারি ফেলো নিযুক্ত করা হয়। এতে তিনি বিশেষ আনন্দ পান, কারণ এই পেম্‌ব্রোক কলেজেই তাঁর পড়াশোনা, তাঁর সেবাকর্মের আরম্ভ।

অনারারি ফেলো হিসাবে পেম্‌ব্রোক কলেজে তিনি থাকার ঘর একটি পেয়েছিলেন। সেখানে তাঁর রাতের খাবার ব্যবস্থাও ছিল। অন্য সবরকম খাবার ব্যবস্থা তাঁকে নিজেকেই করতে হত। রান্নার কাজে অনভ্যাস, তাই মাঝে মাঝে মুশকিলে পড়তে হত। বন্ধুদের একদিন বললেন, 'দেশলাই না পাওয়াতে গ্যাসের উনুনও ধরানো হল না, চা-ও করতে পারলাম না।' আবার একদিন বললেন, 'রুথকে বোলো ওর দেশলাইগুলো চমৎকার। এতকাল একরকম ছোটো ছোটো দেশলাই ব্যবহার করেছি। কেন যে আমার আঙুল পুড়ে যেত বুঝতেই পারতাম না।' ধোপার খরচ বেশি, তাই ছ পেনি দিয়ে একটি ইস্ত্রি কিনে ফেললেন। সেটি নিয়ে খুব গর্ব। হঠাৎ একদিন দেখেন তাঁর একমাত্র উলের শালখানির অনেকটা জায়গা পুড়ে গেছে, কেননা সেখানিই তিনি ইস্ত্রির কাপড়ের নীচে পাতবার কম্বল হিসেবে ব্যবহার করেছেন।

Christ in Prayer বিষয়ে বক্তৃতা দেবার জন্য তাঁকে কেম্‌ব্রিজে আহ্বান করা হয়। বক্তৃতার ঘর লোকে ভরা, বক্তার চেহারায় স্বর্গীয় দীপ্তি। কেম্‌ব্রিজের ছাত্ররা তাঁর ভাষণে মুগ্ধ ও আকৃষ্ট।

শ্রীমতী আগাথা হ্যারিসনকে চিঠিতে লিখলেন[১]—

---

১ আগাথা হ্যারিসনকে (নবেম্বর ১৯৩৪) লেখা চিঠি। দ্র. Chaturvedi & Sykes, *Charles Freer Andrews*, পৃ. ২৯২।

এখানে বন্ধুরা আমাকে দু হাত বাড়িয়ে নিলেন— যেমন কোয়েকার ছাত্ররা তেমনি কেম্‌ব্রিজের ভারতীয়রা। কলেজে কতকগুলি কর্তব্য আমার আছে। সকাল সাড়ে সাতটায় আর সন্ধ্যা সাতটায় উপাসনা। প্রতিদিন সন্ধ্যায় কিছুক্ষণ বক্তৃতা। এ-সবের পরেও যখন আমার সঙ্গে দেখা করতে লোকজন আসেন সকাল সকাল শুতে যাওয়া আমার পক্ষে অসম্ভব হয়ে ওঠে। আর তুমি তো জানো ভোরে ওঠা আমার অভ্যাস।

কয়েকটি জায়গায় যেতে খুব ভালো লাগে। কিংস্‌ কলেজ চ্যাপেলে রবিবার বিকেলের উপাসনা, কলেজের বাগানে হেঁটে বেড়ানো, চার দিককার তরুণ জীবনের সংস্পর্শ, বিশ্ববিদ্যালয়ের নতুন গ্রন্থাগার— এ-সব আবার নতুন করে উপভোগের আনন্দ পাই। কিন্তু তবুও এক-এক সময় ভারতবর্ষের জন্য আমার মন কেমন করে।

১৯৩৬ সালে এভাবে কেম্‌ব্রিজ ও অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদের সঙ্গে যে ঘনিষ্ঠ সম্পর্কে এলেন তার ফলে World Student Christian Federation থেকে তাঁর কাছে আমন্ত্রণ এল তিনি যেন নিউজিল্যাণ্ড ও অস্ট্রেলিয়াতে বিশ্ববিদ্যালয় মিশন পরিচালনা করেন। আমন্ত্রণটি গ্রহণ করে তিনি তৎক্ষণাৎ ইংলণ্ড ত্যাগ করলেন। ১৯৩৬ সালের ২০ মার্চ যখন সাউদাম্পটন থেকে জাহাজে উঠলেন তখনো সেণ্ট বার্নার্ড সম্বন্ধে গবেষণার কাজ শুরুই হয় নি। তবে *Challenge of the North-West Frontier* পুস্তকের অসম্পূর্ণ পাণ্ডুলিপি সঙ্গে করে নিয়ে যান।

নিউজিল্যাণ্ডের পথে ফিজি দ্বীপে

ষোলো বছর আগে (১৯২০) চুক্তিদাসপ্রথা থেকে মুক্তি পেয়েছে ফিজিবাসী ভারতীয় শ্রমিকরা। এবার নিউজিল্যাণ্ড যাওয়াতে ফিজিবাসীর অবস্থা নিজের চোখে দেখা সম্ভব হবে তাঁর পক্ষে। তাই নিউজিল্যাণ্ড ও অস্ট্রেলিয়ার বিশ্ববিদ্যালয়-মিশনের অধিবেশন শুরু হবার আগেই তিনি আর-একবার ফিজি দ্বীপে গেলেন।

ফিজি দ্বীপের ভারতীয়দের নাগরিক অধিকার ক্ষুণ্ণ হবার সম্ভাবনায় তারা এণ্ডরুজের পরামর্শ চাইল। ফিজি আইনসভার প্রতিনিধি নির্ধারণে ভারতীয়রা দাবি করল নির্বাচন-নীতি। কয়েকজন ফিজিবাসী ও ইউরোপীয় অধিবাসীরা চায় মনোনয়ন-নীতি। ফিজি-সরকার ও ভারত-সরকারকে একটি স্মারকলিপি

পাঠিয়ে এণ্ডরুজ পরামর্শ দিলেন, সামান্য পরিবর্তন করে নির্বাচন-নীতিই রক্ষা করা হোক। সাম্প্রদায়িক ভিত্তিতে প্রত্যেক জাতি তিনটি করে সদস্য মনোনয়ন করুক। গভর্নরও স্বয়ং প্রত্যেক সম্প্রদায় থেকে একজন সদস্য নির্বাচন করুন যাতে সংখ্যালঘুদের স্বার্থ বজায় থাকে।

রাজনৈতিক ব্যবস্থার চেয়ে জমির বণ্টন ও শিক্ষাব্যবস্থা তাঁর চোখে অধিক গুরুত্বপূর্ণ ছিল। এবারকার ফিজি ভ্রমণে *India & the Pacific* পুস্তকের তথ্যসংগ্রহ করা হয়। বইটির রচনা শেষ হয় সিমলায়, একবছর পরে। তাঁর মতে ফিজি ও ব্রিটিশ-গিয়ানায় ভূমিবণ্টনের সুব্যবস্থা করে শহরে বাস করার অস্বাভাবিক অবস্থা থেকে জনসাধারণকে রক্ষা করা চাই। কেবলমাত্র আখচাষের জন্য সমস্ত জমি মজুত না রেখে মিশ্রিত চাষ করলে ফিজিবাসীরা নিজেদের খাবার জন্য ধানচালের কষ্টভোগ করবে না। ফিজি-নিবাসীদের সঙ্গে সঙ্গে ভারতীয় চাষীরাও যেন উর্বর জমির ভাগ থেকে বঞ্চিত না হয়। ফিজিতে শিক্ষা, বিশেষ করে ধর্মশিক্ষার কোনো ব্যবস্থাই নেই। এখানেও মেয়েদের বিবাহযোগ্য সব চেয়ে কম বয়স চোদ্দ বছর বেঁধে দেওয়া প্রয়োজন। মেয়েদের লেখাপড়া শেখাতেও হবে। ফিজি সম্বন্ধে তিনি এই আশঙ্কা করলেন যে সমস্ত জগৎ থেকে এদের বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবার সম্ভাবনা আছে। সেজন্য যাতায়াতের ভালোরকম ব্যবস্থা থাকা দরকার। পত্রিকা-প্রকাশেরও চেষ্টা করতে হবে যাতে পৃথিবীতে বড়ো বড়ো ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে নিজেদের ছোটোখাটো সমস্যা সম্বন্ধে দেশের অধিবাসীরা সজাগ থাকতে পারে।

India & the Pacific গ্রন্থে এণ্ডরুজ আশ্চর্য ভবিষ্যদ্‌বাণী করে গেছেন। অতিশয় বিচক্ষণতার সঙ্গে সেখানে তিনি বলেছেন— শান্তিকালে বা যুদ্ধসময়ে সর্বদা ফিজির গুরুত্বপূর্ণ স্থান থাকবে পৃথিবীর ভারসাম্য নিয়ন্ত্রণে। তিনি প্রাণপণ চেষ্টা করলেন ফিজিই যেন প্রশান্ত মহাসাগরীয় দ্বীপপুঞ্জের বিভিন্ন জাতির মধ্যে বন্ধুত্বের কেন্দ্রস্থল হয়।

এ-সব বিষয়ে যতই বিচক্ষণতার পরিচয় দিন এণ্ডরুজ সম্বন্ধে লোকের মনে শেষপর্যন্ত যে ছাপ পড়ত তা রাজনীতির নয়, ধর্মের দীপ্তির। এবার প্রথম যখন সুভার সমুদ্রতীরে তিনি এসে পৌছলেন, ভারতীয় মেয়েরা ভিড় করে এলেন তাঁদের দীনবন্ধুকে একবার দর্শন করতে।

দীর্ঘ দিনগুলি সাক্ষাৎকারেই কাটত। সরকারি কর্মচারী, বণিক, আইন-

জীবী, কোম্পানির ম্যানেজার, শিক্ষক— সর্বস্তরের ভারতীয়ের সঙ্গেই দেখা-সাক্ষাৎ করতেন। একজন ইংরেজ বণিক লিখেছেন—

> এণ্ডরুজ যে চার্চে ধর্মোপদেশ দিতেন, সেখানকার উপাসনায় আমি যোগ দিয়েছি। কেউ যদি আমাকে বলে এমন একটি লোক দেখাও যিনি কথাবার্তায়, কাজে-কর্মে, এমন-কি, চেহারায় পর্যন্ত প্রাচীনকালের সাধুসন্তের মতো, আমি তখনই বলব তিনি সি. এফ. এণ্ডরুজ।

সেখানকার সব ইউরোপীয়রাই সেরূপ অনুভব করতেন যদিও অনেক বিষয়ে এণ্ডরুজের সঙ্গে তাঁরা একমত হতে পারতেন না।

সুভা থেকে ফেরার দিন ঘনিয়ে এলে শেষ চারটি সন্ধ্যায় এণ্ডরুজ টাউন হলে যীশুখ্রীস্ট সম্বন্ধে তাঁর অনুভব ব্যক্ত করলেন। ভারতীয় ইউরোপীয় ও ফিজিবাসী সবাই এসে সেখানে মিলতেন। হিন্দু মুসলমান শিখ খ্রীস্টান— সব জাতেরই লোক এসে উপস্থিত হতেন। সভায় কোনো গান হত না। সভাপতিও কেউ থাকতেন না। এণ্ডরুজ সামনে বসে কেবল তাঁর ভাবনাগুলিকে যেন ভাষায় রূপ দিতেন।[১]

নিউজিল্যাণ্ড ও অস্ট্রেলিয়ায়

এবার (১৯৩৬) এণ্ডরুজ নিউজিল্যাণ্ড ও অস্ট্রেলিয়ায় বিশ্ববিদ্যালয় মিশনের পরিচালনায় যোগ দিতে যান। এক-একদিন সাত জায়গায়ও বক্তৃতা দিতে হয়েছে তাঁকে। তা ছাড়া ব্যক্তিগত সাক্ষাৎকারও ছিল অনেক। তাতেই বেশির ভাগ সময় দিতে এণ্ডরুজ চেষ্টা করতেন। অল্প বয়সের ছেলেরা যখন নৈতিক স্খলনের স্বীকারোক্তির জন্য ভিড় করে আসত তখন তাদের প্রতি সমবেদনায় তাঁর মন ভরে যেত। ঈশ্বরবিশ্বাসের আনন্দ ও শান্তি-লাভ তাদের পক্ষে সহজসাধ্য নয় তবু তাই তাদের প্রয়োজন। তিনি সাধ্যমত তাদের সঙ্গদান করতেন। ফ্রীম্যাণ্টল পৌঁছতেই তাঁর ভগ্নস্বাস্থ্যের সহ্য-ক্ষমতা শেষসীমায় গেল। সেখানে দু-তিন সপ্তাহ বিশ্রামের পর গেলেন কলম্বো। ক্যাণ্ডিতে আবার দিন পনেরো বিশ্রাম নিয়ে জাহাজে বোম্বাই ফিরবেন।

---

১ দ্র. শ্রীকরুণাময় মুখোপাধ্যায়, "C. F. Andrews in Fiji in 1936", *Visva-Bharati News*, February-March 1971, পৃ. ২৬৩-২৮০।

ভারতবর্ষে ফিরে (১৯৩৬) এণ্ডরুজ একটি বিস্তৃত স্মারকলিপি পাঠালেন শিক্ষাবিভাগে। ভারতীয় স্নাতকোত্তর ছাত্রদের অস্ট্রেলিয়ার বিশ্ববিদ্যালয়ে পাঠাবার উৎসাহদীপ্ত প্রস্তাব নিয়ে সেটি রচিত হয়। ১৯১৮ সালেই এই প্রস্তাবটি তিনি প্রথম দেন। তখন কোথাও কোনো সমর্থন না পাওয়ায় এতদিন বিষয়টিতে আর জোর দেন নি। এবার তিনি অস্ট্রেলিয়া যাওয়াতে ভারতীয় ছাত্রদের স্নাতকোত্তর গবেষণার জন্য সিড্‌নি বিশ্ববিদ্যালয় তিনটি বৃত্তিদানের ব্যবস্থা করেন। এ ধরনের প্রয়াস ভারতে যাতে উপযুক্তভাবে সম্বর্ধিত হয় এণ্ডরুজ তার চেষ্টা করলেন। তিনি বললেন, অস্ট্রেলিয়ার বিশ্ব-বিদ্যালয়ের ডিগ্রি ভারতবর্ষ যেন উপযুক্ত সমাদরের সঙ্গে গ্রহণ করে, আর ঠিক সেইভাবে অস্ট্রেলিয়ার ছাত্ররাও যেন ভারতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ে পাঠের সুযোগ পায়।[১]

দক্ষিণ-প্রশান্তমহাসাগরীয় অঞ্চলের জন্য একটি ভারতীয় হাইকমিশন নিয়োগের সমূহ প্রয়োজনীয়তা এণ্ডরুজ অনুভব করেন। সেখানকার হাই-কমিশনারের কাজের ক্ষেত্র ফিজি অস্ট্রেলিয়া ও নিউজিল্যাণ্ড পর্যন্ত বিস্তৃত থাকবে। তাঁর পদাধিকার-বলে ফিজিকে তিনি অন্য দুটি দেশ ও ভারতের সঙ্গে বন্ধুত্বসূত্রে আবদ্ধ করতে পারবেন। এণ্ডরুজের এ-সব প্রস্তাব সম্পর্কে ভারতে মতানৈক্যের সৃষ্টি হয় ঠিকই তবে যে ব্যক্তি এত সব বিষয় চিন্তা করেছেন, তাঁর দৃষ্টিভঙ্গির উদারতা বা মহৎ উদ্দেশ্য সম্বন্ধে কারো মনে কোনো সন্দেহ জাগে নি।

১৯৩৬ সালের নবেম্বর মাসে এণ্ডরুজ দিল্লী এলেন। দেখলেন কাশ্মীর গেটের কাছে সেণ্ট জেম্‌স্‌ চার্চের শতবার্ষিকী উৎসবের আয়োজন চলেছে। সেণ্ট স্টিফেন্স কলেজের সঙ্গে যুক্ত এ গির্জা তাঁর অত্যন্ত প্রিয় ছিল। কেম্‌ব্রিজ ব্রাদারহুডের তৎকালীন অধ্যক্ষ রেভারেণ্ড ক্রিস্টোফার রবিনসন এণ্ডরুজকে জিজ্ঞেস করলেন তাঁর ধর্মযাজক জীবনে এখন কোন্‌ পর্যায় চলেছে। অ্যাথানেসিয়ান সূত্র সম্পর্কে তাঁর সংশয়ের কথা তখন তিনি তাঁকে জানালেন।

---

১ অধুনা অস্ট্রেলিয়ায়, বিশেষত মেলবোর্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে ভারতচর্চার প্রসার হয়েছে। 'দেশ' পত্রিকায় শ্রীশিবনারায়ণ রায়ের 'মেলবোর্নের চিঠি'তে (১০ জানুয়ারি ১৯৭০) পিয়রসন ও এণ্ডরুজের অস্ট্রেলিয়া ও ভারতের মধ্যে যোগস্থাপনের প্রথম প্রয়াসের বিবরণ উল্লেখযোগ্য।

ক্রিস্টোফার সে কথা শুনে হেসে বললেন, '১৯৩০ সালে ভারত, বর্মা ও সিংহলের খ্রীস্টসংঘ ইংলিশ চার্চ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে স্বয়ংশাসিত সংস্থা হয়ে দাঁড়িয়েছে। তখন থেকেই তো যাজকেরা এ দুটি আপত্তিকর নিয়ম পালন থেকে রেহাই পেয়েছে।' এণ্ড্রুজের পুরোনো বন্ধু ভারতের মেট্রোপলিটন ডঃ ফস ওয়েস্টকটও (বেসিল ওয়েস্টকটের দাদা) এসেছেন শতাব্দী-উৎসবে। তিনিও রয়েছেন সেই একই বাড়িতে। এণ্ড্রুজ তাঁর কাছে গিয়ে জানতে চাইলেন রবিনসনের কথা ঠিক কি না। যখন জানলেন সত্যই সে-সব বিধিনিষেধ অপসারিত হয়ে গেছে তখন আর যাজকের কাজ গ্রহণে কোনো বাধা রইল না। তাই ১৯৩৬ সালের ২৪ নবেম্বরে তিনি তাঁর সাধের চার্চে পুনরায় খ্রীস্টপ্রসাদ অনুষ্ঠান উদ্‌যাপিত করলেন বহু বছর পরে। চার্চের রেকর্ড-বইতে এখনো তাঁর হাতের অক্ষরে এক টুকরো কাগজে লেখা রয়েছে, 'চার্লস ফ্রিয়র এণ্ড্রুজ বহু বছর পরে তাঁর যাজকত্ব ফিরে পেয়ে সর্বশক্তিমান পরমেশ্বরকে কৃতজ্ঞতা জানাতে চান।' যীশুর কামহীন জন্ম ও পুনরুজ্জীবন সম্বন্ধে সংশয় পূর্বে তাঁকে যেরূপ অস্থির করত এখন আর তেমন কিছু হয় না। নৈতিক প্রশ্নগুলির মীমাংসা যখন হয়ে গেছে তখন যুক্তিবাদী মনের অপর সমস্যাগুলি তাঁর কাছে আর তত গুরুত্বপূর্ণ নয়। *Christ & Prayer* পুস্তকে তিনি যীশুখ্রীস্টকে মূর্তিপুজার বিরোধী হিসাবে নয়, এক বিপ্লবী হিসাবে বর্ণনা করেছেন। এণ্ড্রুজের নিজের সম্বন্ধেও বর্ণনাটি প্রযোজ্য, কারণ তিনিও তো ছিলেন যীশুখ্রীস্টের এক বিপ্লবী ভক্ত।

দিল্লী ত্যাগ করে এণ্ড্রুজ গেলেন ইটার্সির কাছে একটি খ্রীস্ট-আশ্রমে। ১৯৩৬ সালের ১০ ডিসেম্বর তারিখে সেখানকার ১০ নম্বর জার্নালে শ্রীমতী হিল্‌ডা ক্যাশমোর লিখলেন—

বৃষ্টিধৌত এক নির্মল প্রভাতের কল্পনা করুন। চার্লস ফ্রিয়র এণ্ড্রুজ ট্রেন থেকে নামলেন সাদা খদ্দর পরে, মুখে তাঁর লম্বা সাদা দাড়ি। বাইবেলের একটি ঋষির মতো তাঁকে দেখাচ্ছিল। ধীরে ধীরে পায়ে হেঁটে চললেন বনজঙ্গল পেরিয়ে ছোটো খালের ভিতর দিয়ে। এর মধ্যে তাঁর টাকা-পয়সার ব্যাগ কখন যে হারাল, সেটি আর খুঁজেই পাওয়া গেল না। তবে হারানো টুপিটির উদ্ধার হল।··· আশ্রমে পৌঁছে বারান্দায় বসে সেরে নিলেন তাঁর অভ্যস্ত মিতাহার। সে সময়ে আমাদের বুঝিয়ে বললেন, যথার্থ খ্রীস্টধর্মগ্রহণের সঙ্গে অন্য ধর্মের প্রতি সশ্রদ্ধভাব পোষণের কী সম্পর্ক।

রসৌলিয়ায় গিয়ে সেখানকার ছাত্ররা যারা আমাদের মতো গ্রামোন্নয়নের কাজ সবে শেষ করেছে তাদের কাছে যে কথাগুলি বললেন, তা যেমন ভাবগম্ভীর তেমন মর্মস্পর্শী। তার পরে যেন রাজসমারোহে আবার স্টেশনের দিকে যাত্রা। ছাত্রছাত্রীদের কারো হাতে তাঁর জুতো, কারো হাতে-বা বালিশ। এই হল চার্লস ফ্রিয়র এণ্ডরুজের স্বল্পকাল স্থিতির বর্ণনা।

কয়েকদিন পরে শান্তিনিকেতন থেকে বোম্বাই হয়ে ইংলণ্ডে এণ্ডরুজ ফিরবেন। সেবাগ্রামে গান্ধীজির কাছে বিদায় নিতে গেলেন। গান্ধীজিকে জোর করে ধরলেন, এবার তাঁর সামনে বসে অন্তত 'ফাল্গুনী' (*The Cycle of Spring*) নাটকটি পড়ে নিতেই হবে। কারণ গত প্রায় বিশবছর ধরে এ নাটকের অপরাজিত যৌবনের জয়গান তাঁকে প্রেরণা দিয়েছে। গান্ধীজি এর আগে আর কখনো এ-সব বই পড়েন নি।

এণ্ডরুজের ইংলণ্ডে ফেরার কারণ হল, আগের বছর বসন্তকালেই কেম্‌ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ে বক্তৃতা দেবার একটি আমন্ত্রণ তিনি গ্রহণ করেছেন। তাই 'প্যাস্টোরাল থিওলজির' উপর তাঁকে সেখানে বক্তৃতা দিতে হবে ১৯৩৭ সালে। দু বছর অনবরত ভ্রমণে শরীরে অপরিসীম ক্লান্তি। বেশ কিছুদিনের জন্য শয্যাশায়ী হয়ে পড়লেন। বন্ধুত্বের স্নেহচ্ছায়ায় এ সময়টি শান্তভাবে অতিবাহিত করলেন পরবর্তী পদক্ষেপ নির্ধারণে আলোকের সন্ধানে।

যীশুখ্রীস্টের জীবনী

১৯১৩ সালে এণ্ডরুজ ইংলণ্ডে এসেছেন। বহুদিনের পুরোনো একখানি চিঠি তাঁর হাতে পড়ল। ১৯৩৩ সালে বন্ধু বনারসীদাস চতুর্বেদী তাঁকে এই চিঠিতে লিখেছিলেন[১]—

আমাদের এই কুড়ি বছরের ঘনিষ্ঠ পরিচয়ের মধ্যে কখনো আমি আপনাকে যীশুখ্রীস্ট সম্বন্ধে কিছুই জিজ্ঞাসা করি নি। কারণ তাঁর স্বরূপ আপনার ব্যক্তিত্বেই যে মূর্ত হয়ে উঠত। আর-কিছু জানার আমার প্রয়োজন ছিল না। কিন্তু এখন আমার মনে হচ্ছে, আপনাকেই জানিয়ে যেতে হবে যীশু কেমন করে বেঁচেছিলেন, আজও কেমন করে তিনি কোটি

---

১ ১২ জানুয়ারি ১৯৩৩, এণ্ডরুজকে লেখা চিঠি। দ্র. Chaturvedi & Sykes, *Charles Freer Andrews*, পৃ. ৩০০।

কোটি মানুষের মধ্যে জীবিত রয়েছেন। সহজ ইংরাজিতে আপনি যীশু-খ্রীস্টের একটি জীবনী লিখুন— এই আমার অনুরোধ। এই কাজটি একমাত্র আপনারই পক্ষে করা সম্ভব। ভারতে জ্ঞানীগুণী থেকে একেবারে সাধারণ পর্যন্ত এমন অনেকে আছেন, আপনাকে দেখে যাঁদের খ্রীস্টের অনুভব মনে এসেছে। গত ত্রিশবছর ভারতবর্ষে আপনি যীশুখ্রীস্টেরই অনুসরণে জীবনব্রত সাধন করেছেন। তাই এই বই লেখার যোগ্যতম ব্যক্তি আপনিই।

যীশুখ্রীস্ট ও ভারতের প্রতি গভীর অনুরাগ থাকায় এণ্ডরুজের মন তৎক্ষণাৎ সাড়া দিল এই কাজের আহ্বান গ্রহণে। ভেবে দেখলেন, এই হবে তাঁর অবসরজীবনের সংহত রূপায়ণ, জীবনব্যাপী সাধনার ফসল সংগ্রহ। প্রথম ভাবলেন, একবার প্যালেস্টাইনে ঘুরে আসা দরকার। গত পাঁচ বছরের মধ্যে বারবার পরিকল্পনা করেছেন সেখানে যাবার। যখনই ইহুদী-আন্দোলন প্রবল হয়েছে তখনই সেখানে যাবার সংকল্প করেছেন, কিন্তু আশু প্রয়োজনীয় কর্তব্য সম্মুখে এসে পড়ায় প্রত্যেকবারই বাধা ঘটেছে। এক বিত্তশালী ভারতীয় বন্ধুকে এবার যাতায়াতের ব্যয়ভার গ্রহণের অনুরোধ জানালেন। প্যালেস্টাইনে বসে এই বইটি লেখা সম্বন্ধেও গান্ধীজির পরামর্শ চাইলেন। সেই দেশের অশান্তিকর আবহাওয়ার মধ্যে কাজে পূর্ণ মনোযোগ দেওয়া অসম্ভব। তা ছাড়াও গান্ধীজি মনে করলেন এ পুস্তকের তথ্য সংগ্রহাদির জন্য প্যালেস্টাইনে তাঁর একবার নিশ্চয়ই যাওয়া উচিত, কিন্তু ভারতীয় পরিবেশে রচিত হলে বইটি ভারতীয় মনের উপর বেশি প্রভাব বিস্তার করবে।

আবার একটি বিশেষ প্রয়োজনে সহায়তার প্রার্থনা এল এণ্ডরুজের কাছে। একটি ভারতীয় ছাত্র দুরারোগ্য ক্যানসার রোগে ভুগে দেশে ফিরছেন শেষ-বারের মতো। সঙ্গে তাঁর সেবিকা স্ত্রী রয়েছেন। কিন্তু মৌসুমী ঝড়বাদলের দিনে জলযাত্রা অত্যন্ত পীড়াদায়ক। একটি বন্ধু সঙ্গে থাকলে ভালো হয় ভেবে এণ্ডরুজ বোম্বাই পর্যন্ত তাঁদের সঙ্গে গেলেন। অনেক রোগশয্যায় এণ্ডরুজের উপস্থিতিই যে শুশ্রূষার কাজ করত জে. এস. হয়ল্যাণ্ডের এণ্ডরুজ-জীবনীতে তার বর্ণনা পাই[১]—

এণ্ডরুজ রোগীর ঘরে প্রবেশ করতেন। হয়তো সে ক্যানসারে ভুগছে,

---

১ J. S. Hoyland, C. F. *Andrews, Minister for Reconciliation*, পৃ. ৬৩।

দীর্ঘদিনের অসহ্য রোগযন্ত্রণার সম্ভাবনা সামনে রয়েছে। কিন্তু যখন এণ্ডরুজ সে ঘর থেকে বেরিয়ে যেতেন ততক্ষণে সেই রোগবিধ্বস্ত প্রাণ শান্ত হয়েছে। রোগীর মনে এই উপলব্ধি এসেছে যে যীশুর আহ্বানে সে ক্রমশ অগ্রসর হচ্ছে। যতই রোগযন্ত্রণার মধ্য দিয়ে অতিক্রম করছে, ততই সে যাত্রাপথের গৌরব অনুভব করছে।

ভারতে

১৯৩৭ সালের অগস্ট মাসে যখন এণ্ডরুজ সিমলায় পৌছলেন— পরিশ্রমে ক্লান্তিতে কাতর শরীর— এসেই প্রায় কলেরার মতো গুরুতর রোগে আক্রান্ত হয়ে পড়লেন। সামারহিলে স্যার মহারাজাসিংহের শান্তিপূর্ণ গৃহে চিকিৎসা ও সযত্ন সেবার ব্যবস্থা তৎক্ষণাৎ হয়ে যাওয়ায় সে যাত্রা রক্ষা পেলেন। দু মাস সেখানে শান্তিতে বিশ্রাম করতে পেরে স্বাস্থ্যের কিছুটা উন্নতি হল।

পঞ্চাশ বছর আগে তাঁর জীবনের প্রথম পুণ্যদীক্ষাকালে এবং তার পরেও বিশেষ বিশেষ মুহূর্তে জলস্থল আকাশব্যাপী এই বসুন্ধরা তাঁর চোখে যেমন এক স্বর্গীয় দীপ্তিতে উদ্ভাসিত হয়ে উঠত এবারও রোগমুক্তির পরে কয়েকদিন ধরে সেই আলোকের প্রতিভাস তাঁকে উদ্‌বুদ্ধ করেছে। প্রশান্ত স্বচ্ছ নীলাকাশ, গাছের পাতার ফাঁকে ফাঁকে আলোছায়ার খেলা, তুষারমণ্ডিত পাহাড়শ্রেণী। শ্যামলাধরণী আবার তাঁর মধ্যে অল্পবয়সের কাব্যপ্রতিভা জাগাল। একটি কবিতা এ সময়ে তিনি লেখেন। সেটি হল In As Much। তাঁর মৃত্যুর পরে অমিয় চক্রবর্তীর অনুরোধে কবি রবীন্দ্রনাথ তার বাংলা অনুবাদ করেন— 'পূজালয়ের অন্তরে ও বাহিরে'। এণ্ডরুজ এই সময়ে রবার্ট ব্রিজেস্-এর 'টেস্টামেণ্ট অব্ বিউটি' কাব্যগ্রন্থটির রসাস্বাদন করে কবির কাছে দীর্ঘপত্রে এ বিষয়ে তাঁর চিন্তাধারা বিবৃত করেন। কবিও তখন কঠিন ইরিসিপ্লাস রোগ থেকে সবে সুস্থ হয়ে উঠেছেন।

ভারতী সারাভাই নামে একটি তরুণী সাহিত্যরচনাশিল্পে নবাগতা। এ সময়ে তাঁর কাছে লেখা পত্রে এণ্ডরুজের শিল্পী-মানসের পরিচয় পাই[১]—

> ক্ষণস্থায়ী সৌন্দর্যের পশ্চাতে রয়েছে অনন্ত সৌন্দর্য, খণ্ড সত্যের মৃদু দীপ্তির পশ্চাতেই আছে শাশ্বত সত্যের দ্যুতি— প্লেটোর এই অভিমত

১ Chaturvedi & Sykes, *Charles Freer Andrews*, পৃ. ৩০১, ৩০২।

সর্বকালসম্মত। শিল্পে কলাকৈবল্য (Art for art's sake) সম্পর্কে বহু আলোচনা শুনেছি। জানি যে সৃষ্টির কাজে শিল্পীকে নির্ভীকভাবে সত্য হতে হয়। তবে এও জানি যে মঙ্গল সত্য ও সৌন্দর্য শাশ্বত, এবং অসুন্দর অসত্য, অমঙ্গল— এ-সব মায়া। অতএব যে বিষয়টি তুমি বেছে নেবে সেটির পরিমাপ হয় যেন চিরন্তনের মানদণ্ডে।

দু বছর পরে আবার ১৯৩৯ সালের ২৩ নবেম্বরে এই তরুণীটিকেই লেখেন[১]—

চলার পথের ধারে হঠাৎ ফুল তোলার আনন্দে মেতে যাবার প্রবণতা সকলেরই আছে। অবশ্য রসবঞ্চিত তপস্বী হওয়াও কোনো কাজের কথা নয়। উচ্ছল জীবনের ভরা পাত্রটি যখন মুখের কাছে আসে, তাকে দু-হাত বাড়িয়ে গ্রহণ করায় ভয়ের কিছু নেই। কিন্তু সেই সুধায় মাতোয়ারা হয়ে যদি মহত্তর আহ্বানে সাড়া না দিই, তবে সেই তো হবে আশঙ্কার কারণ। তোমার অন্তরে মহত্ত্বের বীজ সযত্নে সংরক্ষিত হলে তবেই তোমার আনন্দের ফুল ফল হয়ে উঠবে।

এই বিশিষ্ট ভাবধারায় পাই শুধু প্লেটোর নয়— তাঁর গুরুদেব রবীন্দ্রনাথের প্রভাবের ইঙ্গিত।

সৃজনশীল মনোভাবের পুনরুজ্জীবনের সঙ্গে এল নিজ জীবনের বিশেষ অভিপ্রায়ের সচেতনতা। খ্রীস্টের জীবনী লেখার জন্যই যে পুনরায় জীবন ফিরে পেলেন সে ধারণা তাঁর মনে গেঁথে রইল। তবে তাঁর এই বই কোনো-দিন শেষ হবে কি না সে বিষয়ে অন্য লোকের মনে সন্দেহ ছিল। প্রকাশক স্যার স্ট্যানলি আনউইন লিখলেন[২]—

মহাত্মা গান্ধী যদি সি. এফ. এ.-কে তিব্বতের মঠে গিয়ে বসে লেখার পরামর্শ দিতেন তবে হয়তো আশা করা যেত এবার খ্রীস্টজীবনীর কাজ কিছুটা এগোবে। কিন্তু ভারতবর্ষে বসে যে এ-বই লেখা সম্পন্ন হবে সে আশাই আমি রাখি না।

এরূপ সন্দেহের যথেষ্ট কারণও ছিল। ১৯৩৭ সালে এণ্ডরুজ ভারতবর্ষে থাকবেন অথচ দায়িত্বশীল মন্ত্রীরা যখন প্রদেশে প্রদেশে সামাজিক সংস্কারের

---

১ Chaturvedi & Sykes, *Charles Freer Andrews*, পৃ. ৩০২।

২ তদেব, পৃ. ৩০২।

কর্মসূচী নিয়ে কাজে এগোবেন তিনি সে প্রচেষ্টায় অংশ নেবেন না— এ তাঁর পক্ষে কখনোই সম্ভব ছিল না। ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে গত বিশ বছর ধরে যাঁদের তিনি সহকর্মী হিসেবে পেয়েছেন তাঁরা এখন সবাই শাসনক্ষমতা হাতে নিয়ে বসেছেন। মদ্যপাননিবারণ ও কারাগার সংস্কার-প্রচেষ্টায় সংগ্রামের জন্য এবার তাঁর লেখনী যে উৎসুক হবে তাতে আশ্চর্যের কিছু নেই। তা ছাড়াও সে সময় তিনি জড়িয়ে পড়লেন জাঞ্জিবারের লবঙ্গ-বয়কট সংগ্রামে, কেনিয়ার জাতিগত আইনের বিরোধী সংঘর্ষে, সিলোনে তামিল কুলিদের দুঃখনিবারণে।

এ সময়ে প্যালেস্টাইনে আরব ও ইহুদীদের বিবাদ সম্পর্কে জাতীয়তাবাদী ভারতের মনোভাব তাঁকে বিশেষ চিন্তিত করে। মধ্য ইউরোপে ইহুদী নির্যাতন দেখে তাঁর মন দুঃখে ভরে যায়। ভারতীয়দের মনেও ইহুদীদের সম্পর্কে গভীর তিক্ততা লক্ষ্য করে তিনি পত্র-পত্রিকায় নানা প্রবন্ধে লিখতে লাগলেন মানব-সভ্যতার প্রসারে ইহুদীদের অবদানের কথা, আর লিখলেন কী অমানুষিক নির্যাতন সর্বত্র তাদের সহ্য করতে হচ্ছে, সেই বৃত্তান্ত। কংগ্রেস-নেতাদের এ বিষয়ে তিনি কিভাবে পরামর্শ দিতে চেয়েছিলেন তার একটি নমুনা পাই জওহরলাল নেহরুকে লেখা নিম্নোদ্ধৃত পত্রে[১]—

> প্যালেস্টাইন সম্পর্কে আরবের সঙ্গে সন্ধিসূত্রে আবদ্ধ হবার জন্য ইতালির প্রস্তাব সম্বন্ধে তোমাকে কিছু লিখতে চাই। নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটি কোনো সাম্রাজ্যবাদী শক্তির সঙ্গে যেন আপস না করে। আরব ইতালির সঙ্গে আর ইহুদীরা ব্রিটেনের সঙ্গে যদি মিতালির ভান করে করুক, আমরা ভারতীয়রা যেন তাতে যোগ না দিই।
>
> তুমি জানো, কংগ্রেসের ব্যাপারে আমি কিছু বলতে চাই না, কারণ স্বরাজের সার কথাই হল স্ব-রাজ। তবে পাছে আমরা ইতালির ষড়যন্ত্রে জড়িয়ে পড়ি, সেই আশঙ্কায় এ-সব লিখলাম।

স্বদেশ-প্রত্যাগত বাস্তুত্যাগীদের সমস্যা থেকেও এণ্ডরুজের মুক্তি নেই। একটি পত্রে এক ফিজিপ্রবাসী ধনী ভারতীয় পরিবারের কাহিনী বর্ণনা করে লিখেছেন, ভারতবর্ষের আত্মীয়-স্বজনের সঙ্গে মিলিত হতে তাঁরা এ দেশে

---

১ Chaturvedi & Sykes, *Charles Freer Andrews*, পৃ. ৩০৩।

আসেন। আসামাত্র টাকাপয়সা চুরি যায়, এবং চূড়ান্ত দুর্দশায় পড়ে আবার তাঁরা মেটিয়াবুরুজে ফিরে যেতে বাধ্য হন। এণ্ডরুজ লিখছেন[১]—

> এ তো কেবল একটি ঘটনামাত্র। এরকম বহু ঘটনা আমি জানি যা শুনলে লোকের অসহ্য কষ্ট হবে। প্যালেস্টাইনে বসে আমি কেমন করে যীশুখ্রীস্টের জীবনী লিখব? এ-সব আর্ত-অসহায়ের মধ্যে যে আমি তাঁকে প্রত্যক্ষ দেখতে পাচ্ছি।

১৯৩৭ থেকে ১৯৩৮ সালের শীতকাল পর্যন্ত অধিকাংশ সময় তিনি শান্তিনিকেতনে বাস করেন। ভারতবর্ষে এটিই ছিল তাঁর আপনগৃহ। গত পঁচিশ বছর ধরে আশ্রমের সঙ্গে তিনি ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত। ১৯৩৯ সালের জানুয়ারি মাস থেকে দু বছরের জন্য বিশ্বভারতী সংসদ-কর্তৃক তিনি আবার উপাচার্য নির্বাচিত হন।[২] প্রসঙ্গক্রমে মনে রাখতে হবে ১৯২১ সালে বিশ্বভারতীর প্রতিষ্ঠাকালেও তিনিই প্রথম উপাচার্য পদে বৃত হয়েছিলেন। সম্মানটি গ্রহণ করতে এণ্ডরুজ স্বীকৃত হলেন কেবল এই কারণে যে কবির বয়স হয়েছে, তাঁর গুরুভার হয়তো তিনি কিছু লঘু করতে পারবেন। তাঁর নিজের চিঠিপত্র তো ছিলই, এ কাজের ভার পাওয়ায় তাঁর চিঠির সংখ্যা আরো অনেক বেড়ে গেল।

বিশ্বভারতীর হিন্দী ভবনটি বিশেষ করে এণ্ডরুজের সাহায্যে খোলা হয়। ১৯৩৮ সালের ১৬ জানুয়ারিতে তার ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপিত হয়। বিশ্বভারতী সর্বভারতীয় শিক্ষাকেন্দ্র হবে এটি এণ্ডরুজের বিশেষ আগ্রহের কাজ। বাংলার সঙ্গে সঙ্গে প্রতি প্রদেশের সাহিত্যিক ও সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য এর মধ্যে রূপ পাবে— এ ছিল তাঁরও স্বপ্ন। শেষবারের মতো চাঁদা তুললেন তিনি হিন্দী ভবনের জন্য; এই ভবনটির ভিত্তিপ্রস্তরও তিনিই স্থাপন করেন।

সিমলায় সেই কঠিন রোগে ভুগে ওঠার পর এণ্ডরুজ আর সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে ওঠেন নি। তার পরেও তাঁর পরিশ্রম ক্রমশ বেড়েই চলেছে। ১৯৩৮ সালের মার্চ মাসে তিরুপাত্তুরে খ্রীস্টকুল আশ্রমে গেলেন। গ্রীষ্মকালটি তিনি সেখানে এবং নীলগিরি পাহাড়ে কাটান। শান্ত পরিস্থিতিতে এখানে লেখার কাজ খুব এগোয়। *True India* বইখানি শেষ হতেই যেন তরুণের কর্মক্ষমতা

১ আগাথা হ্যারিসনকে ১৯৩৮ সালের জানুয়ারি মাসে লেখা।

২ *Visva-Bharati News*, January 1939।

নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়লেন স্কুলপাঠ্য ইংরেজি বই রচনার কাজে। বহুকাল পূর্বে জাপানে তাঁর আলাপ হয়েছিল হায়দরাবাদের ই. ই. স্পাইটের (E. E. Speight) সঙ্গে। তাঁর সঙ্গে মিলে এখন তিনি পাঠ্যপুস্তক রচনায় প্রবৃত্ত হলেন।

এ বিষয়ে মহাদেব দেশাইকে এগুরুজ লিখেছিলেন[১]—

পাঠ্যপুস্তকের কাহিনীর অংশগুলি এভাবে নির্বাচিত হবে যাতে ছাত্রদের চোখের সামনে তাদের নিজ দেশের এবং সমগ্র পৃথিবীর মহৎ আদর্শগুলি জাজ্বল্যমান থাকে। প্রচলিত ধর্মবিষয়ে নিরপেক্ষতা রক্ষা করেই আমি এর মধ্যে একটি যথার্থ ধর্মের সুর আনতে চাই। জীবনকাহিনী উদ্‌ধৃত করে নীতি ও ধর্মের আদর্শ স্থাপন করা সম্ভব। সত্য ও অহিংসার দিক থেকে এটি এতই প্রয়োজনীয় যে আমি বাপুর সঙ্গে এ বিষয়ে একটু কথা বলতে চাই।

ব্যক্তিগত স্নেহের সম্পর্ককে তিনি যে কত মূল্য দিতেন তা তাঁর জীবনের শেষ কয়েক বছরের প্রত্যেকটি ঘটনায় উদ্‌ভাসিত হয়ে ওঠে। ১৯৩৮ সালের মার্চ মাসে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্তন-উৎসবে বললেন, কেম্‌ব্রিজে তরুণ ছাত্রদের সঙ্গে অভিজ্ঞ শিক্ষকদের স্নেহের সম্পর্কের ফলে যে দৃঢ় বন্ধন তিনি গড়ে উঠতে দেখেছেন শিক্ষাদানব্যাপারে তার প্রভাব কত গভীর। ছয়মাস পরেই দ্বিতীয় যে সমাবর্তনে তিনি আমন্ত্রিত হন তা হল মহীশূর বিশ্ববিদ্যালয়ে। সেখানে তিনি বিশ্ববিদ্যালয়-সংলগ্ন গ্রামোন্নয়ন পরিকল্পনার কথা বলেন। তার ফলে ধনী ও দরিদ্র, ছাত্র এবং গ্রামবাসী— এদের মধ্যে যে দুস্তর ব্যবধান গড়ে উঠেছে তা মিটে যাবার সম্ভাবনা। তাঁর সেই বক্তৃতার ফলে মহীশূর বিশ্ববিদ্যালয়ে গ্রামসেবা-বিভাগ গড়ে উঠল। এখন থেকে ভারতের বহু ছাত্র তাঁকে গুরুর মতো মেনে তাঁর কাছে চিঠিপত্র লিখতে শুরু করল। তিনি নিজেও এককালে তাঁর গুরু ডঃ ওয়েস্ট ও প্রায়রকে সে ভাবেই মান্য করেছেন। ছাত্রদের প্রত্যেকটি চিঠির উত্তর লিখতেন তিনি গভীর স্নেহ ও যত্ন -ভরে।

মাঝে মাঝে যখন কলকাতা যেতেন বড়ো বড়ো হাসপাতালের রুগীদের মনেও নতুন সাহস ও সান্ত্বনা দিয়ে আসতেন। একজন রুগীকে দেখতে

---

১ Chaturvedi & Sykes, *Charles Freer Andrews*, পৃ. ৩০৫।

হাসপাতালে গিয়ে আশীর্বাদ দিয়ে অনেকের মনে উৎসাহ সঞ্চার করে ফিরে এসেছেন। তাদের কৃতজ্ঞতা-ভরা চিঠিতে তার সাক্ষ্য মেলে। কত খ্রীস্টান, অ-খ্রীস্টান বন্ধু জীবনের মহৎ উপলব্ধি সম্বন্ধে তাঁর সঙ্গে আলোচনা করেছেন। দুঃখ বা মৃত্যুর সম্মুখীন হলে তাঁর উপাসনার প্রসাদ-ভিক্ষা করেছেন। বিদেশী বা ভিন্নধর্মীয় বলে পূর্বের সেই সন্দেহের বাধা এখন সম্পূর্ণ অপসারিত হয়েছে। একজন হিন্দু বন্ধুর রোগমুক্তির জন্য এণ্ডরুজ প্রার্থনা করেছিলেন। সেই বন্ধু জি. ই. গনেশান *Sandhya Meditations* নাম দিয়ে খ্রীস্টকুল আশ্রমে তাঁর সান্ধ্য উপাসনার ধ্যানমন্ত্রগুলি লিপিবদ্ধ করে প্রকাশ করেন।

আরো নানারকম লোকত্রাণের ব্যাপারে এই সময়ে জড়িয়ে পড়েন এণ্ডরুজ। উড়িষ্যার পাহাড় অঞ্চলের দেশীয় রাজ্যের অভ্যন্তরে নির্যাতন ও উৎপীড়নের বহু সাক্ষ্য পাওয়া গেল। দলে দলে শরণার্থী চলে এল পার্শ্ববর্তী প্রদেশে। উড়িষ্যার কংগ্রেস মন্ত্রিসভার সদস্যরা অনেকে এণ্ডরুজের ব্যক্তিগত বন্ধু। বন্যাত্রাণের কাজে পূর্বে বহুবার এণ্ডরুজ এঁদের পাশে থেকে সাহায্য করেছেন। এবারেও তাঁরা তাঁর সাহায্য চাইলেন। ভারত-সরকার ও ইস্টার্ন স্টেট্‌স্ এজেন্সির কাছে শরণার্থীদের বিষয়টি বিচারের জন্য পাঠাবার কাজে তিনি তাঁদের সাহায্য করলেন।

তা ছাড়া প্রাচীন দলের আর কেউ তাঁর মতো সহজ বন্ধুত্ব ও সহানুভূতির সঙ্গে তরুণ রাজনৈতিক নেতাদের সঙ্গে মিশতেন না। সুভাষচন্দ্রের প্রতি স্নেহে ও শ্রদ্ধায় তিনি অত্যন্ত আকৃষ্ট ছিলেন। তাই ১৯৩৯ সালের কংগ্রেসের দলীয় সংঘর্ষে উভয় পক্ষে শান্তি স্থাপনের আপ্রাণ চেষ্টা করেছেন এণ্ডরুজ।

১৯৪০ সালে জানুয়ারি মাসে জীবনের প্রায় শেষভাগে আগাথা হ্যারিসনকে যে করুণ চিঠিখানি লেখেন, তাতে পাই—

> মতদ্বন্দ্বের ভীষণ আবর্তে পড়ে কী যে করি ভেবে পাই না। আমি কেবল মৈত্রীর বন্ধনগুলি দৃঢ়ভাবে ধরে একপাশে সরে দাঁড়িয়ে রয়েছি। যখন কোনো অচ্ছেদ্য সমস্যার সম্মুখীন হই তখন দেখি তার জটিলতা মোচন করতে ব্যক্তিগত বন্ধুত্বের চেয়ে বড়ো উপায় আর কিছু নেই।

১৯৩৮ সালের ডিসেম্বর মাসের শেষ দিকে 'আন্তর্জাতিক মিশনরি সমিতি'র উদ্‌যোগে মাদ্রাজের টম্বরম্-এ বিশ্ব-খ্রীস্টান সম্মেলনের এক অধিবেশন হয়। পূর্ব ও পশ্চিম দেশের খ্রীস্টান নেতৃবৃন্দকে নিয়ে এর চেয়ে বড়ো সম্মেলন আর হয় নি। এণ্ডরুজ অবাক হলেন, সেখানে তিনিও আমন্ত্রিত হয়েছেন।

ভেবেছিলেন তাঁর তীক্ষ্ণ মতামতের জন্য তাঁরা তাঁকে আহ্বান করবেন না। যাই হোক, সম্মেলনের প্রস্তুতিতে তিনি উঠে পড়ে লাগলেন। সম্মেলন শুরু হবার পূর্বে লক্ষ্য রাখলেন যেন এই ব্রিটিশ ও আমেরিকান সংগঠনকারীরা খ্রীস্টান ও অ-খ্রীস্টান ভারতীয় নেতৃবৃন্দ এবং বিশেষ করে মহাত্মা গান্ধীর যথাসম্ভব সংস্পর্শে আসে।

গত তিন বছর ধরে নিরবচ্ছিন্ন ভাবে এণ্ডরুজ যে-সব প্রশ্ন নিয়ে চিন্তা করেছেন, সেগুলো এই সম্মেলনে সুস্পষ্টভাবে সকলের সামনে এল। অ-খ্রীস্টান ধর্মসম্প্রদায়ের সম্পর্কে খ্রীস্টবাক্য প্রচারকারীদের কর্তব্য কী— সেটি হল প্রধান প্রশ্ন। ডঃ আম্বেদকরের রাজনৈতিক উদ্দেশ্য-প্রণোদিত প্রস্তাব ছিল, ছয় কোটি অস্পৃশ্যকে হিন্দুধর্মের আওতা থেকে বের করে এনে সন্তোষজনক শর্তে যে-কোনো ধর্মসম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত করা। সমগ্র ভারতে এই আলোচনা তখন চলছিল যে, কোনো মানুষের পক্ষে ধর্মত্যাগ সংগত কি না এবং কোন্ অবস্থায় পড়লে ধর্মত্যাগ নীতিসম্মত বলে বিবেচিত হতে পারে। এণ্ডরুজের ছাত্রবন্ধু রামচন্দ্রন হিন্দু। তিনি তখন কালিকটের 'মাতৃভূমি' পত্রিকার সম্পাদক। খ্রীস্টানশাস্ত্রে 'ধর্মান্তরণ' কথাটির প্রকৃত ব্যাখ্যা কী তা একটি প্রবন্ধে বিস্তৃতভাবে বিবৃত করার জন্য তিনি এণ্ডরুজকে অনুরোধ জানালেন।

এ প্রশ্ন সম্পর্কেও এণ্ডরুজ এবং গান্ধী একমত ছিলেন না।[১] যে-সব জীবন্ত ধর্ম মৃতপ্রায় হয়ে পড়েছে তাতে শক্তিসঞ্চারের চেষ্টাই তাঁর মতে খ্রীস্টধর্মের যথার্থ সেবা। সাধনালব্ধ দৃঢ় অনুভূতি ব্যতিরেকেই কোনো তরুণ পাছে এণ্ডরুজের ব্যক্তিত্বে আকৃষ্ট হয়ে খ্রীস্টধর্ম গ্রহণ করতে চায়, সেজন্য তাঁকে অত্যন্ত সজাগ হয়ে চলতে হত। তবে যদি কেউ বিশেষ ধর্মচেতনার প্রেরণায় এ ধর্ম বরণ করতে চাইত, তিনি তাকে বাধা দিতেন না। তাঁর মুখেই যীশুখ্রীস্টের কথা বারবার শুনে অনেকে তাঁর কাছে দীক্ষা গ্রহণ করতে চেয়েছেন। ১৯৩৬ সালে গান্ধীজির সঙ্গে দীর্ঘ আলোচনার পর তিনি তাঁর নিজের মতামত একটি পত্রে তাঁকে জানান। টম্বরম্-সম্মেলনেও তাঁর বক্তৃতার প্রতিপাদ্য বিষয় ছিল একই। গান্ধীজির কাছে সেই পত্রে এণ্ডরুজ লেখেন[২]—

---

১ Tendulkar, *Mahatma*, vol. IV, পৃ. ৯৮।

২ Chaturvedi & Sykes, *Charles Freer Andrews*, পৃ. ৩১০।

গতকাল ধর্মসম্বন্ধে তোমার আলোচনায় আমার মন ক্ষুব্ধ হয়ে রয়েছে। তোমার মতে 'সব ধর্মই সমান'। এই মত ইতিহাসের বা আমার ধর্মজীবনের অভিজ্ঞতা— কোনোটার সঙ্গেই মেলে না 'যে ধর্ম নিয়ে যে জন্মেছে, আজীবন তাই অনুসরণ করে তার চলা উচিত'— ধর্মের মতো এমন একটি গতিশীল বিষয়ে তোমার এই ঘোষণা আমার খুবই অস্বাভাবিক ঠেকে।

অবশ্য 'ধর্মান্তরণ' শব্দের অর্থ কখনোই পূর্বতন ধর্মের সত্যতায় অশ্রদ্ধা পোষণ করা নয়— এ যে আপন অন্তরে নবসত্যের আবিষ্কার। এরই আহ্বানে মানুষ অনায়াসে আত্মদান করতে পারে। এই নবচেতনা জাগ্রত হলে ধর্মসংঘ পরিবর্তনেও দ্বিধা চলে না।

কোনো ধর্মের অন্তর্নিহিত সত্যকে অস্বীকার করা এর উদ্দেশ্য নয়। সুশীলকুমার রুদ্র হিন্দুধর্মের মাহাত্ম্য প্রকাশ্যে স্বীকার করতেন। তবু তো তিনি একজন নিষ্ঠাবান খ্রীস্টান ছিলেন।

…যে পথ দিয়ে আমি ঈশ্বরের সান্নিধ্যে এসেছি যীশুখ্রীস্টই আমার সেই পথ-পরিচালক। তাই সে বিষয়ে যখনই কাউকে কিছু বলার সুযোগ আমার আসে, আমি না বলে পারি না। খ্রীস্ট-প্রেরিত দূত পল্‌কে আমি সম্মান করি যখন তিনি বলেন, 'ধিক আমাকে, যদি আমি খ্রীস্টবাণী প্রচার না করি।' যে বাণী প্রচারের জন্য প্রভু যীশু অবতীর্ণ হয়েছিলেন, মানুষ তার মধ্যে সর্বাধিক অনুপ্রেরণা লাভ করতে পারে— আমার এই দৃঢ়-বিশ্বাসের জন্যই আমি খ্রীস্টান। আমার বন্ধু আবদুল গফ্‌ফর খানও সে ভাবে মহম্মদের বাণী প্রচার করবেন বলে আমার বিশ্বাস; কেননা তাঁর কাছে যা জীবন্ত সত্য তা তো তিনি প্রকাশ না করে পারেন না।

এর মানে কিন্তু এই নয় যে, কোন্ ধর্মবাণী মহত্তর— তা নিয়ে আমরা বিবাদ করব। খ্রীস্টান, হিন্দু ও মুসলমানের মধ্যে প্রভেদ তো রয়েইছে, তাকে তো আজ অস্বীকার করা যায় না। তবু এই তিনটি ধর্মমতেরই মধ্যে এমন কোনো অমূল্য উপাদান রয়েছে যা সকলের পক্ষেই গ্রহণ করা সম্ভব। সন্ত পল বলেছেন, 'যা সত্য, যা সৎ, যা পবিত্র, যা সুন্দর, যা শুভ— শুধু তাই চিন্তা করো, শান্তির দেবতা তোমার সঙ্গেই থাকবেন।' আমার মতে ধর্মের মধ্যে শান্তি আনার উপায় এটিই, বিভিন্ন ধর্মের বৈশিষ্ট্যগুলি বিসর্জন দিয়ে নয়।

১৯৩৮ সালে টম্বরম্-সম্মেলনের প্রস্তুতি উপলক্ষে এণ্ডরুজ মিশনরিদের

উদ্দেশ্য সম্বন্ধে আলোচনা করে একটি প্রবন্ধ লিখলেন। সন্ত পিটারের এই উক্তিটি তাতে উদ্‌ধৃত করলেন— 'প্রভু যীশুখ্রীস্টের নাম বিনা অন্য কোনো নামে আমাদের উদ্ধার নেই।' তবে অ-খ্রীস্টান কোনো মানুষে যদি ঈশ্বরকে প্রত্যক্ষ করি, তখন এ বাক্যের কী অর্থ আমরা গ্রহণ করব।

তাই এ প্রবন্ধেই আবার লিখেছেন[১]—

> এ-সব প্রশ্ন মনে আসাতে আমার প্রভু যীশুর দিকেই ফিরে তাকালাম। অবাক হয়ে তখন দেখি চোখের সামনে থেকে যেন পর্দা সরে গেল— বাইরের সব নাম, ধাম, উপাধি, সরে গেল। দেখলাম, মানুষের একমাত্র পরিচয় ভগবদনুরাগে, মানুষকে ভালোবাসায়। এটিই খ্রীস্টের শুভবাণী— তাঁর শিষ্যরা সমুদ্র অতিক্রম করে দূর দূর দেশে যাবার প্রেরণা পায় তাঁর মুখের এই বাণী শুনে।…

সম্মেলনের প্রথম দিকের অধিবেশনগুলিতেই কেবল তিনি উপস্থিত ছিলেন। ২৬ ডিসেম্বর (১৯৩৮) এলাহাবাদে ভারতীয় দর্শন-মহাসভায় সভাপতির ভাষণ দেবার জন্য তাঁকে টম্বরম্ ত্যাগ করতে হয়। ২৪ ডিসেম্বর একদিন মাত্র শান্তিনিকেতনে থেকে এলাহাবাদে যান।[২] দর্শন-মহাসভায় তাঁর বক্তৃতার বিষয় ছিল 'অহিংসা'।

১৯৩৯ সালের ২৭ মার্চ তারিখে এণ্ডরুজ দিল্লীতে সেণ্ট স্টিফেন্স কলেজের নতুন গৃহের ভিত্তিস্থাপন করেন। দিল্লীর কলেজগুলির মধ্যে এটিই সর্বপ্রথম শহরের উত্তরভাগে বিশ্ববিদ্যালয়ের নূতন জায়গায় সরে যায়। এণ্ডরুজের জীবনের একটি স্বপ্ন যেন এর মধ্যে রূপায়িত হল। এই সভায় তিনি ডারহামের বিশপ ওয়েস্টকট এবং সুশীল রুদ্রের স্মৃতির প্রতি কৃতজ্ঞতা নিবেদন করলেন। শ্রোতারা তাঁর ভাষণের চেয়েও তাঁকে দেখে বেশি মুগ্ধ হল। ভিত্তি-প্রস্তরটি যখন তিনি বসাচ্ছিলেন তাঁর উপস্থিতির মধ্যেই যেন ভগবানের প্রসন্ন আশীর্বাদ সকলে অনুভব করছিল।

অনুষ্ঠানটি শেষ হতেই এণ্ডরুজকে হাসপাতালে যেতে হল রক্তচাপ রোগে আক্রান্ত হয়ে। অসুস্থ শরীরে সারা বছর কষ্ট পেলেন। পুরীতে রবীন্দ্রনাথের

---

১ Chaturvedi & Sykes, *Charles Freer Andrews*, পৃ. ৩১১।

২ রবীন্দ্রজীবনী, ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ১৬৬।

TO GURUDEV

May 9th. 1939.

Time can but add to thy majestic brow
The snow-white radiance of the mountain height
Thou canst look back on all the past years now
Veiled in the clouds below, while azure light
Crowns thee with splendour. As a noble singer,
Who never stooped to baseness in thy verse,
Thou hast loved this life, and longed to be a bringer
Of joy to young and old, who shall rehearse
Thy songs, and hand them on from age to age,
To gather laurels as the seasons roll,
And give mankind a generous heritage
Of all the tenderest hopes that touch the soul.

Poet, while other glories fade and die
Thy words have won their immortality.

PURI.

C. F. Andrews.

রবীন্দ্রনাথের জন্মদিনে লিখিত

সঙ্গে কয়েকদিন থাকার পর নীলগিরি পর্বতে গেলেন। পর্বতের উচ্চতা তাঁর স্বাস্থ্যের প্রতিকূল হওয়ায় ডাক্তারের পরামর্শে জুন মাসেই নেমে আসতে হল।

১৯৩৮ সালের শেষের দিকে বাঙ্গালোর ইউনাইটেড থিওলজিক্যাল কলেজে যীশুখ্রীস্টের জীবনী সম্বন্ধে এণ্ডরুজ কয়েকটি ভাষণ দিচ্ছিলেন। সেখানেই যীশুখ্রীস্টের উপদেশাবলীর আলোকে তিনি যুদ্ধকালে খ্রীস্টান নাগরিকের কর্তব্য সম্বন্ধে কিছু আলোচনা করেন। অন্যায়ের প্রতিরোধে ধর্মযুদ্ধ ন্যায়সংগত —এই মনোভাবই তাঁর প্রকাশ পায়।

১৯৩৯ খ্রীস্টাব্দের ৩ সেপ্টেম্বর রবিবার সারা পৃথিবীতে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের বার্তা ঘোষিত হল। এণ্ডরুজ তখন বাঙ্গালোরে, সেইদিন সন্ধ্যায় তিনি ইউনাইটেড থিওলজিক্যাল কলেজের প্রার্থনামন্দিরে উপাসনান্তে ভাষণ দেন। ১৯৪০ সালের এপ্রিল মাসে 'দ্য ক্রিশ্চান ওয়ার্লড্' পত্রিকায় সেই দিনের বর্ণনাপ্রসঙ্গে একজন শ্রোতা লেখেন—

> জীবনের এ অভিজ্ঞতা কখনো ভুলব না। বক্তৃতার প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত শুনে শুধু মনে হয়েছিল, একটি পূজাকার্য সমাধা হল। সেদিন যা বলেছিলেন, তা উপদেশ নয়। তা ছিল প্রেমের নিগূঢ়তত্ত্ব সম্বন্ধে তাঁর ধ্যানলব্ধ অভিজ্ঞতার বর্ণনা। প্রেমের দেবতার অন্তরঙ্গ শিষ্যের মুখের বাণীই সেদিন শুনেছি।

বাঙ্গালোর থেকে প্রথম গেলেন মদনাপল্লী। পরে নাগপুর গিয়েছিলেন জাতীয় খ্রীস্টান মহাসভায় দক্ষিণ-আফ্রিকার ভারতীয়দের বিষয়ে আলোচনায় যোগ দিতে। ওয়ার্ধায় গান্ধীজির সঙ্গে দেখা হল। সেখানে দু বন্ধুতে বহুক্ষণ কথাবার্তা চলল। ধর্মসম্বন্ধে গভীর আলোচনাও হয়। আমেদাবাদে সারাভাইদের বাড়িতে বিশ্রাম ও চিকিৎসায় কয়েকদিন কাটল।

দিল্লী ফিরে আসার পর ডিসেম্বর মাসে (১৯৩৯) একখানি চিঠি পেলেন। দিল্লীর তথ্যমন্ত্রণালয় যুদ্ধবিষয়ক প্রচারব্যাপারে তাঁর মতামত জানতে চান। এণ্ডরুজ চিন্তা করতে লাগলেন, ভারত-সম্পর্কে যথার্থ তথ্যপ্রচারে তিনি কিভাবে সাহায্য করতে পারেন।

দীপনির্বাণ

কিন্তু জীর্ণশরীরের কর্মক্ষমতা ততদিনে শেষসীমায় পৌচেছে। এবার খ্রীস্টোৎসবের দিনটি আনন্দে কাটল শান্তিনিকেতনে। ১ জানুয়ারি ইংরেজি

নববর্ষের বাণীতে আশা প্রকাশ করলেন ১৯৪০ সালের মধ্যেই ভারতবর্ষ স্বাধীন হবে। এটিই হল তাঁর শেষ প্রকাশ্য ঘোষণা।[১] পরের কয়েক সপ্তাহে শরীরও একটু সেরেছিল। রোজ ভোরে উঠে হেঁটে চলে যেতেন স্কুলের দিকে লাল কাঁকরের রাস্তা ধরে। হঠাৎ শরীর খারাপ হয়ে পড়ায় ২৭ জানুয়ারি তারিখে কলকাতার প্রেসিডেন্সি জেনারেল হাসপাতালে গিয়ে ভর্তি হলেন।[২] সেখানে পরীক্ষা করে জানা গেল একটি বড়োরকম অস্ত্রোপচার প্রয়োজন হতে পারে। তখনই সাধারণ একটি অস্ত্রোপচার হয়ে গেল। সেরে উঠছিলেন ধীরে ধীরে। বড়ো অস্ত্রোপচারের দিন পিছিয়ে দেওয়া হল। চিঠির উত্তর মুখে বলতেন। স্নেহের পাত্রদের আশীর্বাদ আর তাঁর জন্য উপাসনার অনুরোধ জানাতেন।

অসুখের খবর পেয়ে মহাত্মা গান্ধী ১৭ ফেব্রুয়ারি তারিখে কলকাতায় এসে চার্লির কাছে অনেকক্ষণ বসলেন।[৩]

গভীর অনুরাগে চার্লি বন্ধুর দিকে তাকিয়ে থেকে ধীরে উচ্চারণ করলেন, 'মোহন, স্বরাজ আসছে। ইংরেজ আর ভারতীয়রা ইচ্ছা করলেই স্বরাজ আনতে পারে।' ইংলণ্ড আর ভারতবর্ষ এক মৈত্রীবন্ধনে বদ্ধ হবে— এ যে ছিল তাঁর দিবারাত্রির কামনা। বন্ধু মোহনকে আরো বললেন, 'আমার এ রোগ ঈশ্বরেরই আশীর্বাদ।' ফ্রান্সিস টমসনের কবিতার কয়েকটি পঙ্‌ক্তি অতি ধীরে আবৃত্তি করে গেলেন।[৪]

তাঁকে আলিঙ্গনে আবদ্ধ করে তাঁর ললাটে শেষচুম্বন অঙ্কিত করে মহাত্মা যখন উঠে দাঁড়ালেন, তাঁর চক্ষু তখন অশ্রুসজল। পাঁচবছর পরে ১৯৪৫

---

১ *Visva-Bharati News*, June 1940।

২ তদেব, February 1940।

৩ রবীন্দ্রজীবনী, ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ২১৭।

৪
Does the fish soar to find the Ocean
The eagle plunge to find the air
That we ask of the stars in motion
If they have rumour of thee there ?

Not where the wheeling systems darken
And our benumbed conceiving soars—
The drift of pinions, would we hearken
Beats at our own clay-shuttered doors.

সালের ১৯ ডিসেম্বর এণ্ডরুজ-ভবনের ভিত্তিস্থাপনের জন্য মহাত্মা এসেছেন শান্তিনিকেতনে। ভিত্তিপ্রস্তর গাঁথবার জন্য যে জল নিয়ে যাওয়া হয়েছিল তার অনেকখানি পথে ছলকে পড়ে যায়। মহাত্মা দেখে বলেছিলেন, 'তাতে ভাবনার কী আছে? চার্লির জন্য এখনো আমার চোখে অফুরন্ত জল জমে আছে।'[১]

গুডফ্রাইডের ছুটিতে এলাহাবাদ থেকে তাঁর সন্তানপ্রতিম সুধীর রুদ্র এসেছিলেন। তিনি এলাহাবাদে ফিরে যাবার আগে দুজনে একসঙ্গে প্রার্থনা করলেন। এণ্ডরুজের জিভে তখন জড়তা এসেছে। তবু কী সে মর্মস্পর্শী প্রার্থনা তাঁর।

অবশেষে ডাক্তাররা গুরুতর অস্ত্রোপচারের ঝুঁকি নেওয়াই স্থির করলেন। গান্ধীজি তাঁর ভালোবাসা ও মঙ্গল-কামনা জানিয়ে একটি টেলিগ্রাম করেছিলেন। সেটি পড়ে কিছুক্ষণ চুপ করে রইলেন। পরে বললেন—

> আমার মনে আর কোনো উদ্‌বেগ নেই। একবার বাপুর অনশনের সময় একটি চিকিৎসকের পরামর্শ নেবার জন্য তাঁকে অনুরোধ জানিয়েছিলাম। তিনি উত্তর দিয়েছিলেন, 'চার্লি, তোমার বুঝি ঈশ্বরে বিশ্বাস নেই?' আজ আমিও সেই মহাবৈদ্যের কথা চিন্তা করছি। তিনি যা করবেন তা আমার পক্ষে, ভারতের পক্ষে, সমগ্র পৃথিবীর পক্ষে মঙ্গলের হবে।

প্রসন্ন প্রশান্ত অন্তর তাঁর তখন গুরুদেবের সঙ্গে নিবিড় সংযোগে বিশ্বব্যাপী প্রেমে আপ্লুত হল। রোগশয্যায় ডক্টর অমিয় চক্রবর্তীকে নির্দেশ দেন, মৃত্যু হলে তাঁর শেষ মনোভাব যেন গুরুদেবকে জানানো হয়। শেষবাণীতে তিনি বলেছেন, এই পৃথিবীতে ঈশ্বরের সব চেয়ে বড়ো দান তাঁর কাছে এসেছে বন্ধুত্বের আকারে, আর তাঁর অন্তিম কামনা জানিয়েছেন, এ ধরায় যেন স্বর্গরাজ্যের প্রতিষ্ঠা হয়।[২]

৩ মার্চ তারিখে রায়রডন নার্সিং হোমে তাঁর দেহে দ্বিতীয় অস্ত্রোপচার হয়। তার পরেও যখনই শয্যাপার্শ্বে প্রিয়জন কাউকে দেখেছেন মধুর হাসিতে মুখ উদ্‌ভাসিত হয়ে উঠেছে। অসামান্য সেবা করেছে নার্স এবং একটি নবাগত হিন্দুস্থানী বেয়ারা। ভালোবাসার শক্তিতে সর্বত্র সেবার ইচ্ছা জাগিয়েছে।[৩]

---

১ এ দুটি ঘটনার প্রত্যক্ষদর্শী বিনয়-ভবনের প্রাক্তন অধ্যাপক পরলোকগত শরৎচন্দ্র দত্তের নিকট হইতে এই অংশটি প্রাপ্ত।

২ *Visva-Bharati News*, April 1940।

৩ ১৯৪০ সালের ৬ এপ্রিল পুরী থেকে রবীন্দ্রনাথকে লেখা ডক্টর অমিয় চক্রবর্তীর পত্র।

কলকাতার বিশপ ডঃ ফস্ ওয়েস্টকট প্রার্থনান্তে তাঁকে অন্তিম আশীর্বাণী শোনালেন। অস্ফুটস্বরে এণ্ডরুজ বললেন, 'এই তো চেয়েছিলাম।' ডঃ ফস ওয়েস্টকট তখন ভারতের মেট্রোপলিটন। তিনি ছিলেন ডারহামের বিশপ ওয়েস্টকটেরই পুত্র, এণ্ডরুজের আবাল্য-সুহৃদ বেসিলের দাদা। ৫ এপ্রিল ১৯৪০ শুক্রবার অতিপ্রত্যুষে এণ্ডরুজের দেহাবসান ঘটে। মৃত্যুর পরে তাঁর বিছানায় তাঁর ব্যবহৃত ঘড়ি ও ব্যাগ পাওয়া গিয়েছিল— অপরিগ্রহের প্রতীক এই সন্ন্যাসীর ব্যাগে ছিল একটি মাত্র তামার পয়সা। এই তিনটি জিনিসই এখনো সযত্নে রবীন্দ্র-সদনের প্রদর্শশালায় রক্ষিত।

লোয়ার সার্কুলার রোডের সমাধিক্ষেত্রে তাঁর পূতদেহ সমাহিত করা হয়। শবশোভাযাত্রায় কোনো গাড়ি ছিল না। ধনী নির্ধন সকলেই পায়ে হেঁটে গিয়েছিলেন। কফিন বহন করে যাঁরা নিয়ে গিয়েছিলেন তাঁদের মধ্যে ছিলেন পূর্বপশ্চিম উভয় দেশের এবং খ্রীস্টান অ-খ্রীস্টান সর্বধর্মমতের লোক। শেষকৃত্য করলেন ডঃ ফস্ ওয়েস্টকট।

'যীশুখ্রীস্টের জীবনী' লেখা তাঁর শেষ হয় নি। কিন্তু সেই জীবন নিজে বরণ করে নিয়ে তাঁর প্রভুর চরম আত্মদানেরই অনুবর্তন করেন তিনি— আর দেশে দেশান্তরে প্রপীড়িত মানুষের পরিত্রাণে আপনাকে দেন উৎসর্গ করে।

বিপুল এ পৃথিবীতে নিষ্কাম কর্মসাধনায় কেবল মানুষের অধিকার। খণ্ডকালের মধ্যে তার সাধ্য সীমিত। যুগযুগান্ত ধরে যিনি ফল ফলান, সিদ্ধি তাঁরই হাতে।

তবু জয়ে পরাজয়ে ক্ষোভে নিরাশায়, যাঁর অশ্রান্ত চরণ কখনো টলে নি, লেখনী বিরাম পায় নি, কর্মপ্রচেষ্টা ক্ষান্ত হয় নি— তাঁর অম্লান প্রাণশিখা কি অনির্বাণ নয়? চিরদিনের মানুষকে কি তাঁর অনিঃশেষ প্রেমের উৎস সঞ্জীবিত করবে না? জানাবে না কি—

ফুরায় ফুল ফোটা, পাখিও গান ভোলে
দখিনা বায়ু সেও উদাসী যায় চলে
তবু কি ভরি তারে অমৃত ছিল না রে
স্মরণ তারো কি গো মরণে যাবে ঠেকি?

পরিশিষ্ট

দীনবন্ধু এণ্ড্রুজ

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

আমাদের প্রিয়তম বন্ধু চার্লস এণ্ড্রুজের গতপ্রাণ দেহ আজ এই মুহূর্তে সর্বগ্রাসী মাটির মধ্যে আশ্রয় নিল। মৃত্যুতে সত্তার চরম অবসান নয় এই কথা বলে শোকের দিনে আমরা ধৈর্য রক্ষা করতে চেষ্টা করি, কিন্তু সান্ত্বনা পাই নে। পরস্পরের দেখায় শোনায় নানাপ্রকার আদান-প্রদানে দিনে দিনে প্রেমের অমৃতপাত্র পূর্ণ হয়ে উঠতে থাকে। আমাদের দেহাশ্রিত মন ইন্দ্রিয়বোধের পথে মিলনের জন্যে অপেক্ষা করতে অভ্যস্ত। হঠাৎ যখন মৃত্যু সেই পথ একেবারে বন্ধ করে দেয় তখন এই বিচ্ছেদ দুর্বিষহ হয়ে ওঠে। দীর্ঘকাল এণ্ড্রুজকে বিচিত্রভাবে পেয়েছি। আজ থেকে কোনোদিন আর সেই প্রীতিস্নিগ্ধ সাক্ষাৎ মিলন সম্ভব হবে না এ কথা মেনে নিতেই হবে, কিন্তু কোনোরূপে তার ক্ষতিপূরণের আশ্বাস পেতে মন ব্যাকুল হয়ে ওঠে।

যে মানুষের সঙ্গে আমাদের প্রয়োজনের সম্বন্ধ তার সঙ্গে যখন বিচ্ছেদ ঘটে তখন উদ্‌বৃত্ত কিছুই থাকে না। তখন সহযোগিতার অবসানকে চরম ক্ষতি বলে সহজে স্বীকার করতে পারি। সেইরকম সাংসারিক সুযোগ ঘটানো দেনা-পাওনার সম্বন্ধ মৃত্যুরই অধিকারগত। কিন্তু সকল প্রয়োজনের অতীত ভালোবাসার সম্পর্ক অসীম রহস্যময়, দৈহিক সত্তার মধ্যে তাকে তো কুলোয় না। এণ্ড্রুজের সঙ্গে আমার অযাচিত দুর্লভ সেই আত্মিক সম্বন্ধই ঘটেছিল। এ বিধাতার অমূল্য বরদানেরই মতো। এর মধ্যে সাধারণ সম্ভবপরতার কারণ খুঁজে পাওয়া যায় না। একদিন অকস্মাৎ সম্পূর্ণ অপরিচয়ের ভিতর হতে এই খ্রীস্টান সাধুর ভগবদ্ভক্তির নির্মল উৎস থেকে উৎসারিত বন্ধুত্ব আমার দিকে পূর্ণবেগে প্রবাহিত হয়ে এসেছিল, তার মধ্যে না ছিল স্বার্থের যোগ, না ছিল খ্যাতির দুরাশা, কেবল ছিল সর্বতোমুখী আত্মনিবেদন। তখন কেনোপনিষদের এই প্রশ্ন আপনি আমার মনে জেগে উঠেছে, কেনেষিতং প্রেষিতং মনঃ, এই মনটি কার দ্বারা আমার দিকে প্রেরিত হয়েছে, কোথায় এর রহস্যের মূল। জানি এর মূল ছিল তাঁর অসাম্প্রদায়িক অকৃত্রিম ঈশ্বর-ভক্তির মধ্যে। সেইজন্যে এর প্রথম আরম্ভের কথাটা বলা চাই।

তখন আমি লণ্ডনে ছিলুম। কলাবিশারদ রটেনস্টাইনের বাড়িতে সেদিন ইংরেজ সাহিত্যিকদের ছিল নিমন্ত্রণ। কবি ইয়েট্‌স্‌ আমার গীতাঞ্জলির ইংরেজি অনুবাদ থেকে কয়েকটি কবিতা তাঁদের আবৃত্তি করে শুনিয়েছিলেন। শ্রোতাদের মধ্যে এক কোণে ছিলেন এণ্ড্রুজ। পাঠ শেষ হলে আমি ফিরে যাচ্ছি আমার বাসায়। কাছেই ছিল সে-বাসা। হ্যাম্পস্টেড হীথের ঢালু মাঠ পেরিয়ে চলেছিলুম ধীরে ধীরে। সে রাত্রি ছিল জ্যোৎস্নায় প্লাবিত। এণ্ড্রুজ আমার সঙ্গ নিয়েছিলেন। নিস্তব্ধ রাত্রে তাঁর মন পূর্ণ ছিল গীতাঞ্জলির ভাবে। ঈশ্বর-প্রেমের পথে তাঁর মন এগিয়ে এসেছিল আমার প্রতি প্রেমে। এই মিলনের ধারা যে আমার জীবনের সঙ্গে এক হয়ে নানা গভীর আলাপে ও কর্মের নানা সহযোগিতায় তাঁর জীবনের শেষ পর্ব পর্যন্ত প্রসারিত হয়ে চলবে সেদিন তা মনেও করতে পারি নি।

শান্তিনিকেতনের কাজে যোগ দিতে তিনি প্রবৃত্ত হলেন। তখন আমাদের এই দরিদ্র বিদ্যায়তনের বাহ্যরূপ ছিল যৎসামান্য এবং এর খ্যাতি ছিল সংকীর্ণ। সমস্ত বাহ্য দৈন্য সত্ত্বেও তিনি এর তপস্যাকে বিশ্বাস করেছিলেন এবং আপন তপস্যার অন্তর্গত বলে স্বীকার করে নিয়েছিলেন। যাকে চোখে দেখা যায় না তাকে তাঁর প্রেমের দৃষ্টি দেখেছিল। আমার প্রতি ভালোবাসার সঙ্গে জড়িত করে তিনি শান্তিনিকেতনকে মনপ্রাণ দিয়ে ভালোবেসেছিলেন। সবল চরিত্রশক্তির গুণ এই যে কেবল ভাবাবেগের উচ্ছ্বাসের দ্বারা সে আপনাকে নিঃশেষ করে না, সে আপনাকে সার্থক করে দুঃসাধ্য ত্যাগের দ্বারা। কখনো তিনি অর্থ সঞ্চয় করেন নি, তিনি ছিলেন অকিঞ্চন। কিন্তু কতবার এই আশ্রমের অভাব জেনে কোথা থেকে তিনি যে একে যথেষ্ট অর্থ দান করেছেন তা জানতেও পারি নি। অন্যের কাছে কতবার ভিক্ষা চেয়েছিলেন, কখনো কিছুই পান নি, কিন্তু সেই ভিক্ষা উপলক্ষে অসংকোচে খর্ব করেছেন যাকে সংসারের আদর্শে বলে আত্মসম্মান। নিরন্তর দারিদ্র্যের ভিতর দিয়েই শান্তি-নিকেতন আপন আন্তরিক চরিতার্থতা প্রকাশের সাধনায় নিযুক্ত ছিল এতেই বোধ করি বেশি করে তাঁর হৃদয় আকর্ষণ করেছিল।

আমার সঙ্গে এণ্ড্রুজের যে প্রীতির সম্বন্ধ ছিল সেই কথাটাই এতক্ষণ বললুম, কিন্তু সকলের চেয়ে আশ্চর্যের বিষয় ছিল ভারতবর্ষের প্রতি তাঁর একনিষ্ঠ প্রেম। তাঁর এই নিষ্ঠা দেশের লোক অকুণ্ঠিত মনে গ্রহণ করেছে কিন্তু তার সম্পূর্ণ মূল্য কি স্বীকার করতে পেরেছিল? ইনি ইংরেজ, কেম্‌ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রীধারী।

কী ভাষায় কী আচারে কী সংস্কৃতিতে সকল দিকেই এঁর আজন্মকালের নাড়ীর যোগ ইংলণ্ডের সঙ্গে। তাঁর আত্মীয়মণ্ডলীর কেন্দ্র ছিল সেইখানেই। যে ভারতবর্ষকে তিনি একান্ত আত্মীয় বলে চিরদিনের মতো স্বীকার করে নিলেন, তাঁর দেহমনের সমস্ত অভ্যাসের থেকে তার সমাজব্যবহারের ক্ষেত্র ছিল বহুদূরে। এই একান্ত নির্বাসনের পরিপ্রেক্ষিতেই তিনি প্রকাশ করেছেন তাঁর বিশুদ্ধ প্রেমের মাহাত্ম্য। এ দেশে এসে নির্লিপ্ত সাবধানতার সঙ্গে দূরের থেকে ভারতবর্ষকে তাঁর প্রসাদ বিতরণ করেন নি, অসংকোচে তিনি এখানকার সর্বসাধারণের সঙ্গে সবিনয় যোগ রক্ষা করেছেন। যারা দীন, যারা অবজ্ঞা-ভাজন, যাদের জীবনযাত্রা তাঁদের আদর্শে মলিন শ্রীহীন, নানা উপলক্ষে সহজ আত্মীয়তায় তাদের সহবাস অনায়াসেই তিনি গ্রহণ করেছেন। এ দেশের শাসক-সম্প্রদায় যাঁরা তাঁর এই আচরণ প্রত্যক্ষ করেছেন তাঁরা আপনাদের রাজ-প্রতিপত্তির অসম্মান অনুভব করে তাঁর প্রতি ক্রুদ্ধ হয়েছেন, তাঁকে ঘৃণা করেছেন তা আমরা জানি, তবু স্বজাতির এই অশ্রদ্ধার প্রতি তিনি ভ্রূক্ষেপমাত্র করেন নি। তাঁর যিনি আরাধ্য দেবতা ছিলেন তাঁকে তিনি জনসাধারণের অভাজনদের বন্ধু বলে জানতেন, তাঁরই কাছ থেকে শ্রদ্ধা তিনি অন্তরের সঙ্গে প্রার্থনা করেছেন। এই ভারতবর্ষে কী পরের কী আমাদের নিজের কাছে যেখানেই মানুষের প্রতি অবজ্ঞা অবারিত সেখানেই সকল বাধা অতিক্রম করে তিনি আপন খ্রীস্টভক্তিকে জয়যুক্ত করেছেন। এই প্রসঙ্গে এ কথা বলতে হবে অনেকবার আমাদের দেশের লোকের কাছ থেকেও তিনি বিরুদ্ধতা ও সন্দিগ্ধ ব্যবহার পেয়েছিলেন, সেই অন্যায় আঘাত অম্লানচিত্তে গ্রহণ করাও ছিল তাঁর পূজারই অঙ্গ।

যে সময় এণ্ড্রুজ ভারতবর্ষকে আপন আমৃত্যুকালের কর্মক্ষেত্ররূপে স্বীকার করে নিয়েছিলেন সেই সময়ে এ দেশে রাষ্ট্রীয় উত্তেজনা ও সংঘাত প্রবলভাবে জেগে উঠেছিল। এমন অবস্থায় এ-দেশীয়দের মধ্যে আপন সৌহার্দ্যের আসন রক্ষা করে টিঁকে থাকা ইংরেজের পক্ষে কত দুঃসাধ্য সে কথা সহজেই অনুমান করা যায়। কিন্তু দেখেছি তিনি ছিলেন অতি সহজে তাঁর আপন স্থানে, তাঁর মধ্যে কোনো দ্বিধাদ্বন্দ্ব ছিল না। এই-যে অবিচলিতচিত্তে কঠিন পরীক্ষার মধ্যে জীবনের লক্ষ্য স্থির রাখা, এতেই তাঁর আত্মিক শক্তির প্রমাণ পাওয়া যায়।

যে এণ্ড্রুজকে আমি জানি দুই দিক থেকে তাঁর পরিচয় পাবার সুযোগ

আমার হয়েছে, এক আমার অত্যন্ত কাছে, আমার প্রতি সুগভীর ভালোবাসায়। এমনতরো অকৃত্রিম অপর্যাপ্ত ভালোবাসাকে আমি আমার জীবনের শ্রেষ্ঠ সৌভাগ্যের মধ্যে গণ্য করি। আর দেখেছি দিনে দিনে নানা উপলক্ষে ভারতবর্ষের কাছে তাঁর অসামান্য আত্মোৎসর্গ। দেখেছি তাঁর অশেষ করুণা এ দেশের অন্ত্যজদের প্রতি। তাদের কোনো দুঃখ বা অসম্মান যখনই তাঁকে আহ্বান করেছে তখনই নিজের অসুবিধা বা অস্বাস্থ্যের প্রতি লক্ষ না রেখে সকল কাজ ফেলে ছুটে গিয়েছেন তাদের মধ্যে। এইজন্যই তাঁকে স্থিরভাবে আমাদের কোনো নির্দিষ্ট কাজে বেঁধে রাখা অসম্ভব ছিল।

এই যে তাঁর প্রীতি এ যে সংকীর্ণভাবে ভারতবর্ষের সীমাগত সে কথা বললে ভুল বলা হবে, তাঁর খ্রীস্টধর্মে সর্বমানবের প্রতি প্রীতির যে অনুশাসন আছে ভারতীয়দের প্রতি প্রীতি তারই এক অংশ। একদা তারই প্রমাণ পেয়েছিলুম যখন দক্ষিণ-আফ্রিকার কাফ্রী অধিবাসীদের সম্বন্ধে তাঁর উৎকণ্ঠা দেখেছি, যখন সেখানকার ভারতীয়রা কাফ্রিদেরকে আপনাদের থেকে স্বতন্ত্র করে হেয় করে দেখবার চেষ্টা করেছিল, এবং য়ুরোপীয়দের মতোই তাদের চেয়ে আপনাদের উচ্চাধিকার কামনা করেছিল। এণ্ডরুজ এই অন্যায় ভেদবুদ্ধিকে সহ্য করতে পারেন নি, এই-সকল কারণে একদিন এণ্ডরুজকে সেখানকার ভারতীয়েরা শত্রু বলেই কল্পনা করেছিল।

আজকের দিনে যখন অতিহিংস্র স্বাজাত্যবোধ অসংযত ঔদ্ধত্যে উদ্ধত হয়ে রক্তপ্লাবনে মানবসমাজের সমস্ত ভদ্রতার সীমানা বিলুপ্ত করে দিচ্ছে তখনকার যুগের সর্বশ্রেষ্ঠ প্রকাশ সর্বমানবিকতা। কঠিন বিরুদ্ধতার মধ্য দিয়েই আসে যুগবিধাতার প্রেরণা। সেই প্রেরণাই মূর্তি নিয়েছিল এণ্ডরুজের মধ্যে। আমাদের সঙ্গে ইংরেজের যে সম্বন্ধ সে তাদের স্বাজাত্য ও সাম্রাজ্যের অতি কঠিন ও জটিল বন্ধনের। সেই জালের কৃত্রিমতার ভিতর দিয়ে মানুষ ইংরেজ আপন ঔদার্য নিয়ে আমাদের নিকটে আসতে পদে পদে বাধা পায়; আমাদের সঙ্গে অহংকৃত দূরত্ব রক্ষা করা তাদের সাম্রাজ্যরক্ষার আড়ম্বরের আনুষঙ্গিকরূপে উত্তুঙ্গ হয়ে রয়েছে। সমস্ত দেশকে এই অমর্যাদার দুঃসহ ভার বহন করতে হয়েছে। সেই ইংরেজের মধ্য থেকে এণ্ডরুজ বহন করে এনেছিলেন ইংরেজের মনুষ্যত্ব। তিনি আমাদের সুখে দুঃখে উৎসবে ব্যসনে বাস করতে এলেন এই পরাজয়-লাঞ্ছিত জাতির অন্তরঙ্গরূপে। এর মধ্যে লেশমাত্র ছিল না উচ্চমঞ্চ থেকে অভাগ্যদের অনুগ্রহ করার আত্মশ্লাঘা সম্ভোগে।

এর থেকে অনুভব করেছি তাঁর স্বাভাবিক অতি দুর্লভ সর্বমানবিকতা। আমাদের দেশের কবি একদিন বলেছিলেন—

সবার উপরে মানুষ সত্য
তাহার উপরে নাই—

প্রয়োজন হলে এই কবি-বচন আমরা আউড়িয়ে থাকি কিন্তু আমরা এই সত্যবাক্যকে অবজ্ঞা করবার জন্যে ধর্মের নামে সাম্প্রদায়িক সম্মার্জনীকে যে-রকম ব্যবহার করে থাকি এমন আর কোনো জাতি করে কি না সন্দেহ। এইজন্যে বিদ্রূপ সহ্য করেই আমাকে বলতে হয়েছে আমি শান্তিনিকেতনে বিশ্বমানবের আমন্ত্রণস্থলী স্থাপন করেছি। এইখানে আমি পেয়েছি সমুদ্রপার থেকে সত্যমানুষকে। তিনি এই আশ্রমে সমস্ত হৃদয় নিয়ে যোগ দিতে পেরেছেন মানুষকে সম্মান করার কাজে। এ আমাদের পরম লাভ এবং সে লাভ এখনো অক্ষয় হয়ে রইল। রাজনৈতিক উত্তেজনার ক্ষেত্রে অনেক বার অনেক স্থানে তিনি আপনার কর্মশক্তি নিয়োগ করেছিলেন, কখনো কখনো তার আলোড়নের দ্বারা আবিল করেছিলেন আমাদের আশ্রমের শান্ত বায়ুকে। কিন্তু তার ব্যর্থতা বুঝতে তাঁর বিলম্ব হয় নি, এবং রাষ্ট্রীয় মাদকতার আক্রমণে শেষ পর্যন্ত আশ্রমকে বিপর্যস্ত হতে দেন নি। কেবলমাত্র তাঁর জীবনের যা শ্রেষ্ঠ দান তাই তিনি আমাদের জন্য এবং সকল মানবের জন্যে মৃত্যুকে অতিক্রম করে রেখে গেলেন— তাঁর মরদেহ ধূলিসাৎ হবার মুহূর্তে এই কথাটি আমি আশ্রমবাসীদের কাছে গভীর শ্রদ্ধার সঙ্গে জানিয়ে গেলাম।

৫. ৪. ৪০

—শান্তিনিকেতন মন্দিরে কথিত
ও শ্রীনির্মলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় -কর্তৃক অনুলিখিত

২

এণ্ডরুজ-স্মরণে

মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধী

সি. এফ. এণ্ডরুজের মৃত্যুতে শুধু ভারতবর্ষ কেন সমগ্র মানবসমাজই ক্ষতিগ্রস্ত হল, কেননা সে যে হারিয়ে ফেলল তার একটি সুসন্তানকে, তার একটি একনিষ্ঠ সেবককে। তবু তো শারীরিক যন্ত্রণা থেকে তাঁর মুক্তি নিয়ে এল এই মৃত্যুই। আবার এই মৃত্যুতেই যে পেলেন তিনি তাঁর পার্থিব জীবনের শেষ পরিপূর্ণতা। তাঁর এই মরদেহের বিলুপ্তি সত্ত্বেও তিনি কিন্তু বেঁচে থাকবেন। তিনি বাঁচবেন সেই শতসহস্র মানবের মধ্যে যাঁরা তাঁকে প্রত্যক্ষ জেনে ধন্য হয়েছেন বা যাঁরা তাঁর অপূর্ব গ্রন্থরাজি, অমূল্য রচনাবলী পড়ে জ্ঞান আহরণ করেছেন।

চার্লি এণ্ডরুজ ছিলেন মহদাশয় ইংরেজদের অন্যতম। পুণ্যভূমি ইংলণ্ডের শ্রেষ্ঠ সন্তানদের একজন ছিলেন বলেই তিনি আমাদের ভারতমাতারও সুসন্তান হতে পেরেছিলেন। তাঁর প্রভু যীশুখ্রীস্টের নামে, সমগ্র মানবসমাজের হিতে সমর্পিত এই পূত জীবন। এমন সাধুপ্রকৃতির মানব, এমন খ্রীস্টপ্রেমিক আর দ্বিতীয় কোনো ব্যক্তি আমার চোখে পড়ে নি। ভারতবাসীরা তাঁকে 'দীনবন্ধু' আখ্যা দিয়েছিলেন— দরিদ্র ও নিপীড়িতের সার্থক বন্ধু ছিলেন তিনি সর্বত্রই —তাই এ সম্মান যথার্থই তাঁর প্রাপ্য।

সম্ভবত আমার চেয়ে ঘনিষ্ঠভাবে অন্য কেউই চার্লিকে দেখে নি। গুরুদেব ছিলেন তাঁর গুরু। আর আমার সঙ্গে দক্ষিণ-আফ্রিকায় যেদিন চার্লির প্রথম সাক্ষাৎ হয় সেইদিন থেকে তাঁর জীবনের অন্তিমক্ষণ পর্যন্ত আমরা ছিলাম দুটি ভাই।, আমাদের উভয়ের মধ্যে কোনো ব্যবধান, কোনো দূরত্ব ছিল না। কেবলমাত্র ইংরেজ ও ভারতীয় দুই ব্যক্তির বন্ধুত্ব তো এ নয়। এ যে ছিল দুটি সত্যসন্ধানীর, দুটি লোকসেবকের মধ্যে এক অচ্ছেদ্য বন্ধন।

ইংলণ্ড ও ভারতের একনিষ্ঠ সেবক এই বন্ধুটির মৃত্যুর স্মৃতি সামনে রেখেই যেন আজ আমরা ইংলণ্ড ও ভারত -বাসীরা একযোগে ভেবে দেখি কী সে উত্তরাধিকার যা তিনি আমাদের জন্য রেখে গেলেন। তাঁর চেয়ে বড়ো

স্বদেশপ্রেমিক ইংলণ্ডে আর নেই। আবার ভারতের প্রতি তাঁর ভালোবাসা— তাও তো কোনো ভারতীয়ের চেয়ে তিলমাত্র কম ছিল না। অন্তিমশয্যায় শুয়ে তিনি আমাকে বললেন, 'মোহন, স্বরাজ আসছে। ইংরেজ আর ভারতীয়রা ইচ্ছা করলেই তো স্বরাজ আনতে পারেন।' ইংলণ্ডের বর্তমান শাসকসম্প্রদায় এণ্ডরুজকে ঘনিষ্ঠভাবেই জানতেন। তা ছাড়া আজকের দিনে যে-সব ইংরেজদের মতামতের বিশেষ মূল্য আছে— তাঁরাও কেউ তাঁর অপরিচিত ছিলেন না। ভারতবাসীদের মধ্যেও যাঁরা রাজনীতি নিয়ে চিন্তা করেন তাঁরা প্রত্যেকেই এণ্ডরুজকে জানতেন।

আজ এই মুহূর্তে ইংরেজদের কোনো অপকীর্তির কথা মনে আনতেই চাই না। সে-সব কথা আজ অনায়াসে ভুলে যাওয়া চলে। কিন্তু ভারতবর্ষ ও ইংলণ্ড— এ দুটি দেশ যতকাল ধরাপৃষ্ঠে থাকবে, ততদিন ভোলা চলবে না এণ্ডরুজের মহান বীরত্বের স্মৃতিপূত অপূর্ব জীবনকাহিনী। এণ্ডরুজকে যদি আমরা সত্যিই ভালোবাসি, তবে আজকের দিনে কোনো ইংরেজের প্রতি বিদ্বেষভাব আমাদের মনে আসতেই পারে না। কেননা তিনি যে ছিলেন মহত্তম ইংরেজদেরই একজন। তাই ভারতবর্ষ ও ইংলণ্ডের শ্রেষ্ঠ সন্তানদের নিরন্তর প্রয়াসে উভয় দেশের গ্রহণযোগ্য একটি পন্থা নির্ধারণ সম্ভব বলেই আমার মনে হয়। এণ্ডরুজের আমৃত্যু সাধনার স্মৃতি আজ আমাদের সামনে রয়েছে বলেই এ কার্যে ব্রতী হতে আমাদের কোনো দ্বিধা, কোনো সংশয় নেই। আজকের দিনে এণ্ডরুজের সেই সদাপ্রসন্ন প্রশান্ত দেবোপম মুখশ্রী স্মরণে আনলে তখনই আমার মনে পড়ে যায় জগৎসভায় ভারতবর্ষ যাতে তার স্বকীয় স্বাধীনস্থান অধিকার করতে পারে তারই প্রয়াসে তাঁর প্রেম-নিবেদিত অজস্র সেবাকর্ম।

—